Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author:	Soumen Mondal
Assignment title:	slot 20
Submission title:	Philosophy V Part 2
File name:	Philosophy_V_Total_Book_24.01.2017_Curve_Red.pdf
File size:	16.1M
Page count:	144
Word count:	308
Character count:	4,552
Submission date:	29-Jul-2022 07:15AM (UTC-0700)
Submission ID:	1876569190

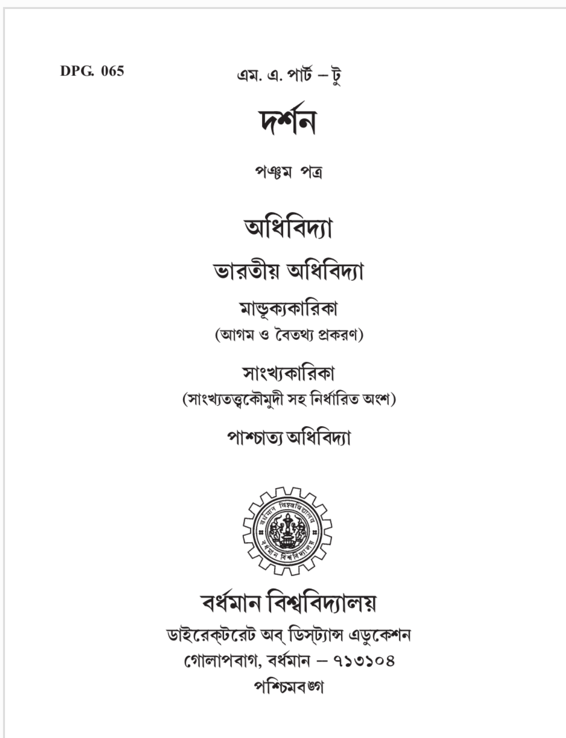

DPG. 065

এম. এ. পার্ট – টু

দর্শন

পঞ্চম পত্র

অধিবিদ্যা

ভারতীয় অধিবিদ্যা

মাণ্ডূক্যকারিকা

(আগম ও বৈতথ্য প্রকরণ)

সাংখ্যকারিকা

(সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী সহ নির্ধারিত অংশ)

পাশ্চাত্য অধিবিদ্যা

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

ডাইরেক্টরেট অব্ ডিস্ট্যান্স এডুকেশন

গোলাপবাগ, বর্ধমান – ৭১৩১০৪

পশ্চিমবঙ্গ

Copyright 2022 Turnitin. All rights reserved.

Philosophy V Part 2

by Soumen Mondal

Submission date: 29-Jul-2022 07:15AM (UTC-0700)
Submission ID: 1876569190
File name: Philosophy_V_Total_Book_24.01.2017_Curve_Red.pdf (16.1M)
Word count: 308
Character count: 4552

DPG. 065

এম. এ. পার্ট – টু

দর্শন

পঞ্চম পত্র

অধিবিদ্যা

ভারতীয় অধিবিদ্যা

মাণ্ডূক্যকারিকা

(আগম ও বৈতথ্য প্রকরণ)

সাংখ্যকারিকা

(সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী সহ নির্ধারিত অংশ)

পাশ্চাত্য অধিবিদ্যা

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
ডাইরেক্টরেট অব্ ডিস্ট্যান্স এডুকেশন
গোলাপবাগ, বর্ধমান – ৭১৩১০৪
পশ্চিমবঙ্গ

সম্পাদক

অধ্যাপক অমরনাথ ভট্টাচার্য

দর্শন বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক দিলীপ কুমার মোহান্ত

দর্শন বিভাগ
কলিকাত বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপিকা কোয়েলী চক্রবর্তী

দর্শন বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

গ্রন্থস্বত্ব © ২০০৮

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
বর্ধমান - ৭১৩ ১০৪
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

পুনর্মুদ্রণ : ২০১৩
পুনর্মুদ্রণ নভেম্বর, : ২০১৩
পুনর্মুদ্রণ : ২০১৪
পুনর্মুদ্রণ : ২০১৫
পুনর্মুদ্রণ : ২০১৬

প্রকাশনা

ডাইরেক্টর, ডিসট্যান্স এডুকেশন
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

আর্থিক সহায়তা

ডিসট্যান্স এডুকেশন কাউন্সিল
নয়াদিল্লি, ভারত

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ

[illegible]
[illegible]
[illegible] 700 056

বর্তমান-পুনর্মুদ্রন-প্রসঙ্গে

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষা কার্যক্রমের দর্শন পাঠক্রম সংক্রান্ত পাঠ-উপকরণগুলি সম্পূর্ণ করার এক বিরাট দায়িত্ব পালন করেছেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান সহ অধিকাংশ প্রাক্তন ও সকল বর্তমান অধ্যাপকবৃন্দ। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাদের পরামর্শ ও সহায়তায় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষা কার্যক্রমের দর্শনের স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পাঠ-উপকরণগুলি শিক্ষার্থী ও সাধারণ পাঠকের দর্শন চর্চার অন্যতম সহায় ও সঙ্গী। এই পাঠ-উপকরণগুলির জুলাই, ২০১০ সংস্করণ প্রায় নিশেঃষিত হওয়ায় মার্চ, ২০১৩ পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশের উদ্যেগে গৃহীত হয়। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক স্মৃতিকুমার সরকারের নির্দেশে শিক্ষার্থী ও সাধারণ পাঠকের ব্যবহারিক সুবিধার্থে এই পুনর্মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশের ক্ষেত্রে সামান্য পরিমার্জনার সুযোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দর্শনের এম. এ প্রথম বর্ষের পাঠ-উপকরণগুলি আগে ন'টি পর্যায়-গ্রন্থে বিন্যস্ত ছিল। বর্তমান সংস্করণে ন'টি পর্যায়-গ্রন্থকে এক মলাটবন্দী করে পাঁচটি পর্যায়-গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশ করা হল। পাঠ-উপকরণগুলির সজ্জাক্রমের এই পরিবর্তন ব্যতীত পূর্ববর্তী সংস্করণের সবকিছুই অবিকল একই রয়েছে। এই কারণেই রয়ে গেছে মুদ্রণ প্রমাদগুলি। আশা করি অদূর ভবিষ্যতে সমস্ত মুদ্রণ প্রমাদকে সংশোধন করে মুদ্রণ ত্রুটিহীন পাঠ-উপকরণ আমরা প্রকাশ করতে পারব।

শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠ-উপকরণগুলি সময়মত পৌঁছে দিতে গিয়ে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে বর্তমান সংস্করণ প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বতমার্ন উপাচার্য অধ্যাপক স্মৃতিকুমার সরকারের আনুপূর্বিক তত্ত্বাবধানে ও দূরশিক্ষা অধিকরণের কর্মীবৃন্দের এবং মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের কর্মীবৃন্দের সহয়তায় এই পাঠ-উপকরণগুলি সময়মত প্রকাশ করা গেল। তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

দর্শন পঞ্চম পত্রের সংকলনে রয়েছে পঞ্চম পত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অর্ধের একত্র সংকলন।

প্রসঙ্গত, শিক্ষার্থী ও সাধারণ পাঠকদের একটি বিশেষ ভ্রম সংশোধনের জন্য জানানো হচ্ছে যে- ''বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষা কার্যক্রমের পাঠক্রম নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে অভিন্ন এবং পরীক্ষা গৃহীত হয় একই সঙ্গে '' এই ধারণা বর্তমান অবস্থায় যথাযথ নয়, বর্তমানে নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের জন্য সেমেস্টার সিস্টেম চালু হওয়ায় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষা কার্যক্রমের পাঠক্রম এখন আর নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে অভিন্ন নেই এবং পরীক্ষাও আর একই সঙ্গে গৃহীত হয় না।

ড. মলয় রায়
কোরফ্যাকাল্টি-দর্শন
দূরশিক্ষা অধিকারণ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

মাণ্ডুক্যকারিকা
অবতরণিকা

আচার্য শঙ্কর নির্গুণ অদ্বৈতবাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। অনেকে অদ্বৈতবেদান্ত দর্শনের আদি প্রবক্তা হিসাবে শঙ্করকেই বুঝে থাকেন। একথা ঠিক যে, শঙ্কর নির্গুণ অদ্বৈতবেদান্তের দৃষ্টিতে **ব্রহ্মসূত্রে**-র এবং দশটি প্রধান উপনিষদের ওপর ভাষ্য রচনা করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি প্রস্থানত্রয়েরই আচার্য। কিন্তু তাঁর পরমগুরু গৌড়পাদ যে অদ্বৈতবেদান্তদর্শনের আদি প্রবক্তা তা অনেক পাঠকই সুবিদিত নন। তাই বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগ স্নাতকোত্তর শ্রেণীর পাঠক্রমে আচার্য গৌড়পাদের **মাণ্ডুক্যকারিকা**-টির নির্ধারিত অংশ অন্তর্ভুক্ত করেছে। ইহা বেদান্ত অনুরাগীর কাছে খুবই উৎসাহব্যঞ্জক।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইরেক্টর অব্ ডিসট্যান্স এডুকেশনের পক্ষ থেকে গৌড়পাদের **মাণ্ডুক্যকারিকা** গ্রন্থটির নির্ধারিত অংশের ওপর পাঠ-উপকরণ প্রস্তুত করার জন্য আমার ওপর দায়িত্ব অর্পিত হয়। **মাণ্ডুক্যকারিকা** গ্রন্থে আগমপ্রকরণ ও বৈতথ্যপ্রকরণ স্নাতকোত্তর শ্রেণীর পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আমি সমগ্র পাঠ্যাংশ তিনটি ইউনিটে ভাগ করে পাঠ-উপকরণগুলি লিখেছি। দূর-শিক্ষার্থীরা মূল গ্রন্থের সাথে অনেক সময় পরিচিত হবার সুযোগ পায় না। এজন্য দূর-শিক্ষার্থীর সুবিধার্থে এখানে স্থলবিশেষে **মাণ্ডুক্যকারিকা** গ্রন্থের মূল ও বঙ্গানুবাদ সংযোজিত হয়েছে। উপকরণগুলি দূরশিক্ষার্থীর উপকারে লাগলে আমার শ্রম সার্থক হবে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইরেক্টরেট অব্ ডিসট্যান্স এডুকেশনের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, যারা আমাকে এই উপকরণগুলি লেখার দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তাদের সকলের প্রতি আমি হার্দিক কতৃজ্ঞতা জানাই। আমার শিক্ষক এবং গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের খ্যাতনামা অধ্যাপক ড. অমরনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় অতি সযত্নে এই পাঠ-উপকরণগুলি সম্পাদনা করেছেন। তাঁর মূল্যবান নির্দেশের দ্বারা এই পাঠ-উপকরণগুলি নানাভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে। তাঁর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।

তারিখ ঃ বর্ধমান, ০৪.০৮.২০১০

মৃদুলা ভট্টাচার্য
দর্শন বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

মাণ্ডুক্যকারিকা
সম্পাদকীয়

গৌড়পাদ প্রণীত **মাণ্ডুক্যকারিকা** গ্রন্থটিতে সর্বপ্রাচীন অদ্বৈত মত বিধৃত আছে। বেদান্তদর্শন বলতে অনেকে বেদান্তের ন্যায়প্রস্থানকে বুঝে থাকেন। কিন্তু শঙ্করপূর্ব বেদান্তদর্শন হল বেদান্তের আগম প্রস্থান। গৌড়পাদ এবং শঙ্কর দর্শনে প্রস্থানভেদ থাকলেও বেদান্তের প্রমেয়তত্ত্ব নিয়ে উভয় প্রস্থান সহমত পোষণ করে। উচ্চ অধিকারীর জন্য গৌড়পাদের দর্শনে মায়াবাদ ও মন্দাধিকারীর জন্য শঙ্করের দর্শনে বিবর্তবাদ প্রদর্শিত হয়েছে। উভয় দর্শনের ভেদ স্তরগত, তত্ত্বগত নয়।

মাণ্ডুক্যকারিকা একটি উপাদেয় প্রামাণিক অদ্বৈত গ্রন্থ। এজন্য শঙ্কর এই গ্রন্থের ওপর ভাষ্য রচনা করেছেন। এ রাজ্যে **মাণ্ডুক্যকারিকা** গ্রন্থটির পঠন-পাঠন ছিল না। তাই প্রাচীন অদ্বৈত মতের সাথে নতুন প্রজন্ম পরিচিত হোক্ এই অভিপ্রায়ে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় দর্শন বিভাগ স্নাতকোত্তর শ্রেণীর পাঠক্রমে এই গ্রন্থটি অন্তর্ভুক্ত করেছে। গ্রন্থটির নির্ধারিত অংশের ওপর দর্শন বিভাগের অধ্যাপিকা ড. মৃদুলা ভট্টাচার্যের লেখা পাঠ-উপকরণগুলি সম্পাদনার দায়িত্ব আমার ওপর অর্পণ করা হয়। আমি আনন্দের সাথে এই পাঠ-উপকরণগুলি সম্পাদনা করেছি। গ্রন্থাকার অতি দুরূহ অদ্বৈততত্ত্ব প্রাঞ্জল ভাষায় যেভাবে লিখেছে তা অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে। স্থলবিশেষ মূল সহ বঙ্গানুবাদ সংযোজিত হওয়ায় উপকরণগুলি আরও আকর্ষণীয় হয়েছে। পাঠ- উপকরণগুলি দূর-শিক্ষার্থীর একান্ত উপযোগী হয়েছে বলে মনে করি।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইরেক্টরেট অব্ ডিসট্যান্স এডুকেশনের কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট সকল সদস্য, যারা আমাকে এই সম্পাদনা কাজটি করার সুযোগ করে দিয়েছেন, তাদের প্রতি আমি অকুণ্ঠচিত্তে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। পাঠপ্রণেতা ড. মৃদুলা ভট্টাচার্যের জ্ঞানের গভীরতা ও ব্যাপকতা এবং অনবদ্য পরিবেশনা আমাকে মুগ্ধ করেছে। তার প্রতি আমার অমোঘ স্নেহাশীল রইল।

তারিখ ঃ বর্ধমান, ০৪.০৮.২০১০

অমরনাথ ভট্টাচার্য
দর্শন বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সাংখ্যকারিকা

অবতরনিকা

ঈশ্বরকৃষ্ণ বিরচিত সাংখ্যকারিকা মহর্ষি কপিল প্রণীত সাংখ্যদর্শনের অধুনা লভ্য প্রাচীনতম সূত্রগ্রন্থ। বাচস্পতি মিশ্র রচিত সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী এই সূত্রগ্রন্থের অন্যতম টীকা। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষার স্নাতকোত্তর স্তরের দর্শনের পাঠ্যসূচীতে সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী সহ সাংখ্যকারিকা-র নির্ধারিত অংশ অন্তর্ভুক্ত। এই পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত উক্ত গ্রন্থদুটির নির্ধারিত অংশ অবলম্বনে এই পাঠ্যোপকরণটি রচিত।

এটি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষার পাঠ্যোপকরণ রচনার প্রচলিত রীতি, পদ্ধতি ও নির্ধারিত শৈলীতে বিন্যস্ত। সমগ্র বিষয়টিকে তিনটি একক-এ বিভক্ত করে এই পাঠ্যোপকরণে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি একক-এ আবার রয়েছে অনেকগুলি অনুচ্ছেদ ও উপ-অনুচ্ছেদ। প্রতিটি একক, অনুচ্ছেদ ও উপ-অনুচ্ছেদ-এর নামকরণ করা হয়েছে এবং প্রতিটি একক-এ উদ্দেশ্য ছাড়াও পাঠপরিকল্পনা অনুযায়ী বিষয়ের উপস্থাপনা সারসংক্ষেপ, প্রধান শব্দগুচ্ছ, নমুনা প্রশ্নাবলী ও গ্রন্থপঞ্জী সংযোজন করা হয়েছে। দূরশিক্ষার্থীদের কাছে সহজবোধ্য করার জন্য যথসম্ভব সহজ বাংলায় এই পাঠ্যোপকরণটি রচনা করা হয়েছে। দর্শনের স্নাতকোত্তর স্তরের সেই দূরশিক্ষার্থীরা এর দ্বারা উপকৃত হলে আমার শ্রম সার্থক হবে।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইরেক্টরেট অফ্ ডিসট্যান্স এডুকেশন-এর কর্তৃপক্ষ আমাকে এই পাঠ্যোপকরণটি রচনা করার দায়িত্ব দিয়েছেন বলে আমি তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

তারিখ ঃ বর্ধমান, ০৪.০৮.২০১০

ড. রজত ভট্টাচার্য্য
দর্শন বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সাংখ্যকারিকা

সম্পাদকীয়

আদিবিদ্বান মহর্ষি কপিল প্রণীত সাংখ্যদর্শনের অধুনা লভ্য প্রাচীনতম সূত্রগ্রন্থ ঈশ্বরকৃষ্ণ বিরচিত *সাংখ্যকারিকা*। অতি চমৎকার প্রমাণতত্ত্ব এবং নীতিতত্ত্বে সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সাংখ্যদর্শন মূলত প্রমেয়শাস্ত্র-রূপে সুবিদিত। সম্ভবত সেই কারণে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর স্তরের দূরশিক্ষার্থীদের পাঠ্যসূচীর পঞ্চম পত্রের ''ভারতীয় অধিবিদ্যা'' (প্রমেয়শাস্ত্র) শীর্ষক প্রথম অর্ধতে সাংখ্যঅধিবিদ্যার অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী-সহ সাংখ্যকারিকা-র* নির্বাচিত অংশ সংযোজনের মাধ্যমে।

ড. রজত ভট্টাচার্য্য কর্তৃক, এই পাঠ্যসূচী অনুযায়ী, *সাংখ্যকারিকা* গ্রন্থের নির্বাচিত অংশ অবলম্বনে রচিত এই পাঠ্যোপকরণটিতে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষার নির্ধারিত শৈলীতে সাংখ্যঅধিবিদ্যার অন্তর্গত প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা সুবিন্যস্তভাবে করা হয়েছে।

পাঠ্যোপকরণটি তিনটি একক-এ বিভক্ত। প্রতিটি একক আবার অনেকগুলি অনুচ্ছেদ, উপ-অনুচ্ছেদে বিভাজিত। উপযুক্ত নামকরণ এবং বিষয়ের সহজ ও সাবলীল যথোপযুক্ত মূলানুসারী উপস্থাপনা, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের দ্বারা এই একক, অনুচ্ছেদ ও উপ-অনুচ্ছেদগুলি সমৃদ্ধ হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি একক-এ উদ্দেশ্য, পাঠপরিকল্পনা, সারসংক্ষেপ , প্রধান শব্দগুচ্ছ, নমুনা প্রশ্নাবলী ও গ্রন্থপঞ্জী সংযোজিত হয়েছে।

আমার বিশ্বাস, যাদের জন্য এই পাঠ্যোপকরণটি রচিত হয়েছে, দর্শনের স্নাতকোত্তর স্তরের সেই দূরশিক্ষার্থীরা এর দ্বারা অবশ্যই উপকৃত হবে। দূরশিক্ষার্থীদের জন্য রচিত হলেও সহজ, স্বচ্ছ ও সাবলীল বাংলায় আকর্ষণীয় উপস্থাপনার ফলে এই পাঠ্যোপকরণটি, আমার মতে, সাধারণ পাঠকের প্রয়োজন মেটাতেও সক্ষম।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইরেক্টরেট অফ্ ডিস্ট্যান্স এডুকেশন-এর কর্তৃপক্ষ আমাকে এই পাঠ্যোপকরণটি সম্পাদনা করার দায়িত্ব দিয়েছেন বলে আমি তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

তারিখ ঃ কলকাতা, ০৯.০৮.২০১০

ড. দিলীপ কুমার মোহান্ত

প্রফেসার

দর্শন বিভাগ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

পাশ্চাত্য অধিবিদ্যা
সম্পাদকের নিবেদন

২০০৩-২০০৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের নতুন স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম চালু হয়। এই নতুন পাঠ্যক্রমে নানা নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে সেই বিষয়গুলিকে আলোচনা করার প্রয়োজন অনুভূত হয়। বিষয়গুলিকে এমনভাবে পরিবেশন করার কথা ভাবা হয় যাতে তা সহজে বোধগম্য হয় এবং যাতে ছাত্রছাত্রীরা অন্য ব্যক্তির সাহায্য না নিয়ে নিজেরাই পড়ে বুঝতে পারেন। পৃথক পৃথক ইউনিটের ক্রমপর্যায় বিষয়গুলিকে ভাগ করে, নমুনা প্রশ্নাবলী ও গ্রন্থপঞ্জীসহ আলোচনা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রকল্পটিকে সফল করার জন্য বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইরেক্টরেট অফ্ ডিসট্যান্স এডুকেশন বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগ, বর্ধমান, বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত কলেজ এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের নিযুক্ত করেন।

এই পুস্তিকাটিতে পাশ্চাত্য অধিবিদ্যার বিভিন্ন সমস্যা আলোচিত হয়েছে। অধ্যাপক সুনীল রায় অধিবিদ্যার বিভিন্ন সমস্যাগুলিকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করেছেন। প্রথম পাঠটিতে অধিবিদ্যা বিষয়ে অ্যারিস্টটল, হিউম, কান্ট ও স্ট্রসনের মত আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় পাঠটিতে অধ্যাপক রায় অস্তিবাদী দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে সারসত্তা (essence) ও অস্তিত্ব (existence)-এই দুই-এর মধ্যেকার পার্থক্য নিয়ে সহজবোধ্য ভাষায় বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তৃতীয় পাঠটিতে আলোচিত হয়েছে 'সামান্য' (universal) বিষয়ে প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের মতামত। এছাড়াও এই অংশে ধারণাবাদ ও নামবাদের বিস্তারিত আলোচনা ও সমালোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ পাঠটির আলোচ্য বিষয় 'দ্রব্য' (Substance)। এই অংশে অধ্যাপক রায় দ্রব্য বিষয়ে প্রাচীনও আধুনিক-উভয় মতের আলোচনা করেছেন। অ্যারিস্টটলের মত, বুদ্ধিবাদী ও অভিজ্ঞতাবাদীদের মত আলোচনা করার পর অধ্যাপক রায় রাসেল ও এয়ারের মতামতও প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচনা করেছেন। পঞ্চম পাঠে অবভাস (appearance) ও তত্ত্ববস্তু (reality) বিষয়ে কান্ট ও ব্র্যাডলির মতামত আলোচিত হয়েছে। আলোচ্য মতগুলি যত সূক্ষ্ম ও জটিল হোক না কেন, অধ্যাপক রায়ের স্পষ্ট সাবলীল রচনাভঙ্গির গুণে তা বোধগম্য হয়ে উঠেছে। এই পাঠের সর্বশেষ অংশে 'ব্যক্তি' প্রসঙ্গে স্ট্রসনের মতামত আলোচিত হয়েছে। প্রতিটি পাঠেই অধ্যাপক রায় নমুনা প্রশ্নাবলী ও গ্রন্থপঞ্জী অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অধিবিদ্যার জটিল তত্ত্বগুলিকে দৃষ্টান্তের সাহায্যে সহজবোধ্য ভাষায় আলোচনা করার গুরু দায়িত্ব অধ্যাপক রায় সুষ্ঠুভাবেই পালন করেছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই পাঠ্যগুলি সযত্নে অধ্যয়ন করলে ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হবেন।

এই প্রসঙ্গে আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই আমার বিভাগের সহকর্মীদের, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ডাইরেক্টরেট অফ্ ডিসট্যান্স এডুকেশন-এর অধিকর্তা ডঃ মোহন পাল ও সহ-অধিকর্তা শ্রী নবকুমার ঘোষকে এবং সর্বোপরি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য সুব্রত পাল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসচিব ডঃ ষোড়শীমোহন দাঁ মহাশয়কে, যাঁদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা, উদ্যোগ ও অনুপ্রেরণা ছাড়া এই কাজে সফল হওয়া যেতো না। দর্শনের কোর ফ্যাকাল্টির শ্রী মলয় রায়কেও ধন্যবাদ জানাই - তাঁর অক্লান্ত সহযোগিতা ছাত্রছাত্রীদের নানা সমস্যার সমাধান করতে সাহায্যে করেছে।

অধ্যাপিকা কোয়েলী চক্রবর্তী
দর্শন বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

বর্ধমান ঃ ১৩ জানুযারী, ২০১০

মাণ্ডূক্যকারিকা

ড. মৃদুলা ভট্টাচার্য্য

রীডার, দর্শন বিভাগ

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সংখ্যাকারিকা

ড. রজত ভট্টাচার্য্য

রীডার, দর্শন বিভাগ

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

পাশ্চাত্য অধিবিদ্যা

অধ্যাপক সুনীল রায়

দর্শন বিভাগ

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সূচিপত্র

মাণ্ডূক্যকারিকা

	বিষয়	পৃষ্ঠা
ইউনিট-১ ঃ	অবস্থাভেদে জীব	১
ইউনিট-২ ঃ	গৌড়পাদের দর্শনে ওঁঙ্কারতত্ত্ব ও সৃষ্টিতত্ত্ব	১৮
ইউনিট-৩ ঃ	দৃশ্য বস্তুর মিথ্যাত্ব স্থাপন	২৮

সাংখ্যকারিকা

ইউনিট-১ ঃ	গ্রন্থপরিচিত ও দুঃখবিচার	৪৩
ইউনিট-২ ঃ	তত্ত্বের শ্রেণীবিভাগ ও গুণত্রয়	৫৩
ইউনিট-৩ ঃ	অব্যক্ত ও পুরুষের অস্তিত্বসিদ্ধি পুরুষের বহুত্ব এবং সৎকার্যবাদ	৬৭

পাশ্চাত্য অধিবিদ্যা

ইউনিট-১	অধিবিদ্যা-প্রাচীনকাল ও সমকাল	৮৩
ইউনিট-২	সারসত্তা ও অস্তিত্ব	৯৩
ইউনিট-৩	সামান্য ঃ কিছু দার্শনিক প্রসঙ্গ	১০২
ইউনিট-৪	দ্রব্য ঃ প্রাচীন ও আধুনিক মত	১১১
ইউনিট-৫	অবভাস ও তত্ত্ববস্তু এবং স্ট্রসনের মতে ব্যক্তির ধারণা	১২১

মান্ডূক্যকারিকা

(আগাম ও বৈতথ্য প্রকরণ)

ড. মৃদুলা ভট্টাচার্য্য
দর্শন বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
বর্ধমান

ইউনিট - ১ ঃ অবস্থাভেদে জীব

পাঠপরিকল্পনা

১.১ প্রাক্‌কথন

১.১.১ 'বেদান্ত' শব্দের অর্থ

১.১.২ মাণ্ডূক্যকারিকার মূল উৎস

১.১.৩ মাণ্ডূক্যকারিকা রচয়িতার পরিচয়

১.১.৪ গৌড়পাদদর্শন ও শঙ্করদর্শন

১.১.৫ মাণ্ডূক্যকারিকার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১.২ পাঠের উদ্দেশ্য

১.৩ জাগ্রদবস্থায় জীব

১.৩.১ জাগ্রৎকালে ব্যষ্টিজীব ও সমষ্টিজীব

১.৩.২ বিশ্ব জীবের স্বরূপ

১.৩.৩ বিশ্ব জীবের উপলব্ধির স্থান, শরীর ও কোষ

১.৩.৪ বিশ্ব জীবের ভোগ্য বিষয় ও ভোগ

১.৪ স্বপ্নাবস্থায় জীব

১.৪.১ স্বপ্নে ব্যষ্টি জীব ও সমষ্টি জীব

১.৪.২ তৈজস জীবের স্বরূপ

১.৪.৩ তৈজস জীবের অনুভূয় স্থান, শরীর ও কোষ

১.৪.৪ তৈজস জীবের ভোগ্য বিষয় ও ভোগ

১.৫ সুষুপ্ত্যবস্থায় জীব

১.৫.১ সুষুপ্তিতে ব্যষ্টি জীব ও সমষ্টি জীব

১.৫.২ প্রাজ্ঞ জীবের স্বরূপ

১.৫.৩ প্রাজ্ঞ জীবের অনুভূয় স্থান, শরীর ও কোষ

১.৫.৪ প্রাজ্ঞ জীবের ভোগ

১.৬ বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ

১.৬.১ বিশ্ব ও তৈজসের সাদৃশ্য

১.৬.২ প্রাজ্ঞ হতে বিশ্ব ও তৈজসের বৈসাদৃশ্য

১.৬.৩ প্রাজ্ঞ ও তুরীয়ের ভেদ

১.৭ সারসংক্ষেপ

১.৮ প্রধান শব্দগুচ্ছ

১.৯ নমুনা-প্রশ্নাবলী

১.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১.১ প্রাক্‌কথন ঃ

১.১.১ বেদান্ত শব্দের অর্থ

বেদান্ত শব্দের অর্থ বেদের সার। বেদের শিরোভাগ হল উপনিষদ্। উপনিষদ্ বলতে ব্রহ্মবিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যাপ্রতিপাদক গ্রন্থসমূহ উভয়কেই বোঝায়। সদানন্দ যোগীন্দ্র তাঁর **বেদান্তসার** গ্রন্থে বলেছেন ''বেদান্তো নাম উপনিষৎপ্রমাণং তদুপকারীণি শারীরকসূত্রাদীনি চ'' অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যা বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের পক্ষে সহায়ক উপনিষৎ সমূহ, **ভগবদ্‌গীতা**, **শারীরকসূত্র** ও তার ওপর প্রণীত টীকা সমূহকে সদানন্দ বেদান্ত বলেছেন। ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীর **ন্যায়রত্নাবলী**টীকা অনুযায়ী বেদব্যাব্যাসের **ব্রহ্মসূত্র**, আচার্য শঙ্করের **ব্রহ্মসূত্রভাষ্য**, বাচস্পতি মিশ্রের **ভামতী**, অমলানন্দের **বেদান্তকল্পতরু**, অপ্যয়দীক্ষিতের **কল্পতরুপরিমল** এ সকল গ্রন্থাবলী বেদান্ত বলে প্রসিদ্ধ। বেদান্তের তিনটি প্রস্থান- শ্রুতিপ্রস্থান, স্মৃতিপ্রস্থান ও ন্যায়প্রস্থান। উপনিষদ্‌সমূহ ও তাদের ভাষ্যাদি বেদান্তের শ্রুতিপ্রস্থানের, **ভগবদ্‌গীতা** স্মৃতিপ্রস্থানের এবং **ব্রহ্মসূত্র** ও তার ওপর রচিত যাবতীয় ভাষ্য, টীকা প্রভৃতি বেদান্তের ন্যায় প্রস্থানের অন্তর্ভুক্ত। ন্যায়প্রস্থানে 'ন্যায়' একটি পারিভাষিক শব্দ, যার অর্থ অধিকরণ। বিষয়, সংশয়, পূর্বপক্ষ, উত্তরপক্ষ ও সংগতি এই পাঁচটিকে অধিকরণের অঙ্গ বলা হয়। বেদান্তদর্শনের উপনিষদ্‌বাক্যের অর্থ অধিকরণের মাধ্যমে বিচার করা হয়ে থাকে। এজন্য একে বেদান্তের ন্যায়প্রস্থান বলা হয়।

১.১.২ মাণ্ডুক্যকারিকার মূল উৎস

মাণ্ডুক্যকারিকা গ্রন্থের মূল উৎস **মাণ্ডুক্যোপনিষদ্**। সকল উপনিষদ্‌ই অধ্যাত্মবিদ্যার প্রতিপাদক। বর্তমানে ১০৮টি উপনিষদ্ পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক এই দশটি প্রধান উপনিষদ্। অদ্বৈতবেদান্তের প্রধান প্রবর্তক আচার্য শঙ্কর এই দশটি উপনিষদের ওপর ভাষ্য রচনা করেছেন। এই দশটির মধ্যে **মাণ্ডুক্যোপনিষদ**কে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। **কৈবল্যোপনিষদ্** এ বলা হয়েছে যে কেবলমাত্র **মাণ্ডুক্যোপনিষদ** মুমুক্ষুকে মুক্তি দিতে সমর্থ।

মাণ্ডুক্যোপনিষদের নামকরণ নিয়ে দু রকম মত প্রচলিত আছে। 'মণ্ডূক' থেকে **মাণ্ডুক্যোপনিষদ্** নাম হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, মণ্ডূক নাম ঋষি এই উপনিষদের দ্রষ্টা। তাই মণ্ডূক ঋষির নাম অনুসরণে 'মাণ্ডুক্যোপনিষদ্' নামকরণ হয়েছে। আবার 'মণ্ডূক' মানে ব্যাঙ। ব্যাঙ যেমন এক জায়গা থেকে আর এক জায়গা লাফিয়ে লাফিয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত গন্তব্যস্থলে পৌঁছায়, তেমনি এই উপনিষদে জীবের জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন রকম অবস্থার বর্ণনা আছে। জীব জাগ্রৎ হতে স্বপ্নে ও স্বপ্ন হতে সুষুপ্তিতে বিলীন হবার পর পরিশেষে তুরীয় ব্রহ্মে উপনীত হয় এবং এই স্তরে জীব স্ব-স্বরূপ উপলব্ধি করে। ওঁঙ্কার তত্ত্বের মূলকথা মাণ্ডূক্যোপনিষদের নামকরণের দ্বারা সূচিত হচ্ছে।

মাণ্ডুক্যোপনিষদে মোট ১২টি মন্ত্র আছে। এই উপনিষদে বলা হয়েছে, 'ওঁম্' ব্রহ্মের প্রতীক। এই দৃশ্যমান জগৎ হচ্ছে 'ওঁম্'। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ এই সবই ওঁমকার। এখানে ওঁমকারের মাধ্যমে ব্রহ্মতত্ত্বলাভের উপায় বর্ণনা করা হয়েছে। ওঁম্-কার ধ্বনিতে অ, উ, ম, ও তুরীয় এই চারটি পাদ বা অংশ আছে। অ, উ, ও ম, এই তিনটি বর্ণের দ্বারা জীবের জাগ্রত্, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটি অবস্থা বিবক্ষিত হয়েছে। এই উপনিষদের মূল কথা হল জাগ্রদাদি ভেদে জীবের অবস্থা ও দেহভেদ স্বীকৃত হলেও সকল অবস্থা ও সকল দেহে এক আত্মা অবস্থান করে। জাগ্রত্‌কালে জীবের 'স্থূলদেহ', স্বপ্নকালে 'সূক্ষ্মদেহ' ও সুষুপ্তিতে জীবের 'কারণদেহ' স্বীকার করা হয়।

স্বপ্নকালে জীবের স্থূলদেহ বিলীন হয়, সূক্ষ্মদেহ থাকে। আর সুষুপ্তিতে জীবের স্থূলদেহ ও সূক্ষ্মদেহ উভয়ই বিলীন হয়, কেবল কারণদেহ থাকে। এখানে কারণ বলতে মূল উপাদান কারণ অজ্ঞানকে বোঝানো হয়ে থাকে। এই উপনিষদের ঋষি একে 'প্রাণ' শব্দের দ্বারা ব্যবহার করেছেন। প্রাণ অদৃষ্টজন্য, অদৃষ্ট কর্মজন্য এবং কর্ম অজ্ঞানজন্য, অজ্ঞানই প্রাণের উপলক্ষিত অর্থ। অজ্ঞান সুষুপ্তিতে বীজাবস্থায় থাকায় সুপ্তজীব পুনরায় জাগ্রত হয়। ওঁম্‌কারের চতুর্থ অংশকে তুরীয়পাদ বলে। বস্তুতঃ তুরীয় বা ব্রহ্মের কোন অংশ নেই। ইহা অংশতুল্য। স্থূলদেহ, সূক্ষ্মদেহ ও কারণদেহ অতিক্রমের মধ্য দিয়ে জীবের তুরীয় ব্রহ্মে উত্তরণের পথ এই উপনিষদে উপদিষ্ট হয়েছে।

১.১.৩ মাণ্ডূক্যকারিকা রচয়িতার পরিচয়

গৌড়পাদ রচিত অন্যান্য গ্রন্থগুলি হল **পঞ্চীকরণ**, **উত্তর-গীতাভাষ্য**। ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রণীত **সাংখ্যকারিকা**-র ওপর প্রণীত **গৌড়পাদভাষ্য**টি এই গৌড়পাদ রচিত কিনা এ বিষয়ে মতানৈক্য আছে।

শঙ্করাচার্যের গুরু আচার্য গোবিন্দপাদ ও গোবিন্দপাদের গুরু গৌড়পাদাচার্য। কাজেই গৌড়পাদাচার্য শঙ্করচার্যের পরম গুরু। আচার্য শঙ্কর গৌড়পাদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন। তাঁর অনাবিল শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ প্রথমেই **মাণ্ডূক্যকারিকা**-র ভাষ্য রচনা করেছেন। তিনি তাঁর **মাণ্ডূক্যকারিকা**-র ভাষ্যের সমাপ্তিশ্লোকে আচার্য গৌড়পাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন যে, আচার্য গৌড়পাদ প্রাণীগণকে জন্মমৃত্যুরূপ হিংস্র জল জন্তু সমাকুল ভীষণ সংসারসাগরে নিমগ্ন দেখে তাঁদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে বুদ্ধিরূপ মানদণ্ডের সাহায্যে বেদবারিধি মন্থন করে দেবগণেরও দুর্লভ বেদান্ত তত্ত্বজ্ঞান সুধা আহরণ করেছিলেন। সেজন্য পূজ্যগণের পূজনীয় সেই পরমগুরুকে তাঁর চরণে পতিত হয়ে নমস্কার করছি। আচার্যশঙ্করের উক্তি থেকে পরিস্ফুট হয় যে, তিনি আচার্য গৌড়পাদকেই অদ্বৈত বেদান্তের প্রাচীনতম আচার্য বলে মনে করতেন। আচার্য গৌড়পাদও তাঁর কারিকায় অন্য কোন প্রাচীন অদ্বৈতাচার্যের নাম উল্লেখ করেন নি। সুতরাং গৌড়পাদকে অদ্বৈত বেদান্তের সর্বপ্রাচীন আচার্য বলা কোন মতে অসংগত হবে না। গৌড়পাদের আবির্ভাবকালও নিশ্চিতভাবে নিরূপণ করা যায় না। কেননা সন্ন্যাসীর জীবনের প্রকৃত পরিচয় লিপিবদ্ধ থাকে না। শঙ্করাচার্য্যের সাক্ষাৎশিষ্য আচার্য সুরেশ্বর তাঁর **নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি**-তে শঙ্করকে দ্রাবিড়দেশীয় ও আচার্য গৌড়পাদকে গৌড়দেশীয় বলে উল্লেখ করেছেন। আচার্য শঙ্কর দ্রাবিড়দেশীয় ইহা ঐতিহাসিক সত্য, কিন্তু গৌড়পাদ গৌড়দেশীয় কিনা তা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। তবে কেউ কেউ বলেন, তিনি পুষ্যমিত্রের সমসাময়িক ছিলেন। পুষ্যমিত্রের সময় ছিল ১৮৪খৃঃপূঃ-১৪৮ খৃঃপূঃ। আবার **শংকরবিজয়** গ্রন্থ থেকে জানা যায়, গৌড়পাদের সঙ্গে শংকরাচার্যের সাক্ষাৎ হয়েছিল। তবে ভাষ্য পড়লে জানা যায় যে, শঙ্করাচার্য তাঁর পরমগুরুর প্রতিভা ও অসামান্য পাণ্ডিত্যের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর শিষ্যগণের সংযম, বিনয়, সারল্য ও পাণ্ডিত্য আচার্যের হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করেছিল।

এখানে উল্লেখ্য যে, গৌড়পাদ ও শঙ্করকে অনেকে 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ' বলে থাকেন। গৌড়পাদ **মাণ্ডূক্যকারিকা**-র দ্বিতীয় ও চতুর্থ প্রকরণে মহাযানী বৌদ্ধগণের মত উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু ঐমত খণ্ডন না করায় তিনি বৌদ্ধ মতের সমর্থক একথা অনেকে বলে থাকেন। কিন্তু আচার্য শঙ্কর **মাণ্ডূক্যকারিকা**-র ভাষ্যে বলেছেন, গৌড়পাদের দর্শন বৌদ্ধদর্শন হতে স্বতন্ত্র। তবে বৌদ্ধমতের সাথে অদ্বৈত মতের যে স্থলে মিল আছে সে স্থলে তিনি বৌদ্ধমত খণ্ডন করেননি। তিনি বৌদ্ধমতাবলম্বী নন। অদ্বৈততত্ত্বই গৌড়পাদের দর্শনে স্থাপন করা হয়েছে ইহা শঙ্করাচার্য্য **মাণ্ডূক্যকারিকা**-র ভাষ্যে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। বৈদিক অদ্বৈতবাদ বৌদ্ধসংঘের অত্যন্ত অনুরূপ। তবে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এই ত্রিবিধ ভেদ বর্জিত অদ্বিতীয় পরমার্থতত্ত্ব বৌদ্ধদর্শনে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সুতরাং এই অদ্বৈত পরমার্থতত্ত্বটি বেদান্ত শাস্ত্রোক্ত বলেই বুঝতে হবে।

মাণ্ডূক্যকারিকা গৌড়পাদ রচিত প্রধান ও প্রামাণিক গ্রন্থ। একে আগমশাস্ত্র বলা হয়। এই গ্রন্থের ওপর আচার্য শঙ্কর এক প্রসন্নগম্ভীর ভাষ্য রচনা করেছেন। এছাড়াও এই গ্রন্থের ওপর **মিতাক্ষরা** নামে একটি টীকা গ্রন্থ আছে। **উত্তরগীতাভাষ্য** গৌড়পাদের প্রণীত আর একটি গ্রন্থ। এই গ্রন্থটি বালসুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সম্পাদনায় বাণীপ্রেস থেকে ১৯১০ সালে প্রকাশিত হয়েছে। ঈশ্বরকৃষ্ণের **সাংখ্যকারিকা**র ওপর আচার্য গৌড়পাদ প্রণীত ভাষ্য পাওয়া যায়। তবে **মাণ্ডূক্যকারিকা**র প্রণেতা গৌড়পাদ ও **গৌড়পাদভাষ্যে**র প্রণেতা গৌড়পাদ একব্যক্তি কিনা এ বিষয়ে বিদ্বদ্‌জনের মধ্যে মতভেদ আছে। **দুর্গাসপ্তশতি, অনুগীতা** এবং **নৃসিংহোত্তরতাপনীয়োপনিষৎ**-এর ওপর তিনিটি টীকাগ্রন্থ গৌড়পাদের রচিত এরূপ প্রসিদ্ধি আছে। **শুভগোদয়স্তুতি** ও **শ্রীবিদ্যারত্নসূত্র** নামে দুটি তন্ত্রশাস্ত্রের ক্ষুদ্রগ্রন্থ গৌড়পাদ রচনা করেছিলেন। তবে তন্ত্রগ্রন্থের রচয়িতা গৌড়পাদ এবং **মাণ্ডূক্যকারিকা** রচয়িতা গৌড়পাদ এক ব্যক্তি কিনা এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। কারণ একজন অদ্বৈতাচার্য ও অন্যজন তান্ত্রিকাচার্য। অদ্বৈত ভাবনা ও তন্ত্রভাবনার মধ্যে দুস্তর ভেদ আছে। তবে একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, **মাণ্ডূক্যকারিকা** গ্রন্থে গৌড়পাদের অদ্বৈতদর্শন মনোজ্ঞভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এই গ্রন্থে তিনি শ্রুতি ও যুক্তির সাহায্যে অদ্বৈতবেদান্তের আগম প্রস্থান সুদৃঢভাবে স্থাপন করেছেন। ভাষার প্রাঞ্জলতা ও ভাবের গাম্ভীর্যে **মাণ্ডূক্যকারিকা** গ্রন্থটি পরবর্তী সকল অদ্বৈতবেদান্তীগণের দ্বারা সমাদৃত হয়েছে।

১.১.৪ গৌড়পাদদর্শন ও শঙ্করদর্শন

আচার্য গৌড়পাদ অদ্বৈতবেদান্তের প্রথম আচার্য। তাঁর গ্রন্থ থেকে আচার্য শংকর তাঁর অদ্বৈত মতবাদের নানা তত্ত্ব গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু উভয় অদ্বৈতবাদের মধ্যে কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। শঙ্করের দর্শনে দেখানো হয়েছে সত্তা ত্রিবিধ-পারমার্থিক সত্তা, ব্যাবহারিক সত্তা ও প্রাতিভাসিক সত্তা। যা কেবল প্রতীতিকালে সৎ, প্রতীতির পূর্বে ও পরে থাকে না, ব্যবহারদশায় বাধিত হয় তাকে প্রতিভাসিক সত্তা বলে। জাগ্রৎকালে ভ্রমীয় বস্তু ও স্বপ্নের বস্তু প্রাতিভাসিক সৎ। যে বস্তু ব্যবহার দশায় অবাধিত থাকে, কিন্তু পারমার্থিক দশায় বাধিত হয় তাকে ব্যাবহারিক সৎবস্তু বলে। জাগতিক বস্তু সকল ব্যাবহারিক সত্তাবিশিষ্ট। আর যা পারমার্থিক সৎ তা কোন কালেই বাধিত হয় না, ব্রহ্মের সত্তা পারমার্থিক সত্তা। পারমার্থিক সৎবস্তু তিনকালে অবাধিত থাকে। প্রাতিভাসিক বস্তুর অপেক্ষায় ব্যাবহারিক বস্তু অধিক সত্তাবিশিষ্ট। আবার ব্যাবহারিক বস্তুর তুলনায় পারমার্থিক বস্তু অধিক সত্তাবিশিষ্ট। প্রাতিভাসিক ও ব্যাবহারিক বস্তু আপেক্ষিক সত্য এবং পারমার্থিক বস্তু নিরপেক্ষ সত্য। শঙ্করের মতে প্রাতিভাসিক ও ব্যাবহারিক বস্তু নিজ নিজ স্তরে সত্য, কিন্তু ঊর্দ্ধতন স্তরে তা মিথ্যা। যেহেতু ঊর্দ্ধতন স্তরে তারা বাধিত হয় বা বাধিত হবার যোগ্য। শঙ্করের পূর্বে গৌড়পাদ অদ্বৈতবাদের তত্ত্ব পরিবেশন করেছেন। গৌড়পাদ দর্শন রচনার সময় পারমার্থিক অবস্থা হতে জগৎকে বিবেচনা করেছেন, কিন্তু শঙ্করাচার্য ব্যাবহারিক অবস্থা হতে জগৎকে নিরীক্ষণ করেছেন। এজন্য শঙ্করাচার্য জগতের ব্যাবহারিক সত্যতা স্বীকার করেছেন, আর গৌড়পাদাচর্য জগৎকে তুচ্ছ, অলীক বলেছেন। বস্তুতঃ গৌড়পাদের মতে একটিই সত্তা বিদ্যমান, তা হল পারমার্থিক সত্তা। শঙ্কর জগতের উৎপত্তি ও ধ্বংস, জীবের বদ্ধাবস্থা ও মোক্ষাবস্থা স্বীকার করেছেন, কিন্তু গৌড়পাদ এগুলি কিছুই স্বীকার করেন নি। শঙ্করের মতে ব্যাবহারিক অবস্থায় জগতের মিথ্যাত্ব অনুভবসিদ্ধ নয়, এর মিথ্যাত্ব যুক্তিসিদ্ধ। কিন্তু গৌড়পাদের দর্শনে জগতের কোন ব্যাবহারিক অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় নি। গৌড়পাদের দর্শন উচ্চাধিকারী মুমুক্ষুর পক্ষেই বোধগম্য, আর শঙ্করের দর্শন ব্যক্তিমাত্রের পক্ষে উপযোগী। গৌড়পাদ ও শঙ্করের দর্শনের উল্লেখযোগ্য পার্থক্য হল, গৌড়পাদ মায়াবাদী আর শঙ্করাচার্য বিবর্তবাদী।

১.১.৫ মাণ্ডুক্যকারিকার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

প্রধানত **মাণ্ডুক্যোপনিষদ** এর ওপর **মাণ্ডুক্যকারিকা** গ্রন্থখানি রচিত হয়েছে। **মাণ্ডুক্যকারিকা**র মোট চারটি অধ্যায় আছে। প্রত্যেকটি অধ্যায়কে 'প্রকরণ' বলা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের নাম আগম প্রকরণ, দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম বৈতথ্যপ্রকরণ, তৃতীয় অধ্যায়ের নাম অদ্বৈতপ্রকরণ ও চতুর্থ অধ্যায়ের নাম অলাতশান্তি প্রকরণ। প্রথম অধ্যায়ে ২৯টি কারিকা আছে। এই প্রকরণটি মাণ্ডুক্যোপনিষদের ১২টি মন্ত্রকে অবলম্বন করে লেখা। উপনিষদের প্রথম ৬টি মন্ত্রের ওপর আগমপ্রকরণের ৯টি কারিকা রচিত হয়েছে। ১০নং কারিকা হতে ১৮নং কারিকা হল উপনিষদের ৭নং মন্ত্রের ব্যাখ্যা। ১৯নং কারিকা থেকে ২৩নং কারিকা উপনিষদের ৮নং থেকে ১১নং মন্ত্রের ব্যাখ্যা। আর ২৪নং কারিকা থেকে ২৯নং কারিকা হল উপনিষদের ১২নং মন্ত্রের ব্যাখ্যা। অবশিষ্ট তিনটি প্রকরণ উপনিষদের সাক্ষাৎ ব্যাখ্যা নয়। বৈতথ্যপ্রকরণে ৩৮টি কারিকা, অদ্বৈতপ্রকরণে ৪৮টি কারিকা এবং অলাতশান্তিপ্রকরণে ১০০টি কারিকা আছে। অনেকের মতে গৌড়পাদের রচিত প্রতিটি প্রকরণই স্বতন্ত্র গ্রন্থ। কিন্তু বিদ্বৎসমাজে এরূপ প্রসিদ্ধি, গৌড়পাদই মাণ্ডুক্যোপনিষদের ওপর চারটি প্রকরণ নিয়ে **মাণ্ডুক্যকারিকা** একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন।

মাণ্ডুক্যকারিকার আগম প্রকরণে গৌড়পাদাচার্য দেখিয়েছেন, ওঁম্ বা ওঁঙ্কার তত্ত্ব অনুধ্যানের দ্বারা কিভাবে নির্গুণ ব্রহ্মে বা তুরীয় ব্রহ্মে উপনীত হওয়া যায়। ওঁঙ্কার বা প্রণবকে ব্রহ্মের প্রতীকরূপে কল্পনা করা হয়েছে। ওঁঙ্কারের অ, উ, ম এবং নাদবিন্দু এই চারটি মাত্রা আছে, তেমনি ব্রহ্মেরও চারটি পাদ—বিশ্ব, তেজস, প্রাজ্ঞ ও তুরীয়। নাদবিন্দু যেমন পৃথগ্‌ভাবে উচ্চারিত হতে পারে না, তেমনি ব্রহ্মের তুরীয়পাদও বাক্য ও মনের অতীত। ভাষার সাহায্যে তুরীয়কে ব্যক্ত করা বা মনে মনে তার স্বরূপ চিন্তা করা যায় না। কেবল নিষেধ মুখে 'নেতি নেতি' বলে তুরীয় ব্রহ্মের উপদেশ সম্ভব হয়। এই তুরীয় আত্মা, বিশ্বও নয়, তৈজসও নয়, প্রাজ্ঞ বা জ্ঞাতাও নয়, অপ্রজ্ঞ বা অজ্ঞাতাও নয়। উহা অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অজ্ঞেয়, অনির্দেশ্য, শান্ত, শিব, অদ্বিতীয় আত্মা। জীবের জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটি অবস্থা। এই তিন অবস্থাতে একই আত্মা বিরাজমান। জাগ্রদবস্থায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল জগৎকে যে আত্মা প্রত্যক্ষ করে তা 'বিশ্ব' আত্মা। স্থূলভুক্ এই আত্মা। স্বপ্নাবস্থায় আমাদের ইন্দ্রিয় সকল বিষয় থেকে বিরত হয়, কিন্তু মন তখন ক্রিয়াশীল থাকে। নিদ্রাবস্থায় মনের সংস্কারবশত যে আত্মা বিষয় ভোগ করে তাকে বলে 'তৈজস'। আর তৈজস আত্মা যে বিষয় ভোগ করে তা বাহ্য বিষয় নয়, মনের কল্পিত আন্তর বিষয়। তাই তাকে প্রবিবিক্তভুক্ বলা হয়। সুষুপ্তি অবস্থায় আবার মন নিষ্ক্রিয় হয়ে বিলীন হয়। এই অবস্থায় আত্মার স্থূল বা সূক্ষ্ম কোন বিষয়ভোগ থাকে না। সুষুপ্তিতে একমাত্র আনন্দই যে ভোগ করে তাকে বলে 'প্রাজ্ঞ' এবং প্রাজ্ঞকে বলা হয় আনন্দভুক্। সুষুপ্তি অবস্থায় প্রাজ্ঞ আত্মা সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরম ব্রহ্মে বিলীন হয়ে তার সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যায়। এই সময় কোন দ্বৈতবস্তুর জ্ঞান তার থাকে না। তবে প্রাজ্ঞ আত্মার সাথে তুরীয় আত্মার পার্থক্য হল, প্রাজ্ঞ আত্মায় তমঃ বা নিদ্রারূপ অবিদ্যা বীজ বর্তমান থাকে, তাই সুষুপ্তি অবস্থা ভেঙ্গে গেলে তাকে আবার মন ও ইন্দ্রিয়ের বন্ধনে বদ্ধ হয়ে মায়ার চক্রে ঘুরতে হয়। কিন্তু তুরীয় আত্মা নিত্য প্রকাশস্বরূপ, উহাতে কোনরূপ অজ্ঞান থাকে না। আত্মার বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ এই পাদত্রয় অজ্ঞানকল্পিত, একমাত্র চতুর্থপাদ তুরীয় আত্মা অজ্ঞানাতীত। এইভাবে এই প্রকরণে অকারাদি মাত্রার সাথে বিশ্বাদি জীব ও জাগ্রদাদি অবস্থার অভেদ দেখানো হয়েছে। এছাড়া দ্বৈতবস্তুর মিথ্যাত্ব ও জগতের সৃষ্টি এখানে আলোচিত হয়েছে। পরিশেষে তুরীয় ব্রহ্মের স্বরূপ, ওঁঙ্কারের স্বরূপ ও ওঁঙ্কার উপাসনার ফল দেখানো হয়েছে।

মাণ্ডুক্যকারিকার বৈতথ্যপ্রকরণে আচার্য শ্রুতিসাপেক্ষ যুক্তির সাহায্যে স্বপ্নদৃশ্য বস্তুর মত জাগ্রদ্‌দৃশ্য বস্তুকে মিথ্যা বলে উপপাদন করেছেন। প্রথমে দেখিয়েছেন, স্বপ্নদৃশ্য বস্তু মিথ্যা। কারণ আমরা পর্বত, হস্তী প্রভৃতি

বিষয়ে যে স্বপ্ন দেখে থাকি, এই সকল বস্তুর পক্ষে দেহের অভ্যন্তরে সংকুচিত হয়ে অবস্থান করা অসম্ভব। আবার দেহ থেকে বহির্গত হয়ে কেউই স্বপ্ন দেখে না, অথচ শতযোজন দূরের স্বপ্ন দেখছে। জাগলেও সেই দেশে তার অবস্থান হয় না। আহার করে শয়ন করেও সে স্বপ্নে দেখে ক্ষুধার জ্বালায় সে অস্থির। এরূপ নানা যুক্তি ও শ্রুতির সাহায্যে স্বপ্নদৃশ্য বস্তুর মিথ্যাত্ব প্রমাণ করার পর দেখানো হয়েছে, জাগ্রদ্দৃশ্য বস্তুসকল মিথ্যা। কারণ স্বপ্নের বস্তু যেমন দৃশ্য, জাগরণের বস্তুও তেমনি দৃশ্য। স্বপ্নদৃশ্য বস্তুর সাথে জাগ্রদ্দৃশ্য বস্তুর কিছু কিছু বৈসাদৃশ্য থাকলেও উভয়ক্ষেত্রেই দৃশ্যত্ব সমান। তাই সকল জাগ্রদ্দৃশ্যবস্তু স্বপ্নদৃশ্য বস্তুর মত মিথ্যা। গ্রাহ্যগ্রাহকভাব উভয়স্থলে থাকায় স্বপ্নদৃশ্যবস্তুর মত জাগ্রদ্দৃশ্য বস্তু মিথ্যা। এ প্রকরণে আরও প্রদর্শিত হয়েছে, দৃশ্য বস্তু পারমার্থিকরূপে সৎ নয়। সদ্‌বস্তু সকল অবস্থায়, সকল কালেই সৎ, কিন্তু যা আদিতে ও অন্তে নেই, তা কখনই পারমার্থিকরূপে সৎ নয়। এখানে প্রশ্ন ওঠে, উভয়দৃশ্যই যদি মিথ্যা হয় তবে চিত্তকল্পিত বহির্বস্তুকে কে জানে? সকলই মিথ্যা হলে নৈরাত্ম্যবাদ এসে পড়ে কিনা? এর সমাধানে বলা হয়েছে আত্মা স্বমায়ার সাহায্যে ভেদ কল্পনা করেন। জগৎকে গৌড়পাদ মায়া বলেছেন। অদ্বৈতবেদান্তীরা এই দৃশ্যমান জগৎকে কেন গন্ধর্বনগরীর মত বলে থাকেন তা এ প্রকরণে সযুক্তিক দেখানো হয়েছে। প্রাণাদি ভাব বস্তুর মিথ্যাত্ব এ প্রকরণে প্রদর্শিত হয়েছে। গৌড়পাদের দর্শনে অদ্বৈতবাদ যে চরম পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়েছে তা এই প্রকরণ থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায়। গৌড়পাদ এখানে দেখিয়েছেন, তত্ত্বত জগতের নিরোধ নেই, উৎপত্তি নেই, বদ্ধজীবন নেই, সাধক নেই, মুমুক্ষু জীব নেই এবং মুক্ত জীবও নেই, কেবল এক অখণ্ড নির্বিকল্প আত্মা আছেন। পরমার্থরূপে অদ্বয়তাই সিদ্ধান্ত, প্রকৃত জ্ঞানীর নিকট নানাত্ব কোথাও নেই।

গ্রন্থটির অদ্বৈতপ্রকরণ নামে তৃতীয় অধ্যায়ে দ্বৈতমিথ্যাত্ব ও অদ্বৈতসত্যত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখানে জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ বর্ণিত হয়েছে। অলাতশান্তিপ্রকরণ নামে চতুর্থ অধ্যায়ে অন্য মত খণ্ডন করে দেখানো হয়েছে, জন্ম-মৃত্যু-কার্য-কারণাদি সকল ভাববস্তু নিঃস্পন্দ বিজ্ঞানের মনঃস্পন্দন মাত্র। 'অলাত' শব্দের অর্থ মশাল। মশালকে ঘোরালে যেরূপ নানাকার দেখায় বাস্তবিক সেগুলি স্পন্দনের ফলমাত্র। ইহা কখনও গোলাকার, কখনও চতুষ্কোণাকার ইত্যাদি নানা আকারে আকারিত হয়। অবশ্য আকারগুলি মশালে লয় পায় না, আকারগুলির উৎপত্তি ও লয় মশালের নয়, উহা স্পন্দনের ফল। যেমন পারমার্থিক দৃষ্টিতে অলাতের সত্তা নেই, ব্রহ্মে প্রতীয়মান দৃশ্য জগতের কোনই সত্তা নেই।

১.২ পাঠের উদ্দেশ্য ঃ

এক অদ্বিতীয় তুরীয় ব্রহ্ম অজ্ঞানের ফলে জীবরূপে কল্পিত। ব্যষ্টি ও সমষ্টিভেদে আবার জীবের ভেদ কল্পিত হয়ে থাকে। তবে সকল ব্যষ্টি জীব সমষ্টি জীবেরই অন্তর্গত। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটি অবস্থার ভেদে একই জীব বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ নামে অভিহিত হয়ে থাকে। ব্যষ্টি বিশ্ব সমষ্টি বৈশ্বানর হতে, ব্যষ্টি তৈজস সমষ্টি বিরাট হতে ও ব্যষ্টি প্রাজ্ঞ সমষ্টি হিরণ্যগর্ভ হতে ভিন্ন নয়। বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ জীবের অবস্থাভেদ, শরীরভেদ, কোষভেদ, ভিন্ন ভোগ্য বিষয়, ভিন্ন ভোগ, বিশ্বাদি জীবের পারস্পরিক সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য এবং তুরীয় হতে প্রাজ্ঞের ভেদ বিশ্লেষণ করাই এই পাঠের উদ্দেশ্য।

১.৩.১ জাগ্রৎকালে ব্যষ্টি জীব ও সমষ্টি জীব

(মূল) জাগরিতস্থানো বহিঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ স্থূলভুগ্ বৈশ্বানরঃ প্রথমঃ পাদঃ —মাণ্ডুক্যোপনিষদ্

(অনু) জাগ্রদবস্থা যার স্থান (বা ভোগক্ষেত্র), বাহ্য বিষয়ে যার প্রজ্ঞা (বা অনুভূতি), সাতটি যার অঙ্গ, ঊনবিংশতিটি যার মুখ (বা উপলব্ধিদ্বার), স্থূলবিষয়ভোগী সেই বৈশ্বানরই আত্মার প্রথম পাদ।

উপনিষদের ঋষি জাগ্রদবস্থায় বিশ্ব জীবকে বহিঃপ্রজ্ঞ বলেছেন। নিজের আত্মা ছাড়া শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই সব বাহ্য স্থূল বিষয়ে যার প্রজ্ঞা অর্থাৎ মনোবৃত্তি থাকে, তাকে বহিঃপ্রজ্ঞ বলে। এই সময় আত্মা অজ্ঞানের ফলে বাহ্য বিষয়াবলম্বীর মতো প্রতিভাত হয়ে থাকে। উক্ত শ্রুতিবাক্যে সমষ্টি জীব বৈশ্বানরের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ব্যষ্টি বিশ্ব যেমন বহিঃপ্রজ্ঞ, তেমনি সমষ্টি বৈশ্বানরও বহিঃপ্রজ্ঞ। বিশ্ব ও বৈশ্বানর উভয়ই সপ্তাঙ্গ। মস্তিস্ক, চক্ষু, প্রাণ, শরীরের অন্তর্ভাগ, মূত্রাশয়, পাদ এবং মুখ এই সাতটি হল বিশ্ব জীবের অঙ্গ। আর দ্যুলোক, সূর্য, বায়ু, আকাশ, জল, পৃথিবী এবং হোমকুণ্ড এই সাতটি হল বৈশ্বানরের অঙ্গ। বিশ্ব এবং বৈশ্বানর উভয়েরই উপলব্ধির মাধ্যম উনিশটি। উপলব্ধির মাধ্যমকে 'মুখ' বলা হয়। পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়, পাঁচটি প্রাণ ও চার প্রকার অন্তঃকরণ এই উনিশটি হল ব্যষ্টি ও সমষ্টি এই উভয় জীবের উপলব্ধির উপায় অর্থাৎ মুখ। সমষ্টি জীবকে বৈশ্বানর বলার অভিপ্রায় হল, তিনি সকল নর অর্থাৎ মানুষের নানাবিধ সুখ সম্পাদন করে থাকেন। বৈশ্বানর শব্দের অন্য অর্থও হতে পারে। তিনি সকল নরের স্বরূপ বলে তাকে বিশ্বানর বলে। এই বিশ্বানর জীবই বৈশ্বানর।

(মূল) বহিঃপ্রজ্ঞো বিভুবিশ্বঃ

—মাণ্ডুক্যকারিকা, ১.১ক

(অনু) জাগ্রৎকালে স্থূল দেহাভিমানী চৈতন্যস্বরূপ স্বপ্রকাশ আত্মা বহির্বিষয়ক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যাপী বিশ্বনামে অভিহিত হন।

মাণ্ডুক্যোপনিষদের ঋষি সাধককে ওঁঙ্কার উপাসনার উপদেশ দিয়েছেন। ওঁঙ্কার হল শব্দ ব্রহ্ম। ওঁঙ্কারের যেমন অ, উ, ম ও নাদবিন্দু চারটি মাত্রা, তেমনি আত্মার জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুযুপ্তি ও তুরীয় এই চারটি পাদ বা অংশ। এজন্যই আত্মাকে 'চতুষ্পাৎ' বলে। বস্তুতঃ ওঁঙ্কারের তিনটি মাত্রা আছে, চতুর্থটি মাত্রাহীন। মাত্রাকল্প ধরে উহার চতুর্থমাত্রা বলা হয়। অনুরূপভাবে আত্মারও বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞভেদে তিনটি পাদ, তুরীয় ব্রহ্ম পাদহীন। কিন্তু তাকে পাদকল্প বুঝে চতুর্থপাদ বলা হয়। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন শরীরধারী একই জীব ভিন্ন ভিন্ন নামে কথিত হয়। প্রত্যেকটি জীবের সমষ্টি ও ব্যষ্টি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন নাম। জাগ্রদবস্থায় সমষ্টি জীবের নাম বৈশ্বানর ও ব্যষ্টি জীবের নাম বিশ্ব।

১.৩.২ বিশ্ব জীবের স্বরূপ ঃ

মাণ্ডুক্যকারিকায় আচার্য গৌড়পাদ জাগ্রদবস্থায় যে বিশ্ব ও বৈশ্বানরের কথা বলেছেন তা স্বরূপতঃ আত্মা। কিন্তু জীব তা বুঝতে পারে না। যেহেতু আত্মা তখন কোষের দ্বারা আবৃত থাকে। যেমন, একটি তরবারি কোষের

ভিতর থাকলে তা দেখা যায় না, তেমনি জাগ্রৎকালে অন্নময়কোষের দ্বারা আত্মা আবৃত থাকে বলে জীব নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে না।

১.৩.৩ বিশ্ব জীবের উপলব্ধির স্থান, শরীর ও কোষ ঃ

(মূল) দক্ষিণাক্ষিমুখে বিশ্বঃ-মাণ্ডূক্যকারিকা ১.২ক

(অনু) দক্ষিণ চক্ষুরূপ দ্বারে (স্থূল বিষয়দর্শী) বিশ্বনামক আত্মা (অনুভূত হয়)।

আচার্য গৌড়পাদ বিশ্ব জীবকে 'বহিঃপ্রজ্ঞ' নামে অভিহিত করেছেন। জাগ্রদবস্থায় বিশ্ব জীব বাহ্য বিষয়কে জেনে থাকে। এজন্য তাকে বহিঃপ্রজ্ঞ বলা হয়। গৌড়পাদ আরও বলেছেন যে, এই বিশ্ব জীব দক্ষিণচক্ষুতে অবস্থান করে। আত্মা যখন দক্ষিণচক্ষু দিয়ে বাইরের স্থূল বিষয় দেখে তখন সেই স্থূলদর্শী আত্মাকে 'বিশ্ব' বলে। বিশ্ব আত্মা সকল ইন্দ্রিয়ে সমানভাবে অবস্থান করলেও প্রধানত দক্ষিণচক্ষুতে তার উপলব্ধি হয়। এজন্য দক্ষিণচক্ষুকে তার উপলব্ধির স্থান বলা হয়। ব্যষ্টি বিশ্ব ও সমষ্টি বিরাটের স্থূল শরীর। ভোগের আয়তনকে শরীর বলে। সুখ বা দুঃখের সাক্ষাৎকারকে ভোগ বলা হয়। বিশ্ব ও বিরাটের স্থূল দেহে ভোগ হয়ে থাকে। জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ এই চার প্রকার দেহকে স্থূল দেহ বলা হয়। জরায়ু হতে উৎপন্ন মনুষ্য, পশু প্রভৃতি জরায়ুজ। অণ্ড হতে উৎপন্ন বিহঙ্গ, ভুজঙ্গ প্রভৃতি হল অণ্ডজ। স্বেদ হতে জাত স্বেদজ। ভূমি হতে উদ্ভূত তরুলতা প্রভৃতিকে উদ্ভিজ বলা হয়। এই চার প্রকার স্থূল শরীরকে অন্নময় কোষ বলে। অন্নের বিকার বলে একে অন্নময় বলা হয়। আর আত্মার স্বরূপের আচ্ছাদক হওয়ায় একে কোষ বলা হয়। অবিবেকী ব্যক্তি স্থূল শরীররূপ এই অন্নময় কোষকে আত্মা বলে বোঝে। গৌড়পাদের মতে বিশ্ব বীজ যেমন দক্ষিণচক্ষুর দ্বারা বাহ্য স্থূল বিষয়কে দর্শন করে, তেমনি ধ্যাননিষ্ঠ ব্যক্তিরা দক্ষিণচক্ষুদ্বারা সমগ্র স্থূল জগতের অভিমানী বিরাট্‌কে প্রত্যক্ষ করেন। এই অভিপ্রায়ে ভাষ্যকার শঙ্কর বিশ্ব ও বিরাট্‌কে অভিন্ন বলেছেন।

(মূল) জাগরিতাবস্থায়ামেব বিশ্বাদীনাং এয়াণামনুভাবপ্রদর্শনার্থোহয়ং শ্লোকঃ দক্ষিণাক্ষীতি। দক্ষিণমক্ষ্যে মুখং, তস্মিন্ প্রাধান্যেন দ্রষ্টা স্থূলানাং বিশ্বোহনুভূয়তে ''ইন্ধো হ বৈ নামৈষঃ, যোহয়ং দক্ষিণেহক্ষণ পুরুষঃ'' ইতি শ্রুতেঃ। ইন্ধো দীপ্তিগুণো বৈশ্বানর আদিত্যান্তর্গতো বৈরাজ আত্মা চক্ষুষি চ দ্রষ্টা একঃ (তদেব, শঙ্করভাষ্য)

(অনু) এক জাগরিত অবস্থাতেই বিশ্বাদি (বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ) ত্রয়ের যেরূপ অনুভব হয়ে থাকে, তা দেখানোর জন্য বলা হয়েছে ''দক্ষিণাক্ষি'' ইত্যাদি শ্লোকটি। দক্ষিণ অক্ষিই মুখ (অর্থাৎ উপলব্ধির দ্বার), তাতেই প্রধানত স্থূলবিষয়দর্শী 'বিশ্ব' অনুভূত হয়ে থাকে; যেহেতু শ্রুতি বলেছেন- এই যে দক্ষিণ অক্ষিগত পুরুষ ইনিই প্রসিদ্ধ 'ইন্ধ'। 'ইন্ধ' শব্দের অর্থ দীপ্তিগুণসম্পন্ন বৈশ্বানর আত্মা। আদিত্যমণ্ডলস্থ বিরাট্ আত্মা এবং চক্ষুতে অবস্থিত দ্রষ্টা বৈশ্বানর, উভয়ই (তত্ত্বতঃ) এক।

এখানে উল্লেখ্য যে, আচার্য শংকর বিশ্ব ও বিরাটের বাস্তবভেদ স্বীকার করেন নি। এ বিষয়ে শ্রুতিবাক্য প্রমাণশ্রুতিতে বলা হয়েছে, এক স্বপ্রকাশ পরমাত্মা সমস্ত ভূতে সমষ্টি ব্যষ্টিরূপে প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিত আছেন। শ্রুতিবাক্যের ন্যায় স্মৃতিবাক্যেও আত্মার একত্ব স্বীকৃত হয়েছে। গীতায় ভগবান্ অর্জুনকে বলেছেন, সমস্ত ভূতে বিবিধ রূপে অবস্থিত আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলেও জানবে।'' ভগবানের এই বাক্য থেকেও আত্মার যে বাস্তব ভেদ নেই তা প্রমাণিত হয়। এখানে প্রশ্ন জাগে, সর্ব্বভূতে ক্ষেত্ররূপে একই আত্মা যদি বিদ্যমান থাকেন, তাহলে প্রতিভূতে ভিন্ন ভিন্ন দেহস্বামীর জ্ঞান কেন হয়? এর উত্তরে শঙ্কর বলেছেন, ভিন্ন ভিন্ন দেহে আত্মা স্বরূপত এক হলেও ভিন্ন ভিন্ন দেহের কল্পনা বশতঃ আত্মা সম্বন্ধে ভেদ বুদ্ধি হয়ে থাকে। তিনি সর্বত্র অবিভক্তরূপে অবস্থিত হলেও বিভক্তের ন্যায় অবস্থিত। এরূপ জ্ঞান সকলের হয়।

১.৩.৪ বিশ্ব জীবের ভোগ্যবিষয় ও ভোগ ঃ

(মূল) বিশ্বো হি স্থূলভুঙ্ নিত্যং - মাণ্ডুক্যকারিকা ১/৩ ক

(অন) বিশ্ব সর্বদা স্থূল বিষয়ই ভোগ করে।

(মূল) স্থূলং তর্পয়তে বিশ্বং - তদেব ১/৪ ক

(অনু) স্থূল বিষয় 'বিশ্বে'-র (স্থূল শরীরাভিমানী ব্যষ্টি জীবের) তৃপ্তি জন্মায়।

শরীর হল ভোগের অবচ্ছেদক উপাধি। স্থূল শরীর সবসময় স্থূল বিষয়কে গ্রহণ করতে পারে। স্থূলদেহী ব্যক্তির ইন্দ্রিয়গুলি স্থূল বিষয়কেই অবলম্বন করে। স্থূলশরীরের অভিমানী ব্যষ্টি বিশ্ব জীবের চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় স্থূল রূপাদি বিষয়কে প্রত্যক্ষ করতে পারে, সূক্ষ্ম রূপাদিকে নয়। বিশ্ব জীবের স্থূলদেহে ভোগ্য সুখ, দুঃখ প্রভৃতি ভোগের আশ্রয় বলে স্থূল শরীরকে 'জাগ্রত' নাম অভিহিত করা হয়। প্রত্যেক ব্যষ্টি স্থূল দেহে উপহিত চৈতন্যকে বিশ্ব বলা হয়। বিশ্বজীব সূক্ষ্মশরীর এই অভিমান পরিত্যাগ না করেই সেই সেই স্থূল দেহে প্রবেশ করে সর্বত্রই 'অহম্' এই অভিমানকে পোষণ করে। জাগ্রৎ কালে বিশ্ব ও বৈশ্বানর শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা স্থূল শব্দকে, ত্বগেন্দ্রিয়ের দ্বারা স্থূল স্পর্শকে, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা স্থূল রূপকে, রসনেন্দ্রিয়ের দ্বারা স্থূল রসকে ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা স্থূল গন্ধকে উপলব্ধি করে। জাগ্রত নামে এই বিশ্ব ও বৈশ্বানর সকল প্রকার কর্মেন্দ্রিয় এবং মনোবৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি, অহঙ্কারবৃত্তি ও চিত্তবৃত্তির দ্বারা বাহ্য স্থূল বিষয়কে অনুভব করে। সুতরাং বাহ্য জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাহ্য কর্মেন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণবৃত্তির দ্বারা স্থূলশরীরাভিমানী ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয় জীব স্থূল বাহ্য বিষয়কে ভোগ করে। ভোগ্য বিষয় স্থূল হলে ভোগটিও স্থূল বলে বিবেচিত হয়। তাই গৌড়পাদ বলেছেন স্থূল দেহী জীবের ভোগ্য বিষয় যেমন স্থূল তেমনি তার তৃপ্তিও স্থূল। সূক্ষ্ম বস্তু যেমন তার ভোগের বিষয় হয়না, তেমনি তার ভোগকেও সূক্ষ্ম বলা যায় না।

১.৪ স্বপ্নাবস্থায় জীব ঃ

১.৪.১ স্বপ্নে ব্যষ্টি জীব ও সমষ্টি জীব ঃ

(মূল) স্বপ্নস্থানোহন্তঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ প্রবিবিক্তভুক্ তৈজসো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ — মাণ্ডুক্যোপনিষৎ ৪

(অনু) স্বপ্নদর্শন ইহার স্থান, অন্তরে (অবাহ্য বিষয়ে) ইহার জ্ঞান, (পূর্বের ন্যায়) সাতটি ইহার অঙ্গ এবং (পূর্বের ন্যায়) ঊনিশটি ইহার মুখ, (কেবল সংস্কারোপস্থাপিত) সূক্ষ্ম বিষয়ভোগী এই তৈজস (জীব) (আত্মার) দ্বিতীয় পাদ।

(মূল) ....হ্যন্তঃপ্রজ্ঞস্তু তৈজসঃ। - মাণ্ডুক্যকারিকা ১/১ খ

(অনু) ....অভ্যন্তরে (মনোমধ্যে) মানস সংস্কারোপস্থাপিত বিষয়ের জ্ঞাতা হল তৈজস (জীব)।

জাগ্রৎকালে বাহ্য বিষয়কে বাহ্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করার পর চক্ষু নিমীলিত হলে জীব যে অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাকে স্বপ্নাবস্থা বলে। কেউ কেউ বলেন, যে অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুৎপন্ন অপরোক্ষ অন্তঃকরণ বৃত্তি জন্মায় তকে স্বপ্নাবস্থা বলে। কিন্তু এটি অদ্বৈতবেদান্তীর সম্মত নয়। কারণ অন্তঃকরণের বৃত্তি হতে গেলেই সেখানে প্রমাণের অপেক্ষা থাকে। সকল মনোবৃত্তিই প্রমাণজন্য। অদ্বৈতবাদীরা বলেন, জাগ্রৎকালে স্থূলবিষয়

ভোগ করার পর যখন নিদ্রারূপ তামসী বৃত্তি উৎপন্ন হয়, ঐসময় স্থূল দেহের অভিমান চলে যায় এবং চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ও ব্যাপারশূন্য হয়ে অন্তঃকরণে বিলীন হয়। এই অবস্থাকে স্বপ্নাবস্থা বলে। এটি অবিদ্যাবৃত্তি, মনোবৃত্তি নয়। স্বাপ্নিক বস্তু ও স্বপ্নজ্ঞান দুটিই অবিদ্যার পরিণাম। স্বপ্নজ্ঞান এক প্রকার স্মৃতিবিভ্রম।

স্বপ্নকালে সমষ্টি জীবকে হিরণ্যগর্ভ ও ব্যষ্টিজীবকে তৈজস বলা হয়। উভয়েই সূক্ষ্মশরীরের দ্বারা উপহিত চৈতন্য। স্বপ্নে ব্যষ্টিজীবকে তৈজস বলার অভিপ্রায় হল ইহা তেজোময় অন্তঃকরণের দ্বারা উপহিত। 'তেজোময়' শব্দের অর্থ বাসনাময়। সমষ্টি জীব হিরণ্যগর্ভ সকল শরীরে মালার অন্তর্গত সূত্রের ন্যায় অনুস্যূত আছেন বলে তাকে 'সূত্রাত্মা' বলে। জ্ঞানশক্তিবিশিষ্ট অন্তঃকরণে উপহিত থাকেন বলে তাকে 'হিরণ্যগর্ভ' বলা হয়। তিনি ক্রিয়াশক্তি বিশিষ্টরূপে প্রাণে অধিষ্ঠিত হওয়ায় তাকে 'প্রাণ' শব্দের দ্বারা অভিহিত করা হয়। হিরণ্যগর্ভ ও তৈজস উভয়ের মধ্যে কোন তত্ত্বত ভেদ নেই।

১.৪.২ তৈজস জীবের স্বরূপ ঃ

মাণ্ডুক্যকারিকায় আচার্য গৌড়পাদ স্বপ্নাবস্থায় যে তৈজস ও হিরণ্যগর্ভের কথা বলেছেন তা স্বরূপতঃ আত্মা। কিন্তু জীব তা বুঝতে পারে না। যেহেতু আত্মা তখন কোষের দ্বারা আবৃত থাকে। যেমন, একটি তরবারি কোষের ভিতর থাকলে তা দেখা যায় না, তেমনি স্বপ্নকালে আত্মা প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় এই তিনটি কোষের অভ্যন্তরে নিহিত থাকে বলে জীব তার নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে না।

১.৪.৩ তৈজস জীবের অনুভূয়স্থান, শরীর ও কোষ ঃ

(মূল)................**মনস্যন্তস্তু তৈজসঃ — মাণ্ডুক্যকারিকা ১/২ খ.**

(অনু) ....শরীরের অভ্যন্তরে মনোমধ্যে (সংস্কারোপস্থাপিত বিষয়ের স্মর্ত্তা) তৈজস (জীব অনুভূত হয়)।

(মূল) দক্ষিণাক্ষিগতো রূপং দৃষ্ট্বা নিমীলিতাক্ষস্তদেব স্মরন্ মনস্যন্তঃ স্বপ্ন ইব তদেব বাসনারূপাভিব্যক্তং পশ্যতি। যথা তত্র, তথা স্বপ্নে, অতো মনসি অন্তস্তু তৈজসোপি বিশ্ব এব। — মাণ্ডুক্যকারিকা ১/২, শাঙ্করভাষ্য।

(অনু) দক্ষিণ চক্ষুস্থিত আত্মা (বাহ্য) রূপ দর্শন করে স্বপ্ন সময়ের ন্যায় নিমীলিত নেত্রে তাই মনোমধ্যে স্মরণ করে সংস্কাররূপে অভিব্যক্ত ঐরূপই দর্শন করে থাকে। এখানে যেরূপ, ঠিক স্বপ্নেও সেইরূপ। অতএব মনোমধ্যগত তৈজস জীবও ফলতঃ বিশ্বই (তা থেকে পৃথক্ নয়)।

তৈজস জীব ব্যষ্টি মনের অধিষ্ঠাতা। আর হিরণ্যগর্ভ সমষ্টি মনের অধিষ্ঠাতা। সমষ্টি মন ও ব্যষ্টি মন এক। কাজেই ব্যষ্টি মনে আশ্রিত তৈজস এবং সমষ্টি মনে আশ্রিত হিরণ্যগর্ভ বস্তুতঃ অভিন্ন, কেবল ব্যষ্টি ও সমষ্টি উপাধি ভেদে প্রভেদ। গৌড়পাদ বলেছেন তৈজস জীব শরীরের সর্বত্র অবস্থান করলেও মনেতেই তার উপলব্ধি হয়। এজন্যই তৈজস জীবকে মনোময় বলে। স্বপ্নকালে জীবের লিঙ্গশরীর অর্থাৎ সূক্ষ্মশরীর স্বীকার করা হয়। এর দ্বারা আত্মার সত্তা জ্ঞাপিত হয় বলে একে লিঙ্গশরীর বলে। লিঙ্গশরীর ১৭টি অবয়বে গঠিত। এই অবয়বগুলি হল পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়, পাঁচপ্রকার বায়ু, মন ও বুদ্ধি। কেউ কেউ একে 'পুর্যষ্টক' নামে অভিহিত করেন। প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ ও বিজ্ঞানময় কোষ এই তিনটি কোষকে একত্রে 'লিঙ্গ শরীর' বলে।

স্বপ্নকালে তৈজস জীব স্থূলশরীরে আত্মাভিমান ত্যাগ করে ও অন্নময় কোষের নিয়ামক যে ক্রিয়াশক্তি যুক্ত প্রাণময় কোষ তাকে আত্মারূপে বোঝে। ঐ অবস্থায় তৈজস জীব মনে করে যে, সে প্রাণস্বরূপ কারণ মৃত্যুকালে দেহ থেকে প্রাণই বহির্গত হয়। কিন্তু বিচার আরও পরিপক্ক হলে সে বুঝতে পারে, যা ক্রিয়াশীল তা বিনাশী। কাজেই প্রাণ আত্মা হতে পারে না। তাই সে প্রাণময় কোষের নিয়ামক জ্ঞানশক্তি বিশিষ্ট মনপ্রধান মনোময় কোষকে আত্মা রূপে গ্রহণ করে। এরপর বিচারের দ্বারা সে ক্রমশঃ বুঝতে পারে যে, যাতে সঙ্কল্প ও বিকল্প হয় তা অবশ্যই বিনাশশীল। এভাবে সে মনোময় কোষে আত্মবুদ্ধি ত্যাগ করে মনোময় কোষের নিয়ামক বুদ্ধিপ্রধান বিজ্ঞানময় কোষকে আত্মারূপে বোঝে।

১.৪.৪ তৈজস জীবের ভোগ্যবিষয় ও ভোগ ঃ

(মূল) ....তৈজসঃ প্রবিবিক্তভুক্। — **মাণ্ডুক্যকারিকা১/৩ খ।**

(অনু) ....তৈজস সর্বদা বাসনাময় সূক্ষ্ম বিষয়ই ভোগ করে।

(মূল) ....**প্রবিবিক্তস্তু তৈজসম্ — মাণ্ডুক্যকারিকা ১/৪ খ।**

(অনু) সূক্ষ্ম বিষয় আবার 'তৈজসের' (তৃপ্তি সাধন করে)।

তৈজস জীব স্বপ্নকালে মনে আন্তর সূক্ষ্ম বিষয়কে প্রত্যক্ষ করে। বিশ্ব জীব জাগ্রদ্দশায় বাহ্য স্থূল বিষয় রূপরসাদিকে প্রত্যক্ষ করে, কিন্তু তৈজস জীব স্থূল বাহ্য বিষয়কে অনুভব করতে পারে না। সে সূক্ষ্ম আন্তর বিষয় কেই অনুভব করে। সমস্ত স্বাপ্নিক ভোগ্য বস্তু মনে উৎপন্ন হয়। মন অতীব সূক্ষ্ম। কাজেই মনস্থ ভোগ্য স্বাপ্নিক বস্তুগুলো অত্যন্ত সূক্ষ্ম। স্থূল বিষয়কে অবলম্বন করে যে ভোগ বা তৃপ্তি হয় তা স্থূল। কিন্তু স্বপ্নদশায় সূক্ষ্মবিষয় থেকে যে ভোগ বা তৃপ্তি জন্মায় তা সূক্ষ্ম। স্থূল ভোগের আয়তন হল স্থূল দেহ, আর সূক্ষ্ম ভোগের আয়তন হল সূক্ষ্মশরীর।

১.৫ সুষুপ্ত্যবস্থায় জীব

১.৫.১ সুষুপ্তিতে ব্যষ্টি জীব ও সমষ্টি জীব

(মূল) যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে, ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি, তৎ সুষুপ্তম্। সুষুপ্ত একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো হ্যানন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদঃ । — **মাড়ুক্যোপনিষদ/১/৫**

(অনু) সুষুপ্ত পুরুষ যে স্থানে (অর্থাৎ যে অবস্থায়) কোনরূপ ভোগ্যবিষয় কামনা করে না, কোনও স্বপ্নই দেখে না, তা-ই 'সুষুপ্ত'; এই সুষুপ্ত যার স্থান, (কোন প্রকার বিক্ষেপ না থাকায়) যিনি একীভাবপ্রাপ্ত স্বপ্ন ও জাগ্রৎকালীন মনোব্যাপারময় জ্ঞানসমূহ পৃথগ্‌ভাবে অপ্রতীত হওয়ায়) যিনি কেবলই প্রকৃষ্ট জ্ঞানমূর্তি, প্রচুর-আনন্দপূর্ণ ও আনন্দভোগী এবং স্বীয় বোধশক্তি যাঁর মুখস্বরূপ, সেই প্রাজ্ঞ (জীব) ইহার (আত্মার) তৃতীয়পাদ।

(মূল) ....**ঘনপ্রজ্ঞস্তথা প্রাজ্ঞঃমাণ্ডুক্যকারিকা/১/১ গ**

(অনু) সেইরূপ ঘনপ্রজ্ঞ (অর্থাৎ প্রজ্ঞানঘন এই তৃতীয়পাদ) প্রাজ্ঞ নামে অভিহিত হয়।

যে অবস্থায় জীব নিজেকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করে, তাকে সুষুপ্ত্যবস্থা বলে। এই অবস্থায় জীব জাগ্রৎকালীন বা স্বপ্নকালীন কোন বিষয়ই ভোগ করে না। এই সুষুপ্তিকালে সমষ্টি জীবকে ঈশ্বর

ও ব্যষ্টি জীবকে প্রাজ্ঞ বলে। উপনিষদের ঋষি এবং গৌড়পাদ উভয়েই প্রাজ্ঞ জীবকে ঘনপ্রজ্ঞ বলেছেন। ইহা জাগ্রৎকালীন জ্ঞান ও স্বপ্নজ্ঞানের যেন এক ঘনীভূত রূপ। রাতে নৈশ অন্ধকারের দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়ায় যেমন বস্তুনিচয় পৃথক্‌ভাবে উপলব্ধ হয় না বলে ঘনভাব প্রাপ্ত হয়, তেমনি সুষুপ্তিতে আত্ম জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালীন জ্ঞানের বিষয়ের অপ্রতীতির ফলে ঘনভাব প্রাপ্ত হয়। এই ঘনপ্রজ্ঞ জীব কেবল আনন্দই উপলব্ধি করে। এজন্য প্রাজ্ঞ জীবকে আনন্দময় বলা হয়। প্রাজ্ঞজীব আনন্দবহুল হলেও আনন্দস্বরূপ নয়। কারণ এই সময় যে আনন্দের উপলব্ধি হয় তা আত্যন্তিক আনন্দ নয়।

সুষুপ্তিতে ব্যষ্টি প্রাজ্ঞ জীবই সমষ্টিগতভাবে ঈশ্বর। যখন উপাধির প্রাধান্য লুপ্ত হয়, কেবল চৈতন্যেরই প্রাধান্য দেখা দেয়, তখন এই অবস্থাকে স্বরূপাবস্থা বলে। এই স্বরূপাবস্থাপন্ন প্রাজ্ঞ জীবই ঈশ্বর। ইনি সকল কার্যজগতের প্রভু। এই ঈশ্বর কার্যজগৎ থেকে ভিন্ন নন, ইনি তাদের স্বরূপই। ইনি অভ্যন্তরে থেকে সকলকে নিয়ন্ত্রিত করেন, এজন্য তাকে অন্তর্যামী বলা হয়। ইনি সকল জগতের উৎপত্তি ও লয়স্থান। এই ঈশ্বর হলেন অজ্ঞানোপহিত চৈতন্য।

১.৫.২ প্রাজ্ঞজীবের স্বরূপ ঃ

মাণ্ডুক্যকারিকার আগমপ্রকরণে আচার্য গৌড়পাদ সুষুপ্তি অবস্থায় যে প্রাজ্ঞ ও ঈশ্বরের কথা বলেছেন তা স্বরূপতঃ আত্মা। কিন্তু জীব তা বুঝতে পারে না। যেহেতু আত্মা তখন কোষের দ্বারা আবৃত থাকে। যেমন একটি তরবারি কোষের দ্বারা আবৃত থাকলে তা দেখা যায় না, তেমনি সুষুপ্তিতে আনন্দময় কোষের দ্বারা আত্মা আবৃত থাকে বলে জীব নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে না। সুষুপ্তিতে জীব অতীত ও ভবিষ্যৎ বিষয় জ্ঞানের কর্তা। এজন্য একে 'প্রাজ্ঞ' বলে। একে প্রাজ্ঞ বলার আরও অভিপ্রায় হল, জাগ্রৎ ও স্বপ্নদশায় জীবে প্রাজ্ঞত্ব থাকলেও সুষুপ্তিতে জীবে কর্তৃত্ব শূন্য প্রাজ্ঞত্ব থাকে। তাছাড়া, জ্ঞানরূপতাই সুষুপ্ত জীবের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। জাগ্রত ও নিদ্রিত জীবে বিশেষ বিশেষ জ্ঞানও থাকে। কিন্তু সুষুপ্ত জীবে কেবল জ্ঞানস্বরূপতা থাকে। এজন্য আত্মার তৃতীয় পাদকে প্রাজ্ঞ জীব বলা হয়।

১.৫.৩ প্রাজ্ঞ জীবের অনুভূয়স্থান, শরীর ও কোষ ঃ

(মূল) আকাশে চ হৃদি প্রাজ্ঞঃ। — মাণ্ডুক্যকারিকা/১/২ গ

(অনু) আর হৃদয়াকাশে প্রজ্ঞানঘন প্রাজ্ঞ আত্মা (অনুভূত হন)।

প্রাজ্ঞ জীব হৃদয়াকাশে অনুভূত হয়। সুষুপ্তিতে মনের কোন ব্যাপার থাকে না। মন তখন নির্ব্যাপার হওয়ায় মনের দ্বারা একে জানা যায় না। এজন্য ঐ সময় জীবের স্বরূপ হৃদয়াকাশে উপলব্ধি হয়। এই হৃদয়াকাশকে কখনও হৃদাকাশ, কখন ও দহরাকাশ, কখনও আবার দভ্রাকাশ বলে অভিহিত করা হয়। একে শঙ্কর 'হৃদয়সুষি' বলেছেন। 'হৃদয়সুষি' শব্দের অর্থ হৃদয়ের ছিদ্র। হৃদয়ের চারদিকে ও উর্দ্ধদিকে মোট পাঁচটি ছিদ্র আছে। পাঁচটি ছিদ্রকেই হৃদয়নগরের পাঁচটি দ্বার বলা হয়। এই পাঁচটি দ্বারে প্রাণ, আপন, সমান, ব্যান ও উদান এই পাঁচজন দ্বারপাল আছেন। ধ্যানের জন্য এই পাঁচজন দ্বারপালের পাঁচটি ছিদ্রে অবস্থিতি শ্রুতিতে বর্ণিত হয়েছে। এই প্রাণাদি পাঁচটিকে 'ব্রহ্মপুরুষ' বলা হয়। 'ব্রহ্মপুরুষ' শব্দের অর্থ ব্রহ্মসম্বন্ধী পুরুষ। যেমন রাজসম্বন্ধী পুরুষকে রাজপুরুষ বলে, তেমনি ব্রহ্মসম্বন্ধী পুরুষকে ব্রহ্মপুরুষ বলে। এই হৃদয়ে যদি ব্রহ্ম বা আত্মা অবস্থান করেন তবেই প্রাণাদিকে ব্রহ্মপুরুষ বলা উপপন্ন হয়। উপাসনার দ্বারা ব্রহ্মপুরুষগণকে বশীভূত করে উপাসক হৃদয়স্থ ব্রহ্মকে

প্রাপ্ত হয়। কাজেই এই হৃদয়াকাশেই আত্মা বিশেষভাব অবস্থান করেন বলে ইহাকে প্রাজ্ঞ জীবের উপলব্ধির স্থান বলা হয়েছে।

সুষুপ্তিতে সমষ্টি ও ব্যষ্টি উভয় জীবেরই কারণশরীর স্বীকার করা হয়। 'কারণ' বলতে কল্পিত জগতের মূল কারণ অজ্ঞানকে বোঝানো হয়েছে। সমষ্টি অজ্ঞান ঈশ্বরের কারণশরীর, আর ব্যষ্টি অজ্ঞান প্রাজ্ঞ জীবের কারণশরীর। সাধারণত ভোগের আয়তনকেই শরীর বলা হয়। জাগ্রৎকালে বিশ্ব জীবের স্থূলশরীরে ভোগ হয় ও স্বপ্নকালে তৈজস জীবের সূক্ষ্মশরীরে ভোগ হয়। কিন্তু প্রাজ্ঞ জীবের কোন ভোগ হয় না এবং কোন ভোগ্য বিষয়ও নেই—ইহা পরে আলোচিত হবে। সুতরাং প্রাজ্ঞ জীবের কারণশরীরে কোন ভোগের প্রশ্ন ওঠে না। তবে সুষুপ্তিতে প্রাজ্ঞের যে আনন্দের উপলব্ধি হয় তা অজ্ঞানের দ্বারা অভিভূত আনন্দ। এর থেকেই বোঝা যায়, প্রাজ্ঞ জীবের শরীর হল কারণশরীর।

সুষুপ্তিকালে প্রাজ্ঞজীব তাঁর নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে না। অনন্ত আনন্দ আত্মা বা তুরীয়ের স্বরূপ। প্রাজ্ঞ জীব ও তুরীয় অভিন্ন হলেও ঐ অবস্থায় জীব তুরীয়ের স্বরূপ জানতে পারে না। প্রাজ্ঞজীব সুষুপ্তিতে প্রচুর আনন্দ উপলব্ধি করলেও আনন্দস্বরূপতাকে উপলব্ধি করতে পারে না। প্রচুর আনন্দকেই 'আনন্দময়' বলা হয়। এখানে 'ময়ট্' প্রত্যয়টি প্রাচুর্য অর্থের বোধক। এই আনন্দময় কোষই জীবের প্রকৃত স্বরূপ আনন্দস্বরূপতাকে আবৃত করে রাখে। এজন্য জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালের ন্যায় সুষুপ্তিকালেও জীবের তত্ত্বজ্ঞান হয় না।

১.৫.৪ প্রাজ্ঞ জীবেব ভোগ ঃ

(মূল) আনন্দভুক্ তথা প্রাজ্ঞঃ —মাণ্ডূক্যকারিকা ১/৩ গ

(অনু) আর প্রাজ্ঞ সর্বদা আনন্দমাত্র ভোগ করে।

(মূল) আনন্দশ্চ তথা প্রাজ্ঞম্। — মাণ্ডূক্যকারিকা/ ১/৪ গ

(অনু) আনন্দমাত্র প্রাজ্ঞের তৃপ্তি সাধন করে।

আচার্য গৌড়পাদ সুষুপ্ত্যবস্থায় প্রাজ্ঞ জীবকে ঘনপ্রজ্ঞ বলেছেন। এই অবস্থায় প্রাজ্ঞ জীব আনন্দকে ভোগ করে। গৌড়পাদ আনন্দের উপলব্ধি না বলে আনন্দের ভোগ বলেছেন। ভোগটা সব সময় শরীরে হয়ে থাকে। প্রাজ্ঞ জীব সুষুপ্তিতে তমো গুণে অভিভূত হয়ে যে আনন্দভোগ করে, ঐ আনন্দ কারণশরীরকে আশ্রয় করেই উৎপন্ন হয়। বিশ্বজীব স্থূলবিষয়কে ভোগ করে, তৈজসজীব সূক্ষ্ম বিষয়কে ভোগ করে এবং প্রাজ্ঞজীব আনন্দকে ভোগ করে। তিন অবস্থায় জীবের ভোগের মধ্যে তারতম্য আছে। একথা পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বিশ্বজীব ও তৈজস জীবের ভোগ যথাক্রমে স্থূল ও সূক্ষ্ম। কিন্তু প্রাজ্ঞজীবের ভোগ স্থূল বা সূক্ষ্ম কোনটিই নয়, কারণ স্থূল বিষয় বিশ্ব জীবের তৃপ্তি সাধন করে। সূক্ষ্ম বিষয় তৈজস জীবকে তৃপ্তি দেয়। কেবলমাত্র আনন্দই প্রাজ্ঞ জীবের তৃপ্তি সাধন করে। সুতরাং বিশ্ব ও তৈজসের তৃপ্তি হতে প্রাজ্ঞের তৃপ্তি ভিন্ন প্রকার।

১.৬.১ বিশ্ব ও তৈজসের সাদৃশ্য

(মূল) **কার্যকারণবদ্ধৌ তাবিষ্যতে বিশ্বতৈজসৌ — মাণ্ডুক্যকারিকা/১/১১ ক**

(অনু) পূর্বোক্ত বিশ্ব ও তৈজস, উভয়ই (অজ্ঞানের) কার্য (ফলাবস্থা) ও কারণ (অজ্ঞানরূপ বীজাবস্থা) দ্বারা আবদ্ধ বলে স্বীকৃত হন।

মাণ্ডুক্যকারিকায় আচার্য গৌড়পাদ দেখিয়েছেন যে, এক আত্মা অবস্থাভেদে বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ নামে অভিহিত হয়ে থাকে। জাগ্রদবস্থায় বিশ্বজীব স্থূলদেহাভিমানী, স্বপ্নাবস্থায় তৈজস জীব সূক্ষ্মদেহাভিমানী এবং সুষুপ্ত্যবস্থায় প্রাজ্ঞ জীব কারণশরীরাভিমানী। তবে এদের মধ্যে কিছু কিছু সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দেখা যায়। বিশ্বও তৈজস এই উভয় জীব কারণ ও কার্যের দ্বারা বদ্ধ। এখানে 'কারণ' বলতে বীজস্বরূপ অজ্ঞান এবং 'কার্য' বলতে অজ্ঞানের ফলস্বরূপ বিপরীতজ্ঞানকে বোঝানো হয়েছে। অজ্ঞান হল কারণ এবং স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ উহার কার্য। অজ্ঞানের ফলে তত্ত্বের অগ্রহণ হয়, আর অজ্ঞানের কার্যের ফলে বিপরীত গ্রহণ হয়। বিশ্ব এবং তৈজস উভয়ই অজ্ঞান এবং অজ্ঞানের কার্যের দ্বারা বদ্ধ হওয়ায় উভয়েরই তত্ত্বাগ্রহণ ও বিপরীত দর্শন হয়ে থাকে। বিশ্বজীবের অন্নময় কোষের দ্বারা আবৃত থাকায় তত্ত্বের অগ্রহণ হয়। তৈজস জীব প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষের দ্বারা আবৃত থাকায় তত্ত্বকে জানতে পারে না। জাগ্রৎকালে বিশ্ব ও স্বপ্নকালে তৈজস এক তুরীয়কে নানা ভাবে দর্শন করে। এজন্য উভয়েই অজ্ঞানের কার্য অর্থাৎ বিপরীত দর্শনের দ্বারা বদ্ধ হয়ে থাকে।

১.৬.২ প্রাজ্ঞ হতে বিশ্ব ও তৈজসের বৈসাদৃশ্য

(মূল) **প্রাজ্ঞঃ কারণবদ্ধস্তু — মাণ্ডুক্যকারিকা/১/১১ গ**

(অনু) কিন্তু প্রাজ্ঞ কেবল কারণ (অর্থাৎ অজ্ঞানের) দ্বারাই আবদ্ধ।

বিশ্ব ও তৈজস নিজেকে এবং অবিদ্যা থেকে উৎপন্ন দ্বৈতবস্তুকে জানে। কিন্তু প্রাজ্ঞ দ্বৈতবস্তুকে জানে না। উহা তত্ত্বাগ্রহণের কারণ যে অজ্ঞান কেবল উহার দ্বারা বদ্ধ হয়ে থাকে। এজন্য প্রাজ্ঞ জীব নিজেকে ও অপর কাউকে জানতে পারে না। প্রাজ্ঞ জীব সত্য বা মিথ্যা কিছুই জানতে পারে না। প্রাজ্ঞের যেমন তত্ত্বদর্শন হয় না, তেমনি বিপরীত দর্শনও হয় না। এজন্য গৌড়পাদ বলেছেন, প্রাজ্ঞ জীব কেবল অজ্ঞানের দ্বারাই বদ্ধ, অজ্ঞানের কার্যের দ্বারা নয়। পক্ষান্তরে, বিশ্বজীব ও তৈজসজীব অজ্ঞান ও অজ্ঞানের কার্য উভয়ের দ্বারা বদ্ধ হওয়ায় তাদের উভয়েরই তত্ত্বাগ্রহণ ও বিপরীতগ্রহণ হয়। মূল কারণ অজ্ঞান থাকার জন্য তারা তুরীয় ব্রহ্মের স্বরূপ যেমন বুঝতে পারে না, তেমনি অজ্ঞানের কার্যের দ্বারা আবদ্ধ হওয়ায় তাদের বিপরীতগ্রহণও হয়ে থাকে।

১.৬.৩ প্রাজ্ঞ ও তুরীয়ের ভেদ

(মূল) **নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিপ্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্। অদৃশ্যমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে, স আত্মা, স বিজ্ঞেয়ঃ। — মাণ্ডুক্যোপনিষদ্ ৭**

(অনু) বিবেকিগণ মনে করেন যে যিনি অন্তঃপ্রজ্ঞ তৈজস নন; বহিঃপ্রজ্ঞ বিশ্ব নন; জাগ্রৎ ও স্বপ্নের মধ্যবর্ত্তী জ্ঞানসম্পন্ন নন; প্রজ্ঞানঘন প্রাজ্ঞ নন; (যুগপৎ সকল বিষয়ের) জ্ঞাতা নন; অচেতন নন; পরন্তু (চক্ষুরাদি) ইন্দ্রিয়ের অবিষয়, 'ইহা অমুক' ইত্যাকার ব্যবহারের অযোগ্য, কর্মেন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য, (অনুমান যোগ্য) কোনরূপ চিহ্নরহিত, মানস-চিন্তার অবিষয়, শব্দ দ্বারা নির্দেশের অযোগ্য; কেবল 'আত্মা' ইত্যাকার প্রতীতিগম্য, (জাগ্রদাদি) প্রপঞ্চের নিবৃত্তিস্থান, নির্বিকার, মঙ্গলময়, অদ্বৈত তিনি আত্মার চতুর্থ পাদ। তিনিই আত্মা; এবং তিনিই একমাত্র জ্ঞাতব্য পদার্থ।

(মূল) ....দ্বৌ তৌ তুর্য্যে ন সিধ্যতঃ। —মাণ্ডূক্যকারিকা ১/১১ ঘ

(অনু) ....চৈতনস্বরূপ তুরীয় আত্মায় কার্য ও কারণ এই দুইই সম্ভব হয় না।

(মূল) নাত্মানং ন পরঞ্চৈব ন সত্যং নাপি চানৃতম্।

প্রাজ্ঞঃ কিঞ্চন সংবেত্তি, তুর্য্যং তৎসর্ব্বদৃক্ সদা। —মাণ্ডূক্যকারিকা ১/১২

(অনু) প্রাজ্ঞ জীব আপনাকে জানে না, পরকেও জানে না; সত্য জানে না, মিথ্যা কিছুমাত্র দর্শন করে না। (কিন্তু) সেই তুরীয় আত্মা সর্ব্বদা সর্ব্ব বস্তু দর্শন করে থাকেন। (তার জ্ঞান কখনই বিলুপ্ত হয় না)।

(মূল) দ্বৈতস্যাগ্রহণং তুল্যমুভয়োঃ প্রাজ্ঞতুর্য্যয়োঃ।

বীজনিদ্রাযুতঃ প্রাজ্ঞঃ, সা চ তুর্য্যে ন বিদ্যতে।। —মাণ্ডূক্যকারিকা ১/১৩

(অনু) প্রাজ্ঞ এবং তুরীয় উভয়ের পক্ষেই দ্বৈতবিজ্ঞানের অভাব তুল্য। কিন্তু উভয়ের মধ্যে বিশেষ এই যে প্রাজ্ঞ জীব অবিদ্যা বীজস্বরূপ নিদ্রাযুক্ত, আর তুরীয়ে সেই নিদ্রার অভাব আছে।

(মূল) স্বপ্ননিদ্রাযুতাবাদ্যৌ প্রাজ্ঞস্ত্বস্বপ্ননিদ্রয়া

ন নিদ্রাং নৈব চ স্বপ্নং তুর্য্যে পশ্যন্তি নিশ্চিতাঃ। —মাণ্ডূক্যকারিকা ১/১৪

(অনু) প্রথমোক্ত (বিশ্ব ও তৈজস) এই দুইটি জীব স্বপ্ন ও নিদ্রাযুক্ত; প্রাজ্ঞ কিন্তু স্বপ্নরহিত (কেবলই) নিদ্রাযুক্ত। স্থিরবুদ্ধি ব্রহ্মবিদ্‌গণ তুরীয়ে নিদ্রা ও স্বপ্ন কখনই দর্শন করেন না।

প্রাজ্ঞ জীব কেবল অজ্ঞানের দ্বারাই বদ্ধ, অজ্ঞানের কার্যের দ্বারা বদ্ধ নয়। এজন্য প্রাজ্ঞ জীবের তত্ত্বাগ্রহণ হয়, বিপরীতদর্শন হয় না। তুরীয় ব্রহ্ম অজ্ঞান ও অজ্ঞানের কার্য কোনটির দ্বারা বদ্ধ নন। এজন্য তার যেমন তত্ত্বের অগ্রহণ হয় না, তেমনি বিপরীতগ্রহণও হয় না। তুরীয় সর্বদা শুদ্ধ, স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ। তাই তুরীয়ে কোন অজ্ঞান নেই। কিন্তু প্রাজ্ঞ অজ্ঞানী। প্রাজ্ঞ জীব নিজে ও অন্য কাউকেই জানে না। সে সত্য বস্তুও জানে না, মিথ্যা বস্তুও জানে না। কিন্তু তুরীয় সর্বদা সকল বস্তু দর্শন করেন। এজন্য তাকে সর্বদৃক্ বলে। প্রাজ্ঞ জীবে স্বপ্ন অর্থাৎ অন্যথাগ্রহণ না থাকলেও নিদ্রা অর্থাৎ অজ্ঞান আছে। কিন্তু তুরীয়ে স্বপ্ন ও নিদ্রা কোনটিই নেই।

১.৭ সারসংক্ষেপ

গৌড়পাদ **মাণ্ডূক্যকারিকা** গ্রন্থের প্রণেতা। গ্রন্থটি **মাণ্ডূক্যোপনিষদ্‌কে** অবলম্বন করে প্রণীত হয়েছে। আগমপ্রকরণটি ঐ উপনিষদ্‌টির ব্যাখ্যা। অন্য প্রকরণগুলিতে বৈদিক অদ্বৈতবাদ যুক্তির দ্বারা উপস্থাপিত হয়েছে। গৌড়পাদের দর্শন শূন্যবাদ থেকে ভিন্ন। তাঁর দর্শনে তুরীয় ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু। এখানে ওঁকারতত্ত্ব বিশ্লেষণের মাধ্যমে জীবের স্বরূপ ব্যাখ্যাত হয়েছে। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটি অবস্থাভেদে এক ব্যষ্টি জীবেরই বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ - এই তিনপ্রকার নাম। এই তিন অবস্থায় বৈশ্বানর, হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বর যথাক্রমে সমষ্টি জীব।

বিশ্ব ও বৈশ্বানর স্থূলশরীরাভিমানী। এরা অন্নময়কোষের দ্বারা আবৃত ও স্থূলবাহ্য বিষয় ভোগ করে। স্বপ্নকালে ব্যষ্টি তৈজস জীব ও সমষ্টি জীব হিরণ্যগর্ভ সূক্ষ্মশরীরের অভিমানী। এরা প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় এই তিনটি কোষের দ্বারা আবৃত থাকে। এরা কেবলমাত্র আন্তর বিষয়কেই প্রত্যক্ষ করে। সুষুপ্তি অবস্থায় ব্যষ্টি জীবকে প্রাজ্ঞ ও সমষ্টি জীবকে ঈশ্বর বলা হয়। এরা কারণশরীরের অভিমানী। আনন্দময় কোষের দ্বারা আবৃত থাকায় ব্যষ্টি প্রাজ্ঞ বা সমষ্টি ঈশ্বর বহুল পরিমাণে আনন্দ উপভোগ করলেও আনন্দ স্বরূপতাকে উপভোগ করতে পারে না। বিশ্ব ও তৈজস অজ্ঞান ও অজ্ঞানের কার্যের দ্বারা বদ্ধ হওয়ায় তত্ত্ব জানতে পারে না ও একটি তত্ত্বকে বিপরীতভাবে বোঝে। প্রাজ্ঞ জীবের কেবল তত্ত্বাগ্রহণ হয়, বিপরীত দর্শন হয় না, যেহেতু সে কেবল অজ্ঞানের দ্বারাই বদ্ধ। তুরীয় নিত্য, আনন্দস্বরূপ ও সকলের দ্রষ্টা। তুরীয়ে তত্ত্বের অদর্শন ও বিপরীত দর্শন কোনটিই নেই।

১.৮ প্রধান শব্দগুচ্ছ

স্বপ্নাবস্থা

জাগ্রৎকালে স্থূল বিষয় ভোগ করার পর যখন নিদ্রারূপ তামসী বৃত্তি উৎপন্ন হয়, তাকে স্বপ্নাবস্থা বলে। এই অবস্থায় জীবে স্থূল দেহের অভিমান চলে যায় এবং বাহ্য জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি ব্যাপারশূন্য হয়ে অন্তঃকরণে বিলীন হয়। এটি অবিদ্যাবৃত্তি, মনোবৃত্তি নয়।

সুষুপ্ত্যবস্থা

যে অবস্থায় জীব নিজেকে প্রাপ্ত হয় তাকে সুষুপ্ত্যবস্থা বলে। এই অবস্থায় জীব জাগ্রৎকালীন বা স্বপ্নকালীন কোন বিষয়ই ভোগ করে না। একে স্বরূপাবস্থা বলে। এটি জাগ্রদবস্থা ও স্বপ্নাবস্থার উৎপত্তিস্থল ও লয়স্থল।

বিশ্ব

জাগ্রদবস্থায় ব্যষ্টি জীবকে বিশ্ব বলে। এর শরীর স্থূল, যাকে অন্নময় কোষ বলা হয়। বিশ্ব স্থূল বাহ্য বিষয় কে জানে। সে স্থূল বিষয়কে ভোগ করে। বিশ্ব সর্বব্যাপী হলেও তা প্রধানত দক্ষিণচক্ষুতে অবস্থান করে, যেহেতু এটি তার উপলব্ধিস্থান। ব্যষ্টি বিশ্ব, সমষ্টি বৈশ্বানর থেকে ভিন্ন নয়। বিশ্বকে বহিঃপ্রজ্ঞ বলা হয়।

তৈজস

স্বপ্নকালে ব্যষ্টি জীব তৈজস নামে অভিহিত হয়। সে লিঙ্গশরীরের অভিমানী। প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় — এই তিনটি কোষের দ্বারা সে ক্রমশঃ আবৃত থাকে। সূক্ষ্ম আন্তর বিষয়কে সে দর্শন করে। তার ভোগ ও তৃপ্তি উভয়ই সূক্ষ্ম। স্বপ্নকালীন তৃপ্তি জাগ্রৎ বা সুষুপ্তিতে অনুবর্তিত হয় না। ব্যষ্টি তৈজস সমষ্টি হিরণ্যগর্ভ হতে ভিন্ন নয়। মনে তৈজসের উপলব্ধি হয়। একে অন্তঃপ্রজ্ঞ বলা হয়।

প্রাজ্ঞ

সুষুপ্তিকালে ব্যষ্টি জীবকে প্রাজ্ঞ বলে। এই জীব অতীত ও ভবিষ্যৎ বিষয়জ্ঞানের কর্তা। জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালে জীবে প্রাজ্ঞত্ব থাকলেও সুষুপ্তিকালে জীবে কর্তৃত্বশূন্য প্রাজ্ঞত্ব থাকে। প্রাজ্ঞে কেবল জ্ঞানরূপতাই থাকে। এটি আত্মার তৃতীয় পাদ। ব্যষ্টি প্রাজ্ঞ ও সমষ্টি ঈশ্বর কারণশরীরের অভিমানী। আনন্দময় কোষ হল কারণশরীর। প্রাজ্ঞ জীবে কেবল তত্ত্বের অগ্রহণ হয়, ভেদবুদ্ধি হয় না। প্রাজ্ঞ জীব কেবল আনন্দ উপলব্ধি করে। এজন্য একে প্রবিবিক্তভুক্ বলে। হৃদয়দেশ প্রাজ্ঞের উপলব্ধিস্থান। ব্যষ্টি প্রাজ্ঞ ও সমষ্টি ঈশ্বর তত্ত্বত ভিন্ন নয়।

১.৯ নমনা-প্রশ্নাবলী ঃ

Essay Type

1. Following Gaudapāda explain the nature of *visa*, *taijaśa* and *prājña*.

Short Type

1. Write notes on *liṅgaśarīra* and *kāraṇa śarīra*.
2. Distinguish between *svapna* and *suṣupti*.

১.১০. গ্রন্থপঞ্জী

আচার্য গৌড়পাদ, মাণ্ডুক্যকারিকা, দুর্গাচরণ সাংখ্যা বেদান্ততীর্থ সম্পাদিত, দেবসাহিত্য কুটীর, কলিকাতা, ১৩৫৫

Acharya Gaudapada, *Mandukyakarika*, in *The Mandukya Upanisad and the Agama Sastra*, ed. Thomas E. Wood, Motilal Banarsidass, Delhi, 1992.

Acharya Gaudapada, *Mandukyakarika*, *Mandukya Upanisad* (With the Karika of Gaudapada and the commentary of Sankaracarya) trans. Swami Gambhirananda, Advaita Ashrama, Mayavati 1989.

ইউনিট ২ ঃ গৌড়পাদের দর্শনে ওঁঙ্কারতত্ত্ব ও সৃষ্টিতত্ত্ব

পাঠপরিকল্পনা

২.১ ঃ পাঠের উদ্দেশ্য

২.২ ঃ ওঁঙ্কার ও তার ধ্যান

২.২.১ ঃ ওঁঙ্কারের স্বরূপ

২.২.২ ঃ প্রণব ঈশ্বরের বাচক

২.২.৩ ঃ ওঁঙ্কার উপাসনার ফল

২.৩ ঃ ওঁঙ্কারের মাত্রা ও আত্মার পাদ

২.৩.১ ঃ ওঁঙ্কারের প্রথম মাত্রা ও আত্মার প্রথম পাদ

২.৩.২ ঃ ওঁঙ্কারের দ্বিতীয় মাত্রা ও আত্মার দ্বিতীয় পাদ

২.৩.৩ ঃ ওঁঙ্কারের তৃতীয় মাত্রা ও আত্মার তৃতীয় পাদ

২.৩.৪ ঃ পাদ ও মাত্রার অভেদ জ্ঞানের ফল

২.৪ সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে গৌড়পাদ ও বাদীগণের মত

২.৪.১ ঃ সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে বাদীগণের মতবাদ

২.৪.২ ঃ গৌড়পাদের দর্শনে অজাতিবাদ

২.৫ সারসংক্ষেপ

২.৬ প্রধান শব্দগুচ্ছ

২.৭ নমুনা-প্রশ্নাবলী

২.৮ গ্রন্থপঞ্জী

২.১ ঃ পাঠের উদ্দেশ্য

ওঁম্ একটি একাক্ষর ধ্বনি। এটি ঈশ্বরের বাচক। সাধক, উপাসক ও তত্ত্বজ্ঞানী নির্বিশেষে ওঁম্-কারের অনুধ্যান করে থাকেন। ওঁম্- কারের স্বরূপ, তার উপাসনার ফল, তার তিনটি মাত্রার সাথে আত্মার তিনটি পাদের অভেদ, সৃষ্টি সম্বন্ধে নানা সৃষ্টিচিন্তকের মত এবং গৌড়পাদের অজাতিবাদের সাথে পরিচয় করানোই এই পাঠের উদ্দেশ্য।

২.২ ঃ ওঁঙ্কার ও তার ধ্যান

২.২.১ ওঁঙ্কারের স্বরূপ

আর্যদের ধর্মগ্রন্থে ওম্ ও ওঁ এই দুটি শব্দের উল্লেখ আছে। ওম্ শব্দটি সম্মতি অর্থের বোধক। বিভিন্ন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে এর বহুল প্রয়োগ আছে। উপনিষদের যুগেও ওম্ শব্দটি সম্মতি অর্থে নানাস্থলে ব্যবহৃত হয়েছে। যেকোন বেদমন্ত্রের শুরুতে ও গায়ত্রী মন্ত্রের শুরু ও সমাপ্তিতে ওম্ শব্দের ব্যবহার হত। শান্তিপাঠের সময়েও ওম্ শব্দের ব্যবহার আছে। কিন্তু ওঁম্ শব্দটি পরব্রহ্ম বা পরাবাক্‌কে বোঝায়। এই অর্থে ওম্ শব্দটি ব্যবহৃত হত না। পুরাণের যুগে ওম্ শব্দটি অ, উ, ম- এই তিনটি ধ্বনিকে বোঝাত। এই ধ্বনি তিনটি যথাক্রমে বিষ্ণু, মহেশ্বর ও ব্রহ্মার বোধক। বিষ্ণু জগতের পালনকর্তা, মহেশ্বর জগতের ধ্বংসকর্তা এবং ব্রহ্মা জগতের সৃষ্টিকর্তা। সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় এরূপ ক্রম সাধারণত বর্ণিত হয়ে থাকে। কিন্তু পুরাণে অনেক জায়গায় স্থিতি, লয় এবং সৃষ্টি- এরূপ ক্রমের উল্লেখ আছে।

উপনিষদের ঋষিরা ওঁম্ শব্দটি প্রয়োগ করেছেন। এই শব্দটি সম্মতি অর্থের বোধক নয়। এই শব্দটি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কর্তাকে বোঝায় না। এটি একটি সন্ধ্যক্ষর। ইহা শব্দব্রহ্ম বা তুরীয়কে বোঝায়। শাব্দিকেরা পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী-এই চার প্রকার ধ্বনি মেনেছেন। পরাবাক্ মূলাধারে থাকে। এতে কোন স্পন্দন থাকে না। একেই শব্দব্রহ্ম বলা হয়। নিস্পন্দ ধ্বনিতে যখন স্পন্দন দেখা দেয় তখন তাকে পশ্যন্তী বাক্ বলে, এটি নাভিদেশে থাকে। একেই ওঁ-কার ধ্বনি বলে। যোগীরা এই ধ্বনিকে প্রত্যক্ষ করেন। মধ্যমা বাক্ স্বশ্রুতিগোচর আর বৈখরী বাক্ পরশ্রুতিগোচর। এক পরাবাকের বিবর্ত হল পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী। ওঁম্ এই ধ্বনিটিতে অ, উ ও ম এই তিনটির মিলিত রূপ ওম্- এই শব্দটি জীবের তিনটি অবস্থাকে বোঝায়। ওকার এর ওপর যে অর্ধচন্দ্রকার চিহ্ন থাকে উহা মায়োপহিত চৈতন্য অর্থাৎ ঈশ্বরকে বোঝায়। অর্ধচন্দ্রাকার চিহ্নটির ওপর যে বিন্দুটি রয়েছে তা শব্দব্রহ্ম বা তুরীয়ব্রহ্মের দ্যোতক। পরবর্তীকালে ওঁম্ শব্দের পরিবর্তে ওঁঙ্কার শব্দটির প্রচলন হয়। এই পাঠ উপকরণে আমরা ওঁঙ্কার শব্দটি গ্রহণ করছি। এই ওঁঙ্কারকেই কখনও প্রণব নামে উল্লেখ করা হয়। প্রপূর্বক নু ধাতুর সাথে অপ্ প্রত্যয় যোগ করে প্রণব শব্দটি গঠিত হয়েছে। ইহা সবসময় প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করে বলে একে প্রণব বলে।

(মূল) প্রণবো হ্যপরং ব্রহ্ম প্রণবশ্চ পরং স্মৃতঃ।
অপূর্ব্বো হনন্তরোহবাহ্যোহনপরঃ প্রণবোহব্যয়ঃ।।

—মাণ্ডুক্যকারিকা ১/২৬

(অনু) প্রণব অপর ব্রহ্ম, প্রণব পরব্রহ্ম (তত্ত্বদর্শীগণ কর্তক) এরূপ কথিত হয়। এই প্রণবের পূর্ববর্তী কারণ নেই, বিজাতীয় ভেদ নেই, সজাতীয় ভেদ নেই। কার্য নেই, ইহা অব্যয় (অর্থাৎ নির্বিকার স্বভাব)।

গৌড়পাদ পূর্ববর্তী শ্লোকটিতে মন্দ ও মধ্যম অধিকারীর জন্য আত্মার ধ্যেয়রূপ প্রদর্শন করেছেন। আর এই কারিকাটিতে তিনি উত্তম অধিকারীর জন্য ব্রহ্মের জ্ঞেয়রূপ বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি প্রণবকে পর ব্রহ্ম, অপর ব্রহ্ম উভয়ই বলেছেন। সোপাধিক ব্রহ্মকে অপর ব্রহ্ম ও নিরুপাধিক ব্রহ্মকে পর ব্রহ্ম বলে। অপর ব্রহ্মই পরব্রহ্ম হন, যখন ওঁঙ্কারের তিনটি মাত্রা বা আত্মার তিনটি পাদ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। প্রণবের কোন কারণ নেই। এজন্য গৌড়পাদ একে 'অপূর্ব' বলেছেন। প্রণবকে এখানে 'অনন্তর' বলা হয়েছে। এর কারণ হল প্রণব থেকে ভিন্ন জাতীয় কিছু নেই। প্রণব ব্যতীত অন্য কিছুই নেই, এজন্য তিনি 'অবাহ্য'। এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, প্রণবের সজাতীয় কিছু না থাকায় ইহা সজাতীয় ভেদরহিত। প্রণবের কোন কার্য নেই। এজন্য তাকে 'অনপর' বলা হয়। সৈন্ধব খণ্ডের ন্যায় প্রণব বাইরে ও অন্তরে থাকে। ইহা হ্রাসবৃদ্ধি রহিত।

২.২.২ ঃ প্রণব ঈশ্বরের বাচক

যোগীরা প্রণবকে ঈশ্বরের বাচক বলেন। প্রণবের সাথে ঈশ্বরের বাচ্যবাচক সম্বন্ধ আছে। প্রণব বাচক, ঈশ্বর বাচ্য। শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ স্বাভাবিক। ঈশ্বরের 'এই শব্দ থেকে এই অর্থ বোঝাক' এই ইচ্ছার দ্বারা ঐ স্বাভাবিক সম্বন্ধ অভিব্যক্ত হয়। প্রত্যেকটি শব্দই সকল প্রকার অর্থকে বোঝাতে সমর্থ। এই জন্যই যোগীরা বলেন, সকল শব্দের সাথে সকল অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ থাকে। ঈশ্বরসংকেত হল তার প্রকাশক ও নিয়ামক। ঈশ্বরসংকেত ও ঈশ্বরাসংকেতের ফলেই বাচক ও অপভ্রংশ এরূপ বিভাগ হয়ে থাকে। কাজেই প্রণব শব্দের সাথে ঈশ্বরের যে বাচ্যবাচক সম্বন্ধ ইহা ঈশ্বরসংকেতলভ্য স্বাভাবিক সম্বন্ধ।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধকে স্বাভাবিক বলা সঙ্গত হবে না, কারণ মহাপ্রলয়ে শব্দ ও তার শক্তি প্রকৃতিতে লীন হয়। মহাপ্রলয়ে প্রণবও বিলীন হওয়ায় উহা তখন বাচক হবে না। সর্গান্তরেও প্রণব ঈশ্বরের বাচক হতে পারবে না, কারণ যেখানে শব্দের কোন সম্বন্ধ থাকে না, সহস্র সংকেতের দ্বারাও তার অভিব্যক্তি সম্ভব নয়। এজন্য মহাপ্রলয়ের পর মহাসৃষ্টিতে প্রণব ঈশ্বরের বাচক হতে পারবে না। এর উত্তরে বলতে হবে, মহাপ্রলয়ে শব্দ শক্তি সহ প্রধানের সাম্য প্রাপ্ত হলেও পুনরায় আর্বিভাবের সময় সে শক্তিযুক্ত রূপেই আবির্ভূত হয়। সুতরাং ঈশ্বর পূর্বসম্বন্ধ অনুসারেই সংকেত করে থাকেন। কাজেই মহাপ্রলয়ের পর সর্গান্তরেও প্রণব ঈশ্বরের বাচক হয়।

২.২.৩ ঃ ওঁঙ্কার উপাসনার ফল

(মূল) যুঞ্জীত প্রণবে চেতঃ প্রণবো ব্রহ্ম নির্ভয়ম্।
প্রণবে নিত্যযুক্তস্য ন ভয়ং বিদ্যতে ক্কচিৎ।।

—মাণ্ডুক্যকারিকা ১/২৫

(অনু) প্রণবে চিত্ত সমাহিত করবে; (কারণ) প্রণব সংসারভয়রহিত ব্রহ্মস্বরূপ প্রণবে সর্বদা সমাহিত চিত্ত ব্যক্তির কোথাও ভয় থাকে না।

গৌড়পাদ **মাণ্ডূক্যকারিকা**-র আগম প্রকরণে ওঁঙ্কার ধ্যানের ফল বিবৃত করেছেন। তিনি ওঁঙ্কার ও প্রণব এই দুটি শব্দ সমার্থকরূপে গ্রহণ করেছেন। প্রণব হল অভয় ব্রহ্মস্বরূপ। প্রণব বলতে ওঁঙ্কার ধ্বনিকে বোঝায়, যা ঈশ্বরের বোধক, পরব্রহ্মের নয়। তবে ওঁঙ্কার ধ্যানের ফলে চিত্ত সমাহিত হলে তুরীয় ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হয়। এজন্য গৌড়পাদ প্রণবকে ব্রহ্মস্বরূপ বলেছেন। প্রণব হচ্ছে ভবসাগর পার হওয়ার তরণী। তাই প্রণবে মন সমাহিত করলে সংসারের সর্বপ্রকার ভয় হতে সে অব্যাহতি পায়। এখানে গৌড়পাদ সমাধি বলতে সম্প্রজ্ঞাত সমাধির কথা বলেছেন। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে মনে একই ধ্যেয় বিষয়ের অনবরত ভাবনা চলে। ওঁঙ্কার নিয়ে এরূপ চিত্তে ভাবনা হলে সমাহিত ব্যক্তি সাংসারিক দুঃখ-কষ্টের দ্বারা ক্লিষ্ট হয় না।

(মূল) সর্ব্বস্য প্রণবো হ্যাদির্ম্মধ্যমন্তস্তথৈব চ।
এবং হি প্রণবং জ্ঞাত্বা ব্যশ্নুতে তদনন্তরম্।।

—মাণ্ড্ক্যকারিকা/১/২৭

(অনু) প্রণবই সকলের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ। এই রূপে প্রণবকে (অর্থাৎ প্রণবরূপী আত্মাকে কারণরূপে) জেনে তৎক্ষণাৎ সেই (পূর্বোক্ত অধিকারী) আত্মাকে প্রাপ্ত হয়।

গৌড়পাদ এই কারিকায় দেখিয়েছেন, প্রণব সকলেরই আত্মা। দৃশ্যমান এই নামরূপাত্মক জগতের উৎপত্তি হয়েছে প্রণব থেকে। প্রণবকে আশ্রয় করে এই সকল বস্তু অবস্থান করে এবং পরিশেষে প্রণবেই লয়প্রাপ্ত হয়। সকল ভূতপদার্থই মায়াময়। মায়াবী যেমন নিজে নির্লিপ্ত থেকে দর্শককে গন্ধর্বনগর দেখায়, তেমনি অবিকারী প্রণব স্বয়ং নির্লিপ্ত থেকে আকাশাদি যাবতীয় ভূতকে উপস্থাপিত করে। যে ব্যক্তি প্রণবকে উপাসনা করেন, তিনি মায়াবীকল্প প্রণবরূপী আত্মাকে জেনে তৎক্ষণাৎ আত্মভাব প্রাপ্ত হন। বস্তুত প্রণবের ধ্যান একপ্রকার প্রতীক উপাসনা। কিন্তু গৌড়পাদ দেখিয়েছেন, এই ধ্যেয় ব্রহ্মের উপাসনা জ্ঞেয় ব্রহ্মে উত্তরণের সোপান।

(মূল) প্রণবং হীশ্বরং বিদ্যাৎ সর্ব্বস্য হৃদি সংস্থিতম্।
সর্ব্বব্যাপিনমোঙ্কারং মত্বা ধীরো ন শোচতি।।

—মাণ্ডুক্যকারিকা ১/২৮

(অনু) প্রণবকে নিশ্চয়ই সকল প্রাণীর হৃদয়ে (অন্তর্যামীরূপে) অবস্থিত ঈশ্বর বলে জানবে। স্থিতধী ব্যক্তি (আকাশের মতো) সর্বব্যাপী ওঁঙ্কারকে জেনে শোক করেন না (অর্থাৎ শোক হতে উত্তীর্ণ হন।)

আত্মা সর্বব্যাপী। কিন্তু হৃদয়েই তার উপলব্ধি হয়। ওঁঙ্কারের উপাসক ওঁঙ্কারকে ঈশ্বর হতে অভিন্ন বলে জেনে শোক থেকে উত্তীর্ণ হবেন। অজ্ঞান শোকের কারণ। সর্বব্যাপী ওঁঙ্কারকে হৃদয়ে মনন ও নিদিধ্যাসন করলে আত্মারূপে উপলব্ধি হয়। আত্মজ্ঞান হলে অজ্ঞান বিনষ্ট হয়। এর ফলে অজ্ঞানের কার্য শোক সম্ভব হয় না। ওঁঙ্কার উপাসনার অধিকারীকে স্থিতধী হতে হবে। যিনি সত্য ও অসত্যের ভেদ জানেন এবং অসত্যকে পরিহার করেন তিনি ধীর বলে বিবেচিত হন। ঐ ধীর ব্যক্তিরই আত্মোপলব্ধি হয়।

(মূল) অমাত্রোঽনন্তমাত্রশ্চ দ্বৈতস্যোপশমঃ শিবঃ।
ওঙ্কারো বিদিতো যেন স মুনির্নেতরোজনঃ।।

—মাণ্ডুক্যকারিকা ১/২৯

(অনু) যার দ্বারা (যে সাধকের দ্বারা) মাত্রারহিত, অনন্তমাত্র (অসীম), দ্বৈতজগতের বিশ্রান্তির স্থান, কল্যাণময় ওঁঙ্কার জ্ঞাত হন তিনি যথার্থ মুনি, অন্য কেউ নয়।

এই শ্লোকে গৌড়পাদ তুরীয়ের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি ওঁঙ্কারকে তুরীয় বলেছেন। ওঁঙ্কারে কোন রূপ মাত্রা থাকে না। তাঁকে তিনি অনন্তমাত্র বলেছেন। কারণ কোন মাত্রা বা পরিচ্ছেদের দ্বারা তাকে সীমাবদ্ধ করা যায় না। মায়ার ফলে যে দ্বৈতজগতের প্রতিভাস ঘটে তার লয়স্থান হল ওঁঙ্কার। ওঁঙ্কার হল মঙ্গলস্বরূপ। ওঁঙ্কারের স্বরূপ যিনি সাক্ষাদ্‌ভাবে উপলব্ধি করেছেন তিনিই যথার্থ মুনি। পরামার্থতত্ত্ব যিনি মনন করেন তাকে মুনি বলে। কাজেই ওঁঙ্কার উপাসনার ফলে উপাসক মুনি পদবী লাভ করেন এবং প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞ বলে বিবেচিত হন।

২.৩ ওঁঙ্কারের মাত্রা ও আত্মার পাদ

২.৩.১ ঃ ওঁঙ্কারের প্রথম মাত্রা ও আত্মার প্রথম পাদ

মাণ্ডুক্যোপনিষদ্ এর ঋষি ও গৌড়পাদ আত্মাকে চতুষ্পাদ বলেছেন। বস্তুত জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটিকে আত্মার পাদ বলা হয়। তুরীয় পাদহীন, তুরীয়ে কোন অংশ নেই, উহা নিরংশ, তথাপি উহাকে পাদকল্প বুঝে আত্মাকে চতুষ্পাদ বলা হয়। ওঁঙ্কারে অ, উ এবং ম এই তিনটি মাত্রা আছে। তুরীয় মাত্রাহীন হলেও তাকে

মাত্রাকল্প ধরে ওঁঙ্কারের চারটি মাত্রা বলা হয়। বস্তুত আত্মার তিনটি পাদ ও ওঁঙ্কারের তিনটি মাত্রা আছে। জাগ্রদবস্থায় স্থূলশরীরের অভিমানী ব্যষ্টি বিশ্ব এবং স্থূল শরীরের সমষ্টি বৈশ্বানর আত্মার প্রথম পাদ।

(মূল) বিশ্বস্যাত্ববিবক্ষায়ামাদিসামান্যমুৎকটম্।

মাত্রাসম্প্রতিপত্তৌ স্যাদাপ্তিসামান্যমেব চ ।।

—মাণ্ডুক্যকারিকা ১/১৯

(অনু) বিশ্বজীবকে অ-কার এই মাত্রা বলার ইচ্ছায় প্রাথমিকত্বরূপ সাদৃশ্যই মুখ্য। আর (বিশ্বের) মাত্রারূপে ভাবনায় ব্যাপকত্বরূপ সাদৃশ্যই (প্রধান) হয়।

গৌড়পাদ আত্মার প্রথম পাদ ও ওঁঙ্কারের প্রথম মাত্রার একত্ব উপপাদন করেছেন। তার মতে অ-কার ও বিশ্বজীব অভিন্ন। প্রাথমিকত্বরূপ সাদৃশ্যই উভয়ের অভেদের প্রধান কারণ। আত্মার পাদসমূহের মধ্যে বিশ্ব প্রথম পাদ। আর ওঁঙ্কারের মাত্রাসমূহের মধ্যে অ-কার প্রথম মাত্রা। অ-কার যেমন সকল বর্ণের আদি, বিশ্ব জীবও তেমনি আত্মার পাদত্রয়ের প্রথম। অ-কার সকল বর্ণে পরিব্যাপ্ত থাকে। বিশ্ব জীবও স্থূল জগতে পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকে। এখানে উল্লেখ্য যে, গৌড়পাদ ব্যষ্টি বিশ্ব জীব ও সমষ্টি বৈশ্বানরকে অভিন্ন বলেছেন। কাজেই সমষ্টি বৈশ্বানর স্থূল জগৎকে পরিব্যাপ্ত করে থাকে বলে বিশ্ব জীবও সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত ইহা বিবক্ষিত। কাজেই আদিত্ব ও ব্যাপকত্ব অ-কার ও বিশ্ব উভয়ের সাধারণ ধর্ম। এজন্যই গৌড়পাদ ওঁঙ্কারের প্রথম মাত্রা অ-কারকে আত্মার প্রথম পাদ বিশ্ব বা বৈশ্বানর বলেছেন।

২.৩.২ ওঁঙ্কারের দ্বিতীয় মাত্রা ও আত্মার দ্বিতীয়পাদ

(মূল) তৈজসস্যোত্ববিজ্ঞানে উৎকর্ষো দৃশ্যতে স্ফুটম্।

মাত্রাসম্প্রতিপত্তৌ স্যাদুভয়ত্বং তথাবিধম্।।

—মাণ্ডুক্যকারিকা ১/২০

(অনু) তৈজসজীবের উ-কার স্বরূপ ভাবনায় উৎকর্ষ স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হয়। (তৈজস জীবের) মাত্রাস্বরূপ ভাবনায় উভয় মধ্যবর্তিত্ব পরিস্ফুট হয়ে থাকে।

গৌড়পাদ দেখিয়েছেন, আত্মার দ্বিতীয় পাদ তৈজস জীব এবং ওঁঙ্কারের দ্বিতীয় মাত্রা উ-কার অভিন্ন। এখানে তৈজস ব্যষ্টি জীবের উল্লেখ থাকলেও সমষ্টি হিরণ্যগর্ভ বিবক্ষিত। কারণ সমষ্টি হিরণ্যগর্ভ সকল ব্যষ্টি তৈজস জীব থেকে ভিন্ন নয়। গৌড়পাদের মতে তৈজস ও উ-কারের সাদৃশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট। মধ্যবর্তিত্ব হল উভয়ের সাদৃশ্য। উ-কার যেমন অ-কার ও ম-কারের মধ্যবর্তী তেমনি তৈজস জীব বিশ্ব ও প্রাজ্ঞের মধ্যবর্তী। তাছাড়া, উৎকর্ষের জন্যও উ-কারকে তৈজস বলা হয়। আত্মার প্রথম পাদ বিশ্ব হতে আত্মার দ্বিতীয় পাদ তৈজস উৎকৃষ্ট। তুল্যভাবে ওঁঙ্কারের প্রথম মাত্রা অ-কার হতে ওঁঙ্কারের দ্বিতীয় মাত্রা উ-কার উৎকৃষ্ট। এই উৎকর্ষ ও মধ্যবর্তিত্বরূপ সাদৃশ্যের জন্যই গৌড়পাদ আত্মার দ্বিতীয় পাদ ও ওঁঙ্কারের দ্বিতীয় মাত্রাকে অভিন্ন বলেছেন।

২.৩.৩ ওঁঙ্কারের তৃতীয় মাত্রা ও আত্মার তৃতীয় পাদ

(মূল) মকারভাবে প্রাজ্ঞস্য মানসামান্যমুৎকটম্।

মাত্রাসম্প্রতিপত্তৌ তু লয়সামান্যমেব চ।।

—মাণ্ডূক্যকারিকা ১/২১

(অনু) প্রাজ্ঞ জীবের ম-কার ভাবনায় পরিমাণসাধর্ম্য প্রধান। আর (প্রাজ্ঞ জীবের) মাত্রাজ্ঞানে লয়স্থান রূপ সাধর্ম্যই (স্পষ্ট)।

গৌড়পাদের মতে আত্মার তৃতীয়পাদ প্রাজ্ঞ জীব এবং ওঁঙ্কারের তৃতীয় মাত্রা ম-কার অভিন্ন। এখানে প্রাজ্ঞ বলতে সমষ্টি ঈশ্বরকেও বুঝতে হবে। প্রাজ্ঞ ও ম-কারের অভেদ ভাবনায় পরিমাপকত্ব সাদৃশ্যই প্রধান কারণ। আবার অ-কার ও উ-কারের লয়স্থান ম-কার। বিশ্ব ও তৈজসের লয়স্থান প্রাজ্ঞ। এরূপ সাধর্ম্যের জন্যই ম-কার ও প্রাজ্ঞকে অভিন্ন বলা হয়।

২.৩.৪ পাদ ও মাত্রার অভেদজ্ঞানের ফল

গৌড়পাদ মাত্রা ও পাদের অভেদ ভাবনার ফল বিশ্লেষণ করেছেন। ওঁঙ্কারকে অবলম্বন করে যখন কেউ উপাসনা করেন, তখন ওঁঙ্কারের প্রথম মাত্রা অ-কার উপাসককে বিশ্ব পদ প্রাপ্ত করায়। এরপর ওঁঙ্কারের দ্বিতীয় মাত্রা উ-কার ঐ উপাসককে তৈজসপদ প্রাপ্ত করায়। ওঁঙ্কারের তৃতীয়মাত্রা ম-কার ধ্যানরত ব্যক্তিকে প্রাজ্ঞপদ প্রাপ্ত করায়। ব্যষ্টি প্রাজ্ঞ সমষ্টি ঈশ্বর থেকে ভিন্ন না হওয়ায় ঐ সাধকের ঈশ্বর পদ প্রাপ্তি ঘটে। এজন্যই গৌড়পাদ বলেছেন, যিনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটি অবস্থায় আত্মার পাদত্রয় বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ এবং ওঁঙ্কারের মাত্রাত্রয় অ, উ এবং ম-এই উভয়ের সাধর্ম্য নিঃসংশয়ে জানেন তিনি ব্রহ্মবিৎ নামে পরিচিত হন এবং প্রথমে বৈশ্বানর পদ, পরে হিরণ্যগর্ভপদ ও পরিশেষে ঈশ্বরপদ প্রাপ্ত হয়ে কৃতকৃতার্থ হন।

২.৪ সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে গৌড়পাদ ও বাদীগণের মত

২.৪.১ সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে বাদীগণের মতবাদ

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে, সৃষ্টিকর্তা কে, কি উপকরণ দিয়েই বা জগতের প্রথম সৃষ্টি— এরূপ নানা জিজ্ঞাসা আদিম যুগেই মানুষের মনে জেগেছিল। বেদ, উপনিষদ্, সংহিতা, পুরাণ, দর্শন প্রভৃতি গ্রন্থে সৃষ্টিবাদ নিয়ে নানা আলোচনা আছে। **ঋগ্বেদে** পুরুষসূক্তের ঋষি বলেছেন, আদি পুরুষ নিত্য সর্বব্যাপক। তা থেকে বিরাট্ পুরুষের সৃষ্টি হয়। বিরাটপুরুষ হল পুরুষতত্ত্ব ও নারীতত্ত্বের এক মিলিত রূপ যা থেকে ক্রমশ বিশ্বচরাচরের সৃষ্টি হয়। **ঋগ্বেদেব** নাসদীয়সূক্তের ঋষি বলেছেন, মহাপ্রলয় দশায় অর্থাৎ মহাসৃষ্টির পূর্বে সৎ, অসৎ, কার্যকারণ, দিনরাত, ও জন্মমৃত্যু কিছুই ছিল না। তখন অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আচ্ছন্ন ছিল। সর্বত্র প্লবমান জলরাশি হতে কামের সৃষ্টি হয়। তবে এই সূক্তের ঋষি বলেছেন, সৃষ্টিতত্ত্ব অত্যন্ত রহস্যপূর্ণ। দেবতারাই হয়ত এই তত্ত্ব জানেন, অথবা তাঁরাও জানেন না। হিরণ্যগর্ভসূক্তে বলা হয়েছে, সৃষ্টির পূর্বে সর্বত্র প্লবমান জলে একটি সুবর্ণডিম্বের উৎপত্তি হয়, ঐ ডিম্ব হতে হিরণ্যগর্ভের সৃষ্টি হয়। তিনি অপরাপর লোকপাল ও সমস্ত প্রাণিকুলকে সৃষ্টি করেন। বেদে দেখা যায়, ভিন্ন ভিন্ন ঋষি সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন।

উপনিষদের ঋষিরা বলেন, এক সচ্চিদানন্দই বহু হয়েছেন। পুরাণে মুখ্যত একজন সৃষ্টিকর্তাই স্বীকার করা হয়েছে। তিনি হলেন প্রজাপতি। আবার কেউ বলেন, সৃষ্টি হল আত্মার বিস্তৃতি। আবার কেউ বলেন, সৃষ্টি হল

মনের স্পন্দন। অদ্বৈতবাদী শঙ্কর ও তার অনুগামী বেদান্তীরা বলেন, সৃষ্টি দুপ্রকার— অচেতন সৃষ্টি ও চেতন সৃষ্টি। অচেতন সৃষ্টিকর্তার নাম প্রাণ আর চেতন সৃষ্টি কর্তা মায়োপহিত চিন্ময় ব্রহ্ম। এই মতে মায়া হচ্ছে সৃষ্টির পরিণামী উপাদান। মায়ার যেখানে প্রাধান্য ও যাতে সৃষ্টির বীজ নিহিত থাকে সেই চেতনের নাম প্রাণ। একটি মাকড়সা যেমন নিজ লালার সাহায্যে নিজ দেহ থেকে সুতো উৎপন্ন করে, তেমনি প্রাণও নিজ চেতনার প্রভাবে নিজ মায়া হতে অচেতন জগৎ সৃষ্টি করে। এই প্রাণেরও যিনি বিম্বস্বরূপ তিনি চিন্ময় ব্রহ্ম। তাকে পুরুষ বলা হয়। ইনি বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ প্রভৃতি চেতনের সৃষ্টিকর্তা। অগ্নি থেকে যেমন অগ্নির অনুরূপ নানা স্ফুলিঙ্গ নিঃসৃত হয়, তেমনি এক চিন্ময় পুরুষ হতে অসংখ্য পুরুষ নির্গত হয়।

সৃষ্টির মূল উৎস, সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টির উপকরণ নিয়ে সৃষ্টিচিন্তকদের মধ্যে যেমন নানা মতভেদ ছিল, তেমনি সৃষ্টির প্রয়োজন নিয়েও ভিন্ন ভিন্ন মত আছে। কোন কোন সৃষ্টিচিন্তক বলেন, সৃষ্টি হল ঈশ্বরের ঐশ্বর্যবিস্তার। পরমেশ্বর নিজের ঐশ্বর্যকে নিরীক্ষণ করার জন্যই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। যেমন রাধা হলেন শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির প্রকাশ। ঐ শক্তি ভক্তের সাত্ত্বিক মনে পতিত হয়ে ভক্তিতে পরিণত হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাই রাধার মধ্যে নিজের হ্লাদিনী শক্তিকে নিরীক্ষণ করতেন। কেউ কেউ বলনে, সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সঙ্কল্পময় ইচ্ছাই সৃষ্টি। সৃষ্টি হল তাঁর চিন্তার বিকাশ। বস্তুত সঙ্কল্পের অতিরিক্ত কিছু নেই। কেউ কেউ বলেন, সৃষ্টিকর্তা নিজের ভোগের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। অনেকে বলেন, সৃষ্টি হল ঈশ্বরের লীলা। ঈশ্বর হলেন পূর্ণকাম। সুতরাং তাঁর সৃষ্টির কোন কামনা থাকতে পারে না। সৃষ্টি প্রয়োজনসাপেক্ষ নয়। ইহা স্বভাবসিদ্ধ লীলামাত্র। যেমন বাহ্য কোন ফলের আকাঙ্খা না করে শ্বাস ও প্রশ্বাস প্রভৃতি প্রাণের ক্রিয়া স্বভাবতই সম্ভব হয়ে থাকে, সেরূপ অন্য কোন প্রয়োজন ছাড়াই কর্মসহকৃত মায়াশক্তিরূপ স্বভাবশতই ঈশ্বরের জগৎসৃষ্টিতে লীলারূপ প্রবৃত্তি হয়ে থাকে।

২.৪.২ গৌড়পাদের দর্শনে অজাতিবাদ ঃ

'মাণ্ডুক্যকারিকা'য় গৌড়পাদ সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রাচীন অদ্বৈত বেদান্তীগণের মত বিধৃত করেছেন। শংকরের মতো তিনি বিবর্তবাদী নন। তিনি মায়াবাদী। তিনি তাত্ত্বিকস্তর হতে জগৎকে নিরীক্ষণ করেছেন। সেজন্য সমস্ত জগৎ তাঁর কাছে মায়া বলে প্রতিভাত হয়েছে। একজন মায়াবী একখণ্ড বস্ত্র শূন্যে নিক্ষেপ করে নিজে সমতলে অদৃশ্য হয়ে আকাশমার্গে বিচরণ করে ও নানা খেলা দর্শককে দেখিয়ে থাকে। কখনও বা সে আকাশমার্গে নানা যুদ্ধে লিপ্ত হয়। দর্শকরা মায়াবীর সমস্ত খেলাকে সত্য বলে বোঝে। কিন্তু মায়াবী এসব কিছু থেকে নিজেকে পৃথক্ রাখে। যে ব্যক্তি মায়াবীর অন্তরালে থাকে সে সবকিছু দেখতে পায়। গৌড়পাদ বলেন, এই বিশ্বসৃষ্টিও মায়াবীর মায়া। অজ্ঞানের ভূমিতেই মায়াবীর এই খেলা। এক শুদ্ধচৈতন্যই মায়ার ভূমিতে নানারূপ দেখাচ্ছেন। সাধারণ অজ্ঞ জীবেরা মায়ায় আবদ্ধ হয়ে নানা বৈচিত্র্যকে সত্য বলে বুঝে থাকে। কিন্তু মায়াবীর মতো শুদ্ধচৈতন্য মায়ার উর্দ্ধে আছেন। মায়ার বেড়াজাল হতে যিনি মুক্ত এমন তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি বুঝতে পারেন এই বিশ্বসৃষ্টি মায়ার খেলা ছাড়া কিছু নয়।

গৌড়পাদ আরও বলেছেন, দৃশ্য এই বিশ্বসৃষ্টি স্বপ্নমাত্র। স্বপ্নদর্শী ব্যক্তি যেমন নিজের মনের বাসনা হতে উৎপন্ন আন্তরবস্তুকে প্রত্যক্ষ করে, তেমনি অজ্ঞানী জীব নিজের অজ্ঞানের বাসনা হতে উৎপন্ন এই বিশ্ব চরাচরকে প্রত্যক্ষ করে। একটি মাকড়সা যেমন নিজের লালা দিয়ে জাল পাড়ে, তেমনি এক তুরীয় ব্রহ্ম অজ্ঞানের সাহচর্যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিজ হতে সৃষ্টি করেন। সুতরাং গৌড়পাদের মতে বিশ্বসৃষ্টি হল মনের কল্পনা।

গৌড়পাদ দেখিয়েছেন, স্বপ্ন ও মায়া উভয়েই অসৎ। এরা অবিদ্যমান হলেও অবিবেকী মানুষের কাছে তা সত্য বলে বিবেচিত হয়। তাঁর মতে, এই সৃষ্টি গন্ধর্বনগর ছাড়া কিছু নয়। বিস্তৃত পণ্যশালা, প্রাসাদ, স্ত্রী-পুত্র ও

ব্যবহারের উপযোগী নানা গ্রামের দ্বারা সমাকীর্ণ গন্ধর্বনগর প্রতীয়মান হয় এবং অচিরেই তা অদৃশ্য হয়। স্বপ্ন, মায়া ও গন্ধর্বনগর অলীক হলেও যেমন দৃষ্টিগোচর হয়, তেমনি এই জগৎ অসৎ হলেও দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে।

গৌড়পাদের মতে, দ্বৈতবস্তুর কোন বাস্তব সত্তা নেই। কাজেই দ্বৈতবস্তুর উৎপত্তি বা বিনাশ কোনটিই হয় না। যার উৎপত্তি হয় তারই বিনাশ হয়ে থাকে। দৃশ্য বস্তুর উৎপত্তি নেই, সুতরাং তার বিনাশও নেই। গৌড়পাদ বলেন, দৃশ্য বস্তুমাত্রই অলীক। অলীক শশশৃঙ্গের যেমন উৎপত্তি বা বিনাশ হয় না, তেমনি নামরূপবিশিষ্ট দ্বৈতবস্তুর উৎপত্তি ও বিনাশ হতে পারে না। গৌড়পাদ দেখিয়েছেন, অসতের যেমন উৎপত্তি হয় না, তেমনি সদ্‌বস্তুরও উৎপত্তি হতে পারে না। তুরীয় ব্রহ্ম একমাত্র সত্যবস্তু। অদ্বৈত তুরীয় উৎপন্নও হয় না, বিলীনও হয় না। ভ্রমস্থলে রজ্জুতে যে সর্প কল্পিত হয় ঐ কল্পিত সর্পটি উৎপন্নও হয় না, বাধিতও হয় না। ভ্রমকালে সর্পটির উৎপত্তি মানলে ঐ সর্পটি হয় রজ্জুতে অথবা মনে অথবা রজ্জু ও মন উভয়ে প্রতীত হবে। ভ্রমস্থলে রজ্জুতে সর্পের উৎপত্তি ও বিনাশ যদি হত তাহলে সকলে তা প্রত্যক্ষ করত। কিন্তু ভ্রান্ত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো কাছে ঐ সর্প প্রতীত হয় না। কেবল ভ্রান্ত পুরুষই ঐ সর্প দেখে থাকে। আর যদি ভ্রান্ত পুরুষের মনে ভ্রমীয় সাপটির উৎপত্তি ও বিনাশ হত তাহলে বাইরের জগতে রজ্জু-সর্পের অনুভূতি হত না। কিন্তু বাইরের জগতে রজ্জু-সর্পের ভ্রম হয় ইহা অভিজ্ঞতালব্ধ। রজ্জু ও মন এই উভয়ে ভ্রমীয় সাপের উৎপত্তি ও বিনাশ হয় একথা বলাও যুক্তিসঙ্গত হবে না। কারণ একটি বস্তুর উৎপত্তি ও বিনাশ দুটি আধারে হতে পারে না। সুতরাং রজ্জু-সর্পের স্থলে সর্পের উৎপত্তিও হয় না, বিনাশও হয় না। গৌড়পাদ বলেন, তুল্যযুক্তিতে দৃশ্যজগতের উৎপত্তি ও বিনাশ কোনটিই হতে পারে না। গৌড়পাদ ব্যাবহারিক জগৎ মানেন না। তাঁর মতে, তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে এই জগতের উৎপত্তিও নেই, বিনাশও নেই। যেমন বাধকজ্ঞান হলে ভ্রান্তপুরুষ বুঝতে পারে, রজ্জুতে যে সর্পটি প্রতীত হয়েছিল তা বস্তুতঃ উৎপন্ন হয় নি ও বিনষ্টও হয় নি। তেমনি এই প্রতীয়মান জীবজগতেরও উৎপত্তি ও বিনাশ বলে কিছু নেই। বাধকজ্ঞান হলে যেমন জানা যায় রজ্জুই সেস্থলে থাকে, তেমনি অধিষ্ঠান তুরীয়ব্রহ্মই কেবল থাকে, কল্পিত জগৎ নয়। তাঁর মতে জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় যেমন নেই, তেমনি সংসারী বদ্ধজীবও নেই। তাঁর দৃষ্টিতে সাধক কিংবা মুমুক্ষু কিংবা মুক্তপুরুষ বলে কেউ নেই। সৃষ্টি হল মনের স্পন্দন। ইহাই হল গৌড়পাদের অজাতিবাদ।

২.৫ সারসংক্ষেপ ঃ

ওঁম্ এবং ওম্ এই দুটি অক্ষরের ভেদ আছে। পরেরটি স্বীকৃতি অর্থের বোধক, পূর্বেরটি পরা বাক্ বা তুরীয়ের বোধক। ওঁঙ্কার ও প্রণব সমার্থক শব্দ। দৃশ্য জগৎ ওঁঙ্কারের দ্বারা পরিব্যাপ্ত ও ওঁঙ্কারেই এদের পর্যবসান হয়। ওঁঙ্কার ঈশ্বরের বাচক। ওঁঙ্কারের ধ্যান এক প্রকার প্রতীক উপাসনা। ওঁঙ্কারের মনন ও নিদিধ্যাসনের ফলে ধ্যানস্থ ব্যক্তি শোক ও ভয় থেকে উত্তীর্ণ হয়। এরূপ ব্যক্তির ঈশ্বরজ্ঞান হয় এবং ক্রমে মায়ারূপ উপাধি দূরীভূত হলে তার আত্মবুদ্ধি জন্মায়। গৌড়পাদের দর্শনে ওঁঙ্কারের তিনটি মাত্রার সাথে আত্মার তিনটি পাদের একত্ব প্রদর্শিত হয়েছে। প্রথমত্ব ও ব্যাপকত্ব সাধর্ম্যের জন্য বিশ্বের সাথে অ-কারের, উৎকর্ষ ও মধ্যবর্তিত্ব সাধর্ম্যের জন্য তৈজসের সাথে উ-কারের এবং পরিমাপকত্ব ও লয়স্থানত্ব সাধর্ম্যের জন্য প্রাজ্ঞের সাথে ম-কারের অভেদ বিবেচিত হয়েছে। অ-কার বিশ্বকে, উ-কার তৈজসকে এবং ম-কার প্রাজ্ঞকে প্রাপ্ত করায়। এই পাঠ-উপকরণে নানা সৃষ্টি চিন্তকের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন মত বিবৃত হয়েছে। কারও মতে সৎ হতে জগতের সৃষ্টি, কারও মতে অসৎ হতে জগতের সৃষ্টি। সৃষ্টিকর্তা বলতে কেউ বিরাট্‌পুরুষকে, কেউ হিরণ্যগর্ভকে, কেউ বা প্রজাপতিকে বুঝে থাকেন। শঙ্করপন্থী অদ্বৈতবেদান্তীর মতে মায়ার প্রভাবে চিন্ময় ব্রহ্ম হতেই চেতন ও অচেতন উভয়প্রকার সৃষ্টি।

প্রথম সৃষ্টিতে মায়োপহিত চিন্ময় ব্রহ্ম কর্তা, দ্বিতীয় সৃষ্টিতে মায়ার কার্যভূত প্রাণ কর্তা। সত্ত্বৈকবাদী গৌড়পাদের মতে সৃষ্ট বস্তু মায়াবীর খেলা মাত্র। ইহা মনের স্পন্দন ভিন্ন কিছু নয়। জগতের উৎপত্তি নেই, স্থিতি নেই ও বিনাশ নেই। দৃশ্য বস্তু অলীক হলেও গন্ধর্বনগরের মতো দৃষ্টিগোচর হয়। ইহাই হল গৌড়পাদের অজাতিবাদের সারকথা।

২.৬ প্রধান শব্দগুচ্ছ

ওঁঙ্কার

ওঁঙ্কার একটি একাক্ষর বিশিষ্ট ধ্বনি। এটি অ, উ, এবং ম—এই তিনটি বর্ণের সন্ধ্যক্ষর। অর্ধাকার চিহ্নটি ঈশ্বরের এবং বিন্দুটি তুরীয় ব্রহ্মের দ্যোতক। ওঁঙ্কারের অন্তর্গত অ-কার সাধককে উ-কারে উ-কার, ম-কারকে এবং ম-কার তুরীয়কে প্রাপ্ত করায়।

সৃষ্টিতত্ত্ব

কারও মতে অচেতন থেকে, কারও মতে চেতন থেকে জগতের সৃষ্টি। কোন মতে সৎ থেকে অসতের সৃষ্টি আবার কোন মতে অসৎ থেকে জগতের সৃষ্টি। কেউ আবার বলেন, সৃষ্টি হল অব্যক্তের ব্যক্তাবস্থা। শঙ্কর মতে জগৎ অজ্ঞানের পরিণাম ও ব্রহ্মের বিবর্ত। কেউ বলেন, সৃষ্টি কর্তার ভোগের জন্যই এই সৃষ্টি। কেউ আবার বলেন, চেতনের ভোগের জন্য অচেতন পদার্থের সৃষ্টি। অন্যেরা বলনে, সৃষ্টি হল ঈশ্বরের ঐশ্বর্যের বিস্তার। এটি তার লীলামাত্র।

অজাতিবাদ

গৌড়পাদ অজাতিবাদের সমর্থক। তার মতে জগতের উৎপত্তি বলে কিছু নেই। সুতরাং জগতের বিনাশের প্রসঙ্গও নেই। রজ্জুতে অজ্ঞানের ফলে যেমন সর্প প্রতীয়মান হয়, তেমনি মায়ার প্রভাবে নামরূপাত্মক এই দৃশ্য জগতের প্রতীতি হয়। ভ্রমীয় সাপের যেমন উৎপত্তি হয় না, তেমনি জগতেরও উৎপত্তি হয় না।

২.৭ নমুনা-প্রশ্নাবলী ঃ

Essay Type

1. Do the three *mātrās* of *oṁkāra* correspond to the three *pādas* of *ātman*? Answer after Gauḍapāda.

Short Type

1. Write a note on *praṇava*.
2. What is meant by *ajāti* according to Gauḍapāda.

২.৮ গ্রন্থপঞ্জী ঃ

আচার্য গৌড়পাদ, **মাণ্ডূক্যকারিকা**, দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ সম্পাদিত, দেবসাহিত্য কুটীর, কলিকাতা, ১৩৫৫

Acharya Gaudapāda, *Maṇḍukyakarika*, in *The Mandukya Upanisad and the Agama Sastra*, ed. Thomas E. Wood, Motilal Banarsidass, Delhi, 1992.

Acharya Gaudapada, *Mandukyakarika*, *Mandukya Upanisad* (With the Karika of Gaudapada and the commentary of Sankaracarya) trans. Swami Gambhirananda, Advaita Ashrama, Mayavati 1989.

ইউনিট ৩ ঃ দৃশ্য বস্তুর মিথ্যাত্ব স্থাপন

পাঠপরিকল্পনা

৩.১ ঃ প্রাক্‌কথন

৩.১.১ ঃ 'বৈতথ্য' শব্দের অর্থ

৩.১.২ ঃ গৌড়পাদ ও শংকরের মতে বৈতথ্যের স্বরূপ

৩.১.৩ ঃ শংকরোত্তর অদ্বৈতগ্রন্থে মিথ্যাত্বের লক্ষণ

৩.২ ঃ পাঠের উদ্দেশ্য

৩.৩ ঃ স্বপ্নদৃশ্য বস্তুর মিথ্যাত্ব স্থাপন

৩.৩.১ ঃ স্বপ্নদৃশ্য বস্তুর মিথ্যাত্বে প্রথম যুক্তি

৩.৩.২ ঃ স্বপ্নদৃশ্য বস্তুর মিথ্যাত্বে দ্বিতীয় যুক্তি

৩.৩.৩ ঃ দেশ ও কাল স্বপ্নদৃশ্য বস্তুর মিথ্যাত্বের প্রয়োজক

৩.৩.৪ ঃ স্বপ্নদৃশ্য বস্তুর মিথ্যাত্বে শ্রুতি প্রমাণ

৩.৪ ঃ জাগ্রদ্‌দৃশ্য বস্তুর মিথ্যাত্ব উপপাদন

৩.৪.১ ঃ জাগ্রদ্‌দৃশ্য বস্তুর মিথ্যাত্বে প্রথম যুক্তি

৩.৪.২ ঃ জাগ্রদ্‌দৃশ্য বস্তুর মিথ্যাত্বে দ্বিতীয় যুক্তি

৩.৪.৩ ঃ জাগ্রদ্‌দৃশ্য বস্তুর মিথ্যাত্বে তৃতীয় যুক্তি

৩.৪.৪ ঃ স্বপ্নদৃষ্টান্তের যাথার্থ্য বিচার

৩.৪.৫ ঃ শূন্যবাদ হতে মায়াবাদের স্বাতন্ত্র্য

৩.৫ ঃ সারসংক্ষেপ

৩.৬ ঃ প্রধান শব্দগুচ্ছ

৩.৭ ঃ নমুনা-প্রশ্নাবলী

৩.৮ ঃ গ্রন্থপঞ্জী

৩.১ ঃ প্রাক্‌কথন

৩.১.১ ঃ 'বৈতথ্য' শব্দের অর্থ

'বৈতথ্য' শব্দের অর্থ মিথ্যাত্ব। 'তথা' শব্দের অর্থ সত্য, 'বিতথ' মানে বিগত হয়েছে তথা যার অর্থাৎ যার সত্যতা চলে গেছে। যেটি যেমন তাকে সেভাবে যদি জানা যায় তবে তা সত্য। দড়িকে দড়ি বলে জানা সত্য, এখানে দড়িটি সত্য। আর দড়িকে সাপ বলে জানা হয় তবে সে সাপটি হবে মিথ্যা। বিতথের ভাব বৈতথ্য, আর বৈতথ্যই মিথ্যাত্ব।

৩.১.২ ঃ গৌড়পাদ ও শংকর মতে বৈতথ্যের স্বরূপ

আচার্য গৌড়পাদ বিতথ বা মিথ্যা বলতে অসৎ বস্তুকে বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে অসৎ অর্থাৎ অলীক বা তুচ্ছ মিথ্যা শব্দের অর্থ। আর আচার্য শংকরের মতে যা সৎ নয়, অসৎ নয়, সদসৎ নয় তা মিথ্যা। **বিবেকচূড়ামণি** গ্রন্থে তিনি বলেছেন, যা ভাব নয়, অভাব নয়, ভাবাভাবও নয় তা মিথ্যা। অথবা যেটি ভিন্ন নয়, অভিন্ন নয়, ভিন্নাভিন্নও নয় তা মিথ্যা। এর থেকে মনে হতে পারে যে, মিথ্যাত্ব সম্পর্কে গৌড়পাদাচার্যের মত থেকে শংকরাচার্যের মত সম্পূর্ণ পৃথক্ই শুধু নয়, সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। কারণ গৌড়পাদ অসৎকে মিথ্যা বলেছেন, আর শংকরাচার্য মিথ্যা বলতে বুঝিয়েছেন যা সৎ নয়, অসৎও নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, 'সৎ' সম্পর্কে গৌড়পাদ ও শংকরের মত ভিন্ন। গৌড়পাদ 'সৎ' বলতে একমাত্র পারমার্থিক সৎকেই বুঝিয়েছেন। কিন্তু শংকরের মতে সৎবস্তু তিন রকম—যেমন পারমার্থিক সৎ, ব্যাবহারিক সৎ ও প্রাতিভাসিক সৎ। শংকর যখন মিথ্যা বস্তুকে সৎ নয় বলেছেন তখন তিনি 'সৎ' বলতে পারমার্থিক সৎ বস্তুকে বুঝিয়েছেন, আবার যখন অসৎ নয় বলেছেন তখন শশকশৃঙ্গ, আকাশকুসুম প্রভৃতি বস্তু যে মিথ্যা নয় তা বলাই তাঁর অভিপ্রায়। শংকরাচার্য যে ব্যাবহারিক ও প্রতিভাসিক সৎবস্তুকে মিথ্যা বলেছেন, গৌড়পাদাচার্য সেই ব্যাবহারিক, প্রাতিভাসিক সৎ বস্তুকে অসৎ বলেছেন এবং তাঁর মতে এগুলি শশকশৃঙ্গ, আকাশকুসুম প্রভৃতির মতই অসৎ। পূর্বেই বলা হয়েছে, গৌড়পাদদর্শন ও শংকরদর্শনের মূল পার্থক্য হল— গৌড়পাদ তাঁর অদ্বৈতদর্শন রচনার সময় পারমার্থিক অবস্থা থেকে জগৎকে বিবেচনা করেছেন; আর শংকর দর্শন রচনার সময় ব্যাবহারিক অবস্থা থেকে জগৎকে নিরীক্ষণ করেছেন। প্রকৃত পক্ষে গৌড়পাদের মতের সঙ্গে শংকরের মতের কোন বিরোধ নেই।

৩.১.৩ ঃ শংকরোত্তর অদ্বৈতগ্রন্থে মিথ্যাত্বের লক্ষণ

আচার্য শংকরের শিষ্য পদ্মপাদাচার্য **পঞ্চপাদিকা** টীকায় 'মিথ্যা' শব্দের অর্থ করেছেন 'অনির্বাচ্য'। কিন্তু তিনি অনির্বাচ্য শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করেননি। শঙ্করভাষ্যের **ভামতী** টীকায় বাচস্পতি বলেছেন, যা সৎ নয়, অসৎ নয় এবং সদসৎ নয় তাকে অনির্বাচ্য বলে। অদ্বৈতবেদান্ত মতে যা তিনকাল ধরে অবাধিত থাকে তা সৎ। দড়িতে সাপের ভ্রমের ক্ষেত্রে দড়ির যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা সাপ বাধিত হয়। সুতরাং ভ্রমীয় বস্তু বাধিত হওয়ার যোগ্য, তাই তাকে সৎ বলা যাবে না। আবার ইহা আকাশকুসুম প্রভৃতির মত অলীকও নয়। অলীক বস্তু সম্পর্কে শাব্দিক বা বাচনিক জ্ঞান হলেও ঐ জ্ঞান প্রবৃত্তি উৎপাদন করতে পারে না। কেউ আকাশকুসুমের মালা পরিধান করেছে বললে আমরা না হেসে পারিনা, কিন্তু সুগন্ধি আকাশকুসুম গ্রহণে প্রবৃত্তি কারও হয় না। কিন্তু ভ্রমীয় বস্তুতে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়ই হয়। শুক্তিকাকে রজত বলে তা গ্রহণে রজতার্থী ব্যক্তির প্রবৃত্তি হয়। দড়িকে সাপ বলে জানলে তা থেকে ভীত ব্যক্তির নিবৃত্তি হয়। ভ্রমীয় বস্তুকে সদসৎও বলা যায় না। সৎ বস্তুতে সত্ত্ব ও অসৎ বস্তুতে অসত্ত্ব নামক ধর্ম থাকে। সত্ত্ব ও অসত্ত্ব এই দুটি বিরুদ্ধ ধর্ম একই অধিকরণে যুগপৎ থাকতে পারে না। কাজেই সদসৎ বস্তু অনুভববিরুদ্ধ ও যুক্তিবিরুদ্ধ। এজন্য ভামতীকার বলেছেন, ভ্রমের বিষয়টি সৎ, অসৎ ও সদসৎ হতে বিলক্ষণ হওয়ায় অনির্বচনীয়। কাজেই যা সৎরূপে বা অসৎরূপে বা সদসৎরূপে নির্বচনযোগ্য নয় তা—অনির্বাচ্য। অদ্বৈত অধিবিদ্যায় মিথ্যা বলতে এরূপ অনির্বাচ্য বস্তুকে বোঝানো হয়েছে। প্রসঙ্গত বলা চলে যে, যা ত্রিকোটিবিনির্মুক্ত তাকে মিথ্যা বললে অজ্ঞাননিবৃত্তিও মিথ্যা হয়ে পড়বে। অদ্বৈতবেদান্ত মতে অজ্ঞান নিবৃত্তি হল মোক্ষের স্বরূপ। উহা সৎ নয়, অসৎ নয় এবং সদসৎও নয়। এজন্য **ইষ্টসিদ্ধি** গ্রন্থে বিমুক্তাত্মন্ বলেছেন, যা সৎ নয়, অসৎ নয়, সদসৎ নয় ও অজ্ঞান নিবৃত্তিও নয় তাকে অনির্বাচ্য বলে। তাঁর মতে মিথ্যা বা অনির্বাচ্য হল চতুষ্কোটিবিনির্মুক্ত।

পঞ্চপাদিকা গ্রন্থের ওপর প্রকাশাত্মন্ যে **পঞ্চপাদিকাবিবরণ** টীকা লিখেছেন সেখানে তিনি মিথ্যাত্বের দুটি লক্ষণ দিয়েছেন। মিথ্যাত্বের প্রথম লক্ষণটিকে মধুসূদন সরস্বতী তাঁর **অদ্বৈতসিদ্ধি** গ্রন্থে এভাবে বিবৃত করেছেন— 'প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বম্' অর্থাৎ যে অধিকরণে যে বস্তুর তিনকালে অভাব থাকে সেখানে সেই বস্তুটি প্রতীয়মান হলে তাকে মিথ্যা বলে। দড়িতে সাপের ভ্রমের স্থলে সত্য দড়িতে যে সাপের ভ্রান্তি ঘটে, ঐ সাপ দড়িতে কোনকালেই থাকে না। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ এই তিনকালেই দড়িতে সাপের অভাব থাকে। তাই সাপটি ত্রিকালে নিষেধের প্রতিযোগী, অথচ দড়িতে সাপের প্রতীতি হয়। ব্রহ্মে জগতের পারমার্থিক ভ্রমে নামরূপাত্মক দৃশ্য জগৎ কোনকালেই শুদ্ধ নিত্য ব্রহ্মে থাকে না। উৎপত্তির পূর্বে জগৎ ব্রহ্মে কারণাত্মক রূপে থাকলেও জগদ্রূপে থাকে না। সুতরাং ব্রহ্মে জগতের তিনকালেই অভাব থাকে। অথচ অজ্ঞানের ফলে নামরূপাত্মক জগৎ আছে বলে ভ্রম হয়। সুতরাং উক্ত লক্ষণটির সকল ভ্রমে সমন্বয় হয়। এখানে প্রশ্ন হতে পারে, সত্য অধিকরণে মিথ্যা বস্তুর তিনকালে যদি নিষেধ থাকে তাহলে ঐ নিষেধটি নিত্য হওয়ায় অদ্বৈতবাদ ব্যাহত হবে। এর উত্তরে অদ্বৈতবাদীরা বলেন, ব্রহ্মে জগতের নিত্য নিষেধ বলতে ব্রহ্মই বোঝানো হয়েছে। সুতরাং অদ্বৈত তত্ত্বের হানি হয় না।

মিথ্যাত্বের আর একটি লক্ষণ হল 'জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ব'। ভ্রমকালে ভ্রান্ত পুরুষ ভ্রমীয় বিষয়কে সত্য বলেই বোঝে। কিন্তু পরবর্তীকালে বাধকজ্ঞান জন্মালে তা বাধিত হয়। যেমন রজ্জু-সর্প প্রভৃতি ভ্রমে 'এটি সর্প নয়', রজ্জু এরূপ বাধকজ্ঞান হলে সর্পটি বাধিত হয়। কাজেই পরবর্তী রজ্জুর জ্ঞানের দ্বারা সর্পটি বাধিত হয় বলে মিথ্যা। লক্ষণে জ্ঞাননিবৃত্ত না বলে জ্ঞাননিবর্ত্ত্য বলা হয়েছে। তার কারণ হল - প্রবলতর ভ্রান্তিস্থলে যথার্থজ্ঞানের দ্বারা ভ্রমীয় বিষয় নিবৃত্ত হয় না, তবে তা জ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্ত হওয়ার যোগ্য। তুল্যভাবে ব্রহ্মে জগতের ভ্রমের স্থলেও সংসার দশায় জগৎ বাধিত না হওয়ায় তাকে জ্ঞাননিবৃত্ত বা জ্ঞানবাধিত বলা যাবে না। কিন্তু উহা ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্ত হওয়ার যোগ্য। এখানে উল্লেখ্য যে, জ্ঞান বলতে অন্তঃ করণবৃত্তি বোঝানো হয়েছে, শুদ্ধ চৈতন্য বা প্রমিতিচৈতন্য নয়। শুদ্ধ চৈতন্যের সাথে ভ্রমীয় বিষয়ের কোন বিরোধ নেই। বরং উহা ভ্রমীয় বিষয়ের আশ্রয়, উহা না থাকলে ভ্রমই হবে না। বস্তুতঃ অন্তঃকরণবৃত্তিই অজ্ঞানের বিরোধী। অন্তঃকরণবৃত্তি উৎপন্ন হলে অজ্ঞান ও অজ্ঞানজন্য ভ্রমীয় বিষয় নিবৃত্ত হয়। কিংবা অন্তঃকরণবৃত্তির দ্বারা ভ্রমীয় বিষয় নিবৃত্ত হওয়ার যোগ্য। ব্রহ্মে জগতের পারমার্থিক ভ্রমে এই লক্ষণটির সমন্বয় আছে, যেহেতু ব্রহ্মাকার অন্তঃকরণবৃত্তির দ্বারা ব্রহ্মবিষয়ে অজ্ঞান ও অজ্ঞানজন্য নামরূপাত্মক জগৎ নিবৃত্ত হওয়ার যোগ্য। সুতরাং জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বকে মিথ্যাত্বের নির্দুষ্ট লক্ষণ বলা চলে।

৩.২ ঃ পাঠের উদ্দেশ্য

গৌড়পাদাচার্য স্বপ্নদৃশ্য বস্তুর মতো জাগ্রদ্‌দৃশ্য বস্তুকে মিথ্যা বলেছেন। এই পাঠে দেখানো হবে, বৈতথ্য ও মিথ্যাত্ব সমার্থক শব্দ, মিথ্যাত্বের নানাপ্রকার লক্ষণ সম্ভব এবং মিথ্যাত্ব বিষয়ে গৌড়পাদাচার্য ও শংকরাচার্যের মতের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। গৌড়পাদ কি যুক্তিতে স্বপ্নদৃশ্য বস্তুকে মিথ্যা বলেছেন, জাগ্রদদৃশ্য বস্তুকেই বা কোন্ কোন্ যুক্তিতে মিথ্যা বলছেন, স্বপ্ন ও জাগরণ উভয় দশায় যাবতীয় দৃশ্য বস্তুকে মিথ্যা বলার কি অভিপ্রায় এবং বিবর্তবাদ হতে মায়াবাদের ভেদ— এই সব দিক্ উদঘাটিত করাই এই পাঠের উদ্দেশ্য।

৩.৩ ঃ স্বপ্নদৃশ্য বস্তুর মিথ্যাত্ব স্থাপন ঃ

৩.৩.১ ঃ স্বপ্নদৃশ্য বস্তুর মিথ্যাত্বে প্রথম যুক্তি

অদ্বৈতবেদান্তী গৌড়পাদাচার্যের মতে তুরীয় ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু। ব্রহ্ম ভিন্ন সকল বস্তুই মিথ্যা। তুল্যভাবে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি জীবের এই তিনটি অবস্থাও মিথ্যা। গৌড়পাদ তাঁর **মাণ্ডুক্যকারিকা** গ্রন্থের বৈতথ্য প্রকরণে প্রথমে স্বপ্ন দৃশ্যবস্তুর মিথ্যাত্ব উপপাদন করেছেন। স্বপ্নদৃশ্যবস্তুর মিথ্যাত্ব সম্পর্কে প্রথম হেতুটি হল অন্তঃস্থান অর্থাৎ অভ্যন্তরে অবস্থিতি। এই অনুমানের আকারটি হল—'স্বপ্নদৃশ্যবস্তু মিথ্যা, যেহেতু উহা শরীরের অভ্যন্তরে অবস্থান করে'। আমরা স্বপ্নে পর্বত, হস্তী, প্রভৃতি স্বাপ্নিক বস্তু দেখে থাকি। এগুলি বিপুলাকার বস্তু হলেও স্বপ্নকালে এরা শরীরের অভ্যন্তরেই অবস্থান করে, শরীরের বাইরে নয়। এজন্য স্বপ্নদৃশ্য বস্তুকে মিথ্যা বলতে হয়।

এখানে আশঙ্কা হতে পারে যে, উক্ত অনুমানের হেতু 'অন্তঃস্থানত্ব' ব্যভিচারী। 'শরীরের অভ্যন্তরে অবস্থান' এই হেতুটি মিথ্যাত্বের সাধক হতে পারে না। যেখানে যেখানে অভ্যন্তরে অবস্থিতি আছে সেখানে সেখানে মিথ্যাত্ব আছে এরূপ ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। কারণ এর ব্যভিচারস্থল আছে। সেই স্থলটি হল বস্ত্র প্রভৃতি দ্বারা আবৃত ঘটাদি বস্তু। অভ্যন্তরস্থত্ব বা আবৃতত্বকে মিথ্যাত্বের ব্যাপ্য বললে যে স্থলে একটি পদার্থের মধ্যে অন্য পদার্থ থাকে কিংবা একটি পদার্থের দ্বারা অন্য পদার্থ আবৃত হয় ঐ সব স্থলে বস্ত্র প্রভৃতির দ্বারা আবৃত ঘটাদি বস্তুকেও মিথ্যা বলতে হয়। কিন্তু ঐ সকল স্থলে আবৃত বস্তুকে কেউ মিথ্যা বলে না। কাজেই অন্তঃস্থানত্ব মিথ্যাত্বের হেতু নয়। ইহা মিথ্যাত্বরূপ সাধ্যের ব্যভিচারী হেতু। সুতরাং 'অন্তঃস্থানত্ব' হেতুদ্বারা মিথ্যাত্বের অনুমানটি সব্যভিচার হেত্বাভাসে দুষ্ট।

৩.৩.২ ঃ স্বপ্নদৃশ্য বস্তুর মিথ্যাত্বে দ্বিতীয় যুক্তি ঃ

অন্তঃস্থত্ব বা আবৃতত্ব মিথ্যাত্বের ব্যভিচারী এরূপ আপত্তি হৃদয়ঙ্গম করেই গৌড়পাদ স্বপ্নদৃশ্য বস্তুর মিথ্যাত্বের সাধক দ্বিতীয় যুক্তিটি দিয়েছেন। এই দ্বিতীয় যুক্তিটি হল সংবৃতত্ব। 'সংবৃতত্ব' শব্দের অর্থ সংকুচিতত্ব। স্বপ্নদর্শী ব্যক্তি স্বপ্নদশায় যে বিরাট পর্বত, বিশাল সমুদ্র প্রভৃতি দেখে, সেগুলি শরীরের অভ্যন্তরে যথাযথভাবে অবস্থান করতে পারে না। শরীরের অভ্যন্তরে অতি সূক্ষ্ম নাড়ীসমূহে ঐ স্বপ্নদৃশ্য বস্তু অতি সংকুচিত অবস্থায় থাকে। স্থূলদেহে ঐ সকল পদার্থ অবস্থান করতে পারে না। আর শরীরের অভ্যন্তরস্থ নাড়ীসমূহ তো অতি সূক্ষ্ম। সুতরাং স্বীকার করতে হবে, ঐসব স্বপ্নদৃশ্য বস্তু শরীরের অভ্যন্তরে সংকুচিত অবস্থায় থাকে। সংকুচিত অবস্থায় শরীরের অভ্যন্তরে অবস্থিতি হল স্বপ্নদৃশ্য বস্তুর মিথ্যাত্বের কারণ। আচার্য গৌড়পাদের অভিপ্রেত অনুমানের আকারটি হল- স্বপ্নদৃশ্য পদার্থ সমূহ মিথ্যা, যেহেতু সেগুলি শরীরের অভ্যন্তরে সংকুচিত অবস্থায় থাকে। স্বপ্নকালে বাহ্যবস্তু শরীরের অভ্যন্তরে নিজ স্বরূপে থাকে না, সংকুচিত অবস্থায় থাকে একথা বললে অনুমানটিতে আর সব্যভিচার হেত্বাভাসের কোন অবকাশ থাকে না। সুতরাং স্বপ্নদৃশ্য বস্তু মিথ্যা এটি যুক্তি পূর্বক প্রতিষ্ঠিত হল।

৩.৩.৩ ঃ দেশ ও কাল স্বপ্নদৃশ্য বস্তুর মিথ্যাত্বের প্রযোজক ঃ

কেউ আশঙ্কা করেন যে, স্বপ্নকালে স্বপ্নদর্শী ব্যক্তি শরীর থেকে বাইরে গিয়ে স্বাপ্নিক বস্তু প্রত্যক্ষ করে। যেমন কোন স্বপ্নদর্শী ব্যক্তি রাত্রে বিছানায় উত্তরদিকে নিদ্রিত হয়ে স্বপ্নদেখে যে সে পশ্চিমদিকে মাথা করে শয়ন করে

আছে। এক্ষেত্রে স্বপ্নদর্শী শরীরের বাইরে বের হয়ে পশ্চিমদিকে গমন করে স্বপ্নদর্শন করে, দেহের মধ্যে স্বপ্নদর্শন থাকে না।

এরূপ আশঙ্কা নিরসনে গৌড়পাদাচার্য বৈতথ্যপ্রকরণে স্বপ্নদৃশ্যবস্তুর মিথ্যাত্বে স্বপ্নকাল ও স্বপ্নদেশের অবতারণা করেছেন। কালের অদীর্ঘত্ব স্বপ্নদৃশ্য বস্তুর মিথ্যাত্ব উপপাদন করে। কালের অদীর্ঘত্ব বলতে বোঝানো হয়েছে সময়ের স্বল্পত্ব। সময়ের স্বল্পত্ব হেতু স্বপ্নদর্শীব্যক্তির দেশের বাইরে গমন সম্ভব নয়। দেহের অভ্যন্তরে সে স্বাপ্নিকবস্তু নিরীক্ষণ করে। কারণ সে নিদ্রিত হওয়া মাত্রই অনেক সময় এরূপ স্বপ্ন দেখে যে, বহু দূরবর্তী কাশীধামে গমন করে সে বিশ্বনাথ দর্শন করছে। কিন্তু ঐ দূরবর্তী দেশে গমন ও আগমনের জন্য যে দীর্ঘ সময়ের আবশ্যক ঐ দীর্ঘকাল স্বপ্নে থাকে না। গৌড়পাদ আরও বলেন যে, স্বপ্নদ্রষ্টা স্বপ্নদেশে গমন করে স্বপ্ন দর্শন করে না। যদি স্বপ্নদর্শন করত তাহলে যে স্থানে সে স্বপ্নদৃশ্য বস্তুকে দেখত জাগ্রত হয়ে সে সেস্থানে অবস্থান করত। কিন্তু নিদ্রিত ব্যক্তি জাগরিত হয়ে যে স্থানে স্বপ্ন দেখেছিল সে স্থানে থাকে না। সুতরাং নিদ্রিত ব্যক্তি শরীরের বাইরে গিয়ে স্বপ্ন দর্শন করে না একথা স্বীকার করতে হবে। তাছাড়া, এরূপ প্রায়ই দেখা যায় যে, কোন ব্যক্তি রাতে নিদ্রিত হয়ে স্বপ্ন দেখে যে, সে দিনের বেলায় স্বাপ্নিক বস্তুকে দর্শন করছে। কখনও বা স্বপ্নদর্শী ব্যক্তি দেখে সে অনেকের মধ্যে আছে। যদি স্বপ্নকালে স্বপ্নদর্শী ব্যক্তি দেহ হতে নির্গত হয়ে বাইরে অন্য লোকেদের মধ্যে উপস্থিত হত তাহলে যাদের সাথে স্বপ্নদ্রষ্টা মিলিত হয়েছিল তাদেরও অনুরূপ জ্ঞান হত। কিন্তু স্বপ্নে দৃশ্য ঐ সকল ব্যক্তিরা কখনও বলে না যে, তারা ঐ সময় স্বপ্নদর্শী ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়েছিল। এভাবে গৌড়পাদ দেখিয়েছেন যে, স্বপ্নদ্রষ্টা দেহ মধ্যে স্বপ্নদর্শন করে, দেহের বাইরে নয়। অথচ স্বপ্নে দৃশ্য বৃহদাকার পদার্থ স্বরূপত দেহ মধ্যে থাকতে পারে না। এজন্য স্বীকার করতে হয় যে, স্বপ্নে দৃশ্য বস্তুগুলি শরীরের অভ্যন্তরে সংকুচিত অবস্থায় থাকে। এভাবে গৌড়পাদ দেশ ও কালের প্রেক্ষাপটে স্বাপ্নিক বস্তুর মিথ্যাত্ব প্রমাণ করেন। যাঁরা দেশ ও কালের সত্যতা স্বীকার করেন তাঁরাও স্বপ্নের মিথ্যাত্ব অবশ্যই স্বীকার করবেন— ইহা গৌড়পাদের বক্তব্য।

৩.৩.৪ ঃ স্বপ্নদৃশ্য বস্তুর মিথ্যাত্বে শ্রুতিপ্রমাণ ঃ

(মূল) অভাবশ্চ রথাদীনাং শ্রূয়তে ন্যায়পূর্বকম্।
বৈতথ্যং তেন বৈ প্রাপ্তং স্বপ্ন আহুঃ প্রকাশিতম্।।
—মাণ্ডুক্যকারিকা ২/৩

(অনু) (স্বপ্নদৃশ্য) রথাদির যৌক্তিক মিথ্যাত্ব শ্রুতিতে শোনা যায়। স্বপ্নকালে (দৃশ্য বস্তু-সমূহের) মিথ্যাত্ব পূর্বোক্ত (স্থানসংবৃতত্ব প্রভৃতি) হেতুর দ্বারা প্রতিপাদিত ইহা (জ্ঞানীরা) বলে থাকেন।

গৌড়পাদ স্বাপ্নিকবস্তুর মিথ্যাত্ব যুক্তির মাধ্যমে উপপাদন করার পর এ বিষয়ে শ্রুতিবাক্য প্রমাণরূপে উল্লেখ করেছেন। ইনি আগমপ্রমাণের ভিত্তিতেই তার অদ্বৈততত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। কাজেই যে সব স্থলে তিনি যুক্তি উপন্যাস করেছেন, ঐ সব যুক্তি যে শ্রুতিনির্ভর তা তিনি দেখিয়ে থাকেন। তাঁর মতে শ্রুতি নিরপেক্ষ স্বাধীন কোন যুক্তিতর্ক গ্রহণযোগ্য নয়। শ্রুতিনির্ভর যুক্তি তাঁর দর্শনে বিবেচিত হয়ে থাকে। এই অভিপ্রায়ে তিনি স্বাপ্নিক বস্তুর মিথ্যাত্ব প্রতিপাদনে যুক্তি প্রদর্শনের পর ঐ বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ বিধৃত করেছেন।

গৌড়পাদ প্রধানত মাণ্ডুক্যোপনিষদের ওপর মাণ্ডুক্যকারিকা গ্রন্থটি রচনা করলেও বৃহদারণ্যকোপনিষদ, কঠোপনিষদ্ প্রভৃতি আগমবাক্যও তার দর্শনে প্রমাণরূপে গৃহীত হয়েছে। 'ন তত্র রথা রথযোগা' ইত্যাদি বৃহদারণ্যক শ্রুতিবাক্যে স্বপ্নদৃশ্য বস্তুর মিথ্যাত্ব আম্নাত হয়েছে। এই শ্রুতি বাক্যটি বৃহারণ্যক উপনিষদের চতুর্থ

অধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণে আম্নাত হয়েছে। উক্ত শ্রুতিবাক্যে দেখানো হয়েছে, স্বপ্নদ্রষ্টা স্বপ্নে যে রথ, রথে যোজিত অশ্বাদি এবং গমনের উপযোগী পথ নিরীক্ষণ করে তা বাস্তবে নেই। রথ নির্মাণের উপকরণ কাষ্ঠ প্রভৃতির অভাবে স্বপ্নে রথের কোন উৎপত্তি সম্ভব নয়। সেরূপ বাহক অশ্বাদিও বস্তুত থাকে না। উপনিষদ্‌বাক্যের অভিপ্রায় হল, জাগ্রৎকালে অভিজ্ঞতা থেকে যে সব বাসনা সঞ্চিত হয়, ঐ বাসনাময়ী মনোবৃত্তি নিজেই প্রাক্তন কর্মরাশির দ্বারা পরিচালিত হয়ে স্বপ্নকালে রথাদি বস্তুরূপে প্রকাশ পেয়ে থাকে। স্বপ্নে চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় কিংবা আলোক কিংবা আলোক প্রকাশ্য রথাদি বিষয় কিছুই থাকে না। স্বপ্নে নিত্য প্রকাশশীল আত্মা স্বয়ং জ্যোতিরূপে প্রকাশ পেয়ে থাকে। স্বপ্নে যেমন রথাদি বিষয় থাকে না, তেমনি আনন্দ ও সুখ কিছুই থাকে না। বাসনাময়ী মনোবৃত্তি সব কিছুই সৃষ্টি করে। উপনিষদের ঋষি বলেছেন, স্বপ্নকালে আত্মা ঐ সব বস্তু সৃষ্টি করে। জীবের প্রাক্তন কর্মই নানা স্বাপ্নিক মনোবৃত্তি সৃষ্টির কারণ। তাই আত্মাতে সাক্ষাৎ কোন কর্তৃত্ব না থাকলেও তাতে কর্তৃত্ব আরোপিত হয়ে থাকে। একথা ঠিক যে, স্বপ্ন কালে জীবের পক্ষে সাক্ষাদ্‌ভাবে ক্রিয়াসম্পাদন করা কোন মতেই সম্ভব নয়, যেহেতু ক্রিয়ার নিষ্পাদক কোন সাধনসামগ্রী তখন থাকে না। সাধনের অভাবে ঐ সময়ে কোন ক্রিয়াও হতে পারে না। তবে জাগরণকালে যে সব কর্ম জীব করে থাকে, ঐ সব কর্মজ সংস্কারই মনে সন্নিবিষ্ট থেকে স্বপ্নকালে তদনুরূপ বৃত্তি উৎপাদন করে। আত্মাতে স্বপ্নকালে কোন স্বতঃসিদ্ধ কর্তৃত্ব থাকে না। আত্মারূপ জ্যোতি অন্তঃকরণের দ্বারা দেহ প্রভৃতিকে উদ্ভাসিত করে ও দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি উদ্ভাসিত হয়ে নানাবিধ কর্মে ব্যাপৃত হয়ে থাকে। এজন্যই শ্রুতিতে স্বপ্নকালে আত্মার কৃর্তত্ব ব্যবহার আম্নাত হয়েছে। এভাবে উপনিষদের ঋষি স্বপ্নে আত্মার গৌণ কর্তৃত্ব মেনেছেন। গৌড়পাদ এই শ্রৌত সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে উহার অবিরোধী যুক্তির দ্বারা স্বপ্নদৃশ্য বস্তুর মিথ্যাত্ব প্রতিপাদনে প্রয়াসী হয়েছেন।

৩.৪ ঃ জাগ্রদ্‌দৃশ্য বস্তুর মিথ্যাত্ব উপপাদন ঃ

৩.৪.১ ঃ জাগ্রদ্‌দৃশ্য বস্তুর মিথ্যাত্বে প্রথম যুক্তি

(মূল) অন্তঃস্থানাত্তু ভেদানাং তস্মাজ্জাগরিততে স্মৃতম্।
যথা তত্র, তথা স্বপ্নে সংবৃতত্বেন ভিদ্যতে।।

- মাণ্ডুক্যকারিকা ২/৪

(অনু) দেহ মধ্যে থাকার জন্য স্বপ্নদৃশ্য বস্তু যেমন মিথ্যা সেরূপ জাগ্রদ্‌দৃশ্য বস্তুও (দৃশ্যবলে) মিথ্যা। স্বপ্নদৃশ্য বস্তুগুলি শরীরের অভ্যন্তরে সংকীর্ণস্থানে অবস্থান করে (জাগ্রদ্দৃশ্য ও স্বপ্নদৃশ্যের মধ্যে) এই প্রভেদ।

প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা হতে বোঝা যায় যে, স্বপ্নদৃশ্যবস্তু ও জাগ্রদ্‌দৃশ্যবস্তুর মধ্যে ভেদ আছে। স্বপ্নদৃশ্য বস্তু দেহমধ্যে সংকীর্ণস্থানে থাকে, কিন্তু জাগ্রদ্‌দৃশ্য বস্তু কোন দেশে সংকুচিত অবস্থায় থাকে না। কাজেই মনে হতে পারে, উভয়দৃশ্যবস্তুকে মিথ্যা বলা যুক্তিসঙ্গত হবে না।

এর উত্তরে গৌড়পাদ বলেন, স্বপ্নদৃশ্যবস্তুর মতো জাগ্রৎকালীন দৃশ্যবস্তুও মিথ্যা, যেহেতু উভয় অবস্থায় সকল বস্তুই দৃশ্য। গৌড়পাদের এই বক্তব্যকে শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে পঞ্চাবয়বী ন্যায়ের আকারে উপস্থাপন করেছেন। অনুমানটির আকার হল "জাগ্রদ্‌দৃশ্যা ভাবাঃ মিথ্যা, দৃশ্যত্বাৎ, স্বপ্নদৃশ্যভাববৎ" অর্থাৎ জাগ্রদবস্থায় সকল দৃশ্য বস্তু মিথ্যা, যেহেতু উহারা দৃশ্য। এই অনুমানটির পঞ্চাবয়ব বাক্য হল ১. প্রতিজ্ঞাবাক্য- জাগ্রদ্‌দৃশ্য বস্তু মিথ্যা ২. হেতুবাক্য-যেহেতু সেগুলি দৃশ্যপদার্থ ৩. উদাহরণবাক্য- যারা দৃশ্য তারা মিথ্যা হয়, যেমন স্বপ্নে দৃশ্য বস্তু; ৪.

উপনয়বাক্য - মিথ্যাত্বের ব্যাপ্য দৃশ্যত্ব জাগ্রৎকালীন দৃশ্য বস্তুতে আছে। ৫. নিগমনবাক্য- সুতরাং জাগ্রদ্দৃশ্য বস্তু মিথ্যা। যে ব্যক্তি স্বপ্নের পর জাগ্রদবস্থায় আসে ঐ ব্যক্তির কাছে স্বপ্নে উপলব্ধ সমস্ত বস্তু মিথ্যা বলে প্রতিভাত হয়। সকল স্বপ্নদৃশ্যবস্তুই ব্যাবহারিক অভিজ্ঞতার দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং স্বপ্নে দৃষ্টবস্তু জাগরণে বাধিত হওয়ায় উহা মিথ্যা বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু জাগ্রৎকালে দৃশ্য পদার্থ ব্যবহারদশায় বাধিত হয় না। তবুও সকল জাগ্রদ্‌বস্তুই মিথ্যা, যেহেতু সেগুলি স্বপ্নকালীন বস্তুর মতই দৃশ্য। স্বপ্নকালীন বস্তু জ্ঞানবাধিত হওয়ায় মিথ্যা। আর জাগ্রৎকালীন বস্তু যৌক্তিকবিচারে মিথ্যা। তাই গৌড়পাদের বক্তব্য পরিস্ফুট করতে গিয়ে শংকর দৃশ্যত্ব হেতুর দ্বারা জগতের মিথ্যাত্ব উপপাদন করেছেন। গৌড়পাদাচার্যের বক্তব্য হল, জাগ্রৎকালীন ও স্বপ্নকালীন দৃশ্যবস্তুর মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। যেমন স্বপ্নকালীন বস্তু দেহমধ্যে সংকীর্ণস্থানে থাকে, আর জাগ্রৎকালীন বস্তু এরূপ অল্পস্থানে সংকুচিত অবস্থায় থাকে না। দৃশ্যত্ব উভয়স্থলে থাকায় অসত্যত্বও উভয়স্থলেই থাকে।

৩.৪.২ ঃ জাগ্রদ্দৃশ্য বস্তুর মিথ্যাত্বে দ্বিতীয় যুক্তি

(মূল) অন্তঃস্থানাত্তু ভেদানাং হি সমত্বেন প্রসিদ্ধেনৈব হেতুনা।

স্বপ্ন-জাগরিতে স্থানে হ্যেকমাহুর্মনীষিণঃ।।

—মাণ্ড্ক্যকারিকা ৩/৫

(অনু) মনীষিগণ লোকপ্রসিদ্ধ (গ্রাহ্যগ্রাহকভাবরূপ) হেতুবলেই স্বপ্ন ও জাগরিত উভয় অবস্থায় পদার্থসকলকে সমান অর্থাৎ অসৎ বলে থাকেন।

গৌড়পাদাচার্য স্বপ্নদৃশ্য ও জাগ্রদ্দৃশ্য উভয় পদার্থের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করার জন্য আর একটি প্রসিদ্ধ হেতু দিয়েছেন। শংকরাচার্য্য এই কারিকার ভাষ্যে বলেছেন যে, জ্ঞানীব্যক্তিগণ স্বপ্নদৃশ্য বস্তুর মতই জাগ্রদ্দৃশ্য বস্তুকে মিথ্যা বলে থাকেন, কারণ উভয়ের তুল্য হেতু হল গ্রাহ্যগ্রাহকভাবত্ব। ইহা পূর্বপ্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হেতুরই ফলস্বরূপ। 'গ্রাহ্যগ্রাহকভাব' কথার অর্থ বিষয়বিষয়িভাব বা জ্ঞানজ্ঞেয় সম্বন্ধ। জ্ঞান হল গ্রাহক আর জ্ঞেয় হল গ্রাহ্য। জাগ্রৎকালে জ্ঞান ও দৃশ্য বস্তুর মধ্যে যেমন গ্রাহ্যগ্রাহকভাব থাকে, তেমনি স্বপ্নেও দৃশ্যবস্তু ও তার প্রতীতির মধ্যে গ্রাহ্যগ্রাহকভাব থাকে। দৃশ্যবস্তুমাত্রই গ্রাহ্য, আর যা গ্রাহ্য তার অবশ্যই গ্রাহক থাকবে। কাজেই স্বপ্নের বস্তু দৃশ্য হওয়ায় সেখানেও গ্রাহ্যগ্রাহকভাব থাকে। এজন্য স্বপ্ন ও জাগ্রৎকালে দৃশ্যবস্তুর একত্ব স্বীকার করতে হবে।

৩.৪.৩ ঃ জাগ্রদ্দৃশ্য বস্তুর মিথ্যাত্বে তৃতীয় যুক্তি

(মূল) আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তৎ তথা।

বিতথৈঃ সদৃশাঃ সন্তোঽবিতথা ইব লক্ষিতাঃ।।

—মাণ্ডুক্যকারিকা ২/৬

(অনু) আদিতে যে বস্তু থাকে না ও অন্তে যে বস্তু থাকে না সেই বস্তু বর্ত্তমানেও (অনুভবসময়েও) আছে বলা যাবে না। (পদার্থসমূহ) অসত্য বস্তুসমূহ তুল্য হয়েও সত্য বলে প্রতীত হয়ে থাকে।

গৌড়পাদ বলেছেন, স্বপ্নদৃশ্য বস্তুর মতো জাগ্রদ্দৃশ্য বস্তুও মিথ্যা, কারণ জাগ্রৎকালীন বস্তুগুলি বর্ত্তমানে আছে বলে প্রতীত হলেও তত্ত্বত সেগুলি নেই। কারণ যে সকল বস্তু আবির্ভাবের পূর্বে বা তিরোভাবের পরে

কিংবা উৎপত্তির পূর্বে ও বিনাশের পরে কিংবা প্রতীতির পূর্বে ও প্রতীতির শেষে থাকে না, উহারা মধ্যবর্ত্তী প্রতীতিকালেও থাকে না। যেমন মরুমরীচিকায় যে জলভ্রম হয় তা প্রতীতির পূর্বে ও পরে থাকে না বলে অলীকবস্তু বলে গণ্য হয়। এই যুক্তিতে গৌড়পাদ জাগরণ ও স্বপ্নে দৃশ্য বস্তুর মিথ্যাত্ব উপপাদন করেছেন। জাগ্রদ্দৃশ্য ও স্বপ্নদৃশ্য সকল বস্তু উৎপত্তির পূর্বে ও বিনাশের পর থাকে না। এজন্য স্থিতিকালেও ওইসব বস্তুকে অসত্য বলতে হবে। কিন্তু অবিবেকী ব্যক্তিরা ঐ সকল বস্তুর স্থিতিকালে তাদেরকে সত্য বলে বুঝে থাকেন। গৌড়পাদ জাগ্রদ্দৃশ্য ও স্বপ্নদৃশ্য বস্তুকে অলীক পদার্থের তুল্য বলেছেন।

৩.৪.৪ ঃ স্বপ্নদৃষ্টান্তের যাথার্থ্য বিচার ঃ

(মূল) সপ্রয়োজনতা তেষাং স্বপ্নে বিপ্রতিপদ্যতে।

তস্মাদাদ্যন্তবত্ত্বেন মিথ্যৈব খলু তে স্মৃতাঃ।।

—মাণ্ডূক্যকারিকা ২/৭

(অনু) তাদের (অর্থাৎ জাগ্রৎকালীন দৃশ্যপদার্থসমূহের) প্রয়োজনসাধকতা স্বপ্নাবস্থায় থাকে না। সেই কারণে জাগ্রদ্দৃশ্য ঐ সকল পদার্থ আদ্যন্তবিশিষ্ট, সুতরাং সেগুলি মিথ্যা বলে নিশ্চিত হয়েছে।

(মূল) অপূর্ব্বং স্থানিধর্ম্মো হি যথা স্বর্গনিবাসিনাম্।

তানয়ং প্রেক্ষতে গত্বা যথৈবেহ সুশিক্ষিতঃ।।

—মাণ্ডূক্যকারিকা ২/৮

(অনু) স্বর্গবাসী ব্যক্তিদের (বৈশিষ্ট্যগুলির) মত স্বপ্নের ঘটনাগুলি অপূর্ব, সেগুলি স্থানিধর্ম (অর্থাৎ স্বপ্নদ্রষ্টার নিজের ধর্ম)। ঠিক যেমন একজন পথাভিজ্ঞ ব্যক্তি সেই স্থানে গিয়ে দ্রষ্টব্য বিষয় দেখে, স্বপ্নদর্শী ব্যক্তিও সেইরূপ (স্বপ্নে দৃশ্যবস্তুসমূহ দর্শন করে)।

(মূল) স্বপ্নবৃত্তাবপি ত্বন্তশ্চেতসা কল্পিতন্ত্বসৎ।

বহিশ্চেতোগৃহীতং সদ্দৃষ্টং বৈতথ্যমেতয়োঃ।।

—মাণ্ডূক্যকারিকা ২/৯

(অনু) স্বপ্নাবস্থায়ও (শরীরের) অভ্যন্তরে মনঃকল্পিত (বিষয়সমূহ) অসৎ (বলে বিবেচিত), আবার (সেই স্বপ্নেই) বাহিরে চিত্তের দ্বারা যে সমস্ত পদার্থ জ্ঞাত হয় সেগুলি সৎ; (কিন্তু) (এরূপ সদসৎ বিভাগ থাকলেও) তাদের উভয়ের মিথ্যাত্ব দেখা যায়।

(মূল) জাগ্রদ্বৃত্তাবপি ত্বন্তশ্চেতসা কল্পিতং ত্বসৎ।

বহিশ্চেতোগৃহতং সদ্যুক্তং বৈতথ্যমেতয়োঃ।।

—মাণ্ডূক্যকারিকা ২/১০

(অনু) জাগ্রদাবস্থাতেও (শরীরের) অভ্যন্তরে মনের দ্বারা কল্পিত (বিষয়সমূহ) অসৎ। আবার বাইরে মনের দ্বারা জ্ঞাত (বিষয়সমূহ) সৎ। (কাজেই) তাদের উভয়ের মিথ্যাত্ব যুক্তিসঙ্গত।

(মূল) চিত্তকালা হি যেহন্তস্তু দ্বয়কালাশ্চ যে বহিঃ।

কল্পিতা এব তে সর্ব্বে বিশেষো নান্যহেতুকঃ।।

—মাণ্ডূক্যকারিকা ২/১৪

(অনু) যে সমস্ত বিষয় অন্তঃকরণে চিত্তকাল (অর্থাৎ যতক্ষণ জ্ঞান ততক্ষণ বর্ত্তমান থাকে) এবং যে সমস্ত পদার্থ বাইরে দ্বয়কাল (অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরের দ্বারা পরিচ্ছেদার্হ) উহারা সকলেই কল্পিত। (আন্তর বস্তু অসত্য আর বাহ্য বস্তু সত্য) এরূপ বিশেষ কল্পনার অন্য কোন হেতু নেই।

আশঙ্কা হতে পারে যে, স্বপ্নদৃশ্যবস্তুর মতো জাগ্রদ্দৃশ্যবস্তুকে যে অসৎ বলা হয়েছে, তা সঙ্গত নয়। কারণ জাগ্রদ্দৃশ্যবস্তু প্রয়োজন নির্বাহ করে, কিন্তু স্বপ্নদৃশ্যবস্তু প্রয়োজন নির্বাহ করতে পারে না। কোন ব্যক্তি যদি স্বপ্নে মন্ত্রী হয়, তাবে জাগরণের পর তার মন্ত্রিত্ব চলে যায়। জাগ্রদ্দশায় যদি কেউ মন্ত্রী হয় তবে স্বপ্নে তার মন্ত্রিত্ব থেকে যায়। জাগ্রদ্দশায় যদি কেউ খাদ্য গ্রহণ করে, তবে তার ক্ষুধা নিবৃত্ত হয়। কিন্তু স্বপ্নদশায় তা হয় না। কাজেই স্বপ্নদৃষ্টান্তের দ্বারা জাগ্রত্কালীন বস্তুকে মিথ্যা বলা ঠিক হবে না।

এর উত্তরে গৌড়পাদ বলেন, স্বপ্নে যে সকল তৃপ্তি হয়ে থাকে তা যেমন জাগ্রত্কালে থাকে না, তেমনি জাগ্রত্কালে যে তৃপ্তি ঘটে থাকে তা স্বপ্নে থাকে না। যেমন কোন ব্যক্তি জাগ্রদবস্থায় তৃপ্তি করে খাবার পর স্বপ্নে নিজেকে ক্ষুর্ধাত বলে মনে করে। তাই গৌড়পাদ বলেন, স্বপ্নকালীন বস্তুর প্রয়োজন সাধনতার ব্যভিচার যেমন জাগ্রৎকালে দেখা যায়, তেমনি জাগ্রদ্দৃশ্যবস্তুর প্রয়োজন সাধনতার ব্যভিচার স্বপ্নে দেখা যায়। সুতরাং স্বপ্ন ও জাগ্রত্কালীন দৃশ্যবস্তুর সমতা স্বীকার করতে হবে।

গৌড়পাদ আরও দেখিয়েছেন, স্বপ্নদৃশ্যবস্তু অপূর্ব হলেও তা স্বপ্নদর্শী ব্যক্তির ধর্ম। একেই 'স্থানিধর্ম' বলে। স্বপ্নদ্রষ্টা স্বপ্নকালে যে সকল বস্তু দেখে তা ঐ ব্যক্তির নিজের মনের বিকল্পমাত্র। কাজেই স্বপ্নে স্বপ্নদর্শী ব্যক্তি নিজের চিত্তের বিকল্পিত অপূর্ববস্তুকেই দেখে থাকে। জাগ্রদবস্থাতেও দেখা যায় যে, কোন ব্যক্তি কোন পথপ্রদর্শকের নির্দেশমত কোন পথ দিয়ে নির্দিষ্টস্থানে পৌঁছে পূর্বে অদৃষ্ট অর্থাৎ অপূর্ববস্তুকে দেখে থাকে। গৌড়পাদের মতে, দড়িতে সাপের ভ্রম যেমন ভ্রান্তপুরুষের মনের কল্পনা, ঠিক তেমনি স্বপ্নদৃশ্যবস্তুও নিদ্রিত ব্যক্তির মনের কল্পনামাত্র। এজন্য উহা অসৎ। কাজেই জগতের মিথ্যাত্ব স্থাপনের জন্য যে স্বপ্নদৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে তা অসিদ্ধ নয়।

এ প্রসঙ্গে গৌড়পাদ আরও বলেছেন, জাগ্রদ্দৃশ্য বস্তুর ন্যায় স্বপ্নদৃশ্যবস্তুরও সদসৎ বিভাগ দেখা যায়। স্বপ্নে শরীরের অভ্যন্তরে কেবল মনের কল্পনার ফলে যে সমস্ত বস্তু দেখা যায় সে সমস্তই অসৎ। কারণ কল্পনার পরই ঐ সব পদার্থ অদৃশ্য হয়ে যায়। আবার ঐ স্বপ্নেই চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বাইরে যে সমস্ত পদার্থ জানা যায় তা সৎ। এরূপ সদসৎ বিভাগ থাকলেও উভয়েই মনের দ্বারা কল্পিত বলে মিথ্যা। কারণ কল্পনার পরই ঐ সব পদার্থ অদৃশ্য হয়ে যায়। অনুরূপভাবে জাগ্রত্কালে রজ্জুতে মনের কল্পিত সাপটি অসৎ, আর বাইরের জগতে উপলব্ধ ঘটপটাদি বস্তু সৎ। গৌড়পাদের মতে জাগ্রত্কালে এরূপ 'সদসৎ' বিভাগ লক্ষিত হলেও উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ নেই, যেহেতু উহারা সকলেই মনঃকল্পিত। এভাবে তিনি স্বপ্নদৃশ্য ও জাগ্রদ্দৃশ্য বস্তুর মধ্যে তুল্যতা দেখিয়েছেন।

এভাবে গৌড়পাদ তাঁর **মাণ্ডুক্যকারিকা** গ্রন্থের বৈতথ্যপ্রকরণে দেখিয়েছেন যে, জাগ্রদ্দৃষ্ট বা স্বপ্নদৃষ্ট সকল পদার্থ কল্পিত। তবে তিনি স্বপ্নদৃশ্যবস্তুকে **'চিত্তকাল'** ও জাগ্রদ্দৃশ্যবস্তুকে 'দ্বয়কাল' বলেছেন। চিত্তকাল শব্দের অর্থ চিত্তকল্পিত পদার্থ, কল্পনাকাল পর্যন্ত স্থায়ী। আর দ্বয়কাল বলতে বোঝায় সেই সকল বস্তু যা দুটিকাল অর্থাৎ অতীত ও বর্তমানে থাকে। চিত্তকাল শব্দের দ্বারা স্বপ্নদৃশ্য আর দ্বয়কাল শব্দের দ্বারা জাগ্রদ্দৃশ্যবস্তুকে বোঝানো হয়েছে। স্বপ্নদৃশ্যবস্তু কেবল কল্পনাকালে মনে থাকে, আর জাগ্রদ্দৃশ্যবস্তু কল্পনাকাল ছাড়াও অন্যকালে থাকে। ''গতকাল আমি যে মানুষটিকে দেখেছিলাম, আজ তাকে দেখছি''—এই সকল প্রত্যভিজ্ঞা হতে প্রতিপন্ন হয়, একটি বস্তু অতীত ও বর্তমান উভয়কালে থাকে। চিত্তের বাইরে জাগ্রদ্দৃশ্যবস্তু পরস্পর পরস্পরকে পরিচ্ছিন্ন

করে। এজন্য কালদ্বয়ের দ্বারা তারা অবচ্ছিন্ন হয়। স্বপ্নে মনের ভেতর মনোরথরূপে যেসব পদার্থ কল্পিত হয় তারা কেবল চিত্তের দ্বারাই পরিচ্ছিন্ন হয়। চিত্তকাল ছাড়া অন্য পরিচ্ছেদক কাল স্বপ্নদৃশ্যবস্তুর নেই। তাই স্বপ্নদৃশ্যবস্তু কেবল কল্পনাকালেই উপলব্ধির বিষয় হয়। কিন্তু চিত্তের বাইরে যেসব বস্তু অনুভূত হয়ে থাকে তাদেরকে দ্বয়কাল বলে। এই সব বস্তুর কালের ভেদ আছে, এদেরকে ভেদকাল বলা হয়। এরা পরস্পর পরস্পরের দ্বারা পরিচ্ছেদ্য। যেমন দেবদত্ত গোদোহনকাল পর্যন্ত আছে- এই বাক্য থেকে জানা যায় যে যতক্ষণ পর্যন্ত দেবদত্ত আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে গোদোহন করছে এবং যতক্ষণ সে গোদোহন করছে ততক্ষণ সে আছে। কাজেই জাগ্রৎকালে দৃশ্যবস্তু যেমন পূর্বকালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়, তেমনি পরবর্তীকালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়। গৌড়পাদ দেখিয়েছেন, চিত্তের বাইরে অনুভূত সব বস্তুই পরস্পর পরস্পরের পরিচ্ছেদ্য ও পরিচ্ছেদক হয়ে থাকে। এজন্য জাগ্রদ্দৃশ্য বস্তুকে দ্বয়কাল বলা হয়। জাগ্রদ্দৃশ্য ও স্বপ্নদৃশ্য বস্তুর মধ্যে এরূপ কালগত ভেদ থাকলেও উভয়েই কল্পিত। গৌড়পাদের মতে স্বপ্নকালে অন্তঃস্থ ও জাগ্রত্কালে বহিঃস্থ এই উভয় পদার্থই কল্পিত। সুতরাং জাগ্রদ্দৃশ্য বস্তুর মিথ্যাত্ব হেতুক অনুমানে স্বপ্নের যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে তা সঙ্গত এবং মিথ্যাত্বের ব্যাপ্য দৃশ্যত্ব সকল জাগ্রত্বস্তুতেই থাকায় স্বপ্নদৃশ্যবস্তুর মতো জাগ্রদ্দৃশ্যবস্তুকেও মিথ্যা বলতে হবে।

৩.৪.৫ ঃ শূন্যবাদ হতে মায়াবাদের স্বাতন্ত্র্য ঃ

(মূল) উভয়োরপি বৈতথ্যং ভেদানাং স্থানয়োর্যদি।
ক এতান্ বুধ্যতে ভেদান্ কো বৈ তেষাং বিকল্পকঃ।।

—মাণ্ডুক্যকারিকা ২/১১

(অনু) যদি (স্বপ্নাবস্থা ও জাগ্রদবস্থা) এই উভয়াবস্থাতেই সকল বস্তু (জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, দ্রষ্টা, দৃশ্য) মিথ্যা হয়, তাহলে কে বিভিন্ন পদার্থসমূহ অনুভব করে এবং কে- ই বা ঐ সব পদার্থের কল্পনাকারী?

(মূল) কল্পয়ত্যাত্মনাত্মানমাত্মা দেবঃ স্বমায়য়া।
স এব বুধ্যতে ভেদানিতি বেদান্তনিশ্চয়ঃ।।

—মাণ্ডুক্যকারিকা ২/১২

(অনু) স্বপ্রকাশ আত্মা স্বীয় মায়া দ্বারা আত্মাকে নিজে কল্পনা করে। বিশেষকরে ইহা সেই (আত্মাই) পদার্থসমূহকে জানে। ইহা বেদান্তের সিদ্ধান্ত।

গৌড়পাদ স্বপ্নকালীন ও জাগ্রৎকালীন সকল বস্তুকেই মনের কল্পনা বলেছেন। সবই যদি কল্পনা হয় তবে ঐ কল্পনাকারী কে হবে? কে-ইবা দেহের ভেতরে ও বাইরে মনের কল্পিত এই বিষয়গুলিকে জানে। প্রত্যক্ষ, স্মৃতি বা প্রত্যভিজ্ঞার কর্তাই বা কে হবে? সবই যদি মায়াবীর খেলা হয় বা মনের স্পন্দন হয় তাহলে গৌড়পাদের মায়াবাদ তো মাধ্যমিক বৌদ্ধগণের শূন্যবাদে পর্যবসিত হবে এরূপ আশঙ্কা হতে পারে। কিন্তু এই আশঙ্কা অমূলক। কারণ মায়াবাদী গৌড়পাদ সত্তৈকবাদী। তুরীয় ব্রহ্ম একমাত্র সত্য বস্তু। ইহাই সকল কল্পনার অধিষ্ঠান। তুরীয় আত্মা নিজ মায়াশক্তির দ্বার নিজেকে নানা আন্তর ও বাহ্য বস্তুরূপে কল্পনা করেন। গৌড়পাদের মতে জীবকল্পনাই সকল কল্পনার মূল। জীবকল্পনার পর কল্পিত জীব নানাপ্রকার বাহ্য ও আধ্যাত্মিক পদার্থসমূহকে কল্পনা করে। মায়াবীর মায়া যেমন বিমল গগনমণ্ডলকে পল্লব শোভিত কুসুমিত তরুরাজি দ্বারা আচ্ছাদিত করে থাকে, তেমনি মায়াও যেন স্বপ্রকাশ তুরীয় আত্মাকে আচ্ছাদিত করে নানা কল্পিত বস্তুকে প্রকটিত করে। কাজেই গৌড়পাদের মায়াবাদ শুদ্ধ চেতন অধিষ্ঠানকে অপেক্ষা করে। কিন্তু মাধ্যমিকগণের শূন্যবাদ নিরধিষ্ঠান। শূন্যবাদী

বৌদ্ধেরা প্রতীয়মান জাগতিক বস্তুকে স্বভাবশূন্য বলেন। তাঁরা কোন সত্য অধিষ্ঠান স্বীকার করেন না। অসৎ বস্তুতেই অসতের খ্যাতি হয়। কিন্তু মায়াবাদী গৌড়পাদের মতে সত্য অধিষ্ঠান তুরীয় ব্রহ্মে যাবতীয় দৃশ্যবস্তু কল্পিত হয়। সুতরাং গৌড়পাদের মায়াবাদ মাধ্যমিক শূন্যবাদ হতে স্বতন্ত্র।

৩.৫ ঃ সারসংক্ষেপ

এই ইউনিট-এর শুরুতে 'বৈতথ্য' শব্দের অর্থ নিরূপণ করা হয়েছে। বৈতথ্য ও মিথ্যাত্ব সমার্থক শব্দ। মিথ্যাত্বের স্বরূপ সম্বন্ধে গৌড়পাদ, শঙ্কর ও শঙ্করোত্তর অদ্বৈতবাদীগণের মত সবিচার উপস্থাপিত হয়েছে। এখানে দেখানো হয়েছে, অন্তঃস্থ ও সংবৃত হওয়ায় স্বপ্নদৃশ্য বস্তু মিথ্যা। স্বপ্নকাল এবং স্বপ্নদেশও স্বাপ্নিক বস্তুর মিথ্যাত্বের নিয়ামক। স্বাপ্নিক বস্তুর মত জাগ্রৎকালে অভিজ্ঞতালব্ধ বস্তুতে দৃশ্যত্ব থাকায় উহারাও মিথ্যা। তবে স্বপ্নদৃশ্য বস্তু ও জাগ্রদ্দৃশ্য বস্তুর মধ্যে কিয়দংশে ভেদও এখানে প্রদর্শিত হয়েছে। স্বপ্নদৃশ্যবস্তু শরীরের অভ্যন্তরে সংকুচিত অবস্থায় থাকলেও জাগ্রদ্দৃশ্য বস্তু সংকুচিত অবস্থায় থাকে না। স্বপ্নদৃশ্যবস্তু চিত্তকাল ও জাগ্রদ্দৃশ্য বস্তু দ্বয়কাল। এরূপ বৈলক্ষণ্য থাকা সত্ত্বেও উভয়েই দৃশ্যত্ব আছে। উভয়ই অপূর্ব ও স্থানিধর্ম। গ্রাহ্যগ্রাহকভাব ও সদসদ্‌বিভাগ উভয়স্থলেই প্রযোজ্য। এই স্বালক্ষণ্য বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে জাগ্রদ্দৃশ্য ও স্বপ্নদৃশ্য বস্তুর মিথ্যাত্ব এখানে উপপাদিত হয়েছে। গৌড়পাদের দর্শনে জ্ঞাতৃ, জ্ঞেয় প্রভৃতি ভেদ এবং আন্তর ও বাহ্য দৃশ্যজগতের সত্যতা স্বীকৃত না হলেও গৌড়পাদের মায়াবাদ যে বৌদ্ধগণের শূন্যবাদ হতে স্বতন্ত্র ইহাও এখানে প্রদর্শিত হয়েছে।

৩.৬ ঃ প্রধান শব্দগুচ্ছ ঃ

বৈতথ্য

'তথা' শব্দের অর্থ সত্যতা। যার তথা বিগত হয়েছে তাকে বিতথ বলে। বিতথ বলতে মিথ্যা বস্তুকে বোঝায়। বিতথের ভাবই হল বৈতথ্য। বৈতথ্য ও মিথ্যাত্ব সমার্থক শব্দ। গৌড়পাদের মতে অসৎ বা কল্পিত বস্তু হল মিথ্যা। তিনি বৈতথ্য বলতে অসত্ত্বকে বুঝিয়েছেন।

চিত্তকাল

স্বপ্নকালে মনোমধ্যে দৃশ্য বস্তুকে চিত্তকাল বলে। চিত্তের কাল ছাড়া আর কোন কাল যার পরিচ্ছেদক থাকে না সেটি হল চিত্তকাল। চিত্তকাল বস্তু কল্পনাকাল পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। কল্পনার পর এর কোন অস্তিত্ব থাকে না।

স্থানিধর্ম

'স্থানী' শব্দের অর্থ দ্রষ্টা। তার ধর্ম হল স্থানিধর্ম। স্বপ্নকালে যে সব বস্তু স্বপ্নদর্শী দেখে ঐসব বস্তু জাগরণে অনুভূত বস্তুর সংস্কার হতে মনে উৎপন্ন হয়। এজন্য স্বাপ্নিক বস্তুকে অন্তঃকরণবৃত্তিবিশিষ্ট আত্মা বা দ্রষ্টার ধর্ম বলা হয়। স্থানিধর্ম সবসময় অপূর্ব হয়। গৌড়পাদের মতে জাগ্রদ্দৃশ্য বস্তুগুলোও স্থানিধর্ম।

শূন্যবাদ

মাধ্যমিক বৌদ্ধেরা শূন্যবাদ স্বীকার করেন। স্বভাবশূন্যতা 'শূন্য' শব্দের অর্থ। লোকে কোন বস্তুর স্বভাবকে যেভাবে বোঝে তা বস্তুর প্রকৃত স্বভাব নয়। এরা শূন্যকে চরম সত্যবস্তু বলেছেন। কারণ পারমার্থিক সত্যের উপলব্ধি হলে তাকে ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। নীরবতাই শূন্য শব্দের অর্থ।

মায়া বলতে ইন্দ্রজালকে বোঝায়, অজ্ঞান বা অবিদ্যা নয়। অজ্ঞানের ফলে তত্ত্বের অগ্রহণ ও অজ্ঞানের কার্যের ফলে বিপরীতগ্রহণ হয়ে থাকে। গৌড়পাদের মতে দৃশ্যজগৎটি হল মায়া। মায়াবী যেমন মায়ার দ্বারা নিজে লিপ্ত না হয়েও দর্শককে অনেক বস্তু দেখিয়ে থাকে, তেমনি তুরীয় ব্রহ্ম মায়া শক্তির দ্বারা এই জগৎকে উপস্থাপন করে থাকে। মায়াবাদে কেবল অধিষ্ঠানই সত্য, দৃশ্য বস্তু কল্পিত।

৩.৭ ঃ নমুনা-প্রশ্নাবলী ঃ

Eassy Type

1. Discuss how Gauḍapāda maintains that dream – objects are unreal.

Short Type

1. Distinguish between *cittakāla* and *dvayakāla*.
2. How does *jāgraddṛśya vastu* differ from *svapnadṛśya vastu*?

৩.৮ ঃ গ্রন্থপঞ্জী ঃ

আচার্য গৌড়পাদ, মাণ্ডুক্যকারিকা, দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ সম্পাদিত, দেবসাহিত্য কুটীর, কলিকাতা, ১৩৫৫।

Acharya Gauḍapāda, *Māṇḍūkyakārikā*, in *The Mandukya Upaniṣad and the Āgama Śastra*, ed, Thomas E. Wood, Motilal Banarsidass, Delhi, 1992.

Acharya Gauḍapāda, *Māṇḍūkyakārikā*, *Māṇḍūkya Upaniṣad* (With the Kārikā of Gauḍapada and the commentary of Śaṅkarācārya) trans. Swami Gambhirananda, Advaita Ashrama, Mayavati 1989.

ঈশ্বরকৃষ্ণ রচিত

সাংখ্যকারিকা

(সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী সহ নির্ধারিত অংশ)

ড. রজত ভট্টাচার্য্য

দর্শন বিভাগ

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

বর্ধমান

একক ১ ঃ গ্রন্থপরিচিতি ও দুঃখবিচার

এই এককের উদ্দেশ্য ঃ

এই একক পাঠ করলে শিক্ষার্থীরা

- *সাংখ্যকারিকা* এবং তার টীকা, ভাষ্য ও বৃত্তি সম্বন্ধে পরিচিত হবে,
- দুঃখের স্বরূপ নির্ণয় করতে পারবে,
- দুঃখের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার পক্ষে যুক্তি দিতে পারবে,
- দুঃখ নিবৃত্তির নানা উপায়ের ভেদ করতে পারবে,
- দুঃখ নিবৃত্তির উপায়গুলির তুলনামূলক বিচার করতে পারবে এবং
- প্রকৃতি-পুরুষের ভেদজ্ঞানের উৎস নির্ধারণ করতে পারবে।

পাঠপরিকল্পনা

১.১ গ্রন্থ পরিচিতি

১.১.১ *সাংখ্যকারিকা* আপ্তশ্রুতি-পরম্পরা-জাত সূত্রগ্রন্থ

১.১.২ *সাংখ্যকারিকা*-র বৈশিষ্ট্য

১.১.৩ *সাংখ্যকারিকা*-র টীকা, ভাষ্য ও বৃত্তি

১.২ দুঃখের স্বরূপ ও অস্তিত্ব

১.২.১ দুঃখের স্বরূপ

১.২.২ দুঃখের অস্তিত্ব

১.৩ দুঃখের প্রকার

১.৩.১ আধ্যাত্মিক দুঃখ

১.৩.২ আধিভৌতিক দুঃখ

১.৩.৩ আধিদৈবিক দুঃখ

১.৪ দুঃখ নিবৃত্তির উপায়

১.৪.১ দুঃখ নিবৃত্তির দৃষ্ট উপায়

১.৪.২ দুঃখ নিবৃত্তির আনুশ্রবিক উপায়

১.৪.৩ সাংখ্যশাস্ত্র বিহিত উপায়

১.৫ দুঃখ নিবৃত্তির উপায়গুলির তুলনামূলক বিচার

১.৫.১ দৃষ্ট উপায়ে দুঃখের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় না

১.৫.২ আনুশ্রবিক উপায় দৃষ্ট উপায়ের মত অবিশুদ্ধি, ক্ষয় ও অতিশয় যুক্ত

১.৫.৩ সাংখ্যশাস্ত্র বিহিত উপায়—তত্ত্বজ্ঞান-ই শ্রেষ্ঠ

১.৫.৪ প্রকৃতি-পুরুষের ভেদজ্ঞানের উৎস

১.৬ সারসংক্ষেপ

১.৭ প্রধান শব্দগুচ্ছ

১.৮ নমুনা প্রশ্নাবলী

১.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১.১ গ্রন্থ পরিচিতি

১.১.১ *সাংখ্যকারিকা* আপ্তশ্রুতি-পরম্পরা-জাত সূত্রগ্রন্থ

সাংখ্যকারিকা সাংখ্যদর্শনের একটি সূত্রগ্রন্থ। জানা যায় যে আচার্য ঈশ্বরকৃষ্ণ শিষ্যপরম্পরাক্রমে মুনি কপিল প্রণীত সাংখ্যশাস্ত্র ভালভাবে জেনে এই গ্রন্থটি রচনা করেন। মহর্ষি কপিল সাংখ্যদর্শনের প্রণেতা। তিনি নিজে কোন গ্রন্থ রচনা করেছিলেন বলে নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে কিছু জানা যায় না। তবে *সাংখ্যকারিকা*-র শেষ তিনটি কারিকা থেকে নিম্নোক্ত তথ্য পাওয়া যায় ঃ-

কপিলের শিষ্য ছিলেন আসুরি এবং আসুরির শিষ্য ছিলেন পঞ্চশিখ। কপিল আসুরিকে পবিত্র ও সর্বোৎকৃষ্ট জ্ঞান সাংখ্যশাস্ত্র প্রদান করেছিলেন এবং আসুরি সেই জ্ঞান পঞ্চশিখকে প্রদান করেন। পঞ্চশিখ আসুরির নিকট থেকে প্রাপ্ত সাংখ্যশাস্ত্রের জ্ঞান বহু শিষ্য মধ্যে প্রচার করেন এবং *ষষ্টীতন্ত্র* নামে একটি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেন। দুঃখের বিষয়, *ষষ্টীতন্ত্র* নামক গ্রন্থটি বর্তমানে পাওয়া যায় না। তবে পঞ্চশিখ-এর কাছ থেকে শিষ্যপরম্পরাক্রমে মুনি কপিল প্রণীত সাংখ্যশাস্ত্র ভালভাবে জেনে প্রজ্ঞাবান উন্নতমনা ঈশ্বরকৃষ্ণ আর্যা ছন্দে একটি গ্রন্থ রচনা করেন, যা বর্তমানে *সাংখ্যকারিকা* নামে পরিচিত।

১.১.২ *সাংখ্যকারিকা*-র বৈশিষ্ট্য

সাংখ্যকারিকা গ্রন্থটি সংস্কৃত ভাষায় সূত্রাকারে রচিত। *সাংখ্যকারিকা*-র অন্যতম টীকাগ্রন্থ *যুক্তিদীপিকা*-য়

এই গ্রন্থকে সূত্রগ্রন্থ বলা হয়েছে। সুতরাং, এই গ্রন্থটি সাংখ্যশাস্ত্রের বর্তমানে লভ্য সর্বাপেক্ষা প্রাচীন নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। এটি একটি অতি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ। এতে মাত্র তিয়াত্তরটি কারিকা বা সূত্র আছে। প্রতিটি কারিকা দুটিমাত্র লাইনে রচিত। এই গ্রন্থের প্রথম সত্তরটি কারিকা যে স্বয়ং ঈশ্বরকৃষ্ণ রচিত, তা নিশ্চিত। তবে অনেকের মতে শেষ তিনটি কারিকা ঈশ্বরকৃষ্ণ রচিত নয়—প্রক্ষিপ্ত, অর্থাৎ অন্য কোন লেখকের রচনা। যাই হোক শেষ দুটি কারিকায় বলা হয়েছে যে সমগ্র ষষ্ঠিতন্ত্রে যে সমস্ত বিষয় (বা তত্ত্ব) বর্ণিত, আখ্যায়িকা ও পরমত খণ্ডন ছাড়া সেই সমস্ত বিষয়ই (প্রথম) সত্তরটি কারিকায় বলা হয়েছে।

১.১.৩ *সাংখ্যকারিকা*-র টীকা, ভাষ্য ও বৃত্তি

সাংখ্যকারিকা গ্রন্থের ব্যাখ্যার জন্য সংস্কৃত ভাষায় অনেক টীকা, ভাষ্য ও বৃত্তি রচিত হয়েছে, যেমন—বাচস্পতি মিশ্র রচিত টীকা *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী*, অজানা লেখক রচিত টীকা *যুক্তিদীপিকা*, গৌড়পাদ রচিত ভাষ্য *গৌড়পাদভাষ্য*, মাঠর রচিত বৃত্তি *মাঠরবৃত্তি* ইত্যাদি।

রীতি অনুসারে এই সমস্ত টীকা, ভাষ্য ও বৃত্তিগুলিতে প্রতিটি কারিকার আলাদা আলাদা ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ রয়েছে, তবে বিষয়-ভিত্তিক বা সামগ্রিক কোন ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ নেই। তাছাড়া, রীতি অনুসারে এই সমস্ত টীকা, ভাষ্য ও বৃত্তিগুলিতে প্রতিটি কারিকা আলোচনা করার সময় মূল গ্রন্থ থেকে নির্দিষ্ট কারিকাটির উদ্ধৃতি দিয়ে সেটির ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রতিটি টীকা, ভাষ্য ও বৃত্তি *সাংখ্যকারিকা* গ্রন্থের স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা প্রদান করে।

কেবলমাত্র সূত্রগ্রন্থ পাঠ করে ঐ গ্রন্থের বক্তব্য অনুধাবন করা কঠিন। সেই কারণে অন্তত একটি টীকা, ভাষ্য বা বৃত্তি সহযোগে সূত্রগ্রন্থ পাঠ করা উচিত। কিন্তু বিভিন্ন বিষয়ে এই সমস্ত টীকা, ভাষ্য ও বৃত্তিগুলির মধ্যে মতভেদ থাকে বলে প্রতিটি টীকা, ভাষ্য ও বৃত্তি পাঠ না করলে সূত্রগ্রন্থে বর্ণিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে সামগ্রিক দৃষ্টিকোন থেকে যৌক্তিক শৃঙ্খলাবদ্ধ ধারণা গঠন করা সম্ভব হয় না।

১.২ দুঃখের স্বরূপ ও অস্তিত্ব

১.২.১ দুঃখের স্বরূপ

সাংখ্যকারিকা গ্রন্থে ঈশ্বরকৃষ্ণ দুঃখের স্বরূপ বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে কিছু না বললেও *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী*-তে বাচস্পতি বলেছেন, "দুঃখং রজঃ পরিণামভেদঃ", অর্থাৎ দুঃখ রজোগুণের পরিণাম বিশেষ। রজোগুণের পরিণাম বিশেষ হওয়ায় দুঃখ স্বরূপত রজোগুণ। রজোগুণ নিত্য। সুতরাং, দুঃখ স্বরূপত নিত্য। নিত্যবস্তুর নাশ হয় না। ফলে দুঃখেরও নাশ হয় না। তবে দুঃখ-রূপে পরিণামপ্রাপ্ত রজোগুণ পুনরায় তার সূক্ষ্ম অবস্থা রজোগুণে অভিভূত হতে পারে। অতএব, দুঃখের নাশ সম্ভব না হলেও দুঃখের অভিভব সম্ভব। সেই কারণে দুঃখের অপঘাত বা নিবৃত্তি বলতে দুঃখের অভিভব বোঝায়।

১.২.২ দুঃখের অস্তিত্ব

বাচস্পতি বলেছেন, "দুঃখ নেই—এমন নয়"। কারণ, দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষ প্রমাণ এবং আপ্তবচন প্রমাণের দ্বারা

দুঃখের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়।

❋ দুঃখের অস্তিত্বের পক্ষে দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষ প্রমাণ

দুঃখের অস্তিত্ব প্রত্যেকের অনুভব-সিদ্ধ; —বাচস্পতির ভাষায় "প্রত্যাত্মবেদনীয়"। সুতরাং দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা দুঃখের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। তবে, দুঃখ অনুকূলরূপে বেদনীয় নয়, প্রতিকূলরূপে বেদনীয়। দুঃখকে সবাই পরিত্যাগ করতে চায়।

❋ দুঃখের অস্তিত্বের পক্ষে আপ্তবচন প্রমাণ

তাছাড়া, ঈশ্বরকৃষ্ণের উক্তি অবশ্যই আপ্তবচন, এবং আপ্তবচন সাংখ্যস্বীকৃত একটি প্রমাণ। *সাংখ্যকারিকা*-র প্রথম কারিকা শুরু হয়েছে "দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা"—এই শব্দটি দিয়ে। জগতে দুঃখ যদি না থাকত, তবে ঈশ্বরকৃষ্ণ "দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা"—এই শব্দটি ব্যবহার করতেন না এবং *সাংখ্যকারিকা*-ও রচিত হত না। সুতরাং, আপ্তবচন প্রমাণের দ্বারাও দুঃখের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়।

১.৩ দুঃখের প্রকার

সাংখ্যকারিকা শুরু হয়েছে "দুঃখত্রয়" এই শব্দটি দিয়ে। দুঃখত্রয়—এই শব্দে *সাংখ্যকারিকা*-য় দুঃখের সংখ্যা তিন—একথা বলা হয়নি। বেদত্রয় বলতে তিনটি বেদ বোঝায়। কিন্তু দুঃখত্রয় বলতে তিনটি দুঃখ বোঝায় না, কারণ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালে স্থিত অসংখ্য প্রাণীর অসংখ্য দুঃখ। এই তিন কালে স্থিত অসংখ্য প্রাণীর অসংখ্য দুঃখ ঈশ্বরকৃষ্ণের মতে তিন প্রকার—এটাই বক্তব্য। সুতরাং দুঃখত্রয় বলতে *সাংখ্যকারিকা*-য় "দুঃখানাং ত্রয়ং দুঃখত্রয়ম্" দুঃখসমূহের ত্রয় দুঃখত্রয় বা ত্রিবিধ দুঃখ—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক, নির্দেশ করা হয়েছে।

১.৩.১ আধ্যাত্মিক দুঃখ

আধ্যাত্মিক দুঃখ দুই প্রকার—শারীর ও মানস। বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মার তারতম্যের ফলে শারীর দুঃখ জন্মে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয়, ঈর্ষা, বিষাদ এবং ইষ্ট বিষয় বিশেষের অদর্শনের ফলে মানস দুঃখ জন্মে। এইসব দুঃখ আন্তর উপায়ে সাধ্য, অর্থাৎ এরা শরীরের ভেতর থেকে উৎপন্ন হয় বলে এদের আধ্যাত্মিক দুঃখ বলে।

১.৩.২ আধিভৌতিক দুঃখ

আধিভৌতিক দুঃখ মানুষ, মৃগ, পশু পক্ষী, সরীসৃপ ও স্থাবর থেকে উৎপন্ন দুঃখ। এই প্রকার দুঃখ প্রমাতার মন ও শরীরের বাইরের কোন কারণ থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে, এদের বাহ্য উপায়ে সাধ্য দুঃখ বলে।

১.৩.৩ আধিদৈবিক দুঃখ

আধিদৈবিক দুঃখ যক্ষ, রাক্ষস, বিনায়ক এবং গ্রহাদির সংস্থান থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে। এই প্রকার দুঃখও বাহ্য উপায়ে সাধ্য, অর্থাৎ শরীরের বাইরের কোন কারণ থেকে উৎপন্ন।

১.৪ দুঃখ নিবৃত্তির উপায়

দুঃখের অভিভব সম্ভব এবং তিন প্রকার দুঃখের অভিভবের তিন প্রকার উপায় আছে। যথা—দৃষ্ট বা লৌকিক উপায়, আনুশ্রবিক উপায়, তথা বেদবিহিত যাগযজ্ঞাদি কর্মকলাপ, এবং সাংখ্যশাস্ত্র বিহিত উপায়—তত্ত্বজ্ঞান।

১.৪.১ দুঃখ নিবৃত্তির দৃষ্ট বা লৌকিক উপায়

দুঃখ নিবৃত্তির দৃষ্ট বা লৌকিক উপায় সর্বাপেক্ষা সহজসাধ্য। তিন প্রকার দুঃখের অভিভবের তিন প্রকার দৃষ্ট উপায় আছে।

※ **আধ্যাত্মিক দুঃখ নিবারণের দৃষ্ট উপায় ঃ** শারীর দুঃখ ও মানস দুঃখ ভেদে আধ্যাত্মিক দুঃখ দুই প্রকার বলে এই দুই প্রকার দুঃখের নিবৃত্তিরও অনেক সহজ দৃষ্ট বা লৌকিক উপায় আছে।

শারীর দুঃখ নিবারণের উপায় ঃ শারীর দুঃখ নিবারণের জন্য শত শত সহজ উপায় আছে, যেমন বৈদ্যদের, অর্থাৎ আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞেদের, দ্বারা উপদিষ্ট ভেষজাদি সেবন।

মানস দুঃখ নিবারণের উপায় ঃ মানস দুঃখ নিবৃত্তির জন্য মনোজ্ঞ স্ত্রী (অথবা পুরুষ), পানীয়, সুস্বাদু খাদ্য সামগ্রী, প্রসাধন সামগ্রী (কস্‌মেটিকস্‌), বস্ত্র , অলঙ্কার ইত্যাদি অনেক সহজলভ্য ভোগ্য বিষয় আছে।

※ **আধিভৌতিক দুঃখ নিবারণের দৃষ্ট উপায় ঃ** আধিভৌতিক দুঃখ নিবৃত্তির জন্য নীতিশাস্ত্রাভ্যাস, নিরাপদ স্থানে বাস ইত্যাদি বিবিধ সহজ উপায় আছে।

※ **আধিদৈবিক দুঃখ নিবৃত্তির উপায় ঃ** আধিদৈবিক দুঃখ নিবৃত্তির জন্য সহজলভ্য মণি, মন্ত্র, ঔষধাদির ব্যবহার-রূপ অনেক সহজ উপায় আছে।

১.৪.২ দুঃখ নিবৃত্তির আনুশ্রবিক উপায়

আনুশ্রবিক শব্দে বেদাবিহিত যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ এবং তত্ত্বজ্ঞান উভয়ই বোঝায়। কিন্তু ঈশ্বরকৃষ্ণ *সাংখ্যকারিকা*-র দ্বিতীয় কারিকা-য় যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ অর্থে আনুশ্রবিক শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অনেক মুহূর্ত, প্রহর, দিন, রাত্রি, মাস এবং বৎসরাদি কাল যাবৎ অনুষ্ঠিতব্য বৈদিক জ্যোতিষ্টোমাদি কর্মকলাপ, তথা যাগযজ্ঞানুষ্ঠান, দুঃখত্রয়কে নিবৃত্ত করতে সমর্থ। এর ফল স্বর্গলাভ। শ্রুতিতে বলা হয়েছে, স্বর্গকামী ব্যক্তি যজ্ঞ করবেন। যে সুখ দুঃখের সঙ্গে মিশ্রিত নয়, যে সুখ পরে দুঃখের দ্বারা অভিভূত হয় না এবং যে সুখ ইচ্ছামাত্র উপস্থিত হয়, সেই সুখকে স্বর্গ বলে। আনুশ্রবিক উপায় দৃষ্ট উপায়ের মত সহজসাধ্য না হলেও বহু জন্ম যাবৎ অনুষ্ঠিতব্য কষ্টসাধ্য বিবেকজ্ঞান থেকে সহজসাধ্য।

১.৪.৩ সাংখ্যশাস্ত্র বিহিত উপায় (তত্ত্বজ্ঞান)

দুঃখ নিবৃত্তির সাংখ্যশাস্ত্র বিহিত উপায় হল তত্ত্বজ্ঞান অর্জন। ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞান-কে সাংখ্যশাস্ত্রে তত্ত্বজ্ঞান বলে। ব্যক্ত অব্যক্ত ও জ্ঞ—এই ত্রিবিধ তত্ত্বের বিভেদ জ্ঞান হলে দুঃখের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নিবৃত্তি সম্ভব হয়। দুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তি হল দুঃখের অবশ্য নিবৃত্তি এবং দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হল নিবৃত্ত দুঃখের পুনরায় উৎপত্তি না হওয়া। তত্ত্বজ্ঞান অর্জন কিন্তু অনেক জন্ম ব্যাপী অভ্যাসপরম্পরা-রূপ আয়াসসাধ্য হওয়ায় অতি দুষ্কর।

১.৫ দুঃখ নিবৃত্তির উপায়গুলির তুলনামূলক বিচার

১.৫.১ দৃষ্ট উপায়ে দুঃখের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় না

দুঃখ নিবৃত্তির দৃষ্ট বা লৌকিক উপায় সর্বাপেক্ষা সহজসাধ্য হলেও দৃষ্ট উপায়ে দুঃখের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নিবৃত্তি সম্ভব হয় না। অর্থাৎ সকল দুঃখের নিশ্চিত চিরনিবৃত্তি হয় না।

১.৫.২ আনুশ্রবিক উপায় দৃষ্ট উপায়ের মত অবিশুদ্ধি, ক্ষয় ও অতিশয় যুক্ত

আনুশ্রবিক উপায় দৃষ্ট উপায়ের মত সহজসাধ্য নয়। অনেক মুহূর্ত, প্রহার, দিন, রাত্রি, মাস এবং বৎসরাদি কাল যাবৎ অনুষ্ঠিতব্য। কিন্তু আনুশ্রবিক উপায়ে দৃষ্ট উপায়ের মতই অবিশুদ্ধি, ক্ষয় এবং অতিশয় যুক্ত।

※ **আনুশ্রবিক উপায় অবিশুদ্ধ ঃ** আনুশ্রবিক উপায় অবিশুদ্ধ, কারণ সোমাদি যাগে পশু বীজাদি বধ করা হয়। ''কোন জীবকে হিংসা করবে না''—এই সামান্য (বা সাধারণ) শাস্ত্রবাক্য ''অগ্নিসোম যজ্ঞে পশু বলি দেবে''- এই বিশেষ শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা বাধিত হয়—একথা বলা ঠিক নয়। কারণ, এই দুই শাস্ত্রবাক্যের মধ্যে আপাতদৃষ্টে বিরোধ থাকলেও প্রকৃত বিরোধ নেই। বিরোধ থাকলে, অর্থাৎ একই বিষয়ে সাধারণ ও বিশেষ শাস্ত্রবাক্যের ভাব ও অভাবরূপে প্রবৃত্তি হলে, প্রবল শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা দুর্বল শাস্ত্রবাক্য বাধিত হয়। কিন্তু এখানে কোন বিরোধ নেই, কেননা দুটি শাস্ত্র বাক্যের বিষয় ভিন্ন। ''হিংসা করবে না''—এই নিষেধের দ্বারা 'হিংসা পাপের কারণ'—এটা বোঝায়, কিন্তু 'হিংসা যজ্ঞের উপকারক নয়', একথা বোঝায় না। যদি তা বোঝাতো, তবে বাক্যভেদ দোষ হত। একই হিংসা পাপের কারণ এবং যজ্ঞের উপকারক হতে পারে, এতে কোন বিরোধ নেই। হিংসা সাধারণভাবে পুরুষের পাপ জন্মালেও যজ্ঞের উপকার করে। পঞ্চশিখাচার্য বলেছেন, ''যাগাদিক্রিয়া স্বল্পসঙ্কর, সপরিহার ও সপ্রত্যবমর্ষ''।

- **যাগাদিক্রিয়া স্বল্পসঙ্কর ঃ** জ্যোতিষ্টোমাদি যাগ থেকে উৎপন্ন প্রধান অপূর্বের সঙ্গে যজ্ঞে কৃত পশুহিংসা-জাত দুঃখের হেতু-রূপ অল্প পরিমাণ পাপের যোগ থাকে বলে তাকে স্বল্পসঙ্কর বলে।
- **যাগাদিক্রিয়া সপরিহার ঃ** যজ্ঞে কৃত পশুহিংসা-জাত পাপ প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা কিছু পরিমাণ দূর করা যায় বলে তা সপরিহার।
- **যাগাদিক্রিয়া সপ্রত্যবমর্ষ ঃ** ভুল করে যদি যজ্ঞে কৃত পশুহিংসা জনিত পাপ নাশের জন্য প্রায়শ্চিত করা না হয় তাহলে যজ্ঞের প্রধান কর্মফল স্বর্গ ভোগের সময় যজ্ঞে-কৃত পশুহিংসা জনিত পাপের ফল দুঃখ ভোগ হয়। তবু সেই পাপ থেকে যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাকে সহজেই সহ্য করা যায়। সহিষ্ণুতার সঙ্গে বর্তমান বলে আনুশ্রবিক উপায়ে সাধ্য সুখকে সপ্রত্যবমর্ষ বলে। কারণ পুণ্যরাশি জাত স্বর্গসুধারূপ মহাহ্রদে অবগাহনকারী পুণ্যশীলগণ স্বল্পপাপ থেকে উৎপন্ন দুঃখরূপ অগ্নিকাণাকে সহজেই সহ্য করতে পারেন।

※ **আনুশ্রবিক উপায় ক্ষয়যুক্ত**

যজ্ঞের ফল স্বর্গাদির ক্ষয় আছে—এটা লক্ষণার দ্বারা বোঝায়। যেহেতু স্বর্গ জন্য-পদার্থ অর্থাৎ যজ্ঞাদির ফলে উৎপন্ন হয় বলে ভাবরূপ হয়ে কার্য করে, সেহেতু অনুমিত হয় যে স্বর্গের ক্ষয় আছে।

※ **আনুশ্রবিক উপায় অতিশয়যুক্ত**

যজ্ঞের ফল স্বর্গাদির অতিশয় আছে—এটা লক্ষণার দ্বারা বোঝায়। যেহেতু জ্যোতিষ্টোমাদি যাগ কেবল

স্বর্গ লাভের উপায়, কিন্তু বাজেপেয়াদি যাগ স্বর্গের আধিপত্য লাভের উপায়, তাই এদের মধ্যে অতিশয় আছে। পরের অধিক সম্পদ দেখে স্বল্প সম্পদের অধিকারী পুরুষ যেমন দুঃখ পায়, সেইরূপ স্বর্গাধিপতির অধিক সম্পদ দেখে সাধারণ স্বর্গবাসীরও যে দুঃখ হয়, তা যুক্তিযুক্ত।

১.৫.৩ সাংখ্যশাস্ত্র বিহিত উপায়—তত্ত্বজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ

"সোমরস পান করে অমর হয়েছি"—এই (বাক্যস্থ) অমরতার অর্থ স্বর্গে চিরকাল অবস্থান। প্রলয় পর্যন্ত স্বর্গে অবস্থানকেই শাস্ত্রে অমৃতত্ব বা অমরতা (বা চিরকাল অবস্থান) বলে। কিন্তু শ্রুতিতে বলা হয়েছে ,"(যজ্ঞাদি) কর্ম পুত্র বা ধনের দ্বারা নয়, কেবলমাত্র ত্যাগের দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করা হয়। অমৃতত্ব স্বর্গ নয়, এটি বুদ্ধিরূপ গুহাতে নিহীত থাকে, বিবেকী যদিগণই তা পেয়ে থাকেন", "কাম্য-কর্মের অতীত অমৃতত্ব লাভ করেন।" এই সমস্ত শাস্ত্রবাক্য বিবেচনা করে বলা হয়েছে যে, যাগযজ্ঞের বিপরীত—তত্ত্বজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। তাই সোমাদি যাগের মত আনুশ্রবিক উপায় অবিশুদ্ধ, অনিত্য এবং অতিশয়যুক্ত ফল স্বর্গাদির জনক হওয়ায় হিংসার মিশ্রনহীন বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানের বিপরীত। শ্রুতিতে বলা হয়েছে যে, তত্ত্বজ্ঞানের ফল নিত্য ও নিরতিশয় বলে অমৃতত্ব লাভের পর জন্ম চিরতরে রহিত হয়। অমৃতত্ব তত্ত্বজ্ঞানের ফল বা কার্য বলে অনিত্য, এরূপ আশাঙ্কা যুক্তিযুক্ত নয়। ভাবরূপ কার্য জন্য-পদার্থ বলে অনিত্য হয়ে থাকে। দুঃখধ্বংস—রূপ অমৃতত্ব কার্য হলেও ভাবরূপ কার্যের বিপরীত। অন্য দুঃখ উৎপত্তির সম্ভাবনা নেই, যেহেতু কারণের প্রবৃত্তি বা ক্রিয়া না থাকলে কার্য উৎপত্তি হয় না। দুঃখাদির প্রকৃতি-রূপী কারণের প্রবৃত্তি বিবেকজ্ঞান বা ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞান জন্মানো পর্যন্তই হয়ে থাকে। দুঃখের অপঘাতক বিবেকজ্ঞান বা প্রকৃতিপুরুষের ভেদ-সাক্ষাৎকার দুঃখ নাশক আনুশ্রবিক উপায়ের বিপরীত বলে শ্রেষ্ঠ। অনুশ্রবিক উপায় বেদবিহীত এবং কিছু পরিমাণে দুঃখনাশক বলে প্রশংসনীয়। প্রকৃতি-পুরুষের ভেদ-সাক্ষাৎকারও প্রশংসনীয় । তবে এই দুই প্রশংসনীয় উপায়ের মধ্যে প্রকৃতি-পুরুষ ভেদ সাক্ষাৎকার বেশী প্রশংসনীয়।

১.৫.৪ প্রকৃতি পুরুষের ভেদজ্ঞানের উৎস

কীভাবে প্রকৃতি-পুরুষের ভেদজ্ঞানের উৎপত্তি হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে —ব্যক্ত, অব্যক্ত ও জ্ঞ (বা পুরুষ)-এর জ্ঞান থেকে। ব্যক্ত, অব্যক্ত ও জ্ঞ মিলে ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞ, — এদের পৃথক ভাবে জানা-ই হল ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞান। প্রত্যক্ষের দ্বারা প্রথমে ব্যক্তের জ্ঞান হবার পর অনুমানের দ্বারা তার কারণ অব্যক্তের জ্ঞান হয়। জড়াত্মক ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয়েই পরের প্রয়োজন সিদ্ধি করে বলে অনুমানের দ্বারা তাদের থেকে ভিন্ন পুরুষের জ্ঞান হয়। প্রথমে ব্যক্ত, পরে অব্যক্ত এবং সবশেষে জ্ঞ বা পুরুষের জ্ঞান হয়। বলা হয়েছে যে, শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণাদি শাস্ত্র থেকে ব্যক্ত , অব্যক্ত ও জ্ঞ-এর সম্বন্ধে পৃথকভাবে শ্রবণ করে শাস্ত্রীয় যুক্তির দ্বারা ব্যবস্থাপন (মনন) এবং দীর্ঘকাল সযত্নে নিরন্তর ভক্তি সহকারে ভাবনারূপ ধর্ম (নিদিধ্যাসন) থেকে (ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞ-এর) বিজ্ঞান লাভ হয়। এভাবে তত্ত্ব-জ্ঞানের অনুশলীন করলে "আমি কর্তা নই, কারো সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নেই, আমি বিকারহীন পুরুষ"— এরূপ ভ্রমহীন বিশুদ্ধ কেবলজ্ঞান, প্রকৃতি-পুরুষের ভেদ-সাক্ষাৎকার, উৎপন্ন হয়।

১.৬ সারসংক্ষেপ

সাংখ্যকারিকা সাংখ্যদর্শনের একটি সূত্রগ্রন্থ। জানা যায় যে আচার্য ঈশ্বরকৃষ্ণ শিষ্যপরম্পরাক্রমে মুনি কপিল প্রণীত সাংখ্যশাস্ত্র ভালভাবে জেনে এই গ্রন্থটি সংস্কৃত ভাষায় সূত্রাকারে রচনা করেন। *সাংখ্যকারিকা*-র অন্যতম

টীকাগ্রন্থ *যুক্তিদীপিকা*-য় এই গ্রন্থকে সূত্রগ্রন্থ বলা হয়েছে। সুতরাং, এই গ্রন্থটি সাংখ্যশাস্ত্রের বর্তমানে লভ্য সর্বাপেক্ষা প্রাচীন নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। এতে মাত্র তিয়াত্তরটি কারিকা বা সূত্র আছে। প্রতিটি কারিকা দুটি মাত্র লাইনে রচিত। বলা হয়েছে যে সমগ্র *ষষ্টিতন্ত্র*-তে যে সমস্ত বিষয় (বা তত্ত্ব) বর্ণিত আখ্যায়িকা ও পরমত-খণ্ডন ছাড়া সেই সমস্ত বিষয়ই (প্রথম) সত্তরটি কারিকায় বর্ণিত।

সাংখ্যকারিকা গ্রন্থের ব্যাখ্যার জন্য সংস্কৃত ভাষায় অনেক টীকা ভাষ্য ও বৃত্তি রচিত হয়েছে। যেমন— *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, যুক্তিদীপিকা, গৌড়পাদভাষ্য, মাঠরবৃত্তি* ইত্যাদি। কেবলমাত্র সূত্রগ্রন্থ পাঠ করে ঐ গ্রন্থের বক্তব্য অনুধাবন করা কঠিন। সেই কারণে অন্তত একটি টীকা, ভাষ্য বা বৃত্তি সহযোগে সূত্রগ্রন্থ পাঠ করা উচিত।

সাংখ্যকারিকা গ্রন্থে ঈশ্বরকৃষ্ণ দুঃখের স্বরূপ বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে কিছু না বললেও *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী*-তে বাচস্পতি বলেছেন, দুঃখ রজোগুণের পরিণাম বিশেষ। রজোগুণ নিত্য। সুতরাং, দুঃখ স্বরূপত নিত্য। নিত্যবস্তুর নাশ হয় না। ফলে দুঃখের নাশ সম্ভব না হলেও দুঃখের অভিভাব সম্ভব। সেই কারণে দুঃখের অপঘাত বা নিবৃত্তি বলতে দুঃখের অভিভাব বোঝায়।

দৃষ্ট প্রমাণ এবং আপ্তবচন প্রমাণের দ্বারা দুঃখের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। দুঃখের অস্তিত্ব প্রত্যেকের অনুভব-সিদ্ধ। তাছাড়া *সাংখ্যকারিকা* শুরু হয়েছে "দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা" এই শব্দটি দিয়ে। দুঃখ যদি না থাকত, তবে ঈশ্বরকৃষ্ণ এই শব্দটি ব্যবহার করতেন না। সুতরাং, আপ্তবচন প্রমাণের দ্বারাও দুঃখের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়।

ঈশ্বরকৃষ্ণের মতে তিন প্রকার—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক। আধ্যাত্মিক দুঃখ দুই প্রকার—শরীর ও মানস। বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মার তারতম্যের ফলে শারীর দুঃখ জন্মে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ঈর্ষা, বিষাদ এবং ইষ্ট বিষয় বিশেষের অদর্শনের ফলে মানস দুঃখ জন্মে। এইসব দুঃখ আন্তর উপায়ে সাধ্য বলে এদের আধ্যাত্মিক দুঃখ বলে। আধিভৌতিক দুঃখ মানুষ, মৃগ, পশু, পক্ষী সরীসৃপ ও স্থাবর থেকে উৎপন্ন দুঃখ। এই প্রকার দুঃখ বাহ্য উপায়ে সাধ্য। আধিদৈবিক দুঃখ যক্ষ, রাক্ষস, বিনায়ক এবং গ্রহাদির সংস্থান থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে। এই প্রকার দুঃখও বাহ্য উপায়ে সাধ্য।

দুঃখের অভিভব সম্ভব এবং তিন প্রকার দুঃখের অভিভবের তিন প্রকার উপায় আছে। যথা—দৃষ্ট বা লৌকিক উপায়, অনুশ্রবিক উপায় (তথা বেদাবিহিত যাগযজ্ঞাদি কর্মকলাপ) এবং সাংখ্যশাস্ত্র বিহিত উপায় (তত্ত্বজ্ঞান)। শরীর দুঃখ নিবারণের জন্য বৈদ্যদের দ্বারা উপদিষ্ট ভেষজাদি সেবন ইত্যাদি এবং বস্ত্র, অলঙ্কার ইত্যাদি সহজলভ্য ভোগ্য বিষয় আছে। আধিভৌতিক দুঃখনিবৃত্তির জন্য নীতিশাস্ত্রাভ্যাস, নিরাপদ স্থানে বাস ইত্যাদি এবং আধিদৈবিক দুঃখ নিবৃত্তির জন্য মণি, মন্ত্র, ঔষধ ইত্যাদি অনেক সহজ উপায় আছে। আনুশ্রবিক শব্দে বেদবিহিত যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ এবং তত্ত্বজ্ঞান উভয়ই বোঝায়। কিন্তু ঈশ্বরকৃষ্ণ যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ অর্থে আনুশ্রবিক শব্দটি ব্যবহার করেছেন। আনুশ্রবিক উপায়- এর ফল স্বর্গলাভ। আনুশ্রবিক উপায় দৃষ্ট উপায়ের মত সহজসাধ্য না হলেও বহু জন্ম যাবৎ অনুষ্ঠিতব্য কষ্টসাধ্য বিবেকজ্ঞান থেকে সহজসাধ্য। দুঃখ নিবৃত্তির সাংখ্যশাস্ত্র বিহিত উপায় হল তত্ত্বজ্ঞান অর্জন। ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানকে সংখ্য-শাস্ত্রে তত্ত্বজ্ঞান বলে। তত্ত্বজ্ঞান অর্জন কিন্তু অনেক জন্ম ব্যাপি অভ্যাসপরম্পরা-আয়াসসাধ্য হওয়ায় অতি দুষ্কর।

দৃষ্ট উপায়ে দুঃখের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নিবৃত্তি সম্ভব হয় না। আনুশ্রবিক উপায় দৃষ্ট উপায়ের মতই অবিশুদ্ধি, ক্ষয় এবং অতিশয় যুক্ত। আনুশ্রবিক উপায় অবিশুদ্ধ, কারণ সোমাদি যাগে পশু বীজাদি বধ করা হয়। হিংসা সাধারণভাবে পুরুষের পাপ জন্মালেও যজ্ঞের উপকার করে। পঞ্চশিখাচার্য বলেছেন- "যাগাদিক্রিয়া স্বল্প-

সঙ্কর, সপরিহার ও সপ্রত্যবমর্ষ। জ্যোতিষ্টোমাদিযাগ থেকে উৎপন্ন প্রধান অপূর্বের সঙ্গে যজ্ঞে কৃত পশুহিংসা-জাত দুঃখের হেতুরূপ অল্প পরিমাণ পাপের যোগ থাকে। যজ্ঞে কৃত পশুহিংসা-জাত পাপ প্রয়শ্চিত্তের দ্বারা কিছু পরিমাণে দূর করা যায়। ভুলকরে যদি প্রয়শ্চিত্ত করা না হয়, তাহলেও যজ্ঞে কৃত পশুহিংসা জনিত পাপ থেকে যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাকে সহজেই সহ্য করা যায়। আনুশ্রবিক উপায় ক্ষয় যুক্ত—এটা লক্ষণার দ্বারা বোঝায়। যেহেতু স্বর্গ জন্য-পদার্থ, অর্থাৎ যজ্ঞাদির ফলে উৎপন্ন হয় বলে ভাবরূপ হয়ে কার্য করে, সেহেতু অনুমিত হয় যে স্বর্গের ক্ষয় আছে। যেহেতু জ্যোতিষ্টোমাদি যাগ কেবল স্বর্গ লাভের উপায়, কিন্তু বাজপেয়াদি যাগ স্বর্গের আধিপত্য লাভের উপায়, তাই এদের মধ্যে অতিশয় আছে। সোমাদি যাগের মত আনুশ্রবিক উপায় অবিশুদ্ধ, অনিত্য এবং অতিশয়যুক্ত ফল স্বর্গাদির জনক হওয়ায় হিংসার মিশ্রন-হীন বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানের বিপরীত। শ্রুতিতে বলা হয়েছে যে তত্ত্বজ্ঞানের ফল নিত্য ও নিরতিশয় বলে অমৃতত্ব লাভের পর জন্ম চিরতরে রহিত হয়। দুঃখের অপঘাত বিবেকজ্ঞান বা প্রকৃতি পুরুষের ভেদ-সাক্ষাৎকার দুঃখ নাশক আনুশ্রবিক উপায়ের বিপরীত বলে শ্রেষ্ঠ।

আনুশ্রবিক উপায় বেদবিহীত এবং কিছু পরিমাণে দুঃখ নাশক বলে প্রশংসনীয়। প্রকৃতি-পুরুষের ভেদ-সাক্ষাৎকারও প্রশংসনীয়। তবে এই দুই প্রশংসনীয় উপায়ের মধ্যে প্রকৃতি-পুরুষ ভেদ-সাক্ষাৎকার বেশী প্রশংসনীয়। তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলন করলে 'আমি কর্তা নই, কারো সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নেই, আমি বিকারহীন পুরুষ'—এরূপ ভ্রমহীন বিশুদ্ধ কেবলজ্ঞান (প্রকৃতি পুরুষের ভেদ-সাক্ষাৎকার) উৎপন্ন হয়।

১.৭ প্রধান শব্দগুচ্ছ

শব্দ	অর্থ
দুঃখ	রজোগুণের পরিণাম বিশেষ
আধ্যাত্মিক দুঃখ	প্রমাতার নিজের শরীর ও মন থেকে জাত দুঃখ
শারীর দুঃখ	বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মার তারতম্যের ফলে উৎপন্ন দুঃখ
মানস দুঃখ	কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয়, ঈর্ষ্যা, বিষাদ এবং ইষ্ট বিষয় বিশেষের আদর্শনের ফলে উৎপন্ন দুঃখ।
আধিভৌতিক দুঃখ	মানুষ, মৃগ, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ ও স্থাবর থেকে উৎপন্ন দুঃখ
আধিদৈবিক দুঃখ	যক্ষ, রাক্ষস, বিনায়ক ও গ্রহাদির সংস্থান থেকে উৎপন্ন দুঃখ
দুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তি	দুঃখের অবশ্যম্ভাবী নিবৃত্তি
দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি	নিবৃত্ত দুঃখের পুনরায় উৎপত্তি না হওয়া
দুঃখের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নিবৃত্তি	সকল দুঃখের নিশ্চিত চিরনিবৃত্তি
বিবেকজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞান। ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞান	ব্যক্ত, অব্যক্ত ও জ্ঞ-এর বিজ্ঞান
কেবলজ্ঞান	প্রকৃতি পুরুষের ভেদ-সাক্ষাৎকার

১.৮ নমুনা প্রশ্নাবলী

Essay type

1. (a) What is sorrow (*duḥkha*) according to Vācaspati ?
   (b) How does Vācaspati show that the existence of sorrow is established by two *pramāṇa*-s?
   (c) Explain, after Vācaspati, Īśvarakṛṣṇa's concept of *duḥkhatraya*.
2. Explain the merits and demerits of the three means for alleviation of sorrow discussed in the *Sāṁkhyakārikā*.

Short answer type

1. Write short notes on the following :
   (a) *aikāntika nivṛtti* of sorrow
   (b) *ātyantika nivṛtti* of sorrow
   (c) *ānuśravika* means for the alleviation of sorrow
   (d) *vyaktāvyaktajñavijñāna*

১.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১। দিবাকরানন্দ, স্বামী (অনূদিত) ঃ *শ্রীমৎ ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রণীত সাংখ্যকারিকা / সটীক বঙ্গানুবাদ/* (মূল কারিকা, অন্বয়ার্থ, অনুবাদ, তত্ত্বকৌমুদী টীকা, টীকানুবাদ ও স্থানে স্থানে ব্যাখ্যা সংযোজিত), প্রকাশক—গনেশ চন্দ্র দত্ত, ৩৪ সদানন্দ রোড, কালিঘাট, কলকাতা-২৬, ১৯৭৬

২। বেদান্তচুঞ্চু সাংখ্যভূষণ সাহিত্যাচার্য্য, পূর্ণচন্দ্র (সঙ্কলিত) ঃ *সাংখ্যকারিকা*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যদ, ১৯৮৩

৩। গোস্বামী, নারায়ণ চন্দ্র ঃ *ঈশ্বরকৃষ্ণবিরচিতকারিকাসহিতা সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী*. প্রকাশক—শিখা পাল, জিৎপুর, মুর্শিদাবাদ, ১৯৮২

তথ্যসূত্র

এই পাঠোপকরণে নির্ধারিত পাঠ্যসূচী অনুযায়ী কেবলমাত্র বাচস্পতি মিশ্র রচিত টীকা *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী* অনুসরণেই *সাংখ্যকারিকা*-য় বর্ণিত বিষয়গুলির আলোচনা করা হয়েছে।

একক ২ ঃ তত্ত্বের শ্রেণীবিভাগ ও গুণত্রয়

এই এককের উদ্দেশ্য

- *সাংখ্যকারিকা*-য় স্বীকৃত তত্ত্বের শ্রেণীবিভাগ প্রদর্শন করতে পারবে,
- বিবিধ শ্রেণীর তত্ত্বের লক্ষণগুলির তুলনামূলক বিচার করতে পারবে,
- গুণত্রয়ের স্বরূপ নির্দেশ করতে পারবে

  এবং
- গুণত্রয়ের প্রয়োজন ও কার্য বর্ণনা করতে পারবে।

পাঠপরিকল্পনা

২.১ *সাংখ্যকারিকা*-য় স্বীকৃত তত্ত্বের শ্রেণীবিভাগ

২.১.১ তত্ত্বের প্রকার সংখ্যা ও নাম

২.১.২ দ্বিতীয় কারিকায় বর্ণিত তত্ত্বের শ্রেণীবিভাগ

২.১.৩ তৃতীয় কারিকায় বর্ণিত তত্ত্বের শ্রেণীবিভাগ

২.১.৪ দ্বাবিংশতি কারিকায় বর্ণিত তত্ত্বের শ্রেণীবিভাগ

২.১.৫ তত্ত্বের ত্রিবিধ শ্রেণীবিভাগের মধ্যে সঙ্গতি

২.২ বিবিধ শ্রেণীর তত্ত্বের লক্ষণ

২.২.১ ব্যক্ত (প্রকৃতি-বিকৃতি ও বিকার)-এর লক্ষণ

২.২.২ অব্যক্ত তথা মূলপ্রকৃতি বা প্রধান-এর লক্ষণ

২.২.৩ প্রকৃতি-র লক্ষণ

২.২.৪ জ্ঞ বা পুরুষ (ন প্রকৃতি ন বিকৃতি)-এর লক্ষণ

২.৩ গুণত্রয়

২.৩.১ গুণত্রয়ের স্বরূপ

২.৩.২ গুণত্রয়ের প্রয়োজন

২.৩.৩. গুণত্রয়ের কার্য

২.৪ সারসংক্ষেপ

২.৫ প্রধান শব্দগুচ্ছ

২.৬ নমুনা প্রশ্নাবলী

২.৭ গ্রন্থপঞ্জী

২.১ *সাংখ্যকারিকা*-য় স্বীকৃত তত্ত্বের শ্রেণীবিভাগ

২.১.১ তত্ত্বের প্রকার সংখ্যা ও নাম

সাংখ্য দর্শনে দুই প্রকার মূল তত্ত্ব স্বীকৃত, যথা—প্রকৃতি ও পুরুষ। প্রকৃতি ও পুরুষ-এর সংযোগের ফলে সাক্ষাৎ ও পরম্পরাক্রমে উৎপন্ন হয় মোট তেইশ প্রকার তত্ত্ব। ফলে সাংখ্য দর্শনে সর্বমোট পাঁচিশ প্রকার তত্ত্ব স্বীকৃত। এই তত্ত্বগুলি পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব নামে দার্শনিক জগতে সুবিদিত। এই তত্ত্বগুলি হল —

১. জ্ঞ বা পুরুষ	
২. অব্যক্ত বা মূলপ্রকৃতি বা প্রধান	
৩. মহৎ বা বুদ্ধি	
৪. অহঙ্কার	
৫. মনস্	
৬. চক্ষু	
৭. কর্ণ	
৮. নাসিকা	পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়
৯. জিহ্বা	
১০. ত্বক্	
১১. বাক্	
১২. পাণি	
১৩. পাদ	পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়
১৪. পায়ু	
১৫. উপস্থ	
১৬. শব্দ	
১৭. স্পর্শ	
১৮. রূপ	পঞ্চতন্মাত্র বা পঞ্চসূক্ষ্মভূত
১৯. রস	
২০. গন্ধ	
২১. আকাশ বা ব্যোম	
২২. মরুৎ বা বায়ু	
২৩. তেজ বা অগ্নি	পঞ্চমহাভূত বা পঞ্চস্থূলভূত
২৪. অপ্ বা জল	
২৫. ক্ষিতি বা পৃথিবী	

সংক্ষেপে এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব হলঃ পুরুষ, মূলপ্রকৃতি বা প্রধান , মহৎ বা বুদ্ধি, অহঙ্কার.,মনস, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র এবং পঞ্চমহাভূত

২.১.২ দ্বাবিংশতি কারিকায় বর্ণিত তত্ত্বের শ্রেণীবিভাগ

দ্বাবিংশতি কারিকায় প্রকৃতি ও পুরুষ-এর সংযোগের ফলে মূলপ্রকৃতি থেকে সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরা-ক্রমে সৃষ্ট ব্যক্ত শ্রেণীর অর্ন্তগত তেইশ প্রকার তত্ত্বের উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলি হল— মহৎ বা বুদ্ধি, অহঙ্কার, মানস্, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রি, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র এবং পঞ্চমহাভূত। এই তেইশ প্রকার তত্ত্ব ও তাদের মূল কারণ প্রকৃতি (মূলপ্রকৃতি) মিলে মোট চব্বিশ প্রকার তত্ত্বের উল্লেখ এই কারিকায় পাওয়া যায়।

২.১.৩ তৃতীয় কারিকায় বর্ণিত তত্ত্বের শ্রেণীবিভাগ

তৃতীয় কারিকায় বলা হয়েছে, সাংখ্যশাস্ত্রের বিষয় বা তত্ত্ব সংক্ষেপে চার প্রকার। যথা—কোন তত্ত্ব **(১) কেবল প্রকৃতি বা কেবল কারণ**, কোন কোন তত্ত্ব **(২) কেবল বিকৃতি বা কেবল কার্য**, কোন কোন তত্ত্ব **(৪) প্রকৃতি ও বিকৃতি উভয়ই** এবং কোন তত্ত্ব **(৪) প্রকৃতিও নয় বিকৃতিও নয়।** যেমন—

(১) **মূল প্রকৃতি ঃ** যে তত্ত্ব কোন তত্ত্বের বিকার বা কার্য নয়, কেবল প্রকৃতি তথা কেবল কারণ। ব্যক্ত শ্রেণীর অর্ন্তগত তেইশ প্রকার তত্ত্বের মূল কারণ মূলপ্রকৃতি।

(২) **প্রকৃতি-বিকৃতি ঃ** যে তত্ত্ব কোন তত্ত্বের কারণ রূপে প্রকৃতি এবং অন্য কোন তত্ত্বের কার্য রূপে বিকৃতি। মহৎ আদিতে যাদের এমন সাতটি তত্ত্ব (যথা—মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র কোন তত্ত্বের) কারণ এবং (অন্য কোন তত্ত্বের) কার্য। যেমন —

- মহৎ অহঙ্কার-এর কারণ রূপে প্রকৃতি এবং মূলপ্রকৃতি-র কার্য রূপে বিকৃতি,
- অহঙ্কার মন, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র-এর কারণ রূপে প্রকৃতি এবং মহৎ-এর কার্য রূপে বিকৃতি এবং
- পঞ্চতন্মাত্র পঞ্চমহাভূত-এর কারণ রূপে প্রকৃতি এবং অহঙ্কার-এর কার্য রূপে বিকৃতি।

(৩) **বিকার ঃ** যে তত্ত্ব কোন তত্ত্বের কারণ নয়, কিন্তু অন্য কোন তত্ত্বের কার্য রূপে বিকৃতি। ষোলটি তত্ত্ব কেবলমাত্র কার্য, যেমন —

- মন, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকার্মেন্দ্রিয় অহঙ্কার-এর কার্য রূপে বিকৃতি এবং
- পঞ্চমহাভূত পঞ্চতন্মাত্র-এর কার্য রূপে বিকৃতি।

(৪) **'ন প্রকৃতি ন বিকৃতি'** তথা **পুরুষ ঃ** যে তত্ত্ব কোন তত্ত্বের কারণ বা প্রকৃতিও নয় এবং অন্য কোন তত্ত্বের কার্য বা বিকৃতিও নয়। যেমন—পুরুষ কোন তত্ত্বের কারণও নয় এবং অন্য কোন তত্ত্বের কার্যও নয়।

২.১.৪ দ্বিতীয় কারিকায় বর্ণিত তত্ত্বের শ্রেণীবিভাগ

দ্বিতীয় কারিকায় সাংখ্যশাস্ত্রে স্বীকৃত তত্ত্বগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে, যথা—ব্যক্ত, অব্যক্ত ও জ্ঞ। দ্বাবিংশতি কারিকায় প্রকৃতি ও পুরুষ-এর সংযোগের ফলে মূলপ্রকৃতি থেকে সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরা-ক্রমে সৃষ্ট যে তেইশ প্রকার তত্ত্বের উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন — মহৎ বা বুদ্ধি, অহঙ্কার, মনস্, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র এবং পঞ্চমহাভূত, সেগুলি ব্যক্ত শ্রেণীর অর্ন্তগত। অব্যক্ত এই ব্যক্ত তত্ত্বগুলির মূল-কারণ এবং জ্ঞ (বা পুরুষ) অব্যক্ত ও ব্যক্ত তত্ত্বগুলির বিপরীত।

২.১.৫ তত্ত্বের ত্রিবিধ শ্রেণীবিভাগের মধ্যে সঙ্গতি

আপাত দৃষ্টিতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় কারিকায় বর্ণিত তত্ত্বের দুই প্রকার শ্রেণীবিভাগের মধ্যে কোন সঙ্গতি নেই বলে মনে হলেও বস্তুত এই দুই প্রকার শ্রেণীবিভাগের মধ্যে কোন বিরোধ নেই, বরং এরা পরস্পরের পরিপূরক। তৃতীয়

কারিকায় বর্ণিত মূলপ্রকৃতি শ্রেণীটি দ্বিতীয় কারিকায় বর্ণিত অব্যক্ত শ্রেণীর নামান্তর এবং তৃতীয় কারিকায় বর্ণিত 'ন প্রকৃতি ন বিকৃতি' তথা পুরুষ শ্রেণীটি দ্বিতীয় কারিকায় বর্ণিত জ্ঞ শ্রেণীর নামান্তর। তাছাড়া তৃতীয় কারিকায় বর্ণিত প্রকৃতি-বিকৃতি শ্রেণী এবং বিকার শ্রেণী দ্বিতীয় কারিকায় বর্ণিত ব্যক্ত শ্রেণীর অর্ন্তগত। দ্বাবিংশতি ক . (প্রকৃতি ও পুরুষ-এর সংযোগের ফলে সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরা-ক্রমে) প্রকৃতি-সৃষ্ট যে তেইশ প্রকার তত্ত্বের উল্লে করা হয়েছে, সেগুলি দ্বিতীয় কারিকায় বর্ণিত ব্যক্ত শ্রেণীর অর্ন্তগত এবং তৃতীয় কারিকায় বর্ণিত প্রকৃতি-বিকৃতি ও বিকার শ্রেণীদ্বয়ের অর্ন্তগত। এছাড়া 'প্রকৃতি থেকে মহৎ উৎপন্ন হয়' বলতে দ্বাবিংশতি কারিকায় প্রকৃতি শব্দে দ্বিতীয় কারিকায় বর্ণিত অব্যক্ত শ্রেণী এবং তৃতীয় কারিকায় বর্ণিত মূলপ্রকৃতি শ্রেণীকেই নির্দেশ করা হয়েছে। সুতরাং, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও দ্বাবিংশতি কারিকায় বর্ণিত শ্রেণীবিভাগের মধ্যে কোন বিরোধ নেই, এরা পরস্পরের পরিপূরক। প্রকৃতি ও পুরুষ-এর সংযোগে মূলপ্রকৃতি থেকে সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরা-ক্রমে সৃষ্ট তত্ত্বসমূহের সৃষ্টিক্রমটি নিম্নরূপ ঃ-

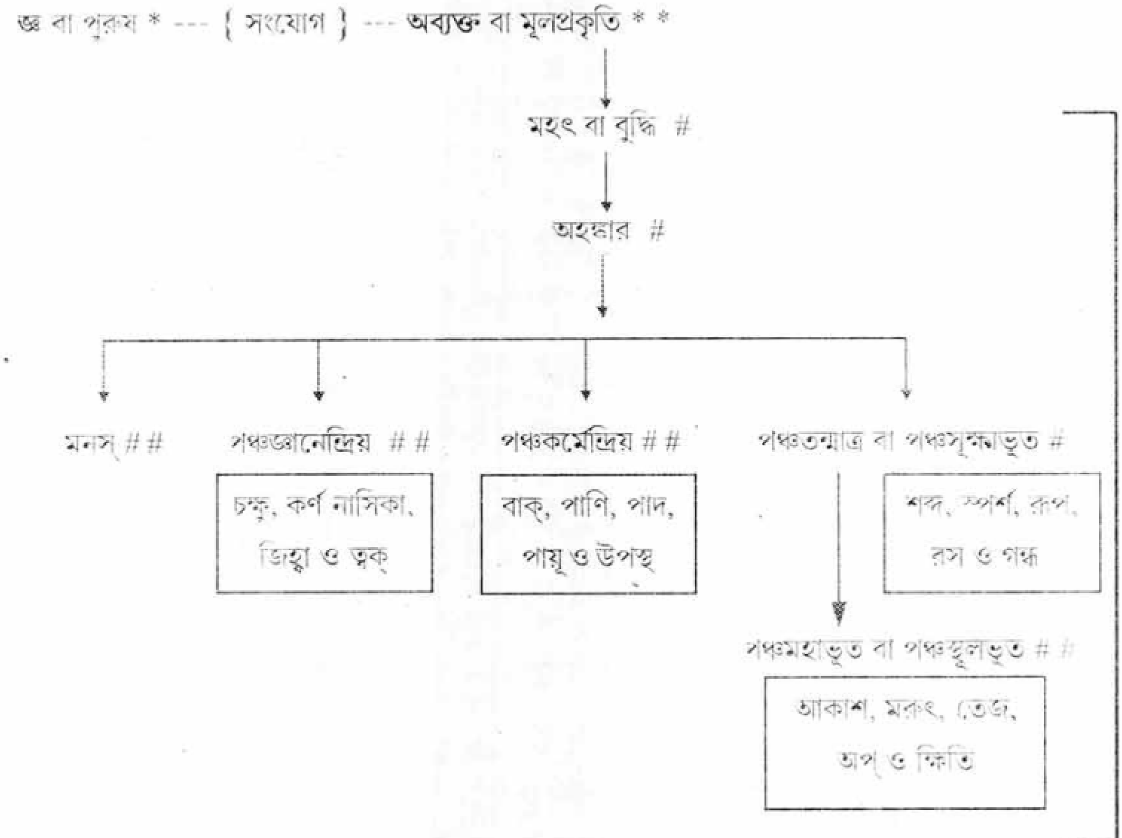

লক্ষ্যণীয় ঃ-

* চিহ্নিত তত্ত্বটি হল 'ন প্রকৃতি ন বিকৃতি'

* * চিহ্নিত তত্ত্বটি হল অবিকৃতি

\# চিহ্নিত তত্ত্বগুলি হল প্রকৃতি-বিকৃতি

\# # চিহ্নিত তত্ত্বগুলি হল বিকার

২.২ বিবিধ শ্রেণীর তত্ত্বের লক্ষণ

২.২.১ ব্যক্ত (প্রকৃতি-বিকৃতি ও বিকার)-এর লক্ষণ

※ **দশম কারিকায় বর্ণিত ব্যক্ত-এর লক্ষণ**

দশম কারিকায় ব্যক্ত-এর লক্ষণ বলে অব্যক্ত-কে তার বিপরীত বলা হয়েছে। ঐ কারিকায় বর্ণিত ব্যক্ত-এর লক্ষণ হল :

"হেতুমদনিত্যমব্যাপি সক্রিয়মনেকমাশ্রিতং লিঙ্গম্ সাবয়বং পরতন্ত্রম্"

অর্থাৎ, ব্যক্ত হল হেতুমৎ, অনিত্য, অব্যাপি, সক্রিয়, অনেক, আশ্রিত, লিঙ্গ, সাবয়ব এবং পরতন্ত্র। কারিকাস্থ লক্ষণপদগুলির অর্থ :

- **হেতুমৎ** (কারণযুক্ত) — ব্যক্ত তত্ত্বগুলি হেতুযুক্ত। হেতু শব্দের অর্থ কারণ, (ব্যক্ত) তদ্‌বিশিষ্ট (অর্থাৎ কারণবিশিষ্ট)।
- **অনিত্য** — যা অনিত্য বা বিনাশী, তার তিরোভাব বা সকারণে লয় হয়।
- **অব্যাপি** (কারণের একাংশে স্থিত) — যা অব্যাপী তার সত্তা সকল পরিণামীব্যাপী থাকে না। কারণের দ্বারাই কার্য ব্যাপ্ত হয়, কার্যের দ্বারা কারণ ব্যাপ্ত হয় না। বুদ্ধি-আদি তত্ত্ব প্রধানকে ব্যাপ্ত করে না। অতএব এরা অব্যাপক।
- **সক্রিয়** (চলনক্রিয়াযুক্ত) — সক্রিয় শব্দের অর্থ পরিস্পন্দন-যুক্ত বা চলনক্রিয়া-যুক্ত। যেমন, বুদ্ধি আদি সূক্ষ্ম শরীর এক একটি উপাত্ত দেহ স্থূল শরীর ত্যাগ করে অন্য স্থূল শরীর গ্রহণ করে— এটাই তাদের পরিস্পন্দন। স্থূল শরীর এবং পৃথিবী আদি স্থূলভূতে পরিস্পন্দন প্রসিদ্ধ, তথা সর্বজন স্বীকৃত।
- **অনেক** — বুদ্ধি-আদি সূক্ষ্ম শরীর প্রতি পুরুষভেদে ভিন্ন ভিন্ন বলে অনেক। পৃথিবী-আদি মহাভূতগুলি শরীর ও ঘটাদি ভেদে অনেক।
- **আশ্রিত** — আশ্রিত শব্দের অর্থ নিজ কারণে অবস্থিত, যেমন বুদ্ধ্যাদি কার্য। কার্য ও কারণ স্বরূপত অভিন্ন হলেও কোনরূপ ভেদ স্বীকার করে সেই ভেদকে আধার-আধেয় ভাব বলা হয়। যেমন, বলা হয় যে, এই বনে তিলক আছে।
- **লিঙ্গ** (লয়শীল ও অনুমাপক) — লিঙ্গ শব্দে লয়শীল ও প্রধানের অনুমাপক বুঝানো হয়েছে।
- **সাবয়ব** (অবয়বযুক্ত) — সাবয়ব শব্দান্তর্গত অবয়ব শব্দে মিথুন, (পরস্পরের) সংশ্লেষ, মিশ্রন বা সংযোগ বোঝায়। অপ্রাপ্তিপূর্বিকা প্রাপ্তিকে, অর্থাৎ যার প্রাপ্তি বা মিশ্রন পূর্বে ছিল না, এরূপ প্রাপ্তিকে সংযোগ বা অবয়ব বলে। তার সঙ্গে বর্তমান, অর্থাৎ সংযোগ বা অবয়বের সঙ্গে বিদ্যমান, থাকাকে সাবয়ব বলে। পৃথিবী-আদি স্থূল তত্ত্বগুলি যেমন পরস্পর সংযুক্ত হয়, ইন্দ্রিয়-আদি সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলিও তেমনই পরস্পর সংযুক্ত হয়।
- **পরতন্ত্র** (পরাধীন) — বুদ্ধ্যাদি পরতন্ত্র বা পরের অধীন। বুদ্ধি নিজ কার্য অহঙ্কারকে উৎপাদন করবার জন্য প্রকৃতির আপূরণ, অর্থাৎ অংশসক্রম-রূপ সাহায্য অপেক্ষা করে; অন্যথায় নিজে ক্ষীণ হওয়ায় অহঙ্কার উৎপাদন করতে সমর্থ হয় না—এটাই নিয়ম। এই ভাবে অহঙ্কারাদিও নিজ নিজ কার্য তন্মাত্রাদি উৎপাদনে প্রকৃতির অপূরণ করে। ব্যক্ত তত্ত্বগুলি নিজ নিজ কার্য উৎপাদনে প্রকৃতির আপূরণ অপেক্ষা করে। অর্থাৎ ব্যক্ত তত্ত্বগুলি নিজ নিজ কার্যের প্রতি কারণ হলেও নিজ নিজ কার্য উৎপাদনে মূলপ্রকৃতির অপেক্ষা করে বলে পরতন্ত্র।

※ একাদশ কারিকায় বর্ণিত ব্যক্ত-এর লক্ষণ

একাদশ কারিকায় ব্যক্ত ও অব্যক্ত-এর সাধারণ লক্ষণ বলে পুরুষকে তার বিপরীত বলা হয়েছে। ঐ কারিকায় বর্ণিত ব্যক্ত-এর লক্ষণ হল :

"ত্রিগুণমবিবেকি বিষয়ঃ সামান্যমচেতনং প্রসবধর্মি"

অর্থাৎ, ব্যক্ত তত্ত্ব মাত্রই সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণাত্মক (হওয়ায়) ত্রিগুণ থেকে অভিন্ন, অনেক পুরুষের জ্ঞানে গৃহীত হবার যোগ্য (অর্থাৎ ভোগ্য বা বিষয়), অচেতন ও পরিণামস্বভাব।

কারিকাস্থ লক্ষণগুলির অর্থ :

- **ত্রিগুণম্** — সুখ, দুঃখ ও মোহ — এই তিনটি গুণ যার আছে তাই ত্রিগুণ। ত্রিগুণম্ শব্দের প্রয়োগের দ্বারা সুখাদি আত্মার গুণ—এই বিরুদ্ধবাদী নৈয়ায়িক মত খণ্ডিত হল।
- **অবিবেকী** — অবিবেকী মানে গুণত্রয় থেকে অভিন্ন। প্রধান যেমন নিজের থেকে ভিন্ন হয় না, মহাদাদিও তেমন প্রধান থেকে ভিন্ন হয়না, যেহেতু এরা প্রধান স্বরূপ। অথবা অবিবেকী মানে সম্ভূয়কারিত্ব, অর্থাৎ মিলিত হয়ে কার্য উৎপাদন করা। কোন বস্তু নিজ কার্য উৎপাদনে একা পর্যাপ্ত নয়, অপরের সঙ্গে মিলিত হয়ে সে কার্য উৎপাদনে সমর্থ হয়। কারণ একটিমাত্র বস্তু থেকে কোন কার্যের কোন প্রকার উৎপত্তি সম্ভব হয় না।
- **বিষয়** — বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদী যে সমস্ত দার্শনিক বলেন বিজ্ঞানই বা চেতনাই সুখ, দুঃখ ও মোহ-রূপ শব্দাদি আকার প্রাপ্ত হয়, বিজ্ঞানের অতিরিক্ত ঐরূপ, অর্থাৎ সুখ-দুঃখাদিরূপ কোন পৃথক ধর্ম নেই, তাঁদের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিষয় পদটি ব্যবহার করা হয়েছে। বিষয় শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিজ্ঞান থেকে ভিন্ন তথা জ্ঞেয়।
- **সামান্য** — জ্ঞেয় বিষয় সামান্য বা সাধারণ, অর্থাৎ ঘটাদির মত অনেক পুরুষের দ্বারা গৃহীত হবার যোগ্য। শব্দাদি বিষয় বিজ্ঞানাকার বললে কিন্তু চিত্তবৃত্তিরূপ বিজ্ঞানগুলি অসাধারণ হওয়ায় শব্দাদিও অসাধারণ হবে। যেমন, পরের জ্ঞান প্রত্যক্ষ হয় না বলে একের বিজ্ঞান অপরের গ্রাহ্য হতে পারে না। এভাবে বিজ্ঞানের অতিরিক্ত বিষয় স্বীকার করলে এক নর্তকীর একটি ভ্রূভঙ্গিতে অনেক পুরুষের প্রতি সন্ধান বা কটাক্ষপাত যুক্তিযুক্ত হয়, অন্যথায় তা হত না।
- **অচেতন** — অচেতন শব্দের প্রয়োগের দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে যে প্রধান বুদ্ধি ইত্যাদি সকল তত্ত্ব অচেতন। বৈনাশিকরা অর্থাৎ বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ সম্প্রদায় যেমন বলেন চৈতন্য বুদ্ধির ধর্ম নয়।
- **প্রসবধর্মী** — প্রসবধর্ম বা পরিণাম ধর্ম যার আছে তা প্রসবধর্মী। প্রবাসধর্ম ব্যক্ত ও অব্যক্তে সর্বদা আছে। স্বরূপ ও বিরূপ পরিণাম থেকে ব্যক্ত ও অব্যক্ত কখনও বিযুক্ত হয় না—এটাই ভাবার্থ।

২.২.২ অব্যক্ত (মূলপ্রকৃতি বা প্রধান)-এর লক্ষণ

※ দশম কারিকায় বর্ণিত ব্যক্ত-এর লক্ষণ

দশম কারিকায় ব্যক্ত-এর লক্ষণ বলে অব্যক্ত-কে তার বিপরীত বলা হয়েছে। ঐ কারিকায় বর্ণিত অব্যক্ত-এর লক্ষণ হল :

"হেতুমদনিত্যমব্যাপি সক্রিয়মনেকমাশ্রিতং লিঙ্গম্।
সাবয়বং পরতন্ত্রমং ব্যক্তং বিপরীতমব্যক্তম্।।"

অর্থাৎ, ব্যক্ত হল হেতুমৎ, অনিত্য, অব্যাপি, সক্রিয়, অনেক, আশ্রিত, লিঙ্গ, সাবয়ব এবং পরতন্ত্র। তার বিপরীত হল

অব্যক্ত। তাই অব্যক্ত হল অহেতুমৎ, নিত্য, ব্যাপি, অসক্রিয়, এক, অনাশ্রিত, অলিঙ্গ, নিরবয়ব এবং স্বতন্ত্র। সুতরাং, হেতুমৎ, অনিত্য, অব্যাপি, সক্রিয়, অনেক, আশ্রিত, লিঙ্গ, সাবয়ব এবং পরতন্ত্র — এই পদগুলির পূর্ববর্ণিত অর্থের বিপরীত অর্থ অব্যক্ত-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

❋ একাদশ কারিকায় বর্ণিত অব্যক্ত-এর লক্ষণ

একাদশ কারিকায় ব্যক্ত ও অব্যক্ত-এর সাধারণ লক্ষণ বলে পুরুষকে তার বিপরীত বলা হয়েছে। এই কারিকায় ব্যক্তের ধর্ম অব্যক্তে অতিদেশ করে (অর্থাৎ প্রযোজ্য বলে) বলা হয়েছে প্রধান ব্যক্তের মত। অর্থাৎ ব্যক্ত যেমন, অব্যক্ত তেমনই। সুতরাং, এই কারিকায় বর্ণিত অব্যক্ত-এর লক্ষণও হল :

"ত্রিগুণমবিবেকি বিষয়ঃ সামান্যমচেতনং প্রসবধর্ম্মি।"

অর্থাৎ, ত্রিগুণ, অবিবেকি, বিষয়, সামান্য, অচেতন ও প্রসবধর্ম্মি — এই পদগুলির পূর্ববর্ণিত অর্থ অব্যক্ত-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সুতরাং, অব্যক্ত তত্ত্ব মাত্রই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মক হওয়ায় ত্রিগুণ থেকে অভিন্ন, অনেক পুরুষের জ্ঞানে গৃহীত হবার যোগ্য, অর্থাৎ ভোগ্য বা বিষয়, অচেতন ও পরিণামস্বভাব।

২.২.৩ প্রকৃতি লক্ষণ

সাধারণত বলা হয়, প্রকৃতির লক্ষণ হল "সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা"। কিন্তু, মনে রাখতে হবে যে প্রকৃতির দুটি অবস্থা—ব্যক্ত বা কার্যাবস্থা এবং অব্যক্ত বা অকার্যাবস্থা। প্রকৃতির অকার্যাবস্থাকে বলে মূলপ্রকৃতি বা প্রধান। মূলপ্রকৃতি বা প্রধানের লক্ষণ হল "সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা"। স্বভাবত এটিকে প্রকৃতির লক্ষণ বললে লক্ষণটি অব্যাপ্তি দোষদুষ্ট হবে। কারণ এই লক্ষণটি প্রকৃতির ব্যক্ত ও অব্যক্ত অবস্থা-দুটির মধ্যে কেবলমাত্র অব্যক্ত অবস্থাকে নির্দেশ করে, ব্যক্ত অবস্থাকে নির্দেশ করে না। তৃতীয় কারিকায় ব্যাখ্যায় মূলপ্রকৃতি শব্দের অর্থ নিরূপন প্রসঙ্গে বাচস্পতি বলেছেন,

"মূলপ্রকৃতিরবিকৃতিঃ" ইতি। প্রকরোতীতি প্রকৃতিঃ প্রধানম্ সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা। সা অবিকৃতিঃ, প্রকৃতিরেবেত্যর্থঃ।

স্পষ্টত দেখা যাচ্ছে, বাচস্পতি বলেছেন, যিনি প্রকৃষ্টরূপে কার্য উৎপাদন করেন, তিনিই প্রকৃতি (প্রকরোতীতি প্রকৃতিঃ), প্রধান হলেন সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের সাম্যাবস্থা (প্রধানম্ সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা)। বলাবাহুল্য, প্রধানই মূলপ্রকৃতি বা অব্যক্ত। স্বভাবত "সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা" মূলপ্রকৃতির লক্ষণ, প্রকৃতির লক্ষণ নয়।

একাদশ কারিকায় যেহেতু প্রকৃতির ব্যক্ত বা কার্যাবস্থা এবং অব্যক্ত বা অকার্যাবস্থার সাধর্ম্য তথা সাধারণ ধর্ম বর্ণিত হয়েছে, সেহেতু একাদশ কারিকায় বর্ণিত ব্যক্ত এবং অব্যক্ত-এর সাধর্ম্যকে প্রকৃতির লক্ষণ বলতে হবে। তবে "সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা"কে প্রকৃতির উপলক্ষণ বলা যায়। একাদশ কারিকায় বর্ণিত প্রকৃতির ব্যক্ত ও অব্যক্ত অবস্থা-দুটির সাধর্ম্যযুক্ত লক্ষণটি হল প্রকৃতি "ত্রিগুণমবিবেকি বিষয়ঃ সামান্যমচেতনং প্রসবধর্ম্মি"। অর্থাৎ প্রকৃতি হল ত্রিগুণ, অবিবেকী, বিষয়, সামান্য, অচেতন এবং প্রসবধর্মী। ত্রিগুণ, অবিবেকি, বিষয়, সামান্য, অচেতন ও প্রসবধর্ম্মি—এই পদগুলির পূর্ববর্ণিত অর্থ প্রকৃতির লক্ষণ-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

তবে তৃতীয় কারিকার ব্যাখ্যায় বাচস্পতি গৌণ অর্থে প্রকৃতিকে তত্ত্বান্তরের উপাদান বলেছেন, এই অর্থে মহৎ আদিতে যাদের এমন সাতটি তত্ত্ব (যথা—মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র)-ও প্রকৃতি।

২.২.৪ জ্ঞ বা পুরুষ (ন প্রকৃতি ন বিকৃতি)-এর লক্ষণ

একাদশ কারিকায় প্রকৃতির ব্যক্ত ও অব্যক্ত অবস্থা-দুটির সাধর্ম্যযুক্ত লক্ষণ বর্ণনা করে বলা হয়েছে, পুমান্ তথা পুরুষ এর বিপরীত। কারিকাটি নিম্নরূপ :

ত্রিগুণমবিবেকি বিষয়ঃ সামান্যমচেতনং প্রসবধর্ম্মি।
ব্যক্তং তথা প্রধানং তদ্বিপরীতস্তথা চ পুমান্।।

অর্থাৎ, ব্যক্ত তত্ত্ব মাত্রই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মক (হওয়ায়) ত্রিগুণ থেকে অভিন্ন, অনেক পুরুষের জ্ঞানে গৃহীত হবার যোগ্য (অর্থাৎ ভোগ্য বা বিষয়), অচেতন ও পরিণামস্বভাব। অব্যক্ত বা প্রকৃতিও সেইরূপ। কিন্তু জ্ঞ বা পুরুষ সেইরূপ হওয়া সত্ত্বেও (ব্যক্ত ও অব্যক্ত তত্ত্ব মাত্রের) বিপরীত।

সুতরাং, প্রকৃতির ব্যক্ত ও অব্যক্ত অবস্থা-দুটির সাধর্ম্যযুক্ত লক্ষণটি হল "ত্রিগুণমবিবেকী বিষয়ঃ সামান্যমচেতনং প্রসবধর্ম্মি"। অর্থাৎ প্রকৃতি হল ত্রিগুণ, অবিবেকী, বিষয়, সামান্য, অচেতন এবং প্রসবধর্মী। পুরুষ সেইরূপ হওয়া সত্ত্বেও, অর্থাৎ অব্যক্তের মত অহেতুমৎ, নিত্য, ব্যাপি, পরিস্পন্দন-হীন, অনাশ্রিত, অলিঙ্গ, নিরবয়ব এবং স্বতন্ত্র হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্ত ও অব্যক্ত তত্ত্ব মাত্রের সাধর্ম্যের বিপরীত লক্ষণযুক্ত, অর্থাৎ পুরুষ হল অ-ত্রিগুণ, বিবেকী, অ-বিষয়, অ-সামান্য, চেতন, অ-প্রসবধর্মী। এছাড়া উনবিংশ কারিকায় বলা হয়েছে যে ব্যক্তাব্যক্তের বিপরীত বলে পুরুষের সাক্ষিত্ব, কৈবল্য, মাধ্যস্থ, দ্রষ্টৃত্ব এবং অকর্তৃভাব ইত্যাদি লক্ষণও সিদ্ধ হয়।

অত্রিগুণত্ব, বিবেকীত্ব, অবিষয়ত্ব, অসাধারণত্ব, চেতনত্ব এবং অপ্রসবধর্মীত্ব এই ধর্মগুলির মধ্যে চেতনত্ব এবং অবিষয়ত্বের দ্বারা পুরুষে সাক্ষীত্ব এবং দ্রষ্টৃত্ব সিদ্ধ হয়। কারণ চেতনই দ্রষ্টা হয়, অচেতন দ্রষ্টা হয় না। যাকে বিষয় দর্শন করানো হয়, সেই সাক্ষী হয়; যার উদ্দেশ্যে প্রকৃতি শব্দাদি বিষয় প্রদর্শন করায় সেই সাক্ষী। যেমন লোকে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের বিবাদের বিষয় সাক্ষীকে দেখায়, অর্থাৎ সাক্ষীর নিকট উপস্থাপন করে, সেভাবেই প্রকৃতিও নিজের সৃষ্ট বিষয় শব্দাদি পুরুষকে দেখায়। তাই পুরুষ সাক্ষী। অচেতন কিংবা বিষয়কে বিষয় প্রদর্শন করা যায় না। চেতনত্ব ও অবিষয়ত্ব থাকায় পুরুষ সাক্ষী হয়। অতএব পুরুষ দ্রষ্টাও হয়।

অত্রৈগুণ্যের জন্য পুরুষের কৈবল্য সিদ্ধ হয়। দুঃখত্রয়ের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক অভাবই কৈবল্য। এই কৈবল্য পুরুষের স্বাভাবিক ধর্ম। অত্রৈগুণ্য বা সুখদুঃখমোহ-রহিত্যের ফলে কৈবল্য পুরুষের অনায়াস সিদ্ধ।

অতএব অত্রৈগুণ্য থাকায় পুরুষ মধ্যস্থ অর্থাৎ নিরপেক্ষ। কারণ সুখী ব্যক্তি সুখের দ্বারা তৃপ্তি লাভ করে বলে এবং দুঃখী ব্যক্তি দুঃখের প্রতি দ্বেষ করে বলে মধ্যস্থ হতে পারে না। এই উভয় রহিত, অর্থাৎ সুখদুঃখরহিত যে, তাকেই মধ্যস্থ বা উদাসীন বলা হয়।

বিবেকীত্ব এবং অপ্রসাধর্মীত্ব থেকে পুরুষ যে অকর্তা—এটা সিদ্ধ হয়। যাই হোক, প্রমাণের দ্বারা কর্তব্য বিষয় জেনে চেতন আমি এটা করতে চাই বলে করেছি—এভাবে প্রযত্ন ও চেতনার একত্র অবস্থান সবাই অনুভব করে বলে মনে হয়, কিন্তু সাংখ্যমতে তা সম্ভব হয় না। কারণ চেতন পুরুষ কর্তা নয় এবং কর্তা বুদ্ধিও চেতন নয়। বিংশতি কারিকায় তাই যথার্থই বলা হয়েছে,

তস্মাত্তৎসংযোগদচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গম্।
গুণকর্তৃত্বে চ তথা কর্তেব ভবত্যুদাসীনঃ।।

অর্থাৎ, সেইহেতু, পুরুষের সংযোগবশতঃ অচেতন মহদাদি চেতনার মত মনে হয় এবং ত্রিগুণের কর্তৃত্ববশতঃ উদাসীন পুরুষ কর্তার মত প্রতিভাত হন।

২.৩ গুণত্রয়

ব্যক্ত ও অব্যক্তকে ত্রিগুণ বলা হয়েছে। এই গুণ তিনটি কী কী? এদের লক্ষণই বা কী? এর উত্তরে ঈশ্বরকৃষ্ণ বলেছেন —

প্রীত্যপ্রীতিবিষাদাত্মকাঃ প্রকাশপ্রবৃত্তিনিয়মার্থাঃ।
অন্যোঽন্যাভিভবাশ্রয়জননমিথুনবৃত্তয়শ্চ গুণাঃ।। ১২।।

অর্থাৎ, সত্ত্ব, রজঃ ও তমো — এই গুণগুলি সুখ, দুঃখ ও মোহ-স্বরূপ। প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও নিয়ম তাদের অর্থ বা প্রয়োজন। পরস্পরকে অভিভূত করা, পরস্পরকে অশ্রয় করা, পরস্পরের সাহায্যে বৃত্তির জনক হওয়া এবং পরস্পরের নিত্যসঙ্গী হাওয়া তাদের বৃত্তি।

আবার কোন্ গুণ কীরূপ? কেনই বা এরূপ হয়? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে ঈশ্বরকৃষ্ণ বলেছেন -

সত্ত্বং লঘু প্রকাশকমিষ্টমুপষ্টম্ভকং চলঞ্চ রজঃ।
গুরুবরণকমেব তমঃ প্রদীপবচ্চার্থতো বৃত্তিঃ।।১৩।।

অর্থাৎ, সত্ত্বগুণ লঘু, প্রকাশক ও ইষ্ট, রজোগুণ চালক, আরম্ভক ও চঞ্চল, এবং তমোগুণ ভারী ও আবরক। প্রয়োজন বা কার্য-সিদ্ধির জন্য প্রদীপের মত তাদের বৃত্তি বা কার্য হয়।

এই দুটি কারিকায় প্রাপ্ত ঈশ্বরকৃষ্ণের বক্তব্য থেকে গুণত্রয়ের স্বরূপ, প্রয়োজন ও কার্য সম্বন্ধে জানা যায়।

২.৩.১ গুণত্রয়ের স্বরূপ

গুণ মানে পরার্থ; অর্থাৎ যা অপরের অর্থ বা প্রয়োজন সাধন করে। "সত্ত্ব গুণ লঘু ও প্রকাশক"— ইত্যাদি বাক্যে সত্ত্বাদি গুণগুলিকে পর্যায়ক্রমে নির্দেশ করা হয়েছে। অনেকের সঙ্গে একের সম্বন্ধ স্থির করে, প্রীতি-আদি গুণত্রয়ের সম্বন্ধ যথা-সংখ্যা-ক্রমে বুঝতে হবে, অর্থাৎ প্রীতির সঙ্গে সত্ত্বের, অপ্রীতির সঙ্গে রজঃ-এর এবং বিষাদের সঙ্গে তমঃ-এর সম্বন্ধ বুঝতে হবে। বলা হয়েছে যে প্রীতি মানে সুখ এবং সত্ত্বগুণ প্রীতিস্বভাব। অপ্রীতি মানে দুঃখ এবং রজোগুণ অপ্রীতিস্বভাব। বিষাদ মানে মোহ এবং তমোগুণ মোহস্বভাব।

যে সমস্ত বৌদ্ধ দার্শনিক মনে করেন যে প্রীতি বা সুখ দুঃখের অভাব ছাড়া কিছু নয় এবং দুঃখও সুখের অভাব ছাড়া কিছু নয়, তাঁদের প্রতি লক্ষ্য রেখে কারিকায় আত্ম (বা স্বভাব) শব্দটি গ্রহণ করা হয়েছে। সুখ-দুঃখাদি পরস্পরের অভাব নয়, বরং এরা ভাবরূপ। কারণ আত্ম শব্দ ভাববাচক। প্রীতি আত্মা বা স্বভাব যাদের, তাদের প্রীত্যাত্মক বা সুখস্বরূপ বলে। এভাবে অন্যগুলিও অর্থাৎ অপ্রীত্যাত্মক এবং বিষাদাত্মক-এর ব্যাখ্যা করতে হবে। অর্থাৎ অপ্রীতি আত্মা বা স্বভাব যাদের, তাদের অপ্রীত্যাত্মক বা দুঃখ স্বরূপ বলে এবং বিষাদ আত্মা বা স্বভাব যাদের, তাদের বিষাদাত্মক বা বিষাদস্বরূপ বলে। সুখাদির ভাবরূপতা সকলের অনুভবসিদ্ধ। পরস্পর অভাব-স্বরূপ হলে অর্থাৎ একটি অপরটির অভাব-স্বরূপ হলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয়, ফলে একটির অভাব হলে অন্যটিরও অভাব হবে।

সত্ত্বগুণ লঘু, প্রকাশক ও ইষ্ট, রজোগুণ চালক, আরম্ভক ও চঞ্চল এবং তমোগুণ ভারী ও অবরক। যা সুখের কারণ তা সুখস্বরূপ সত্ত্ব গুণ, যা দুঃখের কারণ তা দুঃখস্বরূপ রজোগুণ এবং যা মোহের কারণ তা মোহস্বরূপ তমোগুণ। সুখ, প্রকাশ ও লাঘব একই বস্তুতে একই সময়ে উদ্ভূত হওয়ায় কোন বিরোধ নেই। কারণ, এদের এক সঙ্গে দেখা যায়। সেজন্য পরস্পর বিরোধী সুখ, দুঃখ ও মোহের মত পরস্পর অবিরোধী এক-একটি গুণবৃত্তি সুখ, প্রকাশ ও লাঘবের দ্বারা ভিন্ন কারণ কল্পনার কোন প্রশ্ন ওঠে না। এভাবে দুঃখ, চালক ও প্রবৃত্তি, একই বস্তুতে একই সময়ে উদ্ভূত হওয়ায় এবং মোহ, গুরুত্ব ও আবরণ একই বস্তুতে একই সময়ে উদ্ভূত হওয়ায় কোন বিরোধ নেই বলে এদের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন কারণ স্বীকার করার প্রয়োজন নেই।

২.৩.২ গুণত্রয়ের প্রয়োজন

গুণত্রয়ের স্বরূপ বলার পর তাদের প্রয়োজন বলা হয়েছে —"প্রকাশ প্রবৃত্তি ও নিয়ম যাদের অর্থ"—এই

বাক্যাংশে। এখানেও যথা-সংখ্যা-ক্রমে বিষয়টি বুঝতে হবে। গুরু তমোগুণের দ্বারা রজোগুণ যদি নিয়মিত বা নিয়ন্ত্রিত না হত, তবে নিজে প্রবর্তক বলে রজোগুণ লঘু সত্ত্বগুণকে সর্বত্র চালনা করত। তমোগুণের দ্বারা নিয়মিত বা নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় রজোগুণ বিশেষ ক্ষেত্রে সত্ত্ব-গুণকে চালনা করে।

সাংখ্যাচার্যেরা (১) সত্ত্ব গুণকে লঘু প্রকাশক ও ইষ্ট (বা অভিলষিত), (২) রজোগুণকে চালক, আরম্ভক ও চঞ্চল এবং (৩) তমোগুণকে ভারী ও আবরক বলে স্বীকার করেছেন। এদের মধ্যে গুরুত্বের বিপরীত যে ধর্ম কার্যোদ্গমনে হেতু সেটি লাঘব। আগুনের উর্দ্ধমুখী শিখা লাঘবের জন্য হয়ে থাকে। লাঘব আবার কোন কোন বস্তুর (যেমন, বায়ুর) তির্যক গমনের বা বক্র গতির কারণ হয়। এভাবে ইন্দ্রিয়গুলির বৃত্তি-পটুত্বের অর্থাৎ দ্রুত বিষয়-সংযোগের দক্ষতার প্রতি কারণ লাঘব। লাঘবের পরিবর্তে গুরুত্ব থাকলে ইন্দ্রিয়গুলি মন্দগতি সম্পন্ন হয়ে পড়ত।

সত্ত্ব ও তমোগুণ নিজেরা ক্রিয়াহীন বলে নিজ নিজ কার্যে প্রবৃত্ত হয়ে পড়ে। তখন রজোগুণ তাদের চালনা করে অর্থাৎ অবসর থেকে মুক্ত করে তাদের নিজ নিজ কার্যে উৎসাহ সঞ্চার করে বা যত্ন করে। তাই বলা হয়েছে রজোগুণ অন্য গুণের চালক। কেন রজোগুণ এরূপ করে? এর উত্তরে বলা হয়েছে রজোগুণ চল অর্থাৎ ক্রিয়াস্বভাব। এর দ্বারা রজোগুণের প্রয়োজন যে প্রবৃত্তি, তা দেখানো হল। ক্রিয়াস্বভাব বলে রজোগুণ সত্ত্ব ও তমোগুণকে সকল কার্যে চালনা করতে গিয়ে গুরু ও আবরক এবং প্রবৃত্তির ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী তমোগুণের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে কোন কোন বিষয়ে মাত্র প্রবৃত্ত হয়, সকল বিষয়ে প্রবৃত্তি হয় না। তাই সেই সেই বিষয় থেকে বাবৃত্ত করে বলে এবং কোন কোন বিষয়ে প্রবৃত্তির প্রতিবন্ধক হয় বলে তমোগুণকে নিয়ামক বা আচ্ছাদক বলা হয়েছে।

আচ্ছা, পরস্পর বিরুদ্ধ এই গুণগুলি কুখ্যাত অসুরদ্বয় সুন্দ উপসন্দের মত একে অপরকে ধ্বংশ করবে-এটাই তো যুক্তিযুক্ত; এরা মিলিতভাবে কাজ করবে—এটা তো অনেক দূরের কথা। পূর্বপক্ষী এই মত—এর উত্তরে বলা হয়েছে, প্রদীপের মত গুণগুলি একই প্রয়োজনে, অর্থাৎ পুরুষার্থ সাধনের জন্য, কাজ করে থাকে। দেখা গেছে যে সলতে ও তেল যেমন আগুনের বিরোধী হয়েও একসঙ্গে মিলে রূপ প্রকাশের মত কাজ করে এবং বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা পরস্পর বিরোধী হলেও একসঙ্গে মিলে শরীর ধারণের কাজ করে। অনুরূপভাবে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ পরস্পর বিরোধী হলেও একে অপরের অনুবর্তী হয়ে নিজ নিজ কাজ করে।

গুণগুলি ও তাদের কার্য বুদ্ধ্যাদির প্রবৃত্তির প্রতি ভোগ ও অপবর্গরূপ পুরুষার্থই কারণ বা প্রয়োজন, অন্য কোন কারণে বা প্রয়োজনে বুদ্ধ্যাদি করণ কাজ করে না। এখানে সুখ, দুঃখ ও মোহ পরস্পর বিরোধী হওয়ায় নিজের অনুরূপ সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক কারণগুলির অর্থাৎ গুণত্রয়ের সূচনা করে। তাদের ঐসব কারণের পরস্পর অভিভাবক ও অনুভূতি-রূপে নানাবিধ সৃষ্টি হয়।

এটা এরকম যে রূপযৌবন ও কুলশীল সম্পন্না একই নারী তার স্বামীকে সুখী করে, এর কারণ কী? উত্তর—যেহেতু স্বামীর প্রতি সেই নারীর (সত্ত্বের ধর্ম) সুখ উৎপন্ন হয়। সেই একই নারী তার সতীনদের দুঃখ দেয়, এর কারণ কি? উত্তর—তাদের প্রতি ঐ নারীর (রজোগুণের ধর্ম) দুঃখ উৎপন্ন হয়। যে পুরুষ তাকে লাভ করতে পারে নি, তাকে সেই নারী মোহিত করে, এর কারণ কী? উত্তর—ঐ পুরুষের প্রতি সেই নারীর (তমোগুণের ধর্ম) মোহ উৎপন্ন হয়। এই নারীর বর্ণনার দ্বারা সকল বস্তুর ব্যাখ্যা হল।

২.৩.৩ গুণত্রয়ের কার্য

গুণত্রয়ের প্রয়োজন বলার পর তাদের কার্য বলা হয়েছে - "এরা পরস্পর অভিভব, আশ্রয়, জনন এবং মিথুন বৃত্তি-যুক্ত"—এই বাক্যে। বৃত্তি মানে ক্রিয়া। এই কারিকায় বৃত্তি শব্দটি একবার ব্যবহৃত হলেও সেটি অভিভব, আশ্রয়, জনন এবং মিথুন—এই প্রত্যেকটিকে সম্বদ্ধ করে। অর্থাৎ এরা পরস্পর অভিভব-বৃত্তি, পরস্পর আশ্রয়-বৃত্তি,

পরস্পর জনন-বৃত্তি এবং পরস্পর নিথুন-বৃত্তি সম্পন্ন।

- **গুণত্রয়ের পরস্পর অভিভব-বৃত্তি** — পুরুষার্থের ফলে গুণত্রয়ের কোন একটি কার্যোন্মুখ হলে অন্যগুলি অভিভূত হয়, যেমন সত্ত্বগুণ রজঃ ও তমঃ গুণকে অভিভব করে নিজের শান্ত (সুখ) বৃত্তি লাভ করে, এভাবে রজোগুণ সত্ত্ব ও তমোগুণকে অভিভব করে নিজের ঘোর (দুঃখ) বৃত্তি লাভ করে, (এবং) এভাবে তমোগুণ সত্ত্ব ও রজোগুণকে অভিভব করে নিজের মূঢ় (মোহ বৃত্তি লাভ করে)।
- **গুণত্রয় পরস্পর আশ্রয়-বৃত্তি** — গুণত্রয় একটি অপরটির আশ্রিত। যদিও আধার ও আধেয় ভাবে এদের আশ্রয় হয় না, তবুও যাকে অপেক্ষা করে যার ক্রিয়া হয়, সেটি তার আশ্রয়। য়েমন, সত্ত্ব গুণ প্রবৃত্তি ও নিয়মকে আশ্রয় করে রজঃ ও তমঃকে প্রকাশের দ্বারা উপকার করে। রজোগুণ প্রকাশ ও নিয়মকে আশ্রয় করে প্রবৃত্তি দ্বারা সত্ত্ব ও তমঃ-র উপকার করে, তমোগুণ প্রকাশ ও প্রবৃত্তি আশ্রয় করে নিয়মের দ্বারা সত্ত্ব ও রজঃ-র উপকার করে।
- **গুণত্রয় পরস্পর জনন-বৃত্তি** — এদের একটি অন্য একটিকে জন্মায়। জনন শব্দের অর্থ পরিণাম। গুণগুলির স্বরূপ বা সদৃশরূপ জনন বা পরিণামই হয়ে থাকে। অতএব, এখানে হেতুমত্ত্ব-এর প্রসক্তি নেই, কারণ এদের অন্যতত্ত্ব-রূপ হেতু নেই। অন্যতত্ত্বে লয় হয় না বলে এরা অনিত্যও নয়। গুণগুলি নিত্য।
- **গুণত্রয় পরস্পর নিথুন-বৃত্তি** — গুণত্রয় পরস্পর নিত্য সহচর বৃত্তি। এরা একটি অপরটিকে ছেড়ে থাকতে পারে না। এককথায় সমব্যপ্ত। গুণত্রয় পরস্পর নিত্য সহচর-রূপে সর্বত্রগামী। রজোগুণের সহচর সত্ত্ব, সত্ত্ব গুণের সহচর রজঃ, তমোগুণের সহচর সত্ত্ব ও রজঃ উভয়েই, সত্ত্ব ও রজঃ উভয়েরই সহচর তমঃ। এদের আদি, সংযোগ বা বিয়োগ কিছুই বোঝা যায় না।

২.৪ সারসংক্ষেপ

সাংখ্য দর্শনে দুই প্রকার মূল তত্ত্ব স্বীকৃত, যথা— প্রকৃতি ও পুরুষ। প্রকৃতি ও পুরুষ-এর সংযোগের ফলে সাক্ষাৎ ও পরম্পরাক্রমে উৎপন্ন হয় মোট তেইশ প্রকার তত্ত্ব। ফলে সাংখ্য দর্শনে সর্বমোট পঁচিশ প্রকার তত্ত্ব স্বীকৃত। এই তত্ত্বগুলি পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব নামে সুবিদিত। এই তত্ত্বগুলি হল : জ্ঞ বা পুরুষ, অব্যক্ত বা মূলপ্রকৃতি বা প্রধান, মহৎ বা বুদ্ধি, অহঙ্কার, মনস্, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র বা পঞ্চসূক্ষ্মভূত এবং পঞ্চমহাভূত বা পঞ্চস্থূলভূত।

দ্বাবিংশতি কারিকায় প্রকৃতি ও পুরুষ-এর সংযোগের ফলে মূলপ্রকৃতি থেকে সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরা ক্রমে সৃষ্ট ব্যক্ত শ্রেণীর অর্ন্তগত (মহৎ থেকে পঞ্চমহাভূত) তেইশ প্রকার তত্ত্বের উল্লেখ করা হয়েছে। তৃতীয় কারিকায় বলা হয়েছে, সাংখ্যশাস্ত্রের বিষয় বা তত্ত্ব সংক্ষেপে চার প্রকার। যথা— কোন তত্ত্ব (১) কেবল প্রকৃতি বা কেবল কারণ, কোন কোন তত্ত্ব (২) কেবল বিকৃতি বা কেবল কার্য, কোন কোন তত্ত্ব (৩) প্রকৃতি ও বিকৃতি উভয়ই এবং কোন তত্ত্ব (৪) প্রকৃতিও নয়, বিকৃতিও নয়, দ্বিতীয় কারিকায় সাংখ্যশাস্ত্রে স্বীকৃত তত্ত্বগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে, যথা—ব্যক্ত, অব্যক্ত ও জ্ঞ। আপাত দৃষ্টিতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় কারিকায় বর্ণিত তত্ত্বের দুই প্রকার শ্রেণীবিভাগের মধ্যে কোন সঙ্গতি নেই বলে মনে হলেও বস্তুত এই দুই প্রকার শ্রেণীবিভাগের মধ্যে কোন বিরোধ নেই, বরং এরা পরস্পরের পরিপূরক। তৃতীয় কারিকায় বর্ণিত মূলপ্রকৃতি শ্রেণীটি দ্বিতীয় কারিকায় বর্ণিত অব্যক্ত শ্রেণীর নামান্তর

এবং তৃতীয় কারকিায় বর্ণিত 'ন প্রকৃতি ন বিকৃতি' তথা পুরুষ শ্রেণীটি দ্বিতীয় কারিকায় বর্ণিত জ্ঞ শ্রেণীর নামান্তর। তাছাড়া তৃতীয় কারিকায় বর্ণিত প্রকৃতি-বিকৃতি শ্রেণী এবং বিকার শ্রেণী দ্বিতীয় কারিকায় বর্ণিত ব্যক্ত শ্রেণীর অর্ন্তগত। দ্বাবিংশতি কারিকায় প্রকৃতি-সৃষ্ট যে তেইশ প্রকার তত্ত্বের উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি দ্বিতীয় কারকিায় বর্ণিত ব্যক্ত শ্রেণীর অর্ন্তগত এবং তৃতীয় কারিকায় বর্ণিত প্রকৃতি-বিকৃতি ও বিকার শ্রেণীদ্বয়ের অর্ন্তগত। এছাড়া 'প্রকৃতি থেকে মহৎ উৎপন্ন হয়' বলতে দ্বাবিংশতি কারিকায় প্রকৃতি শব্দে দ্বিতীয় কারিকায় বর্ণিত অব্যক্ত শ্রেণী এবং তৃতীয় কারিকায় বর্ণিত মূলপ্রকৃতি শ্রেণীকেই নির্দেশ করা হয়েছে। সুতরাং, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও দ্বাবিংশতি কারিকায় বর্ণিত শ্রেণীবিভাগের মধ্যে কোন বিরোধ নেই, এরা পরস্পরের পরিপূরক।

দশম কারিকায় বর্ণিত ব্যক্ত-এর লক্ষণ — ব্যক্ত হল হেতুমৎ, অনিত্য, অব্যাপি, সক্রিয়, অনেক, আশ্রিত, লিঙ্গ, সাবয়ব এবং পরতন্ত্র। একাদশ কারিকায় বর্ণিত ব্যক্ত-এর লক্ষণ : ব্যক্ত তত্ত্ব মাত্রই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মক হওয়ায় ত্রিগুণ থেকে অভিন্ন, অনেক পুরুষের জ্ঞানে গৃহীত হবার যোগ্য (অর্থাৎ ভোগ্য বা বিষয়), অচেতন ও পরিণামস্বভাব।

দশম কারিকায় বর্ণিত অব্যক্ত-এর লক্ষণ — অব্যক্ত হল অহেতুমৎ, নিত্য, ব্যাপি, অসক্রিয়, এক, অনাশ্রিত, অলিঙ্গ, নিরবয়ব এবং স্বতন্ত্র। একাদশ কারিকায় বর্ণিত অব্যক্ত-এর লক্ষণও হল : ত্রিগুণ, অবিবেকি, বিষয়, সামান্য, অচেতন ও প্রসবধর্ম্মি।

সাধারণত বলা হয়, প্রকৃতির লক্ষণ হল "সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা"। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে প্রকৃতির দুটি অবস্থা—ব্যক্ত বা কার্যাবস্থা এবং অব্যক্ত বা অকার্যাবস্থা। প্রকৃতির অকার্যাবস্থাকে বলে মূলপ্রকৃতি বা প্রধান। মূলপ্রকৃতি বা প্রধানের লক্ষণ হল "সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা"। স্বভাবত এটিকে প্রকৃতির লক্ষণ বললে লক্ষণটি অব্যাপ্তি দোষদুষ্ট হবে। কারণ এই লক্ষণটি প্রকৃতির ব্যক্ত ও অব্যক্ত অবস্থা-দুটির মধ্যে কেবলমাত্র অব্যক্ত অবস্থাকে নির্দেশ করে, ব্যক্ত অবস্থাকে নির্দেশ করে না। একাদশ কারিকায় যেহেতু প্রকৃতির ব্যক্ত বা কার্যাবস্থা এবং অব্যক্ত বা অকার্যাবস্থার সাধর্ম্য তথা সাধারণ ধর্ম বর্ণিত হয়েছে, সেহেতু একাদশ কারিকায় বর্ণিত ব্যক্ত এবং অব্যক্ত-এর সাধর্ম্যকে প্রকৃতির লক্ষণ বলতে হবে। তবে "সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা"কে প্রকৃতির উপলক্ষণ বলা যায়। একাদশ কারিকায় বর্ণিত প্রকৃতির ব্যক্ত ও অব্যক্ত অবস্থা-দুটির সাধর্ম্যযুক্ত লক্ষণটি হল "ত্রিগুণমবিবেকি বিষয়ঃ সামান্যমচেতনং প্রসবধর্ম্মি"।

একাদশ কারিকায় প্রকৃতির ব্যক্ত ও অব্যক্ত অবস্থা-দুটির সাধর্ম্য বর্ণনা করে বলা হয়েছে, পুমান্ তথা পুরুষ এর বিপরীত। পুরুষ অব্যক্তের মত অহেতুমৎ, নিত্য, ব্যাপি, পরিস্পন্দন-হীন, অনাশ্রিত, অলিঙ্গ, নিরবয়ব এবং স্বতন্ত্র হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্ত ও অব্যক্ত তত্ত্ব মাত্রেয় সাধর্ম্যের বিপরীত লক্ষণযুক্ত, অর্থাৎ পুরুষ হল অ-ত্রিগুণ, বিবেকী, অ-বিষয়, অ-সামান্য, চেতন, অ-প্রসবধর্মী। এছাড়া উনবিংশ কারিকায় বলা হয়েছে যে ব্যক্তাব্যক্তের বিপরীত বলে পুরুষের সাক্ষিত্ব, কৈবল্য, মাধ্যস্থ, দ্রষ্টৃত্ব এবং অকর্তৃভাব ইত্যাদি লক্ষণও সিদ্ধ হয়।

ব্যক্ত ও অব্যক্তকে ত্রিগুণ বলা হয়েছে। এই গুণ তিনটি কী কী? এদের লক্ষনই বা কী? এর উত্তরে (ঈশ্বরকৃষ্ণ) বলেছেন, সত্ত্ব, রজ ও তম—এই গুণগুলি সুখ, দুঃখ ও মোহ স্বরূপ। প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও নিয়ম তাদের অর্থ বা প্রয়োজন। পরস্পরকে অভিভূত করা, পরস্পরকে আশ্রয় করা, পরস্পরের সাহায্যে বৃত্তির জনক হওয়া এবং পরস্পরের নিত্যসঙ্গী হওয়া তাদের বৃত্তি। আবার কোন্ গুণ কীরূপ? কেনই বা এরূপ হয়? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে (ঈশ্বরকৃষ্ণ) বলেছেন—সত্ত্বগুণ লঘু, প্রকাশক ও ইষ্ট, রজোগুণ চালক, আরম্ভক ও চঞ্চল এবং তমোগুণ ভারী ও আবরক। প্রয়োজন বা কার্য-সিদ্ধির জন্য প্রদীপের মত তাদের বৃত্তি বা কার্য হয়। ঈশ্বরকৃষ্ণের এই বক্তব্য থেকে গুণত্রয়ের স্বরূপ, প্রয়োজন ও কার্য সম্বন্ধে জানা যায়।

২.৫ প্রধান শব্দগুচ্ছ

<table>
<tr><th>শব্দ</th><th>অর্থ</th></tr>
<tr><td>ত্রিগুণ</td><td>সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ— এই তিনটি গুণ যার আছে</td></tr>
<tr><td>গুণত্রয়</td><td>সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ— এই তিনটি গুণ</td></tr>
<tr><td>ব্যক্ত</td><td>প্রকৃতির কার্যাবস্থা</td></tr>
<tr><td>অব্যক্ত</td><td rowspan="3">প্রকৃতির অকার্যাবস্থা (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের সাম্যাবস্থা)</td></tr>
<tr><td>প্রধান</td></tr>
<tr><td>মূলপ্রকৃতি</td></tr>
<tr><td>প্রকৃতি-বিকৃতি</td><td>কোন তত্ত্বের কারণ এবং অন্য কোন তত্ত্বের কার্য</td></tr>
<tr><td>বিকার</td><td>কোন তত্ত্বের কার্য কিন্তু অন্য কোন তত্ত্বের কারণ নয়</td></tr>
<tr><td>জ্ঞ</td><td rowspan="3">অন্যতম মূল তত্ত্ব -
শুদ্ধ চৈতন্য (প্রকৃতিও নয় বিকৃতিও নয়, অর্থাৎ
কোন তত্ত্বের কার্যও নয় কারণও নয়)</td></tr>
<tr><td>পুরুষ</td></tr>
<tr><td>পুমান্</td></tr>
<tr><td>তত্ত্বান্তর</td><td>সূক্ষ্মতত্ত্বের স্থূলতত্ত্বে পরিণাম</td></tr>
<tr><td>প্রকৃতি</td><td>(গৌণ অর্থ) তত্ত্বান্তরের উপাদান।
(মুখ্য অর্থ) অন্যতম মূল তত্ত্ব—অ-কারণ কারণ—যা ত্রিগুণ, অবিবেকী, বিষয়, সামান্য, অচেতন এবং প্রসবধর্মী।</td></tr>
</table>

২.৬ নমুনা প্রশ্নাবলী

Essay type

1. (a) How does Īśvarakṛṣṇa classify the twenty five elements in the second and third *kārikā*-s of *Sāṁkhyakārikā*?
   (b) In this context explain the characteristics of the major types of elements.
2. Explain, after Īśvarakṛṣṇa, the nature, purpose and functions of the three *guṇa*-s.

Short answer type

1. Write short notes on the following:
   (a) *mūlaprakṛti*

(b) *prakṛti*
(c) *prakṛti-vikṛti*
(d) *prakṛti*
(e) *jña*

২.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১. দিবাকরানন্দ, স্বামী (অনুদিত) : ***শ্রীমৎ ঈশ্বরকৃষ্ণ** প্রণীতা সাংখ্যকারিকা সটীক বঙ্গানুবাদ* (মূল কারিকা, অন্বয়ার্থ, অনুবাদ, তত্ত্বকৌমুদী টীকা, টীকানুবাদ ও স্থানে স্থানে ব্যাখ্যা সংযোজিত।), প্রকাশক—গনেশ চন্দ্র দত্ত, ৩৪ সদানন্দ রোড, কালিঘাট, কলকাতা-২৬, ১৯৭৬

২. বেদান্তচুঞ্চু সাংখ্যভূষণ সাহিত্যাচার্য্য, পূর্ণচন্দ্র (সঙ্কলিত) : *সাংখ্যকারিকা,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৩

৩. গোস্বামী, নারায়ণ চন্দ্র : *ঈশ্বরকৃষ্ণবিরচিতকারিকাসাহিতা সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী,* প্রকাশক—শিখা লাল, জিৎপুর, মুর্শিদাবাদ, ১৯৮২

একক ৩ ঃ অব্যক্ত ও পুরুষের অস্তিত্বসিদ্ধি, পুরুষের বহুত্ব এবং সৎকার্যবাদ

এই এককের উদ্দেশ্য ঃ

এই একক পাঠ করলে শিক্ষার্থীরা

- অব্যক্ত ও পুরুষের অস্তিত্বসিদ্ধির পক্ষে যুক্তি দিতে পারবে,
- পুরুষের বহুত্ব প্রতিষ্ঠা ও তার বিচার করতে পারবে,
- সাংখ্য দর্শনে সৎকার্য-সিদ্ধির পক্ষে প্রদত্ত যুক্তি ব্যাখ্যা ও বিচার করতে পারবে

এবং

- সাংখ্যসম্মত পরিণাম ব্যাখ্যা করতে পারবে।

পাঠপরিকল্পনা

৩.১ অব্যক্ত ও পুরুষের অস্তিত্বসিদ্ধি এবং পুরুষের বহুত্ব

৩.১.১ অব্যক্ত (তথা প্রধান)-এর অস্তিত্বসিদ্ধি

৩.১.২ পুরুষের অস্তিত্বসিদ্ধি

৩.১.৩ পুরুষের বহুত্ব

৩.২ সাংখ্য দর্শনে সৎকার্যবাদ

৩.২.১ সৎকার্য ও অসৎকার্য শব্দদুটির অর্থ

৩.২.২ সৎকার্যবাদ ও অসৎকার্যবাদ শব্দদুটির অর্থ

৩.২.৩ সাংখ্য দর্শনে সৎকার্য-সিদ্ধি

৩.৩ সাংখ্যমতে পরিণাম

৩.৪ সারসংক্ষেপ

৩.৫ প্রধান শব্দগুচ্ছ

৩.৬ নমুনা প্রশ্নাবলী

৩.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৩.১ অব্যক্ত ও পুরুষের অস্তিত্বসিদ্ধি এবং পুরুষের বহুত্ব

৩.১.১ অব্যক্ত (তথা প্রধান)-এর অস্তিত্বসিদ্ধি

প্রাত্যহিক জীবনে দেখা যায়, কার্য কারণগুণাত্মক; যেমন, কাপড় সূতোর গুণে অন্বিত। অনুরূপভাবে সুখদুঃখমোহত্মক মহাদাদি কার্যের কারণ অব্যক্ত প্রধানও সুখদুঃখমোহত্মক হবে। সুতরাং, কার্য কারণগুণাত্মক বলে অব্যক্ত প্রধানের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।

ন্যায় ও বৈশেষিক সম্প্রদায়ের দার্শনিকগণ বলেন ব্যক্ত থেকে ব্যক্ত উৎপন্ন হয়। পরমাণুগুলি ব্যক্ত। সেগুলি থেকে দ্ব্যনুক ইত্যাদি ক্রমে স্থূল পৃথিবী ইত্যাদি রূপ কার্য ব্যক্তের উৎপত্তি হয়। পৃথিবী ইত্যাদিতে কারণের গুণানুসারে রূপ ইত্যাদিরও উৎপত্তি হয়। অতএব, ব্যক্ত থেকে ব্যক্ত এবং তার গুণের উৎপত্তি সম্ভব হলে অজ্ঞাত অব্যক্ত কল্পনার প্রয়োজন কী? এরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলা হয়েছে—

ভেদানাং পরিমাণাৎসমন্বয়াৎশক্তিতঃ প্রবৃত্তেশ্চ।

কারণকার্যবিভাগাদবিভাগাদ্বৈশ্বরূপ্যস্য।।

অর্থাৎ ভেদাদি (মানে মহদাদি ত্রয়োবিংশতি কার্যবিশেষ) পরিমিত বলে, কারণ ও কার্যের মধ্যে (গুণের দিক থেকে) সমতা থাকায়, (কারণের) শক্তির দ্বারা (কার্যের) উৎপত্তি হওয়ায় এবং সকল উৎপন্ন বস্তুতে (সৃষ্টি কালে) কারণ ও কার্যের বিভাগ থাকায় এবং (প্রলয় কালে ঐরূপ) বিভাগ না থাকায় অব্যক্ত প্রধানের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।

তাৎপর্য :

জিজ্ঞাসা : মহৎ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত ভেদ তথা বিশেষ কার্যগুলির কারণ মূলপ্রকৃতি অব্যক্ত যে আছে, কীভাবে তা জানা যায়?

উত্তর : কারণের সঙ্গে কার্যের বিভাগ ও অবিভাগ আছে। উৎপত্তির পূর্বে কার্য কারণে সৎ। এটা এরকম— যেমন, কচ্ছপের শরীরের ভিতরে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থাকে, সেগুলি বেরিয়ে এলে বা বিভক্ত হলে বলা হয়, এটা কচ্ছপের শরীর এবং এগুলি তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। এভাবে কচ্ছপের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কচ্ছপের শরীরে প্রবেশ করে অব্যক্ত হয় বা অদৃশ্য হয়।

অনুরূপ বিভাগ বা আবির্ভাব

- ঘট, কুন্ডল, মুকুটাদি কার্যগুলি মাটি বা সোনারূপ কারণগুলিতে থাকে এবং পরে সেগুলি থেকে আর্বিভূত হয় বা বিভক্ত হয়।
- পৃথিব্যাদি পঞ্চমহাভূত গন্ধাদি তন্মাত্রে থাকে এবং পরে সেগুলি আর্বির্ভূত হয় ও বিভক্ত হয়।
- পঞ্চতন্মত্র তাদের কারণ অহঙ্কারে থাকে এবং পরে আর্বিভূত হয়ে বিভক্ত হয়।
- অহঙ্কার তার কারণ মহৎ-তত্ত্বে থাকে এবং পরে আর্বিভূত হয়ে বিভক্ত হয়।
- এভাবে পরম অব্যক্ত কারণ থেকে, অর্থাৎ মূলপ্রকৃতি থেকে সাক্ষাৎ ও পরম্পরা সম্বন্ধে অন্বিত বিশ্বের সমস্ত কার্যের বিভাগ হয়ে থাকে।

অনুরূপ অবিভাগ

- প্রলয়কালে ঘট, কুন্ডল, মুকুটাদি কার্য তাদের নিজ নিজ কারণ যথাক্রমে মাটি বা সোনার পিন্ডে প্রবেশ করে অব্যক্ত হয়। সেই কারণরূপই অনভিব্যক্ত কার্যকে অপেক্ষা করে অব্যক্ত হয়।
- পৃথিব্যাদি তন্মাত্রতে প্রবেশ করে নিজেদের তুলনায় তন্মাত্রকে অব্যক্ত করে।
- তন্মাত্রগুলি অহঙ্কারে প্রবেশ করে অহঙ্কারকে অব্যক্ত করে।
- অহঙ্কার মহৎ-তত্ত্বে প্রবেশ করে মহৎ-তত্ত্বকে অব্যক্ত করে।
- মহৎ-তত্ত্ব নিজ কারণ মূলপ্রকৃতিতে প্রবেশ করে মূলপ্রকৃতিকে অব্যক্ত করে। মূলপ্রকৃতির কিন্তু কোন তত্ত্বে প্রবেশ হয় না। সেজন্য মূলপ্রকৃতি সকল কার্যের অপেক্ষায় বা তুলনায় অব্যক্তই। এভাবে মূলপ্রকৃতিতে নামরূপ কার্যের অবিভাগ হয়ে থাকে।

সুতরাং কারণে কার্য থাকাতে বিভাগ এবং অবিভাগ হয় বলে অব্যক্ত কারণের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। এভাবে অব্যক্ত আছে—এ বিষয়ে আরো হেতু বলা হয়েছে—

শক্তির দ্বারা কার্য উৎপন্ন হয়। কারণের শক্তি থেকে কার্য উৎপন্ন হয়— এটা সিদ্ধ। কার্য উৎপাদনের অনুকূল শক্তি নেই, এমন কারণ থেকে কার্যের উৎপত্তি হয় না। শক্তি কারণেই থাকে এবং কার্যের অব্যক্ত অবস্থা থেকে ভিন্ন অন্য কোন শক্তি কারণে থাকে না। সৎকার্যবাদ অনুযায়ী কার্যের অব্যক্ত অবস্থা থেকে শক্তির প্রমাণ নেই। বালু থেকে তেলের উপাদান কারণ তিলের পার্থক্য এই যে, তিলে অব্যক্তভাবে তেল থাকে, কিন্তু বালুতে তেল থাকে না।

জিজ্ঞাসা : আচ্ছা, কারণের শক্তি থেকে কার্যের উৎপত্তি এবং কারণ-কার্যের বিভাগ ও অবিভাগ এগুলি মহৎ-তত্ত্বই যে পরম অব্যক্ত তা সিদ্ধ করুক। অন্য কোন অব্যক্তের প্রয়োজন কী?

উত্তর : পরিমাণ আছে বলে, অর্থাৎ মহদাদি পরিমিত বা অব্যাপক বলে। কারণ, ঘটাদির মত পরিমিত বলে মহদাদি বিশেষ অব্যক্ত কারণযুক্ত। দেখা যায় যে, ঘটাদি পরিমিত বলে তাদের অব্যক্ত কারণ (যেমন, মাটির পিন্ড) আছে। কার্যের অব্যক্ত অবস্থা কারণই। পরম অব্যক্তের কারণরূপে অন্য অব্যক্ত কল্পনার প্রমাণ নেই বলে যা মহৎ-তত্ত্বের কারণ, তা পরম অব্যক্ত।

মহদাদি অব্যক্তের কারণ আছে—এটা সমন্বয়রূপ আরেকটি হেতুর দ্বারাও সিদ্ধ হয়। ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর সমানরূপতা হল সমন্বয়। অধ্যবসায় ইত্যাদি ধর্মবিশিষ্ট বুদ্ধ্যাদি সুখদুঃখমোহসমন্বিত-রূপে প্রতীত হয়। যেগুলি যেরূপ সমনুগত, সেগুলি সেই সেই রূপের অব্যক্ত কারণযুক্ত হয়। অর্থাৎ যে যে বস্তুতে যে যে স্বভাবের অনুবৃত্তি থাকে সেই সেই বস্তু সেই সেই স্বভাবের অব্যক্ত কারণযুক্ত হয়। যেমন, মাটি ও সোনা সমনুগত। ঘট, মুকুট ইত্যাদি কার্য মাটি ও সোনা-রূপ অব্যক্ত কারণ থেকে উৎপন্ন হয়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহদাদি বিশেষের অব্যক্ত কারণ আছে।

৩.১.২ পুরুষের অস্তিত্বসিদ্ধি

যে সব তৌষ্টিক (অর্থাৎ, তুষ্টি বা বিষয়ভোগকেই মুখ্য প্রয়োজন মনে করেন এমন যে সব ব্যক্তি) মহৎ অহঙ্কার ইন্দ্রিয়, বা ভূতগুলিকেই আত্মা মনে করে তাদেরই উপাসনা করেন, পুরুষের অস্তিত্ব প্রমাণিত বলে মানেন না, তাঁদের প্রতি বলা হয়েছে—

সংঘাতপরার্থত্বাৎত্রিগুণাদিবিপর্যায়াদধিষ্ঠানাৎ।
পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ।।

অর্থাৎ সংঘাতবস্তু অপরের প্রয়োজন সাধন করে থাকে, ত্রিগুণ ইত্যাদির বিপরীত কেউ আছে, কোন চেতন অধিষ্ঠাতা ছাড়া জড়বর্গ চলতে পারে না, রূপরসাদি ভোগ্যবস্তুর ভোক্তা আছে এবং কেবল বা শুদ্ধ আত্মার ভাব কৈবল্য বা মোক্ষ লাভের জন্য চেষ্টা আছে বলে পুরুষ আছেন—এটাই প্রমাণিত হয়।

তাৎপর্য :

জিজ্ঞাসা : অব্যক্তাদি থেকে ভিন্ন তত্ত্ব পুরুষ আছে—এটা কীভাবে সিদ্ধ হয়?

উত্তর : (হেতু -১) সংঘাত, অর্থাৎ পরস্পর মিলিত হয়ে কাজ করে এমন বস্তু, পরার্থ বলে, অর্থাৎ পরের প্রয়োজন সাধন করে বলে সিদ্ধ হয় যে অবক্তোদি থেকে ভিন্ন তত্ত্ব পুরুষ আছে।

আশঙ্কা : অব্যক্ত, মহৎ, অহঙ্কার ইত্যাদি তত্ত্ব শয্যা, আসন, মালিশের তেল ইত্যাদির মত সংঘাত বলে

পরার্থ। সুখদুঃখমোহত্মক বলে অব্যক্তাদি সকল তত্ত্ব সংঘাত। দেখা যায় যে শয্যা, আসন ইত্যাদি শরীরাদি সংঘাতের প্রয়োজন সাধন করে, কিন্তু এরা ব্যক্ত ও অব্যক্ত থেকে ভিন্ন তত্ত্ব পুরুষ বা আত্মার প্রতি পরার্থ নয়, অর্থাৎ পুরুষ বা আত্মার প্রয়োজন সাধন করে না। অতএব অব্যক্তাদি সংঘাত পরার্থ হলেও অন্য কোন সংঘাতরূপ পরকে বোঝাতে পারে, অর্থাৎ এরা অপর কোন সংঘাতের প্রায়োজন সাধন করতে পারে; কিন্তু অসংঘাত আত্মাকে বোঝাবে না, অর্থাৎ অসংঘাত আত্মার প্রয়োজন সাধন করবে না।

উত্তর ঃ- (হেতু-২) তিনগুণের বিপর্যয়ের ফলে, অর্থাৎ ত্রিগুণাদির বিপরীত ধর্মী কোন তত্ত্ব আছে বলে, পুরুষের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। অভিপ্রায় এই যে, যদি মহদাদি সংঘাত অপর কোন সংঘাতের প্রয়োজন সাধন করে, তবে সেটিও সংঘাত হওয়ায় অন্য একটি সংঘাতের প্রয়োজন সাধন করবে, এবং এভাবে সেই অন্য সংঘাত আবার অপর একটি সংঘাতের প্রয়োজন সাধন করবে—ফলে অনবস্থা দোষ হবে। ব্যবস্থা থাকলে অনবস্থা কল্পনা করা যুক্তিযুক্ত নয়। সেইহেতু অনবস্থা দোষ পরিহারের জন্য সেই অসংহতকে মেনে নিতে ইচ্ছা করলে সেটি অত্রিগুণ, অবিবেকী, অবিষয়, অসাধারণ, চেতন এবং অপ্রসবধর্মী বলে স্বীকার করতে হবে। কারণ ত্রিগুণত্বাদি ধর্মগুলি সংহতত্বের দ্বারা ব্যাপ্ত। সেই সংহতত্ব এই অসংহত পর তত্ত্বে, অর্থাৎ পুরুষে নেই বলে ত্রিগুণত্বাদিও থাকবে না। যেমন, ব্রাহ্মণত্ব না থাকলে কঠত্বাদিও, অর্থাৎ কঠ শাখাভুক্ত হবার সম্ভাবনাও থাকে না। অতএব আচার্য তিনগুণের বিপরীত বলে পুরুষ আছে—একথা বলাতে সেই পর (পুরুষ) অসংহত—এটাই প্রমাণিত হল।

(হেতু-৩) সেই পর পুরুষের অস্তিত্ব বিষয়ে আরো প্রমাণ বলা হয়েছে—অধিষ্ঠানবশত, অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মক বুদ্ধি ইত্যাদি পরের দ্বারা অধিষ্ঠিত বলে পুরুষের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। দেখা যায় যে, যা কিছু সুখদুঃখ মোহাত্মক, সেগুলি সবই পরের দ্বারা অধিষ্ঠিত। যেমন, রথ ইত্যাদি যন্ত্র সারথী ইত্যাদি পরের দ্বারা অধিষ্ঠিত হয়। বুদ্ধি ইত্যাদিও সুখদুঃখমোহাত্মক বলে পরের দ্বারা অধিষ্ঠিত হবে। সেই পর (বা শ্রেষ্ঠ) ত্রিগুণ থেকে ভিন্ন তত্ত্বই পুরুষ বা আত্মা—এটাই প্রমাণিত হল।

(হেতু-৪) পুরুষ আছে—এ বিষয়ে অন্য একটি হেতু বলা হয়েছে—ভোক্তা ছাড়া ভোগ্য হয় না বলে ভোগ্য সুখদুঃখ অনুকূল বা প্রতিকূল-রূপে কোন পর, অর্থাৎ সুখাদির বিপরীত, তত্ত্বের দ্বারা অনুভূত হয়। সেই বিপরীত তত্ত্বই পুরুষ। কারিকায় ভোক্তৃভাব শব্দে ভোগ্য সুখদুঃখ পুরুষে উপলক্ষিত। সুখদুঃখ বুদ্ধি ইত্যাদি পরের অনুকূল বা প্রতিকূল হতে পারে না, কেননা বুদ্ধি ইত্যাদি নিজেরাই সুখদুঃখমোহাত্মক বলে নিজেরাই নিজেদের বৃত্তি বা ব্যাপার হতে পারে না। সুতরাং, যিনি সুখাদির স্বরূপ নন, তিনিই সুখের অনুকূলনীয় এবং দুঃখের প্রতিকূলনীয় হয়ে থাকেন; এবং সেই কারণে তিনিই পুরুষ বা আত্মা—এটাই বক্তব্য।

অন্যেরা (যেমন, গৌড়পাদ) বলেন, বুদ্ধি ইত্যাদি ভোগ্য বা দৃশ্য। দৃশ্যতা যুক্তিযুক্ত হয় না। অতএব, দ্রষ্টা দৃশ্য বুদ্ধদির অতিরিক্ত। তিনিই পুরুষ বা আত্মা। ভোক্তৃভাবাৎ মানে দৃশ্যের দ্বারা দ্রষ্টার অনুমান হয়। সুখাদি স্বরূপ বলে পৃথিব্যাদির মত বুদ্ধাদিও দৃশ্য—এটা অনুমানের দ্বারা জানা যায়।

(হেতু-৫) পুরুষ আছে—এবিষয়ে আরো বলা হয়েছে—যেহেতু শাস্ত্র ও দিব্যলোচন মহর্ষিগণের কৈবল্যের জন্য প্রবৃত্তি হয়ে থাকে। দুঃখত্রয়ের আত্যন্তিক নিবৃত্তিরূপ কৈবল্য বুদ্ধাদির হতে পারে না। কারণ বুদ্ধি ইত্যাদি দুঃখাদিস্বভাব বলে কীভাবে নিজেদের স্বভাব থেকে মুক্ত হবে? কিন্তু বুদ্ধাদি থেকে ভিন্ন তত্ত্ব, দুঃখত্রয় থেকে আলাদা

হতে পারে। সুতরাং, শাস্ত্র ও মহর্ষিগণের কৈবল্যের জন্য প্রবৃত্তি হয় বলে বুদ্ধাদির অতিরিক্ত পুরুষ বা আত্মা আছে—এটাই প্রমণিত হল।

৩.১.৩ পুরুষের বহুত্ব

পুরুষের অস্তিত্ব প্রতিপাদনের পর "পুরুষ কী সকল শরীরে এক, না শরীর ভেদে ভিন্ন"— এই সংশয় হওয়ায় ঈশ্বরকৃষ্ণ শরীর ভেদে পুরুষের অনেকত্ব প্রতিপাদন করেছেন এই কারিকায়—

জন্মমরণকরণানাং প্রতিনিয়মাদযুগপৎপ্রবৃত্তেশ্চ।
পুরুষবহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্যবিপর্য্যয়াচ্চৈব।।

অর্থাৎ জীবের জন্ম-মরণ ও ইন্দ্রিয়সমুহের পৃথক পৃথক অস্তিত্বের জন্য, পৃথক পৃথক ভাবে অন্তঃকরণের চেষ্টা বা যত্নের জন্য এবং ত্রিগুণের বিশেষ বা তারতম্যবশত পুরুষের বহুত্ব প্রমাণিত হয়।

তাৎপর্য :

জিজ্ঞাসা : পুরুষ বা আত্মার বহুত্ব কীভাবে সিদ্ধ হয়?

উত্তর : (হেতু-১) জন্ম, মৃত্যু ও ইন্দ্রিয়গুলির পৃথক ব্যবস্থা থাকায়। নিকায়-বিশিষ্ট (অর্থাৎ মনুষ্যত্বাদি জাতি বিশিষ্ট) নতুন দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও সংস্কারের সঙ্গে পুরুষের সম্বন্ধকে জন্ম বলে। পুরুষের পরিণাম-রূপ জন্ম হয় না, তার অপরিণামিত্বের জন্য। এরূপ সম্বন্ধযুক্ত, অর্থাৎ নিকায়-বিশিষ্ট, উপাত্ত দেহাদির পরিত্যাগকে মৃত্যু বলে। আত্মার কিন্তু মৃত্যু হয় না, তার কুটস্থ-নিত্যত্ব স্বভাবের জন্য। বুদ্ধি ইত্যাদি ইন্দ্রিয় তেরোটি। জন্ম, মৃত্যু ও ইন্দ্রিয়গুলি প্রত্যেকের পৃথক পৃথক ব্যবস্থা আছে। সকল শরীরে একই আত্মা স্বীকার করলে অন্ধ, কালা ইত্যাদি হলে সকলেই অন্ধ, কালা ইত্যাদি হবে এবং একজন উন্মাদ হলে সকলেই উন্মাদ হবে। এভাবে অব্যবস্থা হবে। প্রতি শরীরে পুরুষভেদ থাকলে ব্যবস্থা হতে পারে।

পুরুষ বা আত্মা এক হলেও দেহরূপ উপাধি ভেদে তাদের ভেদ হতে পারে—এ রূপ ব্যবস্থা যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ তাহলে হাত, স্তন ইত্যাদি ভেদে জন্ম ও মরণাদির ব্যবস্থা হয়ে যাবে। (যেমন) বড় বড় অবয়ব (যথা) হস্তাদির ছেদন অথবা স্তনাদির উৎপত্তি হলে যুবতীর জন্ম বা মৃত্যু হয়—এরূপ বলা হবে।

(হেতু-২) প্রতি শরীরে পুরুষ বা আত্মা ভিন্ন—এবিষয়ে অন্য কারণ বলা হয়েছে—যেহেতু অযুগপৎ প্রবৃত্তি হয়, অর্থাৎ সকলের একই সঙ্গে ধর্মাদিতে প্রবৃত্তি হয় না। প্রযত্নরূপ প্রবৃত্তি যদিও অন্তকরণের ধর্ম, তবু পুরুষে তার উপচার হয়, অর্থাৎ অন্তঃকরণের ধর্ম প্রবৃত্তি আত্মার ধর্ম বলে বোধ হয়। সেরূপ হলে একটি শরীরে প্রযত্ন হলে সকল শরীরে পুরুষ এক হওয়ায় সকল শরীরেই প্রযত্ন হবে। তাহলে সকল শরীরই একই সঙ্গে চালিত হবে। কিন্তু পুরুষ বা অত্মা শরীরভেদে ভিন্ন হলে এই দোষ হয় না।

(হেতু-৩) শরীরভেদে পুরুষভেদ বিষয়ে আরো কারণ বলা হয়েছে, ত্রৈগুণ্য ইত্যাদির বিপর্যায়ের ফলেও, অর্থাৎ ত্রিগুণাদির প্রভাবের তারতম্যের ফলেও প্রতি শরীরে পুরুষ বা আত্মা ভিন্ন। তিনটি গুণকে একত্রে ত্রৈগুণ্য বলে। তার বিপর্যয় হল অন্যথাভাব। কেউ কেউ সত্ত্বপ্রধান, যেমন—উর্দ্ধস্রোতা ঋষি বা দেবগণ, কেউ কেউ রজো প্রধান, যেমন—তির্যগযোনিগণ (যথা পশু-পক্ষী, মৃগ ইত্যাদি)।পুরুষ বা আত্মা যদি এক হত, তবে এভাবে ত্রৈগুণ্য

বিপর্যয় বা অন্যথাভাবের ফলে ভিন্ন ভিন্ন শরীরে সুখাদির ভেদ হত না। অতএব, পুরুষ বা আত্মার ভেদ স্বীকারে কোন দোষ নাই।

কিন্তু এই অষ্টাদশ কারিকায় পুরুষের বহুত্ব সিদ্ধির পক্ষে তিনটি হেতু বা যুক্তি দেওয়া হলেও সাংখ্যকারিকায় কোথাও পুরুষ শব্দটি দ্বিবচন বা বহুবচন—এ ব্যবহার করা হয়নি, ঐ গ্রন্থে পুরুষ শব্দটি এবং তার প্রতিশব্দ, যথা—জ্ঞ, পুমান্, পুংস ইত্যাদি, সর্বদা একবচন-এ ব্যবহার করা হয়েছে। তাই সাংখ্যমতে পুরুষ এক না বহু?—এই প্রশ্নের উত্তরে মতভেদ দেখা যায়। প্রশ্ন উঠতে পারে যে—পুরুষ যদি বহু হত, তবে সাংখ্যকারিকায় পুরুষ শব্দটি কেন একবচন-এ ব্যবহার করা হয়েছে? অষ্টাদশ কারিকায় তিনটি হেতু বা যুক্তির সাহায্যে পুরুষের বহুত্ব সিদ্ধ করা হয়েছে। তবে কি, জাতি হিসেবে এক পুরুষ কীভাবে ব্যক্তি হিসেবে বহু হতে পারে, এই কারিকায় তারই পক্ষে যুক্তি দেওয়া হয়েছে? সাংখ্য কি ব্যক্তির অতিরিক্ত জাতি স্বীকার করে? তাছাড়া পুরুষের বহুত্ব সিদ্ধি কি বেদ বা শ্রুতির অদ্বৈত সিদ্ধান্তের বিরোধী নয়? আস্তিক সাংখ্য কীভাবে শ্রুতি বিরোধী হতে পারে? — এইসব প্রশ্নের উত্তর *সাংখ্যকারিকার* টীকাকার বাচস্পতি দেননি। তবে *সাংখ্যপ্রবচনসূত্র*-তে এইসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে এই সূত্রে —

"নাদ্বৈত শ্রুতিবিরোধঃ জাতিপরত্বাৎ"

এর অর্থ হল, সাংখ্য পুরুষ-বহুত্ব স্বীকার করলেও শ্রুতি বিরোধী নয়, কারণ সাংখ্য মতে পুরুষ ব্যক্তি হিসেবে বহু হলেও জাতি হিসেবে এক।

৩.২ সাংখ্য দর্শনে সৎকার্যবাদ

৩.২.১ সৎকার্য ও অসৎকার্য শব্দদুটির অর্থ

সৎকার্য শব্দের অর্থ উৎপত্তির পরের মত উৎপত্তির পূর্বেও কার্য তার উপাদান কারণে সৎ। অসৎকার্য শব্দের অর্থ উৎপত্তির পূর্বে কার্য তার উপাদান কারণে অসৎ। সাংখ্য সৎকার্য স্বীকার করে। মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শনও সৎকার্য স্বীকার করে। তবে তাদের মধ্যে মতভেদ আছে। ন্যায়, বৈশেষিক ও বৌদ্ধ দর্শন সৎকার্য স্বীকার করে না। তারা অসৎকার্য স্বীকার করে। তাদের মধ্যেও মতভেদ আছে। বাচস্পতি অসৎকার্যের পক্ষে ন্যায়দর্শন-উত্থাপিত যুক্তিগুলি পূর্বপক্ষ-রূপে উপস্থাপন ও খণ্ডন করে সৎকার্য সিদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন —

> সৎকার্য (বা কার্য সৎ) বলতে কারণ ব্যাপারের পূর্বেও কার্য কারণে সৎ - এটা বুঝতে হবে। এভাবে বললে নৈয়ায়িকরা যে সিদ্ধসাধন দোষ উদ্ভাবন করেন তা যুক্তিযুক্ত হবে না। যদিও বীজ ও মৃৎপিণ্ড ধ্বংসের পরেই অঙ্কুর ও ঘটাদির উৎপত্তি হতে দেখা যায়, তবু কেবল বীজ ও মৃৎপিণ্ডের ধ্বংস অঙ্কুর ও ঘটাদির উৎপত্তির কারণ নয়, বরং বীজাদির অবয়বরূপ ভাব-পদার্থই অঙ্কুরাদির কারণ।

যে বিষয়টি সিদ্ধ বা প্রমাণিত, এমনকি প্রতিবাদীও যা মেনে নেন, সেটি পুনরায় সিদ্ধ বা প্রমাণ করার চেষ্টাকে বলে সিদ্ধসাধন। সিদ্ধসাধন একটি দোষ। যেমন, কার্য তার উৎপত্তির পরে সৎ—এই বিষয়টি সিদ্ধ বা প্রমাণিত, বাদী সাংখ্যের মত প্রতিবাদী নৈয়ায়িকগণও এটা মানেন। কার্য তার উৎপত্তির পরে সৎ—এই বিষয়টি প্রমাণ করার চেষ্টা হলে সিদ্ধসাধন দোষ দেখা দিত। কিন্তু, সাংখ্যমতে কার্য শুধু তার উৎপত্তির পরেই সৎ নয়,

উৎপত্তির পরের মত উৎপত্তির পূর্বেও কার্য তার উপাদান কারণে সৎ (কারণব্যাপারাৎ প্রাগপীতি শেষঃ)। সুতরাং, উৎপত্তির পূর্বে কার্য অসৎ—এই ন্যায়মত খণ্ডণ করে সাংখ্য উৎপত্তির পরের মত উৎপত্তির পূর্বেও কার্য তার উপাদান কারণে সৎ—এটা প্রমাণ করে বলে সাংখ্যের এই মত (অর্থাৎ সৎকার্য) সিদ্ধসাধন দোষ দুষ্ট নয়।

৩.২.২ সৎকার্যবাদ ও অসৎকার্যবাদ শব্দদুটির অর্থ

যে মতবাদ অনুসারে উৎপত্তির পরের মত উৎপত্তির পূর্বেও কার্য তার উপাদান কারণে সৎ তাকে বলে সৎকার্যবাদ। যে মতবাদ অনুসারে উৎপত্তির পূর্বে কার্য তার উপাদান কারণে অসৎ তাকে বলে অসৎকার্যবাদ। সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শন সৎকার্যবাদী। তবে তাদের মধ্যে মতভেদ আছে। ন্যায়, বৈশেষিক ও বৌদ্ধ দর্শন সৎকার্য স্বীকার করে না। তারা অসৎকার্যবাদী। তাদের মধ্যেও মতভেদ আছে। বাচস্পতি অসৎকার্যের পক্ষে ন্যায়দর্শন উত্থাপিত যুক্তিগুলি পূর্বপক্ষরূপে উপস্থাপন ও খণ্ডন করে সৎকার্যবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। সাংখ্যমতে কারণ ও কার্য উভয়ই সৎ। সৃষ্টিকালে সৎ কারণ সৎ কার্যে পরিণাম প্রাপ্ত হয় এবং প্রলয়কালে সৎ কার্য সৎ কারণে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। তাই সাংখ্য দর্শনের সৎকার্যবাদ পরিণামবাদ নামে পরিচিত।

৩.২.৩ সাংখ্য দর্শনে সৎকার্য-সিদ্ধি

কণাদ ও অক্ষপাদ গৌতমের মতে সৎ কারণ পরমাণু থেকে দ্ব্যণুকাদি অসৎ-এর উৎপত্তি হয়। তাদের মত অনুযায়ী সৎ ও অসৎ-এর প্রভেদ প্রমাণিত হয় না। সেজন্য কারণ কার্য থেকে অভিন্ন হয় না বলে প্রধানের সিদ্ধি হয় না। অতএব প্রাধান সিদ্ধির জন্য প্রথমে সৎকার্যবাদ প্রতিপাদন করা হচ্ছে এই ভাবে—

অসদকরণাদুপাদানগ্রহণাৎসর্ব্বসম্ভবাভাবাৎ।
শক্তস্য শক্যকরণাৎকারণভাবাচ্চসৎকার্য্যম্।।

অর্থাৎ যা নেই তাকে উৎপন্ন করা যায় না, কার্য উৎপাদনে সমর্থ বস্তু থেকেই উৎপাদনযোগ্য বস্তু উৎপন্ন হতে পারে, যে কোন কিছু থেকে যে কোন কিছু উৎপন্ন হয়না, একটি বস্তু যে কার্য উৎপাদনে সমর্থ সেই বস্তুটি কেবলমাত্র সেই কার্যই উৎপাদন করে এবং কার্য স্বরূপত কারণ থেকে অভিন্ন বলে একটি কার্য উৎপত্তির পূর্বে তার উপাদান কারণে অস্তিত্বশীল থাকে।

তাৎপর্য :

অভাব (বা অসৎ কারণ) থেকে ভাবের (বা সৎকার্যের) উৎপত্তি স্বীকার করলে অভাব সর্বত্র থাকে বলে, অর্থাৎ দৃশ্যমান জগতের জ্ঞানের বাধক না থাকায় প্রপঞ্চকে মিথ্যা বলা যায় না। কণাদ ও গৌতমের মত (খণ্ডনের জন্য) কার্য সৎ—এই প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে। এই প্রতিজ্ঞার হেতু বলা হয়েছে---

(হেতু-১) যা অসৎ তাকে উৎপন্ন করা যায় না বলে (কার্য উৎপত্তির পূর্বেও সৎ)। যদি কারণ-ব্যাপারের পূর্বে কার্য (উৎপাদন কারণে) অসৎ হয়, তবে কেউই তাকে উৎপন্ন করতে পারে না। সহস্র শিল্পীও নীলকে পীত (বা হলুদ) করতে পরেনা।

পূর্বপক্ষী অসৎকার্যবাদী নৈয়ায়িক বলেন, সত্তা এবং অসত্তা উভয়ই ঘটের ধর্ম হতে পারে। যেমন ,উৎপত্তির পূর্বে অসত্তা এবং উৎপত্তির পরে সত্তা ঘটের ধর্ম হতে বাধা নেই।

উত্তরে সৎকার্যবাদী সাংখ্যকার বলেন, সেরূপ হলে ধর্মী (ঘট) না থাকলে তার ধর্ম (অসত্তা) থাকতে পারে না। ঘটের উৎপত্তির পূর্বে ধর্মী ঘটের অসত্তা-রূপ ধর্ম স্বীকার করলে ঐ ধর্মী ঘটের তৎকালে সত্তা স্বীকার করতে হয়। অসত্তা -রূপ ধর্ম ঘটরূপ ধর্মীতে সম্বদ্ধ না হলে, কিংবা ঘটের স্বরূপ না হলে, অসত্তা-রূপ ধর্মের দ্বারা কীভাবে 'ঘট নেই'—এরূপ জ্ঞান হবে? অতএব, কারণ-ব্যাপারের পরের মত কারণ-ব্যাপারের পূর্বেও কার্য উপাদান কারণে সৎ। কারণ-ব্যাপারের ফলে এই সৎ কার্যেরই অভিব্যক্তি উৎপন্ন হয়। যেমন, পীড়ন বা পেষনের দ্বারা তিল থেকে তেল উৎপন্ন হয়। যেমন, পীড়ন বা পেষনের দ্বারা তিল থেকে তেল উৎপন্ন হয়, আঘাতের দ্বারা ধান থেকে চাল উৎপন্ন হয়, দোহনের দ্বারা গাভী থেকে দুধ পাওয়া যায়। কিন্তু অসদ্বস্তু উৎপন্ন হচ্ছে, এমন কোথাও দেখা যায় না। সুতরাং কারণ-ব্যাপারের পূর্বে কার্য যে সৎ, তার হেতু বলা হয়েছে—

(হেতু-২) উপাদান গ্রহণের ফলে কার্য উৎপত্তির পূর্বেও সৎ। উপাদান শব্দের অর্থ কারণ, তার গ্রহণ হল কার্যের সঙ্গে সম্বন্ধ। উপাদানের সঙ্গে কার্যের সম্বন্ধের ফলে কার্যকে তার উপাদান কারণে সৎ বলে স্বীকার করতে হয়। আবার এভাবেও বলা যায়, কার্যের সঙ্গে কার্যকারণভাব-রূপে নিয়ত সম্বদ্ধ কারণই কার্যের জনক। কার্য উৎপত্তির পূর্বেও কারণে অসৎ হলে কারণের সঙ্গে কার্যের এই সম্বন্ধ সম্ভব হয় না। অতএব কার্য উৎপত্তির পূর্বেও কারণে সৎ।

(হেতু-৩) আচ্ছা, কার্যের সঙ্গে অসম্বদ্ধ কারণ থেকে কার্য জন্মায় না কেন? তাহলে কারণ-ব্যাপারের পূর্বে অসৎ কার্যের উৎপত্তি হত। উত্তরে বলা হয়েছে—একই উপাদান থেকে সকল বস্তু জন্মায় না বলে কার্য উৎপত্তির পূর্বেও সৎ। কারণের সঙ্গে সম্বন্ধ রহিত কার্যের উৎপত্তি স্বীকার করলে ঐ সম্বন্ধাভাবের কোন বিশেষ (দৃষ্টান্ত) না থাকায় সকল কার্য সর্বদা সকল কারণ থেকেই উৎপন্ন হত, কিন্তু সেরূপ হয় না। অতএব, কার্যের সঙ্গে অসম্বদ্ধ কারণ থেকে কারণের সঙ্গে অসম্বদ্ধ কার্য জন্মায় না। যেমন প্রাচীন সাংখ্যকারগণ বলেছেন, উৎপত্তির পূর্বে কার্যের অসত্তা স্বীকার করলে কার্যের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত কারণের সঙ্গে কার্যের সম্বন্ধ হয় না। কারণের সঙ্গে অসম্বদ্ধ কার্যের উৎপত্তি স্বীকার করলে এই নিয়ম থাকে না।

(হেতু-৪) আবার এভাবেও বাল যায়, কারণের সঙ্গে অসম্বদ্ধ হলেও ঐ কারণ সেই কার্যকেই উৎপাদন করবে যে কার্য উৎপাদনে সেই কারণ শক্ত বা সমর্থ। কার্য দেখেই কারণের এই কার্য উৎপাদন শক্তি জানা যায়। সুতরাং, কোন অব্যবস্থা নেই। সেজন্য কারিকায় বলা হযেছে—শক্ত কারণ শক্য কার্যকে উৎপন্ন করে বলে কার্য উৎপত্তির পূর্বেও সৎ।

শক্ত কারণে আশ্রিত সেই শক্তি কি সর্বত্র অর্থাৎ সকল পদার্থ থাকে? না কি কেবল শক্য কার্যে থাকে? যদি সর্বত্র থাকে, তবে অব্যবস্থা হবে। কারণ, সকল বস্তু থেকে সকল বস্তু জন্মালে কোন নিয়ম থাকবে না। শক্তি যদি কেবল শক্য কার্যে থাকে, তবে কীভাবে অসৎ শক্যকার্যে শক্তি থাকবে? এমন একটি বিশেষ শক্তি কারণে থাকে, যার দ্বারা একটি বিশেষ কার্য জন্মায়, কিন্তু সকল কার্য জন্মায় না—এরূপ যদি বলা হয়, তবে প্রশ্ন হল, সেই বিশেষ শক্তি কার্যের সঙ্গে সম্বদ্ধ, না অসম্বদ্ধ? যদি সম্বদ্ধ হয, তবে অসৎ কার্যের সঙ্গে শক্তি বিশেষের সম্বন্ধ হতে পারে না বলে কার্য উৎপত্তির পূর্বেও সৎ। অসম্বদ্ধ হলে সকল বস্তু থেকে সকল কার্য উৎপন্ন হতে পারে—এরূপ অব্যবস্থা হবে। তাই যথার্থই বলা হয়েছে—শক্ত কারণ শক্য কার্যকে উৎপন্ন করে বলে কার্য উৎপত্তির পূর্বেও সৎ।

(হেতু-৫) উৎপত্তির পূর্বেও কার্য সৎ—এই মতের পক্ষে বলা হয়েছে যে কার্য করণ-স্বরূপ বলে, অর্থাৎ

কার্য কারণাত্মক বলে উৎপত্তির পর্বেও কার্য সৎ। কারণ থেকে কার্য ভিন্নই নয়। সৎ কারণ থেকে অভিন্ন কার্য কীভাবে অসৎ হবে? কার্য ও কারণের অভেদ সাধক অনেক প্রমাণ আছে। যেমন—

- কাপড় সূতো থেকে ভিন্ন নয়। (প্রতিজ্ঞা)
- যেহেতু কাপড় সূতোর ধর্মযুক্ত। (হেতু)
- যে বস্তুটি যে বস্তু থেকে ভিন্ন সেটি তার ধর্ম হয় না। যেমন, গরু ঘোড়া থেকে ভিন্ন বলে ঘোড়ার ধর্ম হয় না । (উদাহরণ)
- কাপড় সূতোর ধর্ম হয়ে থাকে। (উপনয়)
- অতএব, কাপড় সূতো থেকে ভিন্ন নয়। (নিগমন)

এভাবে—

- সূতো ও কাপড় পৃথক বস্তু নয়। (প্রতিজ্ঞা)
- যেহেতু সূতো ও কাপড়ের মধ্যে উপাদান-উপাদেয় বা কারণ-কার্য ভাব আছে। (হেতু)
- যে দুটি পদার্থ পৃথক, তাদের মধ্যে কারণ-কার্যভাব থাকে না। যেমন, ঘট ও কাপড়। (উদাহারণ)
- সূতো ও কাপড়ের মধ্যে কারণ-কার্য ভাব আছে। (উপনয়)
- অতএব, সূতো ও কাপড় পৃথক বস্তু নয়। (নিগমন)

এভাবে—

- সেহেতু এরা আলাদা বস্তু নয়। (নিগমন)
- সূতো ও কাপড় ভিন্ন বস্তু নয়। (প্রতিজ্ঞা)
- তাদের মধ্যে সংযোগ ও বিয়োগের অভাব থেকেও এটা সিদ্ধ হয়। (হেতু)
- সূতো ও কাপড় ভিন্ন বস্তু হলে তাদের মধ্যে সংযোগ দেখা যেত। যেমন, কুন্ড (একটি বিশেষ ধরণের পাত্র) এবং বদর (বা কুল ফল) দুটি পৃথক বস্তু বলে তাদের মধ্যে সংযোগ দেখা যায়। অথবা হিমালয় বা বিন্ধ্য পর্বতের মত তাদের মধ্যে বিয়োগ (বা অপ্রাপ্তি) দেখা যেত। (উদাহরণ)
- এখানে সূতো ও কাপড়ের মধ্যে সংযোগ ও বিয়োগ দেখা যায় না। (উপনয়)
- অতএব, সূতো ও কাপড়ের মধ্যে ভিন্ন বস্তুত্ব নেই। (নিগমন)

এভাবে—

- কাপড় সূতো থেকে ভিন্ন নয়। (প্রতিজ্ঞা)
- যেহেতু সূতোর ওজনের চেয়ে কাপড়ের ওজন ভিন্ন নয়। (হেতু)
- (ব্যবহারে) দেখা যায়, যে বস্তুটি (অন্য) যে বস্তু থেকে ভিন্ন, সেই বস্তুটির তদ্ভিন্ন বস্তু থেকে পৃথক ওজন থাকে। যেমন, এক পল পরিমাণ স্বস্তিকের ওজনের বা তুলাদন্ডের অবনতির চেয়ে দুই পল পরিমান স্বস্তিকের ওজন বা তুলাদন্ডের অবনতি অধিক হয়। (উদাহরণ)
- কিন্তু, অনুরূপভাবে সূতোর ওজনের চেয়ে কাপড়ের ওজনের ভেদ দেখা যায় না। (উপনয়)
- অতএব, কাপড় সূতো থেকে ভিন্ন নয়। (নিগমন)

প্রদর্শিত এই অবীত অনুমানগুলি কার্য ও কারণের অভেদ সাধক। এভাবে এদের অর্থাৎ কার্য ও কারণের অভেদ সিদ্ধ হলে সুতোগুলি সেই সেই আকার, অর্থাৎ বিশেষ আকারে, সাজালেই কাপড় রূপে পরিণত হয়। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে সুতো থেকে ভিন্ন কাপড় নামে কোন বস্তু নেই। একই বস্তুতে ক্রিয়া (অর্থাৎ, উৎপত্তি), নিরোধ (অর্থাৎ ধ্বংস), ব্যাপদেশ (অর্থাৎ ব্যবহার), অর্থক্রিয়াভেদ (অর্থাৎ, বিবিধ প্রয়োজন সাধন) এবং ক্রিয়া ব্যবস্থাভেদ (অর্থাৎ প্রয়োজন সাধনের নিয়ম) ইত্যাদির হেতু নিশ্চিতভাবে কার্য ও কারণের ভেদ সাধন করতে পারে না, বরং একই বস্তুতে সেই সেই নির্দিষ্ট বিশেষের আর্বির্ভাব ও তিরোভাব দ্বারা এদের প্রদর্শিত বিরোধ দূর হতে পারে।

যেমন, কচ্ছপের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কচ্ছপের শরীরে প্রবেশ করলে তিরোহিত হয় এবং শরীর থেকে বেরিয়ে এলে আর্বিভূত হয় বলে ব্যবহার হয়, কিন্তু কচ্ছপের শরীর থেকে কচ্ছপের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উৎপন্ন হয় না। এভাবে এক টুকরো মাটি বা সোনা থেকে ঘট মুকুটাদি কার্য-বিশেষ নিঃসরণ বা প্রকাশিত হলে তাদের আর্বিভূত বা উৎপন্ন হল বলা হয় এবং সেগুলি, অর্থাৎ ঘট ও মুকুটাদি, তাদের কারণ যথাক্রমে মাটি ও সোনায় মিশে গেলে বা প্রবেশ করলে এরা তিরোহিত বা বিনষ্ট হয়েছে বলে বলা হয়। কিন্তু অসৎ-এর উৎপত্তি বা সৎ-এর বিনাশ হয় না। যেমন, ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলেছেন, "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ" (অর্থাৎ অসতের উৎপত্তি হয় না এবং সতের নাশ হয় না)।

যেমন, কচ্ছপ সঙ্কুচিত ও বিকাশিত অবস্থায় নিজের শরীর থেকে ভিন্ন নয়, ঠিক সেই ভাবে ঘটমুকুটাদি যথাক্রমে মাটি ও সোনা থেকে ভিন্ন নয়। এভাবে কার্য ও কারণের অভেদ সিদ্ধ হলে সুতোয় কাপড় থাকে এবং বনে তিলক (এক ধরণের গাছ) থাকে—এরূপ ব্যবহার যুক্তিযুক্ত হয়। অর্থ ও ক্রিয়ার ভেদও কার্য ও কারণের ভেদ সাধন করে না, যেহেতু একই বস্তুর অনেক ক্রিয়া দেখা যায়। যেমন, একই আগুন দহন, প্রকাশ ও পাক করে। অর্থক্রিয়-ব্যবস্থাও বস্তু-ভেদের হেতু হয় না, যেহেতু সকল বস্তুরই মিলিত ও পৃথক অবস্থায় অর্থক্রিয়া-ব্যবস্থা দেখা যায়। যেমন, পালকি বাহকরা প্রত্যেকে আলাদা ভাবে কেবল পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া-রূপ অর্থক্রিয়া করতে পারে। সেইরূপ সুতোগুলি আলাদা আলাদা ভাবে কিছু আচ্ছাদন করতে পারে না, কিন্তু পরস্পর মিলিত হয়ে কাপড়-রূপে কোন বস্তু আচ্ছাদন করতে পারে।

যাই হোক, পূর্বপক্ষী নৈয়ায়িকগণের জিজ্ঞাসা ঃ কারণ ব্যাপারের পূর্বে কাপড়ের আবির্ভাব বা উৎপত্তি সৎ না অসৎ? যদি অসৎ বলা হয়, তবে অসতের উৎপত্তি স্বীকার করা হয়; আবার যদি সৎ বলা হয়, তবে কারণ-ব্যাপারের কী প্রয়োজন? কারণ-ব্যাপারের পূর্বে কার্য সৎ হলে কারণ-ব্যাপারের কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। আবির্ভাবে অন্য আবির্ভাব কল্পনা করলে, অর্থাৎ আবির্ভবের আবির্ভাব কল্পনা করতে থাকলে অনবস্থা দোষ হয়। অতএব, সুতো থেকে কাপড়ের আবির্ভাব হয়, একথার কোন অর্থ নেই।

পূর্বপক্ষী নৈয়ায়িকদের প্রতি সাংখ্যের উত্তর ঃ আপনারা যখন বলেন, অসৎ উৎপন্ন হয়, তখন (এই উক্তিতে) আপনারা যে অসতের কথা বলেছেন, সেই অসৎ-এর উৎপত্তিটি কীরূপ? এটি কি সৎ, না অসৎ? সৎ বললে কারণ-ব্যাপার নিরর্থক হয়, আবার অসৎ হলে সেই অসৎ-এর উৎপত্তিটি অসৎ এবং সেই অসৎ-এর অসৎ উৎপত্তিও অসৎ—এভাবে অনবস্থা দোষ হয়। কাপড়ের উৎপত্তি কাপড় থেকে ভিন্ন নয়, বরং কাপড়ের উৎপত্তি কাপড়ই—যদি এরূপ বলা হয়, তবে কাপড় বলা মাত্রই কাপড়ের উৎপত্তি হচ্ছে—একথাও বলা হয়েছে; যার ফলে কাপড়ের

উৎপত্তি কথাটি বলার আর প্রয়োজন থাকে না। অন্যথায় পুনরুক্তি দোষ হয়। কাপড় বিনষ্ট হয়, একথাও বলা যায় না; কারণ একই সময়ে একই বস্তুতে উৎপত্তি ও বিনাশ থাকতে পারে না। অতএব কাপড়ের উৎপত্তিকে নিজের কারণে সমবায় সম্বন্ধ অথবা নিজের সত্তায় সমবায় সম্বন্ধ বলতে হবে। উভয় পক্ষেই কাপড় উৎপন্ন হতে পারে না। কারণ, সমবায় নিত্য বলে তার সঙ্গে অভিন্ন উৎপত্তি-ক্রিয়াও নিত্য হয় এবং নিত্যের উৎপত্তি নেই। এভাবে যেমন উৎপত্তি সম্ভব হয় না, অথচ ঐ উৎপত্তির জন্য কারণের ব্যাপার হয়, তেমনি কাপড় উৎপত্তির পূর্বে সৎ হলেও তার আবির্ভাবের জন্য কারণের আবির্ভাব আছে —একথা যুক্তিযুক্ত। কাপড়ের রূপের সঙ্গে কাপড়ের কারণ সুতোগুলির সম্বন্ধ হতে পারে না। কারণ, কাপড়ের রূপ ক্রিয়া নয়। ক্রিয়ার সঙ্গে কারণের সম্বন্ধ হয়ে থাকে, অন্যথায় কারণের অভাব থাকে। অতএব উৎপত্তির পূর্বে কার্য সৎ— একথা বলা যুক্তিযুক্ত।

৩.৩ সাংখ্যমতে পরিণাম

সাংখ্যমতে প্রকৃতি নিয়ত পরিণামশীলা। প্রলয় এবং সৃষ্টি উভয় অবস্থায় ঘটে চলেছে পরিণাম। সাংখ্যে প্রলয় বলতে বোঝায় (১) ব্যক্ত অবস্থা থেকে অব্যক্ত অবস্থায় প্রকৃতির পরিণাম এবং (২) প্রকৃতির অব্যক্ত অবস্থা। বিপরীত ভাবে বলা যায়, সাংখ্যমতে সৃষ্টি হল প্রকৃতির অব্যক্ত অবস্থা থেকে ব্যক্ত অবস্থায় পরিণাম।

সৃষ্টির পূর্বে প্রকৃতিতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ সাম্যাবস্থায় থাকে। গুণত্রয়ের এই সাম্যাবস্থা হল প্রলয়। তখন প্রকৃতিতে চলে সরূপ পরিণাম। এই অবস্থায় সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করে না, এরা প্রত্যেকেই নিজের মধ্যে পরিণমিত হতে থাকে। এই অবস্থায় প্রকৃতিতে যে পরিণাম ঘটে তাকে বলে সরূপ পরিণাম। পুরুষের সঙ্গে সংযোগের ফলে গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা বিনষ্ট হয়। তখন সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। এই অবস্থায় প্রকৃতিতে যে পরিণাম ঘটে তাকে বলে বিরূপ পরিণাম। বিরূপ পরিণাম আবার দুই প্রকার, যথা—অনুলোম পরিণাম এবং প্রতিলোম পরিণাম।

গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা বিনষ্ট হলে প্রথমে মূলপ্রকৃতি থেকে উৎপন্ন হয় মহৎ বা বুদ্ধি, তারপর মহৎ থেকে অহঙ্কার এবং অহঙ্কার থেকে ক্রমে ক্রমে মনস্, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র বা পঞ্চসূক্ষ্মভূত এবং পরিশেষে পঞ্চতন্মাত্র থেকে উৎপন্ন হয় পঞ্চমহাভূত বা পঞ্চস্থূলভূত। এইভাবে সূক্ষ্ম থেকে স্থূল তত্ত্বের আবির্ভাব ঘটে। এটাই অনুলোম পরিণাম, যাকে আমরা সৃষ্টি বলি।

সৃষ্টির অন্তে শুরু হয় স্থূল তত্ত্বের সূক্ষ্ম তত্ত্বে লয় হবার প্রক্রিয়া। এটাই প্রতিলোম পরিণাম,—যে প্রক্রিয়ার সূচনায় ঘটে প্রলয়ের শুরু এবং অন্তে ঘটে সৃষ্টির পরিপূর্ণ লয় বা প্রকৃতিলয়, অর্থাৎ ঘটে গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা। প্রতিলোম পরিণাম শুরু হলে প্রথমে পঞ্চমহাভূত বা পঞ্চস্থূলভূত-এর লয় হয় পঞ্চতন্মাত্র বা পঞ্চসূক্ষ্মভূত-এ, তারপর ক্রমে ক্রমে পঞ্চতন্মাত্র বা পঞ্চসূক্ষ্মভূত পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনস্-এর লয় হয় অহঙ্কার-এ, তারপর অহঙ্কার-এর লয় হয় মহৎ বা বুদ্ধি-তে এবং পরিশেষে মহৎ বা বুদ্ধি লয় প্রাপ্ত হয় মূলপ্রকৃতি-তে।

৩.৪ সারসংক্ষেপ

ন্যায় ও বৈশেষিক সম্প্রদায়ের দার্শনিকগণ বলেন ব্যক্ত থেকে ব্যক্ত এবং তার গুণের উৎপত্তি সম্ভব হলে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত অব্যক্ত কল্পনার প্রয়োজন কী? এরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলা হয়েছে—

ভেদাদি, অর্থাৎ মহদাদি ত্রয়োবিংশতি কার্যবিশেষ পরিমিত বলে, কারণ ও কার্যের মধ্যে গুণের দিক থেকে সমতা থাকায়, কারণের শক্তির দ্বারা কার্যের উৎপত্তি হওয়ায় এবং সকল উৎপন্ন বস্তুতে সৃষ্টি কালে কারণ ও কার্যের বিভাগ থাকায় এবং প্রলয় কালে ঐরূপ বিভাগ না থাকায় অব্যক্ত প্রধানের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।

তুষ্টি বা বিষয়ভোগকেই মুখ্য প্রয়োজন মনে করেন এমন যে সব ব্যক্তি মহৎ, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয় বা ভূতগুলিকেই আত্মা মনে করেন, পুরুষের অস্তিত্ব প্রমাণিত বলে মানেন না, তাঁদের প্রতি বলা হয়েছে—

সংঘাতবস্তু অপরের প্রয়োজন সাধন করে থাকে, ত্রিগুণ ইত্যাদির বিপরীত কেউ আছে, কোন চেতন অধিষ্ঠাতা ছাড়া জড়বর্গ চলতে পারে না, রূপরসাদি ভোগ্যবস্তুর ভোক্তা আছে এবং কেবল বা শুদ্ধ আত্মার ভাব কৈবল্য বা মোক্ষ লাভের জন্য চেষ্টা আছে বলে পুরুষ আছেন—এটাই প্রমাণিত হয়।

পুরুষের অস্তিত্ব প্রতিপাদনের পর "পুরুষ কী সকল শরীরে এক, না শরীর ভেদে ভিন্ন?"—এই সংশয় হওয়ায় ঈশ্বরকৃষ্ণ শরীর ভেদে পুরুষের অনেকত্ব প্রতিপাদন করছেন এইভাবে—

> জীবের জন্ম-মরণ ও ইন্দ্রিয়সমূহের পৃথক পৃথক অস্তিত্বের জন্য, পৃথক পৃথক ভাবে অন্তঃকরণের চেষ্টা বা যত্নের জন্য এবং ত্রিগুণের বিশেষ বা তারতম্যবশত পুরুষের বহুত্ব প্রমাণিত হয়।

সৎকার্য শব্দের অর্থ উৎপত্তির পরের মত উৎপত্তির পূর্বেও কার্য তার উপাদান কারণে সৎ। অসৎকার্য শব্দের অর্থ উৎপত্তির পূর্বে কার্য তার উপাদান কারণে অসৎ। সাংখ্য সৎকার্য স্বীকার করে। ন্যায়, বৈশেষিক ও বৌদ্ধ দর্শন সৎকার্য স্বীকার করে না। তারা অসৎকার্য স্বীকার করে। বাচস্পতি অসৎকার্যের পক্ষে ন্যায়দর্শন উত্থাপিত যুক্তিগুলি উপস্থাপন করে বলেন—

সৎকার্য (বা কার্য সৎ) বলতে কারণ ব্যাপারের পূর্বেও কার্য কারণে সৎ —এটা বুঝতে হবে। এভাবে বললে নৈয়ায়িকরা যে সিদ্ধসাধন দোষ উদ্ভাবন করেন তা যুক্তিযুক্ত হবে না।

সাংখ্যমতে কার্য শুধু তার উৎপত্তির পরেই সৎ নয়, উৎপত্তির পরের মত উৎপত্তির পূর্বেও কার্য তার উপাদান কারণে সৎ (কারণব্যাপারাৎ প্রাগপীতি শেষঃ)। সুতরাং, উৎপত্তির পূর্বে কার্য অসৎ—এই ন্যায়মত খণ্ডন করে সাংখ্য উৎপত্তির পরের মত উৎপত্তির পূর্বেও কার্য তার উপাদান কারণে সৎ—এটা প্রমাণ করে বলে সাংখ্যের এই মত (অর্থাৎ সৎকার্য) সিদ্ধসাধন দোষে দুষ্ট নয়।

যে মতবাদ অনুসারে উৎপত্তির পরের মত উৎপত্তির পূর্বেও কার্য তার উপাদান কারণে সৎ তাকে বলে সৎকার্যবাদ। যে মতবাদ অনুসারে উৎপত্তির পূর্বে কার্য তার উপাদান কারণে অসৎ তাকে বলে অসৎকার্যবাদ। সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শন সৎকার্যবাদী। তবে তাদের মধ্যে মতভেদ আছে। ন্যায়, বৈশেষিক ও বৌদ্ধ দর্শন সৎকার্য স্বীকার করে না। তারা অসৎকার্যবাদী। তাদের মধ্যেও মতভেদ আছে। সাংখ্যমতে কারণ ও কার্য উভয়ই সৎ। সৃষ্টিকালে সৎ কারণ সৎ কার্যে পরিণাম প্রাপ্ত হয় এবং প্রলয়কালে সৎ কার্য সৎ কারণে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। তাই সাংখ্যদর্শনের সৎকার্যবাদ পরিণামবাদ নামে পরিচিত।

কণাদ ও অক্ষপাদ গৌতমের মতে সৎ কারণ পরমাণু থেকে দ্ব্যণুকাদি অসৎ-এর উৎপত্তি হয়। তাদের মত নুযায়ী সৎ ও অসৎ-এর প্রভেদ প্রমাণিত হয় না। সেজন্য কারণ কার্য থেকে অভিন্ন হয় না বলে প্রধানের সিদ্ধি হয় না। অতএব, প্রধান সিদ্ধির জন্য প্রথমে সৎকার্যবাদ প্রতিপাদন করা হয়েছে এইভাবে—

যা নেই তাকে উৎপন্ন করা যায় না, কার্য উৎপাদনে সমর্থ বস্তু থেকেই উৎপাদনযোগ্য বস্তু উৎপন্ন হতে পারে, যে কোন কিছু থেকে যে কোন কিছু উৎপন্ন হয় না, একটি বস্তু যে কার্য উৎপাদনে সমর্থ সেই বস্তুটি কেবলমাত্র সেই কার্যই উৎপাদন করে এবং কার্য স্বরূপত কারণ থেকে অভিন্ন বলে একটি কার্য উৎপত্তির পূর্বে তার উপাদান কারণে অস্তিত্বশীল থাকে।

সৃষ্টির পূর্বে প্রকৃতিতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ সাম্যাবস্থায় থাকে। গুণত্রয়ের এই সাম্যাবস্থা হল প্রলয়। তখন প্রকৃতিতে চলে সরূপ পরিণাম। এই অবস্থায় সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ প্রত্যেকেই নিজের মধ্যে পরিণমিত হতে থাকে। পুরুষের সঙ্গে সংযোগের ফলে গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা বিনষ্ট হয়। তখন সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। এই অবস্থায় প্রকৃতিতে যে পরিণাম ঘটে তাকে বলে বিরূপ পরিণাম। বিরূপ পরিণাম আবার দুই প্রকার, যথা—অনুলোম পরিণাম এবং প্রতিলোম পরিণাম।

গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা বিনষ্ট হলে প্রথমে মূলপ্রকৃতি থেকে উৎপন্ন হয় মহৎ বা বুদ্ধি, তারপর মহৎ থেকে অহঙ্কার এবং অহঙ্কার থেকে ক্রমে ক্রমে মনস্, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র এবং পরিশেষে পঞ্চতন্মাত্র থেকে উৎপন্ন হয় পঞ্চমহাভূত বা পঞ্চস্থূলভূত। এইভাবে সুক্ষ্ম থেকে স্থূল তত্ত্বের আবির্ভাব ঘটে। এটাই অনুলোম পরিণাম, যাকে আমরা সৃষ্টি বলি।

সৃষ্টির অন্তে শুরু হয় স্থূল তত্ত্বের সূক্ষ্ম তত্ত্বে লয় হবার প্রক্রিয়া। এটাই প্রতিলোম পরিণাম। প্রতিলোম পরিণাম শুরু হলে প্রথমে পঞ্চমহাভূত বা পঞ্চস্থূলভূত-এর লয় হয় পঞ্চতন্মাত্র বা পঞ্চসূক্ষ্মভূত-এ, তারপর ক্রমে ক্রমে পঞ্চতন্মাত্র বা পঞ্চসূক্ষ্মভূত পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনস্-এর লয় হয় অহঙ্কার-এ, তারপর অহঙ্কার-এর লয় হয় মহৎ বা বুদ্ধি-তে এবং পরিশেষে মহৎ বা বুদ্ধি লয় প্রাপ্ত হয় মূলপ্রকৃতি-তে।

৩.৫ প্রধান শব্দগুচ্ছ

শব্দ	অর্থ
সংঘাত	পরস্পর মিলিত হয়ে কাজ করে এমন বস্তু
সৎকার্য	কারণ-ব্যাপারের পূর্বে কার্য কারণে সৎ
অসৎকার্য	কারণ- ব্যাপারের পূর্বে কার্য কারণে অসৎ
সৎকার্যবাদ	যে মতবাদ অনুসারে উৎপত্তির পরের মত উৎপত্তির পূর্বেও কার্য তার উপাদান কারণে সৎ
অসৎকার্যবাদ	যে মতবাদ অনুসারে উৎপত্তির পূর্বে কার্য তার উপাদান কারণে অসৎ

৩.৬ নমুনা প্রশ্নাবলী

Essay type

1. Explain after Vācaspati the proofs for the existence of *avyakta* (or *pradhāna*) given in the *Sāṁkhyakārikā*.
2. How does Īśvarakṛṣṇa establish that an effect pre-exists in its cause? —Discuss
3. Show, how Īśvarakṛṣṇa proves the existence of *puruṣa*.

Short answer type

Write shortnotes on the following :

(a) *avyaktasiddhi*

(b) *satkāryavāda*

(c) *asatkāryavāda*

(d) *puruṣabahutva*

৩.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১। দিবাকরানন্দ, স্বামী (অনুদিত) : *শ্রীমৎ ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রণীতা সাংখ্যকারিকা (সটীকা বঙ্গানুবাদ* (মূল কারিকা, অন্বয়ার্থ, অনুবাদ, *তত্ত্বকৌমুদী* টীকা, টীকানুবাদ ও স্থানে স্থানে ব্যাখ্যা (সংযোজিত।), প্রকাশক—গনেশ চন্দ্র দত্ত, ৩৪ সদানন্দ রোড, কালিঘাট, কলকাতা-২৬, ১৯৭৬

২ বেদান্তচুঞ্চু সাংখ্যভূষণ সাহিত্যাচার্য্য পূর্ণচন্দ্র (সঙ্কলিত) : *সাংখ্যকারিকা*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৩

৩ গোস্বামী, নারায়ণ চন্দ্র : *ঈশ্বরকৃষ্ণবিরচিতকারিকাসাহিতা সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী*, প্রকাশক—শিখা পাল, জিৎপুর, মুর্শিদাবাদ, ১৯৮২

পাশ্চাত্য অধিবিদ্যা

অধ্যাপক সুনীল রায়
দর্শন বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম পাঠ

অধিবিদ্যা- প্রাচীনকাল ও সমকাল

পাঠ সংকেত

১.১ অ্যারিস্টটল ও অধিবিদ্যা প্রসঙ্গ

১.২ অধিবিদ্যা প্রসঙ্গে ডেভিড হিউম

১.৩ অধিবিদ্যা প্রসঙ্গে কান্ট

১.৩.১ আধিবিদ্যক প্রশ্নের ধরন

১.৩.২ অধিবিদ্যার দুরবস্থার কারণ

১.৩.৩ অধিবিদ্যার প্রাসঙ্গিকতা

১.৪ অধিবিদ্যা বিষয়ে যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের মত

১.৫ অধিবিদ্যা বিষয়ে স্ট্রসনের মত

১.৫.১ অধিবিদ্যার শ্রেণীবিন্যাস

১.৫.২ বর্ণনাত্মক ও সংশোধনাত্মক অধিবিদ্যার সম্বন্ধ

১.৫.৩ বর্ণনাত্মক ও সংশোধনাত্মক অধিবিদ্যার তফাৎ প্রকট নয়

১.৫.৪ চিন্তার পরিকাঠামোর সংখ্যা নিয়ে অনিশ্চয়তা

১.৫.৫ বর্ণনাত্মক অধিবিদ্যার বিরুদ্ধে স্ট্রসন কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তি ও উত্তর

১.৫.৬ বর্ণনাত্মক অধিবিদ্যার বিরুদ্ধে সমালোচনা

১.৫.৭ উপসংহার

১.৬ নমুনা প্রশ্নাবলী

১.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১.১ অ্যারিস্টটল ও অধিবিদ্যা প্রসঙ্গ

পাশ্চাত্য দর্শনের অন্যতম পথিকৃৎ অ্যারিস্টটল। তাঁর রচনা-সম্ভার বিপুল। তাঁর অনেক দার্শনিক রচনার

কোনো শিরোনাম ছিল না। রচনাগুলির সংকলয়িতা Andronicus। সংকলনকালে Andronicus Physics বিষয়ক রচনার পরে কতকগুলি রচনাকে সংকলিত করেন। রচনাগুলির Andronicus প্রদত্ত শিরোনাম 'Metaphysics'। তখন থেকে রচনাগুলি অধিবিদ্যা আখ্যায় ভূষিত হয়ে আসছে।

তবে অ্যারিস্টটল কখনও 'Metaphysics' নামটি ব্যবহার করেন নি। তিনি এই শাস্ত্রকে বোঝাতে যে নামটি ব্যবহার করেছিলেন তা হলো 'First Philosophy'। অ্যারিস্টটলের রচনায় অধিবিদ্যাকে First Philosophy বলার কারণও জানা যায়। তাঁর মতে অধিবিদ্যাই প্রকৃত দর্শন। প্রথম ও প্রধান সূত্রসমূহ এই শাস্ত্রেরই আলোচ্য বিষয়।

উদ্দেশ্য বিচারে সমগ্র শাস্ত্রকে ত্রিধা-বিভক্ত করেন অ্যারিস্টটল— তত্ত্ববিদ্যা, ব্যবহারিক বিদ্যা এবং কাব্যিক বিদ্যা। তাঁর মতে যে বিদ্যার উদ্দেশ্য নেহাত জ্ঞানলাভ তাই তত্ত্ববিদ্যা। তত্ত্ববিদ্যা তিন রকম— ভৌতবিদ্যা (পদার্থ বিদ্যা), গণিতবিদ্যা এবং অধিবিদ্যা। যে বিদ্যায় মানুষের আচরণ আলোচিত হয় তাকে অ্যারিস্টটল ব্যবহারিক বিদ্যা করেছেন। এর বিভাগ চারটি-রাষ্ট্রবিদ্যা, অর্থশাস্ত্র, রণকৌশলশাস্ত্র এবং অলঙ্কার শাস্ত্র। কাব্যকলা নিয়ে যে শাস্ত্রে আলোচনা করা হয় তাকে অ্যারিস্টটল কাব্যিক বিদ্যা করেছেন।

First Philosophy-এর দু'প্রকার বিষয়বস্তুর কথা বলেছেন অ্যারিস্টটল—

ক) পরমসত্তা ও সত্তার স্বরূপ, জ্ঞানতত্ত্ব ও ঈশ্বরস্বরূপ

এবং

খ) ইন্দ্রিয়াতীত জগৎ বা অপ্রাকৃত জগৎ।

প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকেরা পরিবর্তন ও নিত্যতাকে পরমসত্তার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য বলে মনে করতেন। কিন্তু যদি কোনো বস্তু স্থায়ী সত্য হয় তবে তার পক্ষে পরিবর্তন কীভাবে সম্ভব? অপরপক্ষে পরম সত্তা অপরিবর্তনীয় হলে তার বৃদ্ধি, বিকাশ, পরিবর্তন ইত্যাদি কীভাবে সম্ভব? প্রাকৃতিক বিধানেই পরম সত্তা নিত্য ও অপরিবর্তনীয় হলে আমরা কীভাবে পরিবর্তন ও গতিকে ব্যাখ্যা করব? আবার প্রাকৃতিক বিধান সকল গতি ও পরিবর্তনের কারণ হলে ওই গতির মূলে কোনো পরম, নিত্য অপরিবর্তনীয় সত্তা মানা চলে কি? অ্যারিস্টটল তাঁর First Philosophy তে এই সকল প্রশ্নেরই আলোচনা করেছেন।

তবে অ্যারিস্টটল First Philosophy কে জগতের সর্বপ্রথম, সর্বোচ্চ ও সর্বব্যাপক নীতিসূত্র বিষয়ক শাস্ত্র বললেও অন্যান্য শাখার ঘাটতি বা কমতির কথা বলেন নি। তাঁর মতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অপরাপর শাখা অধিবিদ্যার অধীন। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তারা মূল্য বিচারে নিকৃষ্ট। তাদের তুচ্ছতা যৌক্তিক ক্রম বা পর্যায় বিচারে। তারা অধিবিদার তুলনায় কম ব্যাপক নীতি বা সূত্র নিয়ে আলোচনা করে। উদাহরণস্বরূপ, উদ্ভিদ বিজ্ঞানের

নিয়মসমূহ কেবল প্রাণীজগতেই প্রযোজ্য। কিন্তু অধিবিদ্যার নিয়ম বা সূত্র সমূহ সত্তামাত্রের প্রতি প্রযোজ্য অর্থাৎ যে কোনো বিষয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

১.২ অধিবিদ্যা প্রসঙ্গে ডেভিড হিউম

অ্যারিস্টটলের দর্শনে অধিবিদ্যার প্রতি গভীর প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক হিউমের দর্শনে অধিবিদ্যার প্রতি সংশয় অভিব্যক্ত। কোন কোন ক্ষেত্রে হিউম অধিবিদ্যাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন। অধিবিদ্যার প্রতি তাঁর এরকম একটি আক্রমণমূলক উক্তি প্রকাশিত হয়েছে। *An Enquiry Concerning Human Understanding* গ্রন্থের শেষ অনুচ্ছেদে। উক্তিটি এই—

> "When we run over libraries, persuaded of these principles, what havoc must we make? If we take into our hand any volume of divinity or school metaphysics, for instance, let us ask : Does it contain any abstract reasoning concerning quality or number? No, does it contain any experimental reasoning concerning matter of fact and existence? No, commit it then to the flames : for it can contain nothing but sophistry and illusion."

হিউমের এই উক্তিতে তাঁর দর্শনের মূল সূত্রের উল্লেখ আছে, উল্লেখ আছে যুক্তিবিভাগের ভিত্তিতে শাস্ত্র-বিভাগের। সর্বোপরি এতে প্রকাশিত হয়েছে অধিবিদ্যার প্রতি হিউমের বিধ্বংসী আক্রমণাত্মক মনোভাব।

প্রশ্ন হলো— সূত্র বলতে হিউম কী বোঝেন? সূত্র বলতে হিউম মানবীয় অনুসন্ধিৎসার বিষয় বোঝেন। তাঁর মতে মানবীয় অনুসন্ধিৎসার বিষয় দু'রকম— ধারণাগুলোর পারস্পরিক সম্বন্ধ এবং বাস্তব ব্যাপার। বিষয় বিভাগ অনুসারে বাক্যকেও দ্বিধা বিভক্ত করেছেন হিউম। বাক্যও দু'প্রকার — ধারণার সম্বন্ধ বিষয়ক বাক্য এবং বাস্তব ব্যাপার বিষয়ক বাক্য। ধারণার সম্বন্ধ বিষয়ক বাক্যের উদাহরণ মেলে পাটীগণিত, জ্যামিতি ও বীজগণিতে। আর বাস্তব ব্যাপার বিষয়ক বাক্যের উদাহরণ পাওয়া যায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলিতে। '২+২=৪' - একটি গাণিতিক বাক্য। দুই বা চার হল ধারণা, দেশ ও কালে অবস্থিত বস্তু নয়। 'সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে', ' গোলাপটি সুগন্ধী' প্রভৃতি বাস্তব ব্যাপার বিষয়ক বাক্য।

এই দুই রকম বাক্যের মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছেন হিউম। তাঁর মতে ধারণার সম্বন্ধ বিষয়ক বাক্য পূর্বতঃসিদ্ধ। এরকম বাক্যের সত্যতা ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতা নির্ভর নয়। এরকম বাক্যকে হিউম বিশ্লেষক বাক্যও বলেছেন; কারণ এরকম বাক্যের উদ্দেশ্যকে বিশ্লেষণ করলেই বিধেয়র ধারণা পাওয়া যায়। অপরপক্ষে বাস্তব ব্যাপার বিষয়ক

বাক্য সংশ্লেষক বাক্য। এরকম বাক্যের বিধেয়ের ধারণটি উদ্দেশ্যের ধারণার সাথে কিছু সংযুক্ত করে থাকে। এরকম বাক্যের সত্যতা অভিজ্ঞতা নির্ভর বলে এরকম বাক্যকে হিউম পরতঃসিদ্ধ বলেছেন।

তবে হিউম তৃতীয় কোনো প্রকার বাক্য স্বীকার করেন নি। ধারণার সম্বন্ধ বিষয়ক বাক্য সমূহ পূর্বতঃসিদ্ধ বিশ্লেষক বলে সুনিশ্চিত। এদের সত্যতা নির্ধারিত হয় বিরোধ নীতির সাহায্যে। এদের বিরুদ্ধ বাক্যগুলি স্ববিরোধী। কিন্তু বাস্তব ব্যাপার বিষয়ক বাক্য এরকম সুনিশ্চিত নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, 'সূর্য আগামীকল উঠবে'— এ বাক্যের কোনো নিশ্চয়তা নেই। অভিজ্ঞতা নির্ভর এরকম বাক্য সম্ভাবনামূলক।

হিউমের মতে বিজ্ঞানও দু'রকম —(১) গণিত ও যুক্তিবিজ্ঞান এবং (২) প্রাকৃত বিজ্ঞান। ধর্মতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব প্রভৃতি ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে থাকে। এদের ভিত্তি বিশ্বাস। সংশয়ী মননশীল ব্যক্তি এসকল শাস্ত্রের সিদ্ধান্তকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন না। হিউমের মতে দু'প্রকার শাস্ত্র ছাড়া বাকি সব শাস্ত্রই ভ্রান্তি ও কূটতর্কে ভরা।

কিন্তু একথা মনে করাও ভুল হবে যে হিউমের মতে অধিবিদ্যামাত্রেই নিন্দনীয়। উল্লিখিত গ্রন্থটিতে হিউম দু'রকম অধিবিদ্যার কথা বলেছেন — যথার্থ অধিবিদ্যা ও ভ্রান্ত অধিবিদ্য। তিনি যথার্থ অধিবিদ্যার সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করতে চেয়েছেন। তিনি সমালোচনামুখর হয়েছেন ভ্রান্ত অধিবিদ্যার প্রতি।

হিউম মনে করেন — ভ্রান্ত অধিবিদ্যা অনিশ্চয়তা ও ভ্রান্তির উৎস। এরকম অধিবিদ্যা কোনো বিজ্ঞান পদবাচ্য নয়। এরকম অধিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় আমাদের কাছে অজ্ঞেয়। এরকম অধিবিদ্যার মূলে আছে মানুষের অহমিকা — সব কিছুই মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব— এই অহমিকা। এর আর একটি উৎসও আছে। তা হলো প্রচলিত কুসংস্কার। যুক্তি দিয়ে এরকম সংস্কার সমর্থিত হয় না বলেই অপযুক্তির সাহায্য নেওয়া হয়। যার পরিণাম ভ্রান্ত অধিবিদ্যা।

তবে অধিবিদ্যার চর্চাকে হিউম নিষ্ফল মনে করেন না। তিনি বলেন যে ভ্রান্ত অধিবিদ্যাকে দূরে রাখার জন্য যথার্থ অধিবিদ্যার অনুশীলন প্রয়োজন। তাই যত্ন সহকারে যথার্থ অধিবিদ্যার অনুশীলনের কথা বলেছেন হিউম। এরকম অধিবিদ্যার অনুশীলনের ফলে মানুষ অতীন্দ্রিয় জগতের আলোচনা থেকে বিরত হয়ে পড়বে বলেই হিউমের বিশ্বাস। যথার্থ অধিবিদ্যা শুধু বিশুদ্ধ যক্তিতর্কের উপর নির্ভর করে সত্যানুসন্ধান করে। তার উদ্দেশ্যও বিমূর্ত সত্য নয়, অভিনব সত্যানুসন্ধান। এরকম অধিবিদ্যার ভিত্তি মানুষের মনের শক্তি-সামর্থ্যের বিচার-বিশ্লেষণ।

১.৩ অধিবিদ্যা প্রসঙ্গে কান্ট

কান্টের মহাগ্রন্থ *Critique of pure Reason*। গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৭৮১ সালে।

আর গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৭৮৭ সালে। দু'টি সংস্করণের মুখবন্ধও দু'টি। প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধে অধিবিদ্যার প্রতি কান্টের মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। শুরুতে তিনি বলেছেন,

> "Human reason has this peculiar fate that in one species of its knowledge it is burdened by questions which as prescribed by the very nature of reason itself it is not able to ignore but which as transcending all its powers it is also not able to answer."

কান্টের এই উক্তিতে এক ধরনের প্রশ্নের কথা পাওয়া যায়। প্রশ্নগুলি স্বাভাবিক — মানবীয় প্রজ্ঞার স্বভাব সঞ্জাত। তবে প্রশ্নগুলির উত্তর দানের ক্ষমতা মানবীয় প্রজ্ঞার নেই।

১.৩.১ আধিবিদ্যক প্রশ্নের ধরন

প্রশ্ন হলো- আধিবিদ্যক প্রশ্নগুলি কেমন? প্রসঙ্গত কান্ট আধিবিদ্যক প্রশ্নের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। 'এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি কারণ কি'? — একটি আধিবিদ্যক প্রশ্ন। জাগতিক অভিজ্ঞতায় এই ধরনের প্রশ্নের কোনো সদুত্তর পাওয়া যায় না। অথচ মানুষের জ্ঞান অভিজ্ঞতার জগতেই সীমিত। এই ধরনের আধিবিদ্যক প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে মানুষের জ্ঞান চর্চার সূত্রপাত ঘটেছে। স্বাভাবিক এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে মানুষের অনুসন্ধান শুরু হয়েছে। তারপর এই ধরনের আরো অনেক প্রশ্নই মানুষের মনে জেগেছে এবং বিভিন্ন জ্ঞান শাস্ত্রের উদ্ভব ঘটেছে। আধিবিদ্যক প্রশ্ন ওই সকল প্রশ্নেরও ভিত্তি হওয়ায় এক সময়ে অধিবিদ্যাকে সকল শাস্ত্রের জননী বলা হতো।

১.৩.২ অধিবিদ্যার দুরবস্থার কারণ

কিন্তু পরবর্তীকালে অধিবিদ্যার এই গৌরব ধূলিসাৎ হয়। অধিবিদ্যায় নির্বিচারবাদী মানসিকতা প্রাধান্য লাভ করে। এই মানসিকতায় ধরে নেওয়া হয় যে, দার্শনিকেরা পরাজগৎ সম্পর্কে যা কিছু বলেন তা সবই সত্য। কিন্তু নির্বিচারবাদী কথাবার্তা অনেকটা গা-জুড়ি কথাবার্তা। এর প্রতিক্রিয়ারূপে দর্শনে উদ্ভব ঘটে সন্দেহবাদের। এই মত অনুসারে কোন্‌টা সত্য, আর কোন্‌টা মিথ্যা তা নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার। প্রগতি-পরিপন্থী নির্বাচারবাদ ও সন্দেহবাদের টানাপোড়েনের ফলে গড়ে ওঠে আর একটি মত— ঔদাসীন্যবাদের অবস্থা। মানুষ আধিবিদ্যক প্রশ্নের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে পড়ে।

১.৩.৩ অধিবিদ্যার প্রাসঙ্গিকতা

এইভাবে চিরাচরিত অধিবিদ্যা, তার বর্তমান দুরবস্থা প্রভৃতি নিয়ে নিজের মত ব্যক্ত করেছেন কান্ট। এক কথায়, তাঁর মতে চিরাচরিত অধিবিদ্যা যথার্থ জ্ঞান দিতে পারে না। তবে অধিবিদ্যাকে বর্জনের পক্ষপাতী তিনি নন। এই প্রসঙ্গে দুই রকম অধিবিদ্যার কথা বলেছেন তিনি — অতিবর্তী অধিবিদ্যা এবং অন্তর্বর্তী অধিবিদ্যা। অতিবর্তী অধিবিদ্যাই এতাবৎ আলোচিত। এই অধিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় ছিল ঈশ্বর, আত্মা, জগৎ-সমগ্র প্রভৃতি। কিন্তু কান্ট প্রণীত অন্তর্বর্তী অধিবিদ্যা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ ছেড়ে কোনো অতীন্দ্রিয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করার কথা বলে না। এর উপজীব্য আমাদের অভিজ্ঞতার জগৎ। অন্তর্বর্তী অধিবিদ্যার প্রশ্ন-আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার জগতের স্বরূপ কি? আমাদের জ্ঞানের সঙ্গে তার কী সম্বন্ধ? অন্তর্বর্তী অধিবিদ্যা প্রণয়ন করতে গিয়ে কান্ট এক বৈপ্লবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। তিনি যে বিপ্লবের কথা বলেছেন তা হল জ্ঞানরাজ্যে কোপার্নিকীয় বিপ্লব। এর মূল কথা হল- কেবল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান সম্ভব, অতীন্দ্রিয় বিষয় সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান সম্ভব নয়। ফলে অতিবর্তী অধিবিদ্যা পত্রপাঠ খারিজ হলো, হলো অন্তর্বর্ত্তী অধিবিদ্যার গৌরবময় আবির্ভাব।

১.৪ অধিবিদ্যা বিষয়ে যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের মত

পাশ্চাত্য দর্শনের সূত্রপাত করেন গ্রিকরা। দুজন গ্রিক দার্শনিক– প্লেটো এবং অ্যারিস্টটলের সময়ে দর্শন শাস্ত্র উন্নতির শিখরে গিয়ে পৌঁছায়। অধিবিদ্যা বলতে যা বোঝায় তা তাদের সময়েই দর্শনের একটি শাখারূপে আত্মপ্রকাশ করে। তারপর দর্শনের উন্নতির সাথে সাথে অধিবিদ্যারও উন্নতি সাধিত হয়। কিন্তু আধুনিক যুগের শুরুতেই অধিবিদ্যার বুকে চরম আঘাত হানা শুরু হয়। হিউমের পর অধিবিদ্যার বুকে এরকম আঘাত হানেন যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীরা।

যৌক্তিক অভিজ্ঞতাবাদীদের মতে আধিবিদ্যক বাক্য অর্থহীন। তা দেখাতে গিয়ে তারা একটি নীতির কথা বলেছেন। এই নীতিকে বলে অর্থের যাচাইকরণ নীতি। এই নীতি অনুসারে যা কিছু অনুভবে যাচাইযোগ্য তার অর্থ আছে, যা কিছু অনুভবে যাচাইযোগ্য নয় তার অর্থ নেই। আর একটি কথা– যৌক্তিক অভিজ্ঞতাবাদীরা বলেন দু'প্রকার বাক্যের কথা– পূর্বতঃসিদ্ধ বিশ্লেষক বাক্য এবং পরতঃসাধ্য সংশ্লেষক বাক্য। কিন্তু আধিবিদ্যক বাক্যসমূহ, যথা– 'এই জগতের একটি আদি কারণ আছে,' 'ঈশ্বর আছেন', 'ঈশ্বর সর্বশক্তিমান' বিশ্লেষক নয় আবার অনুভবে যাচাই যোগ্যও নয়। কাজেই এজাতীয় বাক্য অর্থহীন। অধিবিদ্যা এজাতীয় বাক্য ভিন্ন অন্য কোনো প্রকার বাক্য নিয়ে সংশ্লিষ্ট নয়। তাই যৌক্তিক অভিজ্ঞতাবাদীরা বলেন যে অধিবিদ্যা হলো অর্থহীন বাক্যসমষ্টি।

১.৫ অধিবিদ্যা বিষয়ে স্ট্রসনের মত

বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য দার্শনিক স্ট্রসন। তিনিও যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদী এবং ভাষাবিশ্লেষণবাদী। তবুও তিনি অধিবিদ্যাকে পূর্বতন মর্যাদার আসেন ফিরিয়ে আনার কাজে নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন। এই কাজে অধিবিদ্যাকে তিনি এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখতে শুরু করেন। তাঁর *Individuals - An Essay in Descritive Metaphysics* ওই দৃষ্টিভঙ্গী প্রসূত একটি আধিবিদ্যক গ্রন্থ।

১.৫.১ অধিবিদ্যার শ্রেণীবিন্যাস

Individuals গ্রন্থের মুখবন্ধে অধিবিদ্যার শ্রেণীবিন্যাস দেখিয়েছেন স্ট্রসন। বলা বাহুল্য, এই মুখবন্ধেই অধিবিদ্যার প্রতি স্ট্রসনের নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন —"Metaphysics has been often revisionary and less often descriptive." অর্থাৎ তাঁর মতে দর্শনের ইতিহাসে অধিবিদ্যা অনেক সময়ই সংশোধনাত্মক অধিবিদ্যার রূপ লাভ করেছে, তা বর্ণনাত্মক রূপ লাভ করেছে কম সময়েই। স্ট্রসন প্রস্তাবিত দু'রকম অধিবিদ্যা হলো বর্ণনাত্মক অধিবিদ্যা ও সংশোধনাত্মক অধিবিদ্যা।

১.৫.২ বর্ণনাত্মক ও সংশোধনাত্মক অধিবিদ্যার সম্বন্ধ

স্ট্রসনের মতে আমাদের জাগতিক চিন্তার একটি বাস্তব কাঠামো আছে। যে অধিবিদ্যায় ওই কাঠামোর বর্ণনার কথা বলা হয়ে থাকে তাকে বলে বর্ণনাত্মক অধিবিদ্যা। অপর পক্ষে সংশোধনাত্মক অধিবিদ্যায় ওই কাঠামোকে সংশোধন করে একটি উন্নতমানের পরিকাঠামো প্রদান করার কথা বলা হয়। সংশোধনাত্মক অধিবিদ্যা একাধারে গভীর চিন্তাপ্রসূত এবং মনোগ্রাহী। কিন্তু জাগতিক চিন্তার পারিকাঠামোটিকে বিশ্লেষণের সাহায্যে খুঁজে বের করতে না পারলে তার সংশোধনের প্রসঙ্গটাই অবান্তর হয়ে দাঁড়ায়। তাই সংশোধনাত্মক অধিবিদ্যা বর্ণনাত্মক অধিবিদ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। বর্ণনাত্মক অধিবিদ্যা সংশোধনাত্মক অধিবিদ্যার ভিত্তি। বর্ণনাত্মক অধিবিদ্যা ও সংশোধনাত্মক অধিবিদ্যার এই মূলগত সম্পর্কের উপর নির্ভর করেই স্ট্রসন বলেন— "Revisionary metaphysics is at the service of descriptive metahysics."

১.৫.৩ বণনাত্মক ও সংশোধনাত্মক অধিবিদ্যার প্রভেদে অপ্রকটতা

বর্ণনাত্মক ও সংশোধনত্মক অধিবিদ্যার আলোচনায় স্ট্রসন একথাও বলতে ভোলেন নি যে কাজের অভিপ্রায় বা পরিণাম বিচারে এমন কোনো আধিবিদ্যক দার্শনিক নেই যাকে পুরোপুরি বর্ণনাত্মক বা পুরোপুরি সংশোধানত্মক বলা যায়। তবুও এক বিশেষ বিচারের ফলে তিনি ডেকার্ত, লাইবনিৎস এবং বার্কলিকে সংশোধনাত্মক

অধিবিদদের পর্যায়ে ফেলেছেন। আর তাঁর মতে অ্যারিস্টটল এবং কান্ট হলেন বর্ণনাত্মক অধিবিদ। হিউমকে নিয়ে তিনি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। হিউমকে তিনি কখনও বর্ণনাত্মক, কখনও সংশোধনাত্মক অধিবিদ বলে মনে করেন।

১.৫.৪ চিন্তার পরিকাঠামোর সংখ্যা নিয়ে অনিশ্চয়তা

স্ট্রসন বর্ণনাত্মক অধিবিদ্যার পরিধি নির্ণয়েও প্রয়াসী। তিনি মনে করেন—বর্ণনামূলক অধিবিদ্যার বর্ণনার বিষয় হচ্ছে বাস্তবে ব্যবহৃত সাধারণ ভাষার মূলে যে পরিকাঠামো আছে বিশ্লেষণের মাধ্যমে তা প্রকাশ করা এবং তার বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা। এই পরিকাঠামো যে কেবল একটি বিশেষ ভাষার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তা নয়। তা সকল ভাষার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এখানে স্ট্রসনের প্রশ্ন—এমন কতকগুলি পরিকাঠামো সম্ভব? স্ট্রসন বলেন যে, এই পরিকাঠামোর সংখ্যা বিষয়ে কোনো স্থিরতা নেই। কারণ বহু সংশোধনাত্মক দার্শনিক নানাভাবে তাদের মত প্রকাশ করতে পারেন। এখানে সমস্যা হলো —এই সকল মতের কোনো একটিকে যথাযথ বলে নির্বাচন করার সমস্যা। বর্ণনামূলক অধিবিদ্যার ক্ষেত্রে এই সমস্যা নেই। কারণ সকল প্রচলিত ভাষার পরিকাঠামো একই। এমনকি যে কোনো ভাষার বিশ্লেষণের দ্বারাই এই উক্তির যাথার্থ্য বিচার করা সম্ভব।

১.৫.৫ বর্ণনাত্মক অধিবিদ্যার বিরুদ্ধে স্ট্রসন কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তি ও উত্তর

বর্ণনামূলক অধিবিদ্যার বিরুদ্ধে দু-একটি সম্ভাব্য আপত্তি উত্থাপন করেছেন স্ট্রসন। প্রথমতঃ এর সমালোচকেরা বলেন যে, বর্ণনাত্মক অধিবিদ্যার কোনো প্রয়োজন নেই; কারণ চিন্তা বা ভাষার বিশ্লেষণেই এর কাজ মিটে যায়। তাই বর্ণনাত্মক অধিবিদ্যা বা তজ্জাতীয় কোনো অধিবিদ্যা স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন। এই আপত্তির উত্তর দিয়েছেন স্ট্রসন। তাঁর মতে বর্ণাত্মক অধিবিদ্যা ভাষা বা ধারণার বিশ্লেষণের অতিরিক্ত কিছু করে। এর কাজ নিছক বিশ্লেষণের মধ্যেই সীমিত নয়। তার জন্য যা প্রয়োজন তা বর্ণনাত্মক অধিবিদ্যাই সম্ভব করে তোলে। আরেকটি দিক থেকেও বর্ণনাত্মক অধিবিদ্যার বিরুদ্ধে আপত্তি তোলা যায় বলে মনে করেন স্ট্রসন। অনেকে বলতে পারেন যে, যে কোনো অধিবিদ্যার লক্ষ্য হলো আমাদের চিন্তাধারা বা জগতের পরিবর্তন সাধন। কিন্তু বর্ণনাত্মক অধিবিদ্যায় এই প্রসঙ্গ অবান্তর। এই আপত্তির উত্তরে স্ট্রসনের বক্তব্য এই যে, বর্ণনাত্মক অধিবিদ্যা চিন্তার জগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে কাজ করে না। আমাদের চিন্তার এক বিরাট অংশের কোনো ইতিহাস নেই। তাদের গতি প্রকৃতির কোনো গঠনমূলক আলোচনাই হয় নি। বর্ণনাত্মক অধিবিদ্যা ঠিক এই আলোচনাই করে থাকে। আর তার মাধ্যমেই চিন্তার মৌলিক কাঠামোর পরিচয় দিয়ে থাকে বর্ণনাত্মক অধিবিদ্যা। তবে সেই পরিবর্তন বোধগম্য হয়ে ওঠে তার পশ্চাতে বিদ্যমান কোনো স্থির পরিকাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে। এরকম ক্ষেত্রে একটি আশঙ্কাও প্রকাশ করেছেন স্ট্রসন। তাঁর ভাষায়, "...there are categories and

concepts which, in their most fundamental character change not at all." কিন্তু যুগে যুগে তাদের প্রকাশভঙ্গি পরিবর্তিত হয়। কাজেই পুরনো ধারণাগুলিকেই আবার প্রচলিত ভাষায় মাধ্যমে প্রকাশ করে যেন নতুন করে ভাবা হয়।

১.৫.৬ বর্ণনাত্মক অধিবিদ্যার বিরুদ্ধে সমালোচনা

স্ট্রসন প্রণীত বর্ণনাত্মক অধিবিদার বিরুদ্ধে একদল দার্শনিক যে আপত্তি তুলেছেন তা হলো— ভাষার পরিকাঠামো সর্বত্র এক বা তা স্থান-কাল দিয়ে গঠিত - স্ট্রসনের একথা ঠিক নয়। কারণ বাস্তবে এমন ভাষা আছে যেখানে স্থান-কালের কোনো বালাই নেই। এরা আরো বলেন যে, ওই পরিকাঠামো সর্বত্র এক হলে এবং তা স্থানকাল দিয়ে গঠিত হলে বর্ণনাত্মক অধিবিদ্যার দাবিই অযৌক্তিক হয়ে পড়বে।

স্ট্রসন প্রণীত বর্ণনাত্মক অধিবিদ্যার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আপত্তিটি তুলেছেন Hamlyn। Hamlyn তাঁর *Metaphysics* গ্রন্থে বলেছেন যে বর্ণনাত্মক অধিবিদ্যা যদি বর্ণনাই করে থাকে তাহলে এমন সময় আসবে যখন তার প্রয়োজন ফুরোবে। অর্থাৎ কালের বিবর্তনে এক সময় বর্ণনাত্মক অধিবিদ্যা নিশ্চিহ্ন হবে। Hamyln আরো বলেন যে, স্ট্রসন অধিবিদ্যার যে বিভাগ দেখিয়েছেন তা অসঙ্গত। Hamlyn বর্ণনাত্মক ও সংশোধনাত্মক অধিবিদার মধ্যে বৈসাদৃশ্যের চাইতে সাদৃশ্যই বেশি লক্ষ্য করেছেন। আর তাদের মধ্যে এতো সাদৃশ্যের কারণেই তাদের শ্রেণীবিন্যাসকে Hamlyn চূড়ান্ত বলে মনে করেন না।

বর্ণনাত্মক অধিবিদ্যার বিরুদ্ধে তৃতীয় আপত্তিটি তুলেছেন phenomenologist দার্শনিকেরা। Phenomenologist দার্শনিকদের আপত্তিটি একটু ভিন্ন ধরনের। তারা বলেন যে, স্ট্রসন যেভাবে জগৎ বিষয়ক পরিকাঠামোকে বর্ণনা করার কথা বলেছেন তা ঠিক নয়। তারা মনে করেন যে, এই বর্ণনায় চৈতন্যকে যেন প্রশ্ন করে সকল উত্তর আদায় করে নেওয়া হয়। এই বর্ণনার স্তরভেদ আছে। তার কারণ মানবীয় অভিজ্ঞতার স্তরভেদ আছে। কোনো বিশেষ ব্যক্তি শেষ কথা বলে দিতে পারে না। তাহলে অভিজ্ঞতার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাওয়া আমাদের পক্ষে কোনো দিনই সম্ভব হবে না।

১.৫.৭ উপসংহার

এইভবে বিরুদ্ধবাদী দার্শনিকেরা স্ট্রসন প্রণীত বর্ণনাত্মক অধিবিদ্যার বিরুদ্ধে বিভিন্ন আপত্তি উত্থাপন করেছেন। এই সকল আপত্তির যে কোনো গুরুত্ব নেই তা নয়। তবুও বর্ণনাত্মক অধিবিদ্যা বিষয়ে স্ট্রসনের মতের তাৎপর্যকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। প্লেটোর সময়ে অধিবিদ্যার গুরুত্ব উপলব্ধ হয়। তারপর দীর্ঘদিন এর গুরুত্ব অনুভূত হয়। এক সময়ে অধিবিদ্যাকে জ্ঞানবিজ্ঞানের রানী বলা হতো। কিন্তু আধুনিক যুগের শুরুতে তার

সেই গৌরব ধূলিসাৎ হয়। যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীরা তার বুকে চরম আঘাত হানতে শুরু করেন। তারা আধিবিদ্যক বাক্যকে একেবারে অর্থহীন বলে উড়িয়ে দিতে শুরু করেন। তরপর সেরকমভাবে কোনো দার্শনিক অধিবিদ্যার চর্চায় ব্রতী হতে সাহস পান নি। কিন্তু স্ট্রসন সেখানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। আর বর্ণনাত্মক অধিবিদ্যা তাঁর এই ভূমিকা পালনের পরিণাম স্বরূপ। এই বিচারে বর্ণনাত্মক অধিবিদ্যার অভিনবত্ব অনস্বীকার্য।

১.৬ নমুনা প্রশ্নাবলী

১। অধিবিদ্যার স্বরূপ বিষয়ে অ্যারিস্টটলের মত ব্যাখ্যা ও বিচার কর।

২। অ্যারিস্টটল অধিবিদ্যাকে 'First Philosophy' বলেছেন কী অর্থে? তিনি বিদ্যার কীরকম শ্রেণীবিন্যাস করেছেন? অধিবিদ্যার সাথে অন্যান্য বিদ্যার কেমন সম্বন্ধের কথা বলেছেন তিনি?

৩। অধিবিদ্যা সম্পর্কে হিউমের মত আলোচনা কর।

৪। হিউম কি যে কোনো ধরনের অধিবিদ্যাকেই বর্জনের কথা বলেছেন? অধিবিদ্যার প্রকার সম্পর্কে হিউমের মত বিবৃত করে আলোচনা কর।

৫। স্ট্রসন কীভাবে বর্ণনাত্মক ও সংশোধনাত্মক অধিবিদ্যার মধ্যে প্রভেদ করেছেন? এই প্রভেদ কি গ্রহণযোগ্য?

১.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১। An Anquiry Concerning Human Understanding by David Hume

২। Metaphysics. ed. David Ross

৩। Individuals (An Essay in Descriptive Metaphysics) by P. F. Strawson

৪। পাশ্চাত্য দর্শনের রূপরেখা, রমাপ্রসাদ দাস ও শিবপদ চক্রবর্তী

৫। জ্ঞানতত্ত্ব ও অধিবিদ্যা - কয়েকটি সমস্যা, ড. বিশ্বনাথ সেন।

দ্বিতীয় পাঠ

সারসত্তা ও অস্তিত্ব (Essence and Existence)

পাঠ সংকেত

২.১ অস্তিবাদী দর্শনের মূল কথা

২.২ জার্মান ভাববাদী দর্শনের প্রতিক্রিয়ারূপে অস্তিবাদের উদ্ভব

২.৩ অস্তিবাদী দর্শনে 'অস্তিত্ব' শব্দের অর্থ

২.৩.১ কিয়ের্কেগার্ড ও 'অস্তিত্ব' শব্দের অর্থ

২.৩.২ হাইডেগার ও 'অস্তিত্ব' শব্দের অর্থ

২.৩.৩ সার্ত্র ও 'অস্তিত্ব' শব্দের অর্থ

২.৩.৪ ইয়াসপার্স ও 'অস্তিত্ব' শব্দের অর্থ

২.৪ অস্তিত্বের বৈশিষ্ট্য

২.৫ সারসত্তা অস্তিত্বের পুরোগামী

২.৬ অস্তিত্ব সারসত্তার পুরোগামী

২.৭ নমুনা প্রশ্নাবলী

২.৮ গ্রন্থপঞ্জী

২.১ অস্তিবাদী দর্শনের মূল কথা

এমন নয় যে, সকল অস্তিবাদী চিন্তাবিদ একত্রে একটি সুসম্বন্ধ দার্শনিক সম্প্রদায় গড়ে তুলেছেন। তাই অস্তিবাদের কোনো সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা দেওয়াও দুরূহ ব্যাপার। তাছাড়া আধুনিক যুগে অস্তিবাদ দার্শনিক আলোচনার বাইরে বিবিধ সাহিত্যকর্মের মাধ্যমেও প্রকাশিত হয়েছে। এমন কি অনেক অস্তিবাদী দার্শনিক এই অভিধায় আখ্যায়িত হতেও চান না। অস্তিবাদী দার্শনিকদের মধ্যে বৈচিত্র্যও কম নয়। অনেক অস্তিবাদী ঈশ্বরবিশ্বাসী, অনেক অস্তিবাদী নিরীশ্বরবাদী। ফলে মানুষের অস্তিত্ব বিষয়ে তাদের মতও ভিন্ন ভিন্ন। বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও অস্তিবাদের মূল সুর বিষয়ে কিন্তু তাদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির কোনো প্রভেদ নেই। অমূর্ত মননের বিরোধিতা, ব্যক্তির অস্তিত্বের অর্থ ও সমস্যাবলীর আলোচনা, অস্তিত্বের মূর্ত রূপ, জীবনের মূর্ততা, ব্যক্তিস্বাধীনতা প্রভৃতির

উপর অস্তিবাদীরা সমধিক গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। প্রচলিত দার্শনিক, ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক মতের প্রতি এদের মনোভাবও সমালোচনাত্মক।

২.২ জার্মান ভাববাদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া হিসেবে অস্তিবাদের উদ্ভব

কিয়ের্কেগার্ডকে বলা হয় আধুনিক অস্তিবাদের জনক। তাঁর দু'টি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে Philosophical Fragments এবং Concluding Unscientific Postscript। গ্রন্থ দু'টিতে কিয়ের্কেগার্ড হেগেল প্রবর্তিত পারমার্থিক ভাববাদের বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। হেগেলের মতে চৈতন্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা ব্যক্তিগত সত্তা নয়। তবে তা-ই সত্তা বিষয়ক ধারণার মূল ভিত্তি। তবুও চৈতন্যের ধারক রূপে মানুষের স্থান বিশ্বের কেন্দ্রমূলে। মানুষের সাধারণ কাজকর্মের মধ্য দিয়ে বিষয়ীরূপ চৈতন্যের প্রত্যয় বাস্তব রূপ ধারণ করে। পারমার্থিক সেই অতীন্দ্রিয় সত্তার অভিব্যক্তির একটি মাধ্যম হচ্ছে মানুষ। মানুষের ব্যক্তি অস্তিত্বের মূল্য তাই অতীব নগণ্য। পারমার্থিক ভাববাদ অনুসারে আরও বলা হয় যে, মানুষ এক ব্যাপক কর্মকাণ্ডের যন্ত্রস্বরূপ। তাই তথাকথিত ব্যক্তিস্বাধীনতার অর্থ পারমার্থিক চৈতন্যের আদর্শ পূরণের নিমিত্ত আত্মবলিদান। চৈতন্যই সত্তার মূল স্বরূপ হওয়ায় প্রকৃতির সব বস্তুই জ্ঞেয়। এমন কি মানুষের স্বরূপ সত্তার আদর্শের সঙ্গে এক ও অভিন্ন হওয়ায় মানুষের স্থান মৃত্যুর ঊর্ধ্বে। কিন্তু অস্তিবাদীরা মনে করেন মৃত্যু মানুষের অলঙ্ঘ্য নিয়তি। তাই পারমার্থিক ভাববাদ বিষয়ে তাদের বক্তব্য -এই মতবাদে মানুষের অস্তিত্বের ব্যাখ্যা ভ্রান্ত। এই মতবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে অস্তিত্বশীল স্বাধীন ব্যক্তি মানুষের স্বরূপ নিরূপণে প্রয়াসী হয়েছেন অস্তিবাদীরা।

২.৩ অস্তিবাদী দর্শনে 'অস্তিত্ব' শব্দের অর্থ

সাধারণত অস্তিত্ব বলতে বস্তু, প্রাণী বা বিষয়ের মূর্ত্ত বাস্তব অবস্থা বোঝায়। এই অর্থে মানুষ, মনুষ্যেতর প্রাণী, গাছপালা, নদীনালা প্রভৃতির অস্তিত্বের কথা আমরা বলে থাকি। এই অর্থে যে 'আমি' এখন লিখছি সে অস্তিত্বশীল, অস্তিত্বশীল তার লেখনী, তার লেখার কাগজও। অপরপক্ষে, সোনার পাহাড়, মৎসকন্যা প্রভৃতির কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই,বা তারা কোনো মূর্ত্ত বাস্তব অবস্থায় নেই। অস্তিবাদী দর্শনের উদ্ভবের আগে বা তার পরেও অন্যান্য দার্শনিকেরা 'অস্তিত্ব' শব্দের এই সাধারণ অর্থ গ্রহণ করেই তাদের দার্শনিক কর্ম সুসম্পন্ন করেছেন। কিন্তু অস্তিবাদী দর্শনে 'অস্তিত্ব' শব্দটি একটি বিশেষ অর্থের দ্যোতক হয়ে উঠেছে। অস্তিবাদী দার্শনিকেরা এই শব্দটিকে পারিভাষিক অর্থে গ্রহণ করেছেন। তারা ওই শব্দের সাধারণ ব্যবহার থেকে দূরে সরে এসেছেন। এই পারিভাষিক অর্থ নিয়ে বিব্রত হয়েছেন যে সকল দার্শনিক তাদের মধ্যে কিয়ের্কেগার্ড (Kierkegaard), হাইডেগার (Heidegger), সার্ত্র (Sartre) এবং ইয়াসপার্স (Jaspers) অন্যতম।

২.৩.১ কিয়ের্কেগার্ড ও 'অস্তিত্ব' শব্দের অর্থ

'অস্তিত্ব' শব্দটি ব্যুৎপন্ন হয়েছে ল্যাটিন শব্দ *'ex-sistere'* থেকে যার অর্থ হলো to stand out। *Ex-sistere* বলতে বোঝায় সচেতন ক্রমবিকাশ। ধারাবাহিক প্রয়াস ছাড়া কোনো ব্যক্তি বিশেষের পক্ষেই এই ক্রমবিকাশ ঘটান সম্ভব নয়। কিয়ের্কেগার্ডের মতে অমূর্ত চিন্তা মূর্ত ও কালস্থিত পরিবর্তনশীল সত্তাকে, অস্তিত্ব রক্ষার প্রক্রিয়াকে এবং কালিক পরিবর্তন ও চিরন্তনের মিলনস্থল হিসেবে অস্তিত্বশীল ব্যক্তিসত্তার সমস্যাগুলিকে উপেক্ষা করে। তিনি মনে করেন যে অস্তিত্ব কখনও অমূর্ত গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না। অস্তিত্ব মূর্ত। তা মূর্ত জগতের মধ্যেই উপস্থাপিত স্থান-কালে সীমাবদ্ধ। তবে মূর্ত অস্তিত্ব আনন্ত্যের প্রতি ধাবমান। সান্ত হয়েও সে হতে চায় অনন্ত, চিরন্তন। অস্তিত্বের অভ্যন্তরে তাই নিহিত আছে এক রকম স্ববিরোধ। Existentialism গ্রন্থে এই স্ববিরোধের স্বরূপ নির্ণয় করেছেন John Macquarrie। তাঁর ভাষায়, "Man paradoxically joins in himself the temporal and the eternal, the finite and the infinite; and though will never 'make sense' of this or combine two sides of man's beng in a unitary whole. Existence is not an idea or an essence that can be intellectually manipulated ...Man fulfile his being precisely by existing, by standing out as the unique individual that he and stubbornly refusing to be absorbed into a system."

২.৩.২ হাইডেগার ও 'অস্তিত্ব' শব্দের অর্থ

হাইডেগার 'অস্তিত্ব' শব্দের তিনটি প্রতিশব্দ ব্যবহার করেছেন। তাঁর ব্যবহৃত প্রথম শব্দটি হচ্ছে *'Dasein'*। সাধারণত এই শব্দটি বিভিন্ন বস্তুর অস্তিত্বকে বোঝায়। এমন কি ঈশ্বরের অস্তিত্ব বোঝাতেও এই শব্দটির প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। কিন্তু হাইডেগার কেবলমাত্র মানুষের অস্তিত্ব বোঝাতে এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন। হাইডেগার কর্তৃক ব্যবহৃত দ্বিতীয় প্রতিশব্দটি হচ্ছে *'Vorhandenheit'*। এই শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে 'presence-at-hnd'। এর দ্বারা জাগতিক সকল বস্তু বা প্রাণীর উপস্থিতি বোঝায়। হাইডেগারকর্তৃক ব্যবহৃত তৃতীয় প্রতিশব্দটি হচ্ছে 'Existentz'। এটি একটি জার্মান শব্দ। এর কোনো বাংলা প্রতিশব্দ নেই। হাইডেগারের মতে এই শব্দটি কেবল বিশেষ বিশেষ মানবসত্তার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এর অর্থ শুধু অস্তিত্ব, অথবা অস্তিত্বশীল ব্যক্তিগতসত্তাও হতে পারে।

২.৩.৩ সার্ত্র ও 'অস্তিত্ব' শব্দের অর্থ

কিয়ের্কেগার্ডের মতো সার্ত্রও ব্যক্তির অস্তিত্বের অন্তরস্থিত এক অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা বলেছেন। তবে তাঁর

pour-soi -এর সঙ্গে হাইডেগারই অধিক তুলনীয়। *Pour-soi (for-itself)* হাইডেগারের *Dasein* এবং *Exitenz* -এর অনুরূপ অর্থবাহী। সংক্ষেপে সার্ত্রের *pour-soi*-এর অর্থ হলো ব্যক্তিসত্তা। আর তাঁর *en-soi (in-itself)* ব্যক্তির যথার্থ স্বরূপের দ্যোতক। সার্ত্র মনে করেন যে, ব্যক্তিসত্তা তার যথার্থ স্বরূপ লাভে অসমর্থ হলেও সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে স্বাধীন ও স্ব-নির্ধারিত পথে চেষ্টা করতে সক্ষম। কিন্তু তার এই স্বাধীনতা তার স্বরূপ বা পূর্ণসত্তার দ্বারা উপেক্ষিত হয়। কাজেই ব্যক্তিসত্তা যতো স্বাধীনই হোক না কেন, পূর্ণতার অভাব ব্যক্তিসত্তার মধ্যে চিরকালই বিদ্যমান। Macquarrie যথার্থই বলেছেন, "The pour-soi is free to choose the essence. Its being is its freedom. Yet paradoxically, its freedom is also its lack of being. For Sartre as for Kierkegaard there is an inner contradiction in existence."

২.৩.৪ ইয়াসপার্স ও 'অস্তিত্ব' শব্দের অর্থ

ইয়াসপার্স 'অস্তিত্ব' শব্দের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে কিছুটা অভিনবত্ব স্বীকার করে থাকেন পণ্ডিতেরা। তিনি মনে করেন যে, আমরা প্রথম থেকেই প্রশ্নাতীতভাবে এ-জগতে আছি। জগৎস্থিত সত্তা হিসেবেই আমরা নিজেদের প্রত্যক্ষ করে থাকি। তিনি ব্যবহার করেছেন 'Existenz' শব্দটি। তাঁর মতে Existenz প্রকৃত সত্তা নয়, সুপ্ত সত্তা। অর্থাৎ আমি প্রকৃত সত্তা নই, আমি সম্ভাব্য সত্তা। আমার যথার্থ স্বরূপ আমার মধ্যে প্রদত্ত নয়। তা আমাকে অর্জন করে নিতে হবে। ইয়াসপার্স এই প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যও করেছেন। পার্থক্যটি Existence এর সাথে Transcendence-এর এর অর্থ নিয়ে আরও একটি কথা বলেছেন ইয়েসপার্স। তাঁর মতে ওই শব্দটি সর্বদাই এক বিশেষ সত্তার দ্যোতক। এরকম ব্যক্তিসত্তার কোনো বিকল্প সম্ভব নয় এবং তা কখনই হস্তান্তর হবার যোগ্য নয়।

২.৪ অস্তিত্বের বৈশিষ্ট্য

অস্তিবাদী দর্শনে 'অস্তিত্ব' শব্দের অর্থের আলোচনা থেকে অস্তিত্বের তিনটি মূল বৈশিষ্ট্যের কথা জানা যায়।

প্রথমত, অস্তিবাদী দর্শনে 'existence' শব্দটির সঙ্গে 'transcendence', 'standing out', 'Ecstacy' প্রভৃতি শব্দের ঘনিষ্ট সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। Transcendence বলতে আস্তিক অস্তিবাদী দার্শনিকেরা ঈশ্বরকেই বোঝেন। আর নিরীশ্বরবাদীরা transcendence বলতে বোঝেন আত্ম-অতিক্রমণ। তবে উভয়ক্ষেত্রেই ব্যক্তির অস্তিত্ব যে বহির্মুখী এবং নিরবচ্ছিন্ন গতির প্রতীক তার প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। প্রতি মুহূর্তে অস্তিত্বের রূপ পরিবর্তিত হচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে মানুষ বর্তমানকে অতিক্রম করে ভবিষ্যতের পানে ছুটে চলেছে।

মানুষ কী?— এই প্রশ্নের কোনো প্রাক্‌সিদ্ধ উত্তর অস্তিবাদীদের জানা নেই। বিচিত্র সম্ভাবনাময় অজানা ভবিষ্যতের বিশাল ক্ষেত্রে নিজেকে উপস্থাপিত করেই ব্যক্তি যথার্থ অর্থে অস্তিত্বশীল হতে প্রয়াসী হয় এবং বহু সম্ভাবনার বাস্তব রূপায়ণের ভিতর দিয়ে সে নিজেই এই প্রশ্নের জবাব দানের চেষ্টা করে।

দ্বিতীয়, অস্তিত্ব হলো স্বতন্ত্র, একক ও অনন্য। অস্তিত্ববান হিসেবে প্রতিটি মানুষ এক একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা। প্রত্যেক মানুষেরই এমন কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে যেগুলি তার একান্ত নিজস্ব। এই বৈশিষ্ট্যগুলি থাকার ফলেই সে বিশেষ এবং অন্য সকল মানুষ থেকে স্বতন্ত্র। অস্তিত্বের এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে John Macquarrie বলেছেন, "It is an assertion of my unique individual being as an existent who stands out as this existent and to other." অর্থাৎ আমি আমি হিসেবেই আছি এবং থাকব। আমি আমি ভিন্ন অন্য কেউ নই বা তা হতে পারি না।

তৃতীয়ত, অস্তিত্ব যথার্থ হতে পারে। মানুষ পরিবেশের কাছে আত্ম সমর্পণ করে সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়ম এবং প্রচলিত সামাজিক রীতি-নীতি ও প্রথার অধীনতা স্বীকার করে বাঁচতে পারে। আবার মানুষ সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের উর্ধ্বে উঠে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে তার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠার পথ বেছে নিতে পারে। প্রথম ক্ষেত্রে অস্তিত্ব অযথার্থ, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তা যথার্থ। অস্তিত্ব তখনই যথার্থ বলে গণ্য হবে যখন তা প্রচলিত ভাবধারায় প্রভাবিত না হয়ে স্বাধীনভাবে নিজের জীবনের উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্য সাধন করার পথ নির্ণয় করে তার বাস্তব রূপায়ণে সক্ষম। প্রশ্ন হলো— যদি কোনো মানুষ সমাজবিরোধী হওয়াকেই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলে মনে করে এবং তা বাস্তবায়িত করে তাহলেও কি বলা হবে যে সেই ব্যক্তির অস্তিত্ব যথার্থ? কিম্বা যদি কোনো মানুষ প্রচলিত নৈতিক বিধি অনুযায়ী জীবন পরিচালিত করে তবে তার অস্তিত্ব কি অযথার্থ?

এরকম প্রসঙ্গ নিয়ে নিশ্চয়ই বিতর্কের অবকাশ আছে। তবে সার্ত্র বলেন যে, আমরা প্রত্যেকেই নিজের জন্য উদ্দেশ্য ও পথ নির্বাচন করতে গিয়ে পরোক্ষভাবে অপর সকলের জন্যও তা করে ফেলি। আর এ ব্যাপারে প্রত্যেকের দায়িত্ব সমান। স্বাধীনতা, সর্বদাই দায়িত্বপূর্ণ। তাই প্রতিটি স্বাধীন ব্যক্তিকেই অনিবার্যভাবে দায়িত্বের বোঝা বহন করতে হয়। তাই সমাজবিরোধী হবার বাসনা কোনো দায়িত্বশীল ব্যক্তি মনে পোষণ করতে পারেন না। সংক্ষেপে, 'অস্তিত্ব' শব্দের প্রকৃত অর্থ হলো অন্য সব কিছু এবং অন্য সব মানুষের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত জগৎস্থিত আমির অস্তিত্ব।

২.৫ সারসত্তা অস্তিত্বের পুরোগামী

অস্তিবাদী দার্শনিকেরা তাদের দার্শনিক তত্ত্ব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভাববাদের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। একথা আমরা পূর্বেই বলেছি। ভাববাদী দর্শন সম্পর্কে তাদের মনোভাব যে আপোষহীন তা আমরা উল্লেখ করেছি। অস্তিত্ব ও সারসত্তার সম্বন্ধ নিয়ে ভাববাদীরা যা বলেছেন অস্তিবাদী দার্শনিকেরা তার উল্টোটাই বলেছেন।

প্রসঙ্গত, অস্তিত্ব ও সারসত্তার সম্বন্ধ নিয়ে জানার আগে তা নিয়ে ভাববাদী দার্শনিকদের মত জানার প্রশ্ন ওঠে। বলা বাহুল্য, অস্তিবাদী দার্শনিকেরা যে সকল প্রসঙ্গ নিয়ে ভাববাদের বিরোধিতা করেছেন অস্তিত্ব ও সারসত্তার সম্বন্ধ তাদের অন্যতম।

ভাববাদীদের মতে জগতের মূল তত্ত্ব হলো অমূর্তভাব (idea) অথবা সামান্য ধারণা (universal)। কারণ মূর্ত পদার্থ মাত্রেই যৌগিক এবং বিভাজ্য। বিভিন্ন অংশের সংযোজনে যার উৎপত্তি তা-ই হলো একটি বিশেষ যৌগিক পদার্থ। সংযুক্ত অবস্থায় অংশগুলি যতোদিন থাকে ততোদিন যৌগিক পদার্থের স্থিতি। আর ওই অংশগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল যৌগিক পদার্থটিও বিলুপ্ত হয়। কিন্তু তত্ত্বের কখনও উৎপত্তি বা বিনাশ থাকতে পারে না। তার থাকে কেবল স্থিতি। এই কারণে তত্ত্ব কখনও যৌগিক হতে পারে না। তার উৎপত্তি বা বিনাশ থাকা সম্ভব নয়। ভাব বা সামান্য অমূর্ত হওয়ায় তা নিরংশ, মৌলিক ও চিরন্তন। বিশেষ বিশেষ মানুষের জন্ম, জীবন ও মৃত্যু আছে। কিন্তু মনুষ্যত্বরূপ অমূর্ত ভাব বা সামান্য চিরন্তন। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ —এই তিন কালের মানুষের ক্ষেত্রেই মনুষ্যত্ব কথাটি প্রযোজ্য। কারণ মনুষ্যত্ব রূপ সামান্য ধারণাটি গঠিত হয়েছে মানুষ জাতির পক্ষে অপরিহার্য গুণগুলি দিয়ে। প্রত্যেক মানুষই জীব। তার জীববৃত্তি আছে। আবার প্রত্যেক মানুষই বুদ্ধিমান প্রাণী। তাই মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিতা স্বীকার্য। এই দুই বৈশিষ্ট্য — জীবত্ব ও বুদ্ধিবৃত্তিত্ব যার আছে সেই মানুষ। বিশেষ বিশেষ মানুষের হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে মনুষ্যত্বরূপ সামান্য ধারণার কোনো হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না।

ভাববাদী দার্শনিকেরা মনে করেন যে, পরিবর্তনশীল বিশেষ সমূহের জগৎ চিরন্তন, অমূর্ত ভাবসমূহের মূর্ত প্রকাশ। কিন্তু মানুষ যেমন নিজের অথবা অন্য কোনো বিশেষের আবির্ভাবের জন্য দায়ী নয়, তেমনি সে কোনো সামান্যের সৃষ্টিকর্তাও নয়। সে শুধু কোনো এক শ্রেণীর কিছু সংখ্যক বিশেষ বস্তু বা জীব পর্যবেক্ষণ করে তাদের শ্রেণীগত সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি জানতে পারে; এবং সেই অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যগুলির সমন্বয়ে গঠিত সামান্যটি আবিষ্কার করতে পারে। তাছাড়া, মানুষ সর্বজ্ঞ নয়। এমন অনেক জিনিস আছে যা এখনও মানুষের অজানা।

প্রশ্ন এখানেই — সামান্য যদি মনুষ্যসৃষ্ট না হয় তবে তার উৎসস্থলটি কী? বিশেষ এবং সামান্যের জ্ঞান চেতনা ভিন্ন অসম্ভব। কাজেই ভাববাদীরা মনে করেন — এক অদ্বিতীয়, অনন্ত বিশ্বচেতনা বা পরম ধীশক্তি আছে। এই পরম ধীশক্তি মানুষের জানা এবং অজানা উভয় প্রকার সামান্যেরই উৎস। এই অদ্বিতীয় তত্ত্বই পরম তত্ত্ব। এই অদ্বিতীয় বিশ্বচেতনাই সকল প্রকার অমূর্ত, অবিভাজ্য, এবং মৌলিক ধারণার উৎস। দৃশ্যমান জগৎ সেই মৌলিক ধারণার মূর্ত প্রকাশ। ভাববাদী দার্শনিকদের মধ্যে প্লেটো এবং হেগেলের নাম উল্লেখযোগ্য; কারণ প্রাচীন যুগে দার্শনিকদের মধ্যে প্লেটোই সর্বপ্রথম তাঁর দর্শনে ভাববাদের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দান করেন। আর হেগেলীয় দর্শনে এই মতবাদ চরম পরিণতি লাভ করে।

ভাববাদী দর্শনে বিশেষের তুলনায় তার নির্যাসরূপে সামান্য ধারণাই অধিকতর মূল্যবান এবং পুরোগামী। "Essence precedes existence"— অর্থাৎ আগে ভাব, তারপর বিশেষর মাধ্যমে তার মূর্ত প্রকাশ।

আগে নিত্য অরূপ ধারণা, তারপর অস্তিত্বশীল রূপের মাধ্যমে তার অভিব্যক্তি। নির্যাসরূপে নিত্য ভাব আগে, তারপর বিশেষর অস্তিত্ব। আগে মনুষ্যত্ব, তারপর বিশেষ বিশেষ মানুষের অস্তিত্ব।

২.৬ অস্তিত্ব সারধর্মের পুরোগামী

'সারধর্ম অস্তিত্বের পুরোগামী'— সর্বপ্রথম এই ভাববাদী তত্ত্বের বিরোধিতা করেন ডেনমার্কের বিখ্যাত দার্শনিক সোরেন কিয়ের্কেগার্ড। শুধু তাই নয়, তিনি ভাববাদীদের ওই সূত্রের ঠিক বিপরীত কথাই প্রতিপাদন করতে চাইলেন — 'অস্তিত্ব সারধর্মের পুরোগামী'। Barrett-এর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ হচ্ছে *Irrational Man*। এই গ্রন্থে Barrett কিয়ের্কেগার্ডের মতকে সংক্ষেপে অথচ খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। Barrett বলেছেন, "Existence cannot be represented in a concept because it s too dense, concrete and rich. I am; and this fact that I exist is so compelling and enveloping a reality that it can not be reproduced thinly in any of my mental concepts, though it is clearly the life and death fact without which all my concepts would be void." অর্থাৎ Barrett মনে করেন— আমি আছি। আমি একটি মূর্ত মানব সত্তা। আমার জন্ম-মৃত্যুযুক্ত অস্তিত্ব একটি গুণসমৃদ্ধ নিরেট বাস্তব ঘটনা। ঘটনাটি এতোই সুস্পষ্ট যে তাকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। জন্ম-মৃত্যু ব্যতীত আমার অস্তিত্ব সম্পর্কে সকল ধারণাই শূন্যগর্ভ। সুতরাং মূর্ত আধেয়বিহীন কোনো মানস ধারণার মাধ্যমে এহেন বাস্তব ঘটনার অভিব্যক্তি অসম্ভব। অস্তিত্ব মনের ধারণামাত্র নয়।

কিয়ের্কেগার্ডের মতে অস্তিত্ব একটি বাস্তব ঘটনা। বাস্তব অস্তিত্ব এবং অস্তিত্ব বিষয়ক চিন্তা এক নয়। অস্তিত্বের স্বরূপ নিয়ে বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন মত পোষণ করতে পারেন, কিন্তু অস্তিত্ব যা তা-ই থাকে। মতামতের বিভিন্নতার কারণে তার রূপের কোনো পরিবর্তন হয় না। অস্তিবাদী-দার্শনিকদের মতো কান্টও মনে করেন যে, কোনো বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা সেই বাস্তুর বাস্তব অস্তিত্বের দ্যোতক নয়। বস্তুর ধারণা এবং তার অস্তিত্বের ধারণা স্বরূপত এক; কারণ উভয়ই ধারণা। অতএব বৈচিত্র্য সমৃদ্ধ কোনো সামান্য ধারণার মাধ্যমে অস্তিত্ব কখনই সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত হতে পারে না।

কিয়ের্কেডার্ডের মতের কথা ভালভাবে বুঝে নেবার জন্য আর একটি সম্পূর্ণ বিপরীত মতের সঙ্গে তাঁর মত তুলনীয়। এই বিপরীত মতটি ডেকার্তের। ডেকার্তের মতে, 'আমি চিন্তা করি, সুতরাং আমি আছি'। মনে করেন, চিন্তাশক্তিই 'আমি'-র অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। সুতরাং চিন্তাশক্তির উপস্থিতি অনিবার্যভাবে চিন্তন কর্তার অস্তিত্ব সূচিত করে। সব কিছুকে সন্দেহের চোখে দেখা চলে, কিন্তু চিন্তন ক্রিয়ার কর্তা হিসেবে 'আমি'-র অস্তিত্ব সন্দেহাতীত। এই মতের বিরোধিতা করে কিয়ের্কেগার্ড বলেছেন, "... this being which is ascribed to the thinker does not signify that he is, but is only that he is engaged in thinking... The existing individual, on the other hand, is engaged in existing

which is indeed the case with every human being." অর্থাৎ কেবল চিন্তাশীল সত্তা হিসেবে মানুষের অস্তিত্ব আছে— একথা বলা ঠিক নয়। চিন্তাশীল হবার অর্থই অস্তিত্বশীল হওয়া নয়। যে চিন্তাশীল সে চিন্তারত থাকতে পারে। কিন্তু যে অস্তিত্বশীল সে নিজের অস্তিত্বের পূর্ণ রূপ দানে ব্যস্ত— একথা প্রত্যেকটি মানব সত্তার ক্ষেত্রেই খাটে।

অস্তিত্ব যে সারধর্মের পুরোগামী – একথার ব্যাখ্যাতা সার্ত্রও। সার্ত্র শুরুতেই যে প্রশ্নটি তুলেছেন তা হলে – 'অস্তিত্ব সারধর্মের পুরোগামী'– একথার অর্থ কী? এর উত্তরে তিনি বলেছেন, "We mean that man first of all exists, encounters himself, surges up the world – and defines himself afterwards." অর্থাৎ সার্ত্রের মতে মানুষের অস্তিত্ব আছে –এটাই প্রথম কথা। তারপর সে নিজেই নিজের সম্মুখীন হয়, আপন পছন্দ অনুযায়ী জগৎকে গতিশীল করতে তৎপর হয় এবং পরিশেষে নিজের নিজের সংজ্ঞার্থ নিরূপণ করে।

সার্ত্রের মতে মানুষের কোনো পূর্ব ঘোষিত সারধর্ম থাকতে পারে না, যার সাহায্যে মুনষ্যত্বরূপ সামান্য ধারণা গঠিত হয়। ভাববাদীদের মতে মনুষ্যত্বরূপ সামান্য ধারণা মৌলিক ও চিরন্তন হওয়ায় জগতে মানুষের প্রথম আবির্ভাবের আগেই ছিল। কিন্তু সার্ত্র বলেন যে, প্রত্যেক মানুষের জীবনে থাকে বিভিন্ন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য। সে স্বেচ্ছায় যা হতে চায় তা-ই তার জীবনের লক্ষ্য। স্ব-নিধারিত পসে সে লক্ষ্যের পানে অগ্রসর হয়। তার জীবন একটা কর্মধারা, স্ব-নির্ধারিত লক্ষ্যের বাস্তব রূপায়ণের এক অবিরাম প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টায় সে যেভাবে সকলের মধ্যে নিজেকে উপস্থাপিত করে তা-ই হলো তার স্বরূপ বা সারধর্ম। সারধর্ম তাই স্ব-অর্জিত বৈশিষ্ট্য। তা অর্জনের জন্য যা দরকার তা হলো তার অস্তিত্ব।

সার্ত্র বলেন যে যা আছে তাই বাস্তব। নিজের সম্পর্কে পূর্বনির্ধারিত কোনো ধারণার মধ্য দিয়ে তার প্রকৃত রূপ প্রকাশিত হয় না। সে স্বেচ্ছায় যা হতে চায় বা হতে পারে বস্তুতপক্ষে সে তা-ই। মানুষ নিজের সম্পর্কে একটা ধারণা গঠন করে। আর তা সে করে একটি অস্তিত্বশীল সত্তা হিসাবে। সে নিজেকে যেভাবে গঠন করে সেটাই হয় তার বাস্তব রূপ। সে এর বেশী কিছু নয়। এটাই সার্ত্র-প্রণীত অস্তিবাদের মূল সূত্র। প্রত্যেক মানুষ তার স্ব-আকাঙ্ক্ষিত রূপের যতটুকু সে বাস্তবায়িত করতে পারবে ততটুকুই তার স্ব-অর্জিত সারধর্ম। সার্ত্রের কথায়, "Since there is no pre-established pattern for human nakure, each man mates his essence as he likes."

এই প্রসঙ্গে সার্ত্র ভাববাদী দার্শনিকদের মতের বিরোধিতা করেছেন এই মর্মে যে সারধর্ম কখনই বিশেষের দৃশ্যমান রূপের অন্তরালে নিহিত থাকতে পারে না। বরং মূর্ত বিশেষের মাধ্যমেই ক্রমান্বয়ে তার প্রকাশ ঘটতে থাকে। কোনো কিছুর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ তার স্বরূপ বা সারধর্মকে আবৃত করে না। বরং তাকে প্রকাশ করে। এই দৃশ্যমান রূপটিই তার স্বরূপ। সারধর্ম কোনো এক অস্তিত্বশীল সত্তার অতল গহ্বরে নিমজ্জিত বৈশিষ্ট্যমাত্র নয়।

বহু বিচিত্র অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে তার স্বরূপ প্রকাশিত হতে থাকে। এটাই তার স্বরূপের ক্রম অভিব্যক্তির নিয়ামক বিধি। তাই সার্ত্রের সিদ্ধান্ত— বিশেষ বিশেষ মানুষের অস্তিত্ব অনিবার্যভাবে তার সারধর্মের পুরোগামী।

২.৭ নমুনা প্রশ্নাবলী

১। কিয়ের্কেগার্ড, হাইডেগার, সার্ত্র ও জিয়েসপার্সকৃত 'অস্তিত্ব' পদটির অর্থ ব্যাখ্যা কর। অস্তিত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

২। অস্তিত্বের কাঠামো বলতে কী বোঝায়? এই কাঠামো কীভাবে গঠিত হয়।

৩। 'অস্তিত্ব সারধর্মের পুরোগামী' — সার্ত্র কীভাবে এই তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠা করেছেন? আলোচনা কর।

৪। টীকা লেখ ঃ-

ক) অস্তিত্বের কাঠামো

খ) আস্তিক অস্তিবাদ

গ) নাস্তিক অস্তিবাদ

ঘ) 'সারধর্ম অস্তিত্বের পুরোগামী'

ঙ) অস্তিত্বের বৈশিষ্ট্য

২.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১। Exitentialism by John Macquarrie

২। Exitentialism by Mary Warnock

৩। Being and Nothingness by J. P. Sartre

৪। Irrational May by William Barrett

৫। *অস্তিবাদের মর্মকথা*, শৈলেশ রঞ্জন ভট্টাচার্য

৬। *অস্তিবাদের দর্শন ও প্রতিভাস বিজ্ঞান*, স্বপ্না সরকার

তৃতীয় পাঠ

সামান্য : কিছু দার্শনিক প্রসঙ্গ

পাঠ সংকেত

৩.১ অবতরণিকা

৩.২ সামান্য বিষয়ক বস্তুবাদ

৩.২.১ সামান্য বিষয়ে প্লেটোর মত

৩.২.২ সামান্য বিষয়ে প্লেটোর মতের সমালোচনা

৩.২.৩ সামান্য বিষয়ে অ্যারিস্টটলের মত

৩.২.৪ সামান্য বিষয়ে অ্যারিস্টটলের মতের সমালোচনা

৩.৩ সামান্য বিষয়ক ধারণাবাদ

৩.৪ সামান্য বিষয়ক ধারণাবাদের সমালোচনা

৩.৫ সামান্য বিষয়ক নামবাদ

৩.৬ সামান্য বিষয়ক নামবাদের সমালোচনা

৩.৭ নমুনা প্রশ্নাবলী

৩.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৩.১ অবতরণিকা

মানুষ যে বর্ণেরই হোক — কৃষ্ণবর্ণ, শ্বেতবর্ণ বা পীতবর্ণ—আমরা প্রত্যেক বর্ণের মানুষকেই মানুষ বলে অভিহিত করি। একই গাছের বিভিন্ন পাতা। তারা এক হয়েও যেন এক হয় না। তবুও তো তারা পাতা। একই দোকানের একই কাঠের একই ছুতোর নির্মিত দু'টি চেয়ার। তবুও তাদের মধ্যে প্রভেদ যে নেই তা নয়। তবুও তারা চেয়ার। একই জাতীয় বিভিন্ন বস্তুকে একই নামে অভিহিত করা হয়। নিজস্ব নাম দিয়ে ওই নামধারী বিশেষ ব্যক্তিকে বোঝায়। কিন্তু 'মানুষ', 'পাখি', 'গাছ', 'গাছের পাতা' প্রভৃতি সামান্য পদ। এরকম একটি সামান্য পদ দিয়ে কাকে বোধ্যব্য? অনেকে বলেন, এরকম সামান্য পদদ্বারা সামান্যই বোধ্যব্য। প্রশ্ন এখানে— সামান্যের স্বরূপ কী? দার্শনিক মহলে এ-নিয়ে বিভিন্ন মতবাদ সৃষ্টি হয়েছে। কেউ বলেন—সামান্য দ্রব্যস্বরূপ, কেউ বলেন—

সামান্য ধারণা স্বরূপ, কেউ বলেন সামান্য নামমাত্র। সামান্য বিষয়ক এই মতগুলি যথাক্রমে বস্তুবাদ, ধারণাবাদ ও নামবাদ নামে পরিচিত।

৩.২ সামান্য বিষয়ক বস্তুবাদ

সামান্য বিষয়ক বস্তুবাদ অনুসারে ভাষায় ব্যবহৃত সামান্য পদসমূহ সামান্য নির্দেশক। সামান্য জ্ঞান-নিরপেক্ষভাবে সৎ। সামান্য ইন্দ্রিয়গম্য নয়, বুদ্ধিগম্য। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কেবল ব্যক্তিকে জানা যায়, সামান্যকে নয়। সামান্য বিষয়ক বস্তুবাদী দার্শনিক হলেন প্লেটো এবং অ্যারিস্টটল। তবুও গুরু-শিষ্য সম্পর্কে আবদ্ধ এই দুই দার্শনিকের মধ্যে মতভেদ আছে। প্লেটোর মতে সামান্য দ্রব্যস্বরূপ, অ্যারিস্টটলের মতে সামান্য দ্রব্য নয়, ব্যক্তিসমূহের সাধারণ ধর্ম। প্লেটো মনে করেন— ব্যক্তি না থাকলেও সামান্যের অস্তিত্ব সম্ভব। কিন্তু অ্যারিস্টটল মন করেন — ব্যক্তি ছাড়া জাতির অস্তিত্ব অসম্ভব। ফলে প্লেটো এবং অ্যারিস্টটলের হাতে সামান্য বিষয়ক বস্তুবাদ দুটি ভিন্নরূপ ধারণ করেছে।

৩.২.১ সামান্য বিষয়ে প্লেটোর মত

প্লেটোর মতে সামান্য দ্রব্যস্বরূপ, স্বয়ংসৎ ও স্বতন্ত্র। প্লেটো সামান্যকে আকার নামে অভিহিত করেছেন। প্রত্যেক শ্রেণীরই একটা আকার থাকে। শ্রেণীর অন্তর্গত সকল সদস্যে সেই আকারই বাস্তবায়িত হয়। মানুষমাত্রেই মানবাকারের বা মানব- সামান্যের কিঞ্চিৎ রূপায়ণ। সেই রকম গরু, ঘোড়া, হাতী প্রভৃতি শ্রেণীর যে আকার বা সামান্য আছে বাস্তব গরু, ঘোড়া, হাতী প্রভৃতি সেই সামান্যের অনুকরণ বৈ অন্য কিছু নয়। তবে সামান্যের কোনো মাত্রাভেদ নেই, তা আছে ব্যক্তির।

সামান্য যে দ্রব্যস্বরূপ তার দার্শনিক অর্থ হচ্ছে সামান্য স্বয়ংসৎ, তা তার নিজসত্তার উৎস। এই পারিভাষিক অর্থে সামান্য দ্রব্যস্বরূপ। সামান্যই চরম এবং পরম সত্তা। সামান্য যেমন অন্য সকল বস্তুর আশ্রয় তেমনি নিজের আশ্রয়।

প্লেটো সামান্যকে ধারণাও বলেছেন। তবে তা কোনো ব্যক্তিমনের ধারণা নয়। একটি ঘোড়ার ধারণা এই বা ওই ঘোড়া নয়। ব্যক্তিমনের ধারণার বিষয়গত দিক হলো সামান্য। সামান্য ধারণাস্বরূপ হওয়ায় সামান্য এক,বহু নয়। সামান্য অপরিবর্তনশীল ও অবিনাশী। সামান্য বস্তুর সারসত্তাস্বরূপ এবং দেশ ও কালের অতীত।

সামান্য বিষয়ক প্লেটোর কথা থেকে মনে হয়— তিনি দ্বিজগৎ তত্ত্বে বিশ্বাসী। একটা জগৎ আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার জগৎ, শব্দ-স্পর্শ-রস-রূপ-গন্ধের জগৎ। আর একটা বুদ্ধির জগৎ যে জগতে কেবল বুদ্ধির দ্বারাই জ্ঞান লাভ করা যায়। ওই ইন্দ্রিয়াতীত বুদ্ধিগম্য জগৎই সামান্যের জগৎ, আকার বা ধারণার জগৎ। প্রশ্ন হলো—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সাথে ইন্দ্রিয়াতীত জগতের সম্বন্ধ কী? অন্য কথায় জাগতিক বস্তুর সাথে

আকার বা সামান্যের কী সম্বন্ধ ? প্রসঙ্গত প্লেটো তিন রকম সম্পর্কের কথা বলেছেন—মূলের সঙ্গে অনুকরণের সম্পর্ক, অংশগ্রহণের সম্পর্ক এবং উদাহরণের সম্পর্ক।

(এক) মূলের সঙ্গে অনুকরণের সম্পর্ক : সামান্যই পূর্ণসত্তা। বিশেষ বিশেষ বস্তুর কোনো নিজস্ব সত্তা নেই। সামান্যের সঙ্গে জাগতিক বস্তুর সম্বন্ধ তাই মূলের সঙ্গে অনুকরণ বা প্রতিলিপির সম্পর্ক। জাগতিক বস্তুসমূহ সামান্যের অসম্পূর্ণ প্রতিলিপি মাত্র।

(দুই) অংশগ্রহণের সম্পর্ক : ব্যক্তিকে সামান্যের অংশীদারও বলেছেন প্লেটো। একটা অনুষ্ঠানে যেমন বিভিন্ন ব্যক্তি অংশগ্রহণ করে থাকে তেমনি বিভিন্ন ব্যক্তি একই সামান্যে অংশগ্রহণ করে।

(তিন) উদাহরণের সম্পর্ক : প্লেটোর দর্শনে সামান্য ও ব্যক্তির এই তৃতীয় সম্পর্কটি খুঁজে পেয়েছেন John Hospers। এ সম্পর্ক হলো উদাহরণ -উদাহৃতের সম্পর্ক। ব্যক্তি হচ্ছে সামান্যের মূর্ত রূপ বা উদাহরণ ব্যক্তির মধ্যেই সামান্য রূপ ধারণ করে।

৩.২.২ সামান্য বিষয়ে প্লেটোর মতের সমালোচনা

Theory of Knowledge গ্রন্থে Woozley প্লেটোর সামান্য বিষয়ক মতের দু'টি ত্রুটি উল্লেখ করেছেন—(এক) প্লেটোর এই তত্ত্ব দুর্বোধ্য এবং (দুই) এই তত্ত্ব সমর্থনে সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাব।

(এক) প্লেটোর সামান্য বিষয়ক তত্ত্বের দুর্বোধ্যতা : প্লেটোর মতে সামান্যের জগৎ আমাদের পরিচিত দেশ-কালে বিস্তৃত জগৎ থেকে আলাদা। সে জগৎ অতীন্দ্রিয় ও নিত্য। আর Woozley -এর মতে এখানেই দুর্বোধ্যতার সৃষ্টি। দেশ-কালাতীত জগতে সামান্যের অস্তিত্ব— একথা বলার অর্থ কী? সাধারণ অর্থে আমরা বস্তুর অস্তিত্ব বলতে বস্তুটি কোনো দেশে বা কোনো কালে আছে তাই বুঝি। কাজেই — নিত্য সামান্য দেশে ও কালে নেই অথচ তার অস্তিত্ব আছে —একথা বলায় প্লেটোর মতে স্ববিরোধ ঘটেছে। এমনকি প্লেটোর কথা যদি মেনেও নিতে হয় তাহলেও বলতে হয় যে অস্তিত্ব দু'রকম — দেশ ও কালগত অস্তিত্ব এবং দেশহীন ও কালহীন অস্তিত্ব। Woozley মনে করেন এই দ্বিতীয় প্রকার অস্তিত্বকে প্লেটো সহজ-সরলভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন নি।

(দুই) প্লেটোর তত্ত্ব সমর্থনে সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাব : সামান্য বিষয়ক প্লেটোর মত সমর্থনে কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই। এমন কোন প্রমাণ নেই যার সাহায্যে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব যে সামান্য দেশাতীত, সামান্য কালাতীত। সামান্য নিত্য, ব্যক্তি সামান্যের মূর্ত রূপ, তা প্রত্যক্ষের সাহায্যে দেখানো সম্ভব নয়।

প্লেটোর সামান্য বিষয়ক মতের সপক্ষে প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতিরেকে একমাত্র যে প্রমাণ উত্থাপন করা যায় তাকে বলা চলে পরোক্ষ যুক্তি। Woozley উল্লেখ করেছেন যে কান্টের দর্শনে এরকম যুক্তিকে বলে জ্ঞানতাত্ত্বিক

যুক্তি (transcendental argument)। পরোক্ষ যুক্তি অনুসারে প্লেটো বলতে চেয়েছেন যে, সামান্য স্বীকার না করলে বস্তু সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু Woozley -র মতে যে কোনো ব্যক্তিই এরকম যুক্তি দিয়ে দাবি করতে পারেন যে তার মত স্বীকার না করলে আলোচ্য বিষয়ের সুষ্ঠু ব্যাখ্যা দেওয়ায় সম্ভব নয়। এক কথায়, প্লেটোর বিরুদ্ধে Woozley -র অভিযোগ হচ্ছে — প্লেটোর মত কোনো সমর্থক যুক্তি দ্বারা সমর্থিত নয়।

৩.২.৩ সামান্য বিষয়ে অ্যারিস্টটলের মত

নিত্য সামান্যের সঙ্গে অনিত্য পদার্থের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে প্লেটো বলেছিলেন দুই জগতের কথা — আমরা উল্লেখ করেছি। কিন্তু অ্যারিস্টটল প্লেটোর মতো এই দ্বিজগৎ তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না। এক অতীন্দ্রিয় কেবল সামান্যের অস্তিত্ব আছে — প্লেটো-প্রণীত এই মত তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয় নি। সামান্যকে ধারণা বলেছিলেন প্লেটো। প্লেটোর ধারণা বিষয়ক মতের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন অ্যারিস্টটল। সামান্য বিষয়ক প্লেটোর মত খণ্ডনে অ্যারিস্টটল নিম্নলিখিত যুক্তিগুলির অবতারণা করেছেন:

প্রথমত আকার স্বরূপ সামান্য বস্তুর অস্তিত্বের ব্যাখ্যা দিতে পারে না। জাগতিক বস্তুর বৈচিত্র্যের ব্যাখ্যা দানই দর্শনের একটি মূল সমস্যা। প্লেটো এই সমস্যার সমাধান কল্পেই ধারণা বা সামান্যের প্রসঙ্গ টেনেছিলেন। কিন্তু প্লেটোর সামান্য বা ধারণা বিষয়ক মত এই সমস্যার সন্তোষজনক সামাধান দিতে পারে নি। যদি মেনেও নেওয়া হয় যে, শ্বেতত্বের ধারণার অস্তিত্ব আছে তবুও তা থেকে কীভাবে শ্বেতবস্তু উৎপন্ন হয় তা বোঝা অত্যন্ত দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয়ত ধারণা বা সামান্যের সঙ্গে বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তির সম্পর্ক নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অ্যারিস্টটল। প্লেটোর মতে অনিত্য বস্তুরাজি নিত্যসামান্যের প্রতিলিপি এবং তারা সামান্যে অংশগ্রহণ করে। অ্যারিস্টটলের প্রশ্ন এখানেই। ঐ অংশগ্রহণের অর্থ কী? অ্যারিস্টটলের মতে প্লেটো এই প্রশ্নের স্পষ্ট কোনো উত্তর দিতে পারেনে নি। 'অংশগ্রহণ' কাব্যিক রূপক মাত্র, তা কোনো সমাধান নয়।

তৃতীয়ত সামান্য স্বরূপ ধারণা সমূহের দ্বারা প্লেটো অনিত্য জগতের ব্যাখ্যা দানে প্রয়াসী হয়েছিলেন। স্বেতত্বের ধারণা শ্বেতবস্তুর জনক, সৌন্দের্যের ধারণা সুন্দর বস্তুর জনক ইত্যাদি। কিন্তু ধারণাগুলি অপরিণামী ও গতিহীন হওয়ায়, এবং এই জগৎ ধারণার প্রতিলিপি হওয়ায় প্লেটো এই জগতের গতিময়তার ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি। জাগতিক পরিবর্তন ব্যাখ্যার জন্য ধারণার মধ্যেই কোনো সূত্র থাকা প্রয়োজন; কিন্তু প্লেটো এমন কোনো সূত্র স্বীকার করেন নি।

অবশ্য এমন অনেক দার্শনিক আছেন যারা মনে করেন যে অ্যারিস্টটল প্লেটোর সামান্য বিষয়ক মতের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন করে তাঁর প্রতি সুবিচার করেন নি। কারণ ধারণা যে গতির ব্যাখ্যা দিতে পারে না

সেই বিষয়ে প্লেটো সচেতন ছিলেন এবং এই সচেতনতার ফলে প্লেটো তাঁর দর্শনে গতির নিয়ন্তা রূপে Demiurge -এর ধারণাটি অবতারিত করেছিলেন।

চতুর্থত এই জগতে বহুসংখ্যক বস্তু আছে। প্লেটো এই বহুত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বহুসংখ্যক ধারণার অস্তিত্ব মেনেছেন। তাতে অ্যারিস্টটলের মতে ধারণাগুলির নিছক প্রত্যক্ষগ্রাহ্য বস্তুর অপ্রয়োজনীয় দ্বিত্বকরণ ঘটেছে।

পঞ্চমত প্লেটো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের ব্যাখ্যাদান করতে গিয়ে অতীন্দ্রিয় ধারণার সন্ধানে ব্যাপৃত হয়েছিলেন। কিন্তু ধারণাগুলিও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। ঘোড়া ও ঘোড়ার ধারণা, মানুষ ও মানুষের ধারণার মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই।

অবশ্য এ অভিযোগটিকেও অনেকে যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেন না। প্লেটো সামান্য মানুষ বলতে বুঝেছেন আদর্শ মানুষকে যা একটি আকার বা ধারণাস্বরূপ। ধারণা কখনোই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হতে পারে না।

ষষ্ঠত Bertrand Russell প্লেটোর সামান্য বা আকারবাদের বিরুদ্ধে 'তৃতীয় মানুষের যুক্তিটি'কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। এই যুক্তি অনুসারে সব মানুষের মধ্যে যেদিক থেকে মিল আছে তা হল - তারা মানুষের ধারণার বা সামান্যের অনুকরণ। তাহলে বিশেষ বিশেষ মানুষ ও মানুষের ধারণার মধ্যে একটা সাধারণ উপাদানের অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করতে গেলে একটি তৃতীয় ধারণার কথা ভাবতে হয়। আর তৃতীয় ধারণা ও ব্যক্তিমানুষের মধ্যে সাধারণ উপাদান হিসেবে অন্য আর একটি সাধারণ ধারণার কথা ভাবতে হয়। আর এভাবে চলতে থাকলে অনবস্থা দোষ দেখা দেয়।

সপ্তমত সামান্য বস্তুর সারাসত্তা স্বরূপ। কিন্তু প্লেটো সারসত্তাগুলিকে বস্তুর বাইরে থাকে ভেবেছিলেন। অ্যারিস্টটলের মতে তা সম্ভব নয়। সারসত্তারূপে সামান্য বস্তুর অন্তরেই নিহিত।

অ্যারিস্টটল প্রদত্ত এই সাতটি যুক্তি প্লেটোর সামান্য বিষয়ক মতের বিরুদ্ধে দু'টি সমালোচনা উপস্থাপন করে। (এক) সামান্য উপযুক্তভাবে বস্তুস্বভাব ব্যাখ্যা করতে পারে না। (দুই) বস্তু ও সামান্যের সম্পর্ক তাতে অব্যাখ্যেয় থেকে যায়।

সামান্য বিষয়ে প্লেটোর মত খণ্ডন সামান্য বিষয়ে অ্যারিস্টটলের মতের নঞর্থক দিক। অ্যারিস্টটলের মতের সদর্থক দিকও আছে। প্লেটোর মতে সামান্য দ্রব্যস্বরূপ। কিন্তু অ্যারিস্টটলের মতে সামান্য দ্রব্যধর্মী নয়। সামান্য হলো বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম। স্বনির্ভর সামান্যের কোনো অস্তিত্ব নেই। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির সাধারণ ধর্মই সামান্য। ফলে সামান্যের অবস্থান ব্যক্তিতে। সামান্য যেমন ব্যক্তির উপর যৌক্তিকভাবে নির্ভরশীল, তেমনি ব্যক্তিও যৌক্তিকভাবে সামান্যের উপর নির্ভরশীল। মানুষ না থাকলে মানুষের সারধর্ম যে মনুষ্যত্ব তা থাকতে পারে না; কারণ মানুষ মনুষ্যত্বের আশ্রয়। আশ্রয় ব্যতিরেকে অশ্রিতের থাকা সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে মনুষ্যত্ব যদি না থাকে কোনো প্রাণীকে মনুষ্য বলা যাবে না। সুতরাং সামান্য ও ব্যক্তি একে অপরের উপর নির্ভরশীল।

অ্যারিস্টটল বলেন, একই শ্রেণীর একাধিক বস্তুকে পর্যবেক্ষণ করে ও পরস্পর তুলনা করে আমরা যে ধর্মটি তাদের মধ্যে আছে বলে লক্ষ করি, সেই ধর্মটিকে আমরা বিমূর্তীকরণ প্রক্রিয়ায় পৃথক করে নিই। ওই ধর্মটি

হবে সংশ্লিষ্ট শ্রেণীর শ্রেণীধর্ম বা সামান্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ, অনেক মানুষ দেখে আমরা তাদের মধ্যে মনুষ্যত্ব ধর্মটি সমানভাবে লক্ষ্য করতে পারি। তখন মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে আমাদের মনে একটা বিমূর্ত ধারণার সৃষ্টি হয়। এই ধর্মটিই হলো সামান্য।

৩.২.৪ সামান্য বিষয়ে অ্যারিস্টটলের মতের সমালোচনা

Woozley অ্যারিস্টটলের মতের বিরুদ্ধে দু'টি আপত্তি উত্থাপন করেছেন।

(এক) অ্যারিস্টটলের বিরুদ্ধে Woozley -র প্রথম আপত্তি হচ্ছে যে সাধারণ ধর্মকে অ্যারিস্টটল সামান্য বলেছেন তা ঠিক বোধগম্য নয়। অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ ধর্ম যে কি তা বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না। কোনো পরিবারের সদস্যদের যদি দেখা যায় যে তাদের নাক খাড়া তবে বলা যায় যে খাড়ানাক ওই পরিবারের সদস্যদের একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য। অনুরূপভাবে আপেল শরীরের পক্ষে পুষ্টিকর। তাই আপেলের সাধারণ ধর্ম হলো পৌষ্টিকতা। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ ধর্ম নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হয়। Woozley দেখিয়েছেন - একটি ধর্ম নানাভাবে সাধারণ ধর্ম হতে পারে। কয়েকজন ব্যক্তি একটি চাদরের নীচে শুয়ে থাকলে বলা যেতে পারে যে একই চাদরের নীচে শোওয়া ওই ব্যক্তিগুলির সাধারণ ধর্ম। আবার কয়েক জন ব্যক্তি আগুন পোহালে বলা যায়— আগুন পোহানো তাদের সাধারণ ধর্ম। তারা যদি একই পাত্রে খায় তাহলে বলতে হবে- একই পাত্রে খাওয়া তাদের সাধারণ ধর্ম। Woozley বলতে চান- অসংখ্যভাবে ও নানা অর্থে একটি ধর্ম কোনো কিছুর সাধারণ ধর্ম হতে পারে।

(দুই) অ্যারিস্টটলের বিরুদ্ধে Woozley-র দ্বিতীয় আপত্তি হচ্ছে- যা সামান্য বা সাধারণ ধর্ম তা বিভিন্ন উদাহরণে এক ও অভিন্ন থাকবে। এক বা অভিন্ন সামান্য ধর্ম বিভিন্ন দেশ ও কালে অবস্থিত দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে এক ও অভিন্ন থাকবে। কিন্তু তা কল্পনা করা কঠিন। ব্যক্তির বিশেষত্ব যদি সাধারণ ধর্মকে প্রভাবিত না করে তাহলে বিশেষত্ব ও সাধারণ ধর্মের মধ্যে কোনা নিবিড় সম্পর্ক থাকতে পারে না। ফলে ব্যক্তির অভেদ ও অখণ্ডতা বজায় থাকবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দেয়। আর যদি ব্যক্তির বিশেষত্ব দ্বারা সামান্য ধর্ম প্রভাবিত হয় তাহলে বস্তুর অভেদত্ব বজায় থাকলে সামান্যধর্ম অভিন্ন থাকে না।

Woozley - একথা মানেন যে, আমরা সাধারণ ধর্মের ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস করে থাকি। তবুও শ্রেণীভুক্ত বস্তুগুলি কদাচিৎ সম্পূর্ণভাবে পৃথক হয়। যে সকল ক্ষেত্রে শ্রেণীর সীমারেখা স্পষ্ট নয় সেই সকল ক্ষেত্রে খানিকটা যথেচ্ছভাবে আমরা বস্তুর শ্রেণীবিন্যাস করে থাকি। কিন্তু আরিস্টটলের সামান্যতত্ত্ব অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীর বিভাজন রেখা স্পষ্ট এবং একটু চেষ্টা করলেই তা বার করা সম্ভব। কিন্তু Woozley -র মতেবাস্তবে তা হয় না।

অনেক ক্ষেত্রে কল্পনাশ্রয়ী হয়ে আমাদের বস্তুর শ্রেণী ধর্ম নির্ণয় করতে হয়। তা শ্রেণীবিন্যাসের বেলায় ব্যক্তির অভিজ্ঞতা ও কল্পনা সামান্যতত্ত্বের থেকে কম কার্যকর নয়।

৩.৩ সামান্য বিষয়ক ধারণাবাদ

সামান্য বিষয়ে প্লেটো-অ্যারিস্টটলের মত পরবর্তী দার্শনিকদের সন্তুষ্ট করতে পারিনি। তাই সামান্যের স্বরূপ বিষয়ে দু'টি ভিন্ন মতের উদ্ভব ঘটে- সামান্য বিষয়ক ধারণাবাদ এবং নামবাদ।

সামান্য বিষয়ক ধারণাবাদের প্রবক্তা জন লক। তাঁর মতে সংবেদনের মাধ্যমে অসংখ্য পদার্থের সঙ্গে আমরা পরিচিত হই। কিন্তু প্রতিটি পদার্থের একটি পৃথক নাম দেওয়া অসম্ভব। অথচ ভাষা প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিটি বস্তুকে নির্দেশ করা প্রয়োজন। প্রশ্ন হলো-তা করা সম্ভব কীভাবে? লকের মতে তা সম্ভব একই ধারণাকে বহু ধারণার প্রতিনিধি হিসেবে গ্রহণ করে। আর এরূপ সম্ভব বিমূর্তিকরণ প্রক্রিয়ায়। লক বলেন যে, প্রতিনিধি স্থানীয় ধারণাটি হলো বিমূর্ত ধারণা এবং এই বিমূর্ত ধারণাটিকেই সামান্য ধারণা বলে ধরে নিয়ে উল্লিখিত ভাষা সমস্যার সমাধান দেওয়া সম্ভব।

অভিজ্ঞতাবাদী লক মনে করেন আসলে সাধারণ ধর্ম বলে কিছু নেই। জগতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বা বস্তু আছে, আছে তাদের মধ্যে নানা রকম সাদৃশ্য। প্রতিটি মানুষের বর্ণ, চেহারা, উচ্চতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য নিয়ে মানুষ সম্বন্ধে আমাদের একটা সাধারণ ধারণা গড়ে ওঠে। মন বিমূর্তিকরণের সাহায্যে এরকম যে-কোন সমগ্র ধারণা থেকে কিছু অংশ বিযুক্ত করে বাকি অংশ থেকে বিযুক্ত অংশটিকে পৃথক করে নেয়, কল্পনা করে ওই পৃথক অংশই সকল মানুষের ধারণার প্রতিনিধি। তার ফলে মানুষের সামান্য ধারণার উৎপত্তি হয়। এই ধারণা মনোগত, বিষয়নিষ্ঠ নয়। বিমূর্তিকরণের দ্বারাই আমরা সামান্যের ধারণা এবং তার বোধক নাম ব্যবহার করে থাকি। তাই সামান্য মনের ধারণা মাত্র। এটাই সামান্য বিষয়ে লকের মতের মূল কথা।

৩.৪ সামান্য বিষয়ক ধারণাবাদের সমালোচনা

ধারণাবাদের বিরুদ্ধেও সমালোচনা কম নয়। লকের মতে বিমূর্ত ধারণা আমাদের মনে থাকে। তা বস্তুগত নয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো-বিমূর্তধারণা কোন্ বিষয়ের ধারণা? ধারণা সবিষয়ক। লক নিজেই বলেছেন- একটি বিশেষ শ্রেণীর বস্তুসমূহের মধ্যে কিছু কিছু বিষয়ে সাদৃশ্য থাকে। তাঁর মতে, সাদৃশ্যের ধর্মগুলি একত্রিত হয়ে এবং অন্য ধর্ম থেকে বিযুক্ত হয়ে বিমূর্ত ধারণা গঠিত হয়। নীল রংয়ের বস্তুর নীলত্বরূপ সাধারণ ধর্ম নিয়ে নীলত্বের সামান্য ধারণা তৈরী হয়। কিন্তু তাহলে অ্যারিস্টটলের মতই প্রতিষ্ঠিত হয়। একটি শ্রেণীর একটি সাধারণ শ্রেণীধর্ম থাকে। তাই লকের ধারণাবাদ যুক্তিযুক্ত নয়।

৩.৫ সামান্য বিষয়ক নামাদ

সামান্য বিষয়ক নামবাদ অনুসারে জগৎ বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তু দ্বারা গঠিত। এক জাতীয় একাধিক বস্তুকে আমরা একই নামে অভিহিত করে থাকি। বস্তুর মধ্যে কোনো সাধারণ ধর্ম নেই। নামই তাদের একমাত্র সামান্য ধর্ম। বৈশিষ্ট্য ব্যক্তি, শ্রেণী বা গোষ্ঠীগত নয়। তাদের মধ্যে যা সাধারণ তা হলো তাদের নাম। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সকল গরুর একটি ধর্মই সাধারণ। তাহলে তাদের 'গরু' নাম। এই মতবাদকে বলে নামবাদ। এই মতবাদ অনুসারে একাধিক বস্তুকে আমরা একটি সাধারণ নামে অভিহিত করি মাত্র। নাম আমাদেরই দেওয়া। বস্তুর নিজস্ব সাধারণ ধর্ম বলে কিছু নেই। এরকম নামবাদকে বলে চরমপন্থী নামবাদ।

বার্কলিও নামবাদী। তিনি এরকম চরমপন্থী নামবাদ থেকে সরে এসে তাঁর নামবাদ উপস্থাপন করেছেন। তাঁর মতে আমাদের মনে থাকে বিশেষ বিশেষ বস্তুর প্রতিচ্ছবি না মনশ্চিত্র। কেউ যখন একটি ত্রিভুজের কথা ভাবে তখন তার মনে থাকে একটা বিশেষ ত্রিভুজের ছবি। তার চিন্তার ত্রিভুজটি সমবাহু, সমদ্বিবাহু বা বিষমবাহু হবে। কোনো ত্রিভুজ একাধারে তিন রকম হতে পারে না। তেমনি তার মনশ্চিত্র বা প্রতিচ্ছবিটিও একটা বিশেষ ত্রিভুজের ছবি। বার্কলি কোনো বস্তু বা ব্যক্তি সম্বন্ধে আমাদের ধারণার অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। তবে সে ধারণা বিশেষ ধারণা। যে সামান্য ধারণার কথা চরমপন্থী নামবাদে খণ্ডিত হয়েছে সেই সামান্য ধারণাও বার্কলির মনে একটা বিশেষ ধারণা। বিশেষ ধারণা আসলে শ্রেণীগত সকল বস্তুর প্রতিনিধি। বিমূর্ত সামান্য ধারণা বলে কিছু নেই।

৩.৬ সামান্য বিষয়ক নামবাদের সমালোচনা

চরমপন্থী নামবাদের সমালোচনা করেছে John Hospers। Hospers -এর আপত্তি দু'টি।

(এক) যখন আমরা বিভিন্ন জিনিসকে নীল বলি তখন আমরা একটা ধর্ম নিয়েই বলি-একথা বলার অর্থ-বস্তুগত সমানধর্ম স্বীকার করে নেওয়া।

(দুই) বিভিন্ন বস্তুর সাধারণ ধর্ম নাম -একথা Hospers -স্বীকার করেন নি। Hospers -এর মতে শ্রেণী বিভাজন বস্তুগত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রেণীগত বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে কোনো সমানধর্ম না থাকলে তারা এক শ্রেণীর হয় না। দুই বা ততোধিক খেলার মধ্যে একটা সাদৃশ্য মানলে বিষয়গত সমানধর্মই স্বীকৃত হয় বলে মনে করেন Hospers। তাঁর মতে সমান ধর্ম না মানলে সাদৃশ্যের উপপত্তি হয় না।

বার্কলি প্রণীত নামবাদও Hospers -এর নিকট অসুবিধাজনক। বার্কলি বলেছেন যে আমার মনে যে ত্রিভুজের প্রতিচ্ছবিটি আছে তা একই ধরণের সকল সামতলিক ক্ষেত্রেই প্রতিনিধস্বরূপ। Hospers প্রশ্ন এখানে- 'একই ধরণের' ('of the same sort') বলতে বার্কলি কী বুঝিয়েছেন? প্রথমে ত্রিভুজের ধারণা থাকা চাই।

কিন্তু তা জানা আর মনে ত্রিভুজের একটা প্রতিচ্ছবি থাকা এক নয়। ত্রিভুজের প্রতিচ্ছবি ছাড়াও ত্রিভুজে সংজ্ঞার্থ প্রকাশক বৈশিষ্ট্যগুলি জানা প্রয়োজন। তাই Hospers বলতে চান যে, আমাদের মানসিক প্রতিচ্ছ্বি ছাড়াও সামান্য ধারণা থাকে।

৩.৭ নমুনা প্রশ্নাবলী

১। ক) সামান্য সম্বন্ধে প্লেটোর মত বাখ্যা কর।

খ) অ্যারিস্টটল কীভাবে এই মতের সমালোচনা করেছেন? আলোচনা কর।

২। ক) সামান্য সম্বন্ধে অ্যারিস্টটলের মতের মূল বক্তব্য ব্যাখ্যা কর।

খ) এই মত কি গ্রহণযোগ্য?

৩। ক) সামান্য সম্বন্ধে প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের মতের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলি ব্যাখ্যা কর

খ) কার মতটিকে তুমি অধিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে কর?

৪। সমালোচনা সহকারে সামান্য বিষয়ক ধারণাবাদের মূল বক্তব্যগুলি ব্যাখ্যা কর।

৫। সামান্য বিষয়ক নামবাদের সবিচার ব্যাখ্যা দাও।

৩.৮ গ্রন্থপঞ্জী

Theory of Knowledge by Woozley

An Introduction of Philosophical Analysis by John Hospers

The Problem of Knowledge by A. J. Ayesr

পাশ্চাত্য দর্শনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (প্রাচীন যুগ), অধ্যাপক প্রমোদবন্ধ সেনগুপ্ত

জ্ঞানতত্ত্ব ও অধিবিদ্যা, কয়েকটি সমস্যা, ড. বিশ্বনাথ সেন

পাশ্চাত্য দর্শনের রূপরেখা, রমাপ্রসাদ দাস ও শিবপদ চক্রবর্তী

চতুর্থ পাঠ

দ্রব্য : প্রাচীন ও আধুনিক মত

পাঠ সংকেত

৪.১ দ্রব্য বিষয়ে সাধারণ মত

৪.২ দ্রব্য বিষয়ে অ্যারিস্টটলের মত

৪.৩ দ্রব্য বিষয়ে বুদ্ধিবাদী মত

৪.৪ দ্রব্য বিষয়ে অভিজ্ঞতাবাদী মত

৪.৫ দ্রব্য বিষয়ে রাসেলের মত

৪.৬ দ্রব্য বিষয়ে এয়ারের মত

৪.৭ নমুনা প্রশ্নাবলী

৪.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৪.১ দ্রব্য বিষয়ে সাধারণ মত

ইংরেজি 'substance' শব্দের বাংলা তর্জমা 'দ্রব্য'। সাধারণ মানুষ দ্রব্য বলতে বোঝে পদার্থকে। এই পদার্থই গুণ ও কর্মের আশ্রয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একটি হিরো হোণ্ডা একটি দ্রব্য বা পদার্থ; এর একটি বিশেষ গুণ আছে। আর চলচ্ছক্তি এর কর্ম। সাধারণ ভাবনায় গুণ ও কর্ম কখনও স্ব-নির্ভর নয়। তাদের একটা আশ্রয় চাই। গুণ ও কর্ম তার আধেয় স্বরূপ। ওই আধার বা আশ্রয়ই দ্রব্য।

সাধারণ মতে দ্রব্য বিষয়ে আরো কথা আছে। দ্রব্য অপরিবর্তনীয়। পরিবর্তন যা কিছু ঘটে তা গুণ ও কর্মের। অপরিবর্তনীয় দ্রব্যই একমাত্র অন্য দ্রব্যের উপর ক্রিয়া করতে সক্ষম। তবে একাজে তার মাধ্যম গুণ। তবুও গুণ কখনও দ্রব্য- নিরপেক্ষভাবে ক্রিয়া করতে পারে না। আগুন ও জল উভয়ই দ্রব্য। আগুণ জলকে বাষ্পে রূপান্তর করতে পারে। এক কথায়, শত পরিবর্তনের মধ্যেও যা কিছু অপরিবর্তিত থাকে তাই দ্রব্য।

তবে দ্রব্য বিষয়ে এই সাধারণ মত মানলে কতকগুলি অসুবিধা দেখা দেয়। দ্রব্যের সঙ্গে গুণের কী সম্বন্ধ? গুণাতিরিক্ত দ্রব্যের স্বরূপ কী? এসব প্রশ্নের সন্তোষজনক সমাধান সাধারণ মতে নেই। প্রশ্নগুলির সমাধানকল্পে তাই দার্শনিক ভাবনা নির্ভর হতে হয়। পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মধ্যে যিনি এ-ভাবনায় অগ্রণী তিনি হলেন অ্যারিস্টটল।

৪.২ দ্রব্য বিষয়ে অ্যারিস্টটলের মত

অ্যারিস্টটলের মতে দার্শনিকের উদ্দেশ্য হলো সত্তাস্বরূপের আলোচনা। আর এই সত্তাস্বরূপের আলোচনা বলতে যা বোঝায় তা মূলতঃ দ্রব্যেরই আলোচনা। তবে তিনি 'দ্রব্য' পদটির কোনো সুনির্দিষ্ট অর্থ করেন নি। তাঁর মতে এই পদটি চারটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ওই চারটি বিষয়কে তিনি দ্রব্যের চারটি দাবিদার বলে অভিহিত করেছেন। দাবিদার চারটি হচ্ছে-সারসত্তা (Essence), সামান্য (universal), গণ (genus) এবং আধার (substratum) । Metaphysics গ্রন্থে এই চারটি দাবিদার নিয়ে তিনি যে আলোচনা করেছেন তা নিম্নরূপ।

আধারকে কখনও অ্যারিস্টটল দ্রব্যের সবল দাবিদার বলে মনে করেন। আধার বলতে বোঝায় এমন কিছুকে যার ক্ষেত্রে অন্যান্য কিছুই বিধেয় বলে গণ্য হতে পারে। আধারের মূল্য বৈশিষ্ট্য এই যে তা নিজে অন্য কোনো কিছুর বিধেয় হতে পারে না। আর ঠিক এই অর্থে জড় উপাদানকে তিনি আধার বলে গণ্য করেছেন। বস্তুর অন্যান্য ধর্মকে মুছে ফেললেও তার আধার বিদ্যমান থাকে। তবে অ্যরিস্টটল যে আধারের কথা বলেছেন তা কোনো বিশেষ বস্তু বা কোনো বিশেষ পরিমাণ নয়।

এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে চরম উপাদানই দ্রব্য। কিন্তু অ্যারিস্টটল এই মত গ্রহণ করেন নি। তাঁর মতে বিশুদ্ধ জড় উপাদান দ্রব্য নয়। তার কারণ উল্লেখ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে, পৃথক্ সত্তা ও ব্যক্তিত্ব উভয়ই দ্রব্যের বৈশিষ্ট্য; কিন্তু বিশুদ্ধ জড় উপাদানের পৃথক অস্তিত্ব বা ব্যক্তিত্ব কিছুই নেই। প্রশ্ন হতে পারে, আমরা কীভাবে বিশুদ্ধ জড় উপাদানের ধারণা লাভ করি? এর উত্তর হচ্ছে- বিশুদ্ধ জড় উপাদান যৌক্তক বিশ্লেষণের পরিণাম। যৌক্তিক বিশ্লেষণের দ্বারাই আমরা কোনো বস্তুতে আকার এবং অ-আকারের বিভাজন করে থাকি। বিশুদ্ধ জড় উপাদান ব্যক্তিও নয়। কারণ যা ব্যক্তি তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য থাকে। কিন্তু নিছক জড় উপাদানের তা নেই।

কাজেই দ্রব্যের আলোচনায় একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির আশ্রয় নিয়েছেন অ্যারিস্টটল। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনি জানিয়েছেন যে যা কিছু কোনো বস্তুর মূলে বিদ্যমান তাই দ্রব্য। এই অর্থে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আকার, জড় উপাদান এবং আকারের মূর্তি-এই তিনটির সমষ্টিকে দ্রব্য গণ্য করা হয়।

এই দৃষ্টিভঙ্গিও বর্জন করেছেন অ্যারিস্টটল। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আকার কেবল বিশেষ ব্যক্তির কাছেই জ্ঞেয়। তাই আকার কোনো বস্তুর স্বরূপ নির্ণায়ক নাও হতে পারে। তাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আকারকে দ্রব্য বলে গ্রহণ করা যায় না। আকার ও উপাদানের মূর্ত সমষ্টিকে দ্রব্যরূপে প্রত্যাখ্যান করার কারণ দু'টি -(এক) ওই রকম মূর্ত সমষ্টি চরম উপাদান নির্ধরক নয়, এবং (দুই) তা আকার ও উপাদানের সমষ্টি হওয়ায় মৌলিক বা প্রাথমিক হতে পারে না।

সারসত্তা বলতে বস্তুর এমন আন্তর স্বভাবকে বোঝায় যার ফলে কোনো বস্তু যা সে তা-ই। সারাসত্তা

লক্ষ্য (object of definition)। কিন্তু ব্যক্তি অসংজ্ঞেয়। সারসত্তাই দ্রব্য-এই মত মানলে দ্রব্য হবে উপাদানহীন। তা সনাক্তকরণযোগ্য হবে কেবল আকার দ্বারা। তাছাড়া সারসত্তাকে কেবল দ্রব্যেই ভাবতে হবে, অন্য কোনো বিধেয়ে নয়। কারণ একমাত্র দ্রব্যই সংজ্ঞেয়। অন্য কোনো বিধেয়কে সংজ্ঞিত করতে গেলে অনবস্থা এসে পড়বে। আমাদের বলতে হবে যে বস্তুসত্তা সারসত্তা দিয়ে গঠিত। এর অর্থ সত্তা ও সারসত্তা (being and essence) এক ও অভিন্ন। সুতরাং সারসত্তাই দ্রব্য।

কিন্তু এই মতেরও বিরোধিতা করেছেন অ্যারিস্টটল। Metaphysics গ্রন্থে জড়সামান্যের আলোচনায় এই বিরোধ প্রকটাকার ধারণ করেছে। তিনি জানিয়েছেন যে, জড়সামান্যের সারসত্তাকে জড়ের উল্লেখ ব্যতিরেকে প্রকাশ করা যায় না। প্রশ্ন হলো- অ্যারিস্টটল আদৌ একরকম জড়সামান্যের সারসত্তার প্রসঙ্গ তুলেছেন কেন? এ-প্রশ্নের অ্যারিস্টটলীর উত্তর এই যে, সামান্য বলতে যা বোঝায় তা স্বরূপতঃ অস্তিত্বহীন, কোনো কিছুকে আশ্রয় না ক'রে তার অস্তিত্ব মূর্ত হতে পারে না। স্বয়ং অস্তিত্বশীল হওয়াই দ্রব্যের অন্যতম লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য।

যাই হোক অ্যারিস্টটল নিছক জড় উপাদান বা নিছক আকারকে সারসত্তা বলে মনে করেন নি। তবে জড় উপাদান ও আকারের মধ্যে নিবিড় সম্পর্কের কথা বলেছেন তিনি। কিন্তু সারসত্তাকে তিনি কোনো অর্থেই দ্রব্য বলে মনে করেন নি। অ্যারিস্টটল দ্রব্যের আর একটি দাবিদারের কথা আলোচনা করেছেন। একটি সামান্য এর সঙ্গে গণের সংশ্লিষ্টতার কথাও উল্লেখ করেছেন তিনি। সামান্যকে অ্যারিস্টটল দ্রব্য বলে মানেন নি। কারণ কোনো বস্তুর দ্রব্যত্ব বলতে যা বোঝায় তা একান্তই তার নিজস্ব। কিন্তু সামান্য বলতে যা বোঝায় তা এক জাতীয় অনেকের মধ্যেই সমভাবে বিদ্যমান। তাই তা দ্রব্য বলে গণ্য নয়। তাছাড়া দ্রব্য তা-ই যা কখনই কোনো উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্বীকৃত হয় না। কিন্তু সামান্যকে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্বীকার করা চলে। এমন কি দ্রব্য কোনো উপাদানও নয়। প্রসঙ্গতঃ অ্যারিস্টটলের যুক্তি ত্রিধা বিভক্ত।

ক) কোনো বিশেষের উপাদান হওয়ার অর্থ বিশেষ শ্রেণীর সারসত্তার অন্তর্ভূক্ত হওয়া।

খ) ব্যক্তিদ্রব্য স্বীকার করলে বলতে হয় যে তা এমন সব উপাদান দিয়ে গঠিত যা ব্যক্তি নয়, গুণ। একথার অর্থ গুণের পূর্বগামিতা মানা।

গ) গণকে দ্রব্য বলে মানার অর্থ নিছক তাকে প্রজাতির দ্রব্য বলে মানা নয়, বক্তি বিশেষের দ্রব্য বলে মানা। তিনিটি যুক্তির ক্ষেত্রেই (ক), (খ) এবং (গ) -এ প্রদত্ত বাক্যগুলি প্রধান যুক্তিবাক্য স্বরূপ। তিনিটি যুক্তিতেই হেতুবাক্য হচ্ছে 'দ্রব্যকে সেভাবে মানা যায় না'। অ্যারিস্টটল সিদ্ধান্ত টেনেছেন- সামান্য দ্রব্য নয়।

তবে সামান্যকে দ্রব্য বলে মানার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ অর্থের কথা বলেছেন অ্যারিস্টটল। এই অর্থে দ্রব্যই মূল উৎস এবং তা কারণস্বরূপ। প্রশ্ন হলো - কিসের দ্বারা কোনো বস্তু দ্রব্য পদবাচ্য হয়ে ওঠে? অ্যারিস্টটলের মতে বিশেষে সামান্যের উপস্থিতির দ্বারা জড় উপাদান সহযোগে বিশেষ বস্তুদ্রব্য পদবাচ্য হয়। কিন্তু জড়

উপাদানের সমষ্টি দ্রব্য পদবাচ্য নয়। সামান্যের জড়ীয় উপাদান নেই। জড় উপাদানের মধ্যে বিদ্যমান কোনো আকারগত ধর্মও তা নয়। আমরা যদি এইভাবে সামান্যকে গ্রহণ করি তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায়- কোনো মূর্ত বস্তু কী সে স্বরূপতঃ যা তা হয়ে থাকে? অ্যারিস্টটলের মতে সামান্য ও জড় অবয়রে সম্বন্ধ ব্যাখ্যার জন্য একটি কাঠামো মানা দরকার। এ সকল সমস্যা এড়াতেই অ্যারিস্টটল সামান্যকে মূর্ত বস্তুর কাঠামোরূপে মেনে নেবার কথা বলেছেন।

যাইহোক দ্রব্য বিষয়ক এই আলোচনায় অ্যারিস্টটল একাধারে প্রাক্-সক্রেটিসদের মত ও প্লেটোর মতের বিরোধিতা করেছেন। তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন প্রাকৃত স্বরূপের প্রাকৃত আকারের উপর। তিনি দ্রব্যের আলোচনার উপসংহার টেনেছেন এই বলে যে কোনো বস্তুর দ্রব্য হলো এমন একটি নীতি বা কাঠামো যার উপস্থিতিতে একটি জড়-সমষ্টি সুসংসম্বন্ধ সমগ্রে পরিণত হয়।

অ্যারিস্টটলের দর্শনে দশটি প্রকার (category) স্বীকৃত। প্রকারসমূহের মধ্যে দ্রব্যই প্রথম প্রকার। অ্যারিস্টটল মনে করেন তিনটি অর্থে একটা বস্তু প্রথম হতে পারে। অর্থ তিনটি হচ্ছে- সংজ্ঞার্থ, জ্ঞানগত অর্থ, কালার্থ। সংজ্ঞার্থের বিচার দ্রব্য প্রথম; কারণ কোনো পদের সংজ্ঞায় তার দ্রব্যত্বের উল্লেখ অবশ্যম্ভাবী। কোনো বস্তু স্বরূপতঃ যা, তা জানাই বস্তুজ্ঞানের মর্মকথা। তা জানার অর্থ দ্রব্যকে জানা। পরিশেষে প্রকারসমূহের মধ্যে দ্রব্য ভিন্ন অন্য কোনো প্রকার স্বতন্ত্রভাবে অস্তিত্বশীল হতে পারে না। কাজেই তিনটি অর্থেই দ্রব্য প্রথম।

৪.৩ দ্রব্য বিষয়ে বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের মত

বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের মধ্যে আছেন ডেকার্ট, স্পিনোজা ও লাইবনিজ। ডেকার্ট প্রদত্ত দ্রব্যের সংজ্ঞা দুটি। একটি সংজ্ঞা অনুসারে যা গুণের আধার তাই দ্রব্য। এই অর্থে গুণ দ্রব্য ছাড়া থাকতে পারে না। গুণ মাত্রেই কোনো না কোনো দ্রব্যের গুণ। জড় একটা দ্রব্য। এর অপরিহার্য গুণ বিস্তৃতি। সেরকম আত্মাও একটি দ্রব্য। এর অপরিহার্যগুণ চিন্তা। বুদ্ধির স্বাভাবিক আলোতেই জড় ও আত্মার জ্ঞান হয়ে থাকে আমাদের। আরেকটি সংজ্ঞা অনুসারে ডেকার্ট বলেন যে, যা স্বনির্ভর তাকে বলে দ্রব্য। এই অর্থে যাকে আমরা সাধারণ দ্রব্য বলি তা অন্যনির্ভর হওয়ায় দ্রব্যপদবাচ্য নয়। এই অর্থে একমাত্র ঈশ্বরই অন্য কিছুর উপর নির্ভরশীল না হওয়ায় দ্রব্য বলে গণ্য। তবে ডেকার্ট বলেন যে জড় ও আত্মা পুরোপুরি স্বনির্ভর নয়। তবুও এরা যেহেতু কেবল ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে সেহেতু এরাও দ্রব্য বলে গণ্য।

ডেকার্টকে অনুসরণ করে স্পিনোজা বলেন যে, ডেকার্টের সংজ্ঞা মেনে নিলে কেবল ঈশ্বরকেই দ্রব্য বলে মানতে হয়। জড় ও আত্মাকে স্পিনোজা দ্রব্য বলেন নি। তাঁর মতে এগুলি হচ্ছে ঈশ্বরের গুণ। স্পিনোজোর মতে দ্রব্য = ঈশ্বর = প্রকৃতি। ঈশ্বর এবং প্রকৃতিকে অভিন্ন বলায় অনেকে স্পিনোজাকে জড়বাদী বলে বর্ণনা

করেছেন। ঈশ্বর জড়প্রকৃতি হলে জড় ছাড়া আর কিছুই রইল না। আবার ঈশ্বর প্রকৃতি হওয়ায় স্পিনোজাকে অনেকে সর্বেশ্বরবাদী বলে অভিহিত করেছেন; কারণ সব কিছুই তো ঈশ্বর।

বুদ্ধিবাদী লাইবনিজও দ্রব্যের সংজ্ঞায় অ্যারিস্টটলকে অনুসরণ করেছেন। অ্যারিস্টটলকে অনুসরণ করে তিনিও বলেছেন যে, যা পরিবর্তনের কেন্দ্র মূল, যাকে আশ্রয় করে সকল পরিবর্তন সাধিত হয় তাই দ্রব্য। দ্রব্য কেবল বাক্যের উদ্দেশ্যই হতে পারে। দ্রব্যের সংজ্ঞায় লাইবনিজ বলেন যে জড়বস্তু কখনও সরল বা অবিভাজ্য হতে পারে না। সুতরাং জড় পরমাণু দ্রব্য বলে গণ্য হতে পারে না। লাইবনিজের মতে যে উপাদান দিয়ে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড গঠিত তা জড় পরমাণু নয়, চিৎ পরমাণু। এই চিৎ পরমাণুকে লাইবনিজ মনাড্ (monad) নামে অভিহিত করেছেন। মনাড্ অবিভাজ্য। তা জড়ের কণা নয়, আত্মা বা চৈতন্যের কণা।

নানা কারণে ডেকার্ট, স্পিনোজা ও লাইবনিজ প্রমুখ দার্শনিক প্রণীত বুদ্ধিবাদ সমালোচিত হয়েছে। ডেকার্টের দ্রব্য বিষয়ক মতের সমালোচনায় বলা হয় যে, তিনি দ্রব্যের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তাতে একমাত্র ঈশ্বরই দ্রব্য হতে পারেন। কিন্তু তিনি তিনটি দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। তাছাড়া ডেকার্ট আত্মা ও জড়ের পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করায় দ্বৈতবাদ সৃষ্টি হয়। মূলতঃ এই দ্বৈতবাদের অসুবিধা দূর করতেই স্পিনোজার অদ্বৈতবাদের উদ্ভব হয়।

স্পিনোজার দ্রব্য সম্পর্কিত মত সন্তোষজনক নয়। এই মতবাদ বহুত্ব অস্বীকার করে এবং 'এক' - এর অস্তিত্ব স্বীকার করে। কিন্তু বহুত্ববর্জিত ঐক্য বা এক একটি শূন্যগর্ভ ধারণামাত্র। তাছাড়া স্পিনোজার মতে দ্রব্য, এক, অসীম। তার গতি বা পরিবর্তন অসম্ভব।

লাইবনিজের দ্রব্য সম্পর্কিত মতও ত্রুটিহীন নয়। লাইবনিজের দ্রব্যতত্ত্বে জড়ের অস্তিত্ব অস্বীকৃত। কিন্তু জড়ের অস্তিত্ব অস্বীকার করলে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাছাড়া বোধবুদ্ধির দ্বারা আমরা অভিভাজ্য মনাডের অস্তিত্ব খুঁজে পাই না। ফলে বোধ পাওয়া জড়বস্তুর সাথে মনাড্ বা চিৎপরমাণুগুলির সম্পর্কও জানা যায় না।

৪.৪ দ্রব্য বিষয়ে অভিজ্ঞতাবাদী মত

দ্রব্য বিষয়ে অভিজ্ঞতাবাদী মত বলতে লক, বার্কলি, হিউম প্রণীত অভিজ্ঞতাবাদকেই বোঝায়। অভিজ্ঞতাবাদী লকের মতে অভিজ্ঞতা থেকে সরাসরি জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, উৎপন্ন হয় ধারণা। এই ধারণা থেকেই পরে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ধারণা দুই প্রকার-সরল ও জটিল। অভিজ্ঞতা থেকে বর্ণ, গন্ধ, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি সরল ধারণার সৃষ্টি হয় মনে। তারপর সংযুক্তিকরণ, সম্বন্ধীকরণ এবং বিমূর্তিকরণের মাধ্যমে মনে জটিল ধারণার সৃষ্টি হয়। জটিল ধারণা তিন প্রকার-প্রকার বিষয়ক, দ্রব্য বিষয়ক এবং সম্বন্ধ বিষয়ক।

তবে লক বলেন যে, দ্রব্য হচ্ছে এমন কিছু যা স্ব-আশ্রিত। অবশ্য তাঁর মতে দ্রব্যের নিজস্ব স্বরূপ বিষয়ে আমরা কিছু জানতে পারি না। আমরা দ্রব্যের কেবল গুণের কথাই জানি। ইন্দ্রিয় সংবেদনে উৎপন্ন ধারণাগুলিকে মিলিয়ে জড় দ্রব্যের ধারণা এবং অন্তর্দর্শনে প্রাপ্ত ধারণাগুলিকে মিলিয়ে মন বা আত্মার ধারণা তৈরি হয়। জড় দ্রব্যের ধারণা বাহ্য দ্রব্যের ধারণা। মন বা আত্মার ধারণা আন্তর দ্রব্যের ধারণা। গুণের অতিরিক্ত দ্রব্যের স্বরূপ সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় না। দ্রব্য যে গুণের আশ্রয় বা আধার দ্রব্য সম্বন্ধে আমরা শুধু এটুকুই জানি। দ্রব্য গুণের অজ্ঞাত আধার বা আশ্রয়।

দ্রব্য বিষয়ে লকের মত প্রসঙ্গে আরেকটি কথা। তিনি বলেন যে, গুণ দু'প্রকার-মুখ্য ও গৌণ। মুখ্য গুণগুলি বস্তুতে থাকে। বিস্তৃতি, আকার, আয়তন, গতি, ওজন প্রভৃতি হচ্ছে দ্রব্যের মুখ্য গুণ। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি হচ্ছে দ্রব্যের গৌণ গুণ। লকের মতে মুখ্য গুণগুলি বস্তুর অবিচ্ছেদ্য ধর্ম। বস্তু যে অবস্থাতেই থাক না কেন মুখ্য গুণগুলি তাতে থাকবে। কিন্তু গৌণগুণগুলি সেরূপ নয়। বস্তুর পরিবর্তনের সঙ্গে গৌণগুণগুলি পরিবর্তিত হয়। সে কারণে প্রভাতসঙ্গীত সুস্থ মানুষকে আনন্দ দিলেও, রুগ্ন জন তাতে বিরক্ত হতে পারে। এক কথায়, মুখ্য গুণগুলি বস্তুর স্বরূপ প্রকাশক। গৌণগুণগুলি তা নয়।

অতএব দ্রব্য বিষয়ে লকের মত হলো-মুখ্য ও গৌণ গুণ সৃষ্টিকারী শক্তিগুলির বাস্তব অস্তিত্ব আছে। এগুলি নিছক মনের ধারণা নয়। কিন্তু ওই গুণ বা শক্তি স্ব-নির্ভর নয়। তারা কোনো না কোনো অধিকরণ নির্ভর। নিরালম্ব হয়ে তারা থাকতে পারে না। তাদের যে আশ্রয় বা অধিকরণ তাই দ্রব্য। লকের এই মত দ্রব্যবিষয়ক আশ্রয়বাদ (substratum theory of substance) বলে অভিহিত।

লকের মতো বার্কলিও বলেন যে অভিজ্ঞতাই সকল জ্ঞানের উৎস। যা অভিজ্ঞতায় পাওয়া যায় না তার কোনো অস্তিত্ব নেই। তিনি লক স্বীকৃত দ্রব্যের মুখ্য ও গৌণ গুণের পার্থক্য প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর মতে গৌণগুণগুলি যেমন স্থান-কাল ভেদে পরিবর্তিত হয়, তেমনি মুখ্যগুণগুলিও পরিবর্তিত হয়। দূর থেকে বস্তুকে ছোটো দেখায়, কাছে থেকে বস্তুকে বড় দেখায়। তাই বস্তুর আকৃতি এক রকম থাকে না। তাই মুখ্য গুণগুলিও গৌণ গুণের মতো পরিবর্তনশীল।

বার্কলি বলেন যে, বাহ্য দ্রব্য বলে কিছু নেই, আছে কেবল গুণাবলী। গুণের অতিরিক্ত কোনো বস্তু নেই। যাকে দ্রব্য বলা হয় তা গুণের পুঁটুলি মাত্র। একেই বলা হয় Bundle theory of substance।

তবে বার্কলি বাহ্য দ্রব্যের অস্তিত্ব না মানলেও মন বা আত্মা নামক দ্রব্য স্বীকার করেছেন। সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ প্রভৃতির আশ্রয় হিসেবে তিনি আত্মা নামক দ্রব্য স্বীকার করেছেন। তাছাড়া ঈশ্বর নামক আর একটি অতিরিক্ত দ্রব্যও স্বীকার করেছেন বার্কলি। বস্তুর নিরবচ্ছিন্ন অস্তিত্ব মানার জন্য তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার

করেছেন। তিনি বলেন, জগতে অসংখ্য মন বা জীবাত্মা আছে। আমার ধারণা ঈশ্বরের ধারণার প্রতিরূপ। ঈশ্বরের ধারণাই আমার ধারণারূপে প্রক্ষিপ্ত।

প্রশ্ন হলো- জড়দ্রব্যের অস্তিত্ব না মানলে আত্মা নামক কোনো দ্রব্য মানা চলে কি? দৃষ্টিবাদী হিউম এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। হিউমের মতে গুণের অজ্ঞাত আধাররূপে জড়দ্রব্য মানা যেমন অসঙ্গত, তেমনি মানসিক গুণের আধাররূপে আত্মা নামক দ্রব্যের অস্তিত্ব মানাও অসঙ্গত।

হিউমের মতে দ্রব্যের ধারণা হচ্ছে একটা দুর্বোধ্য উদ্ভট কল্পনা। তথাকথিত জড়দ্রব্য সংবেদনের সমষ্টিমাত্র। ইন্দ্রিয়ানুভবের মাধ্যমে আমরা যে আত্মাকে পাই তা হচ্ছে চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা প্রভৃতি কতকগুলি মানসিক প্রক্রিয়ার পারম্পর্য বা ধারা। তিনি আরও বলেন যে এইসব মানসিক প্রক্রিয়ার মধ্যে কোনো ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য স্থায়ী আত্মার অস্তিত্ব স্বীকারের প্রয়োজন নেই। তাঁর কথায়, "... when I enter most intimately into what I call myself, I always stumble on some particular perception or other, of heat or cold, light or shade, love or hatred, pain or pleasure, I never catch myself at any time without a perception and never can observe anything but the perception." অর্থাৎ "আমি যখনই অন্তরঙ্গভাবে তথাকথিত আত্মার মধ্যে প্রবেশ করি তখন আমি যার সঙ্গে পরিচিত হই তা হচ্ছে গরম বা ঠাণ্ডা, আলো বা ছায়া, প্রেম বা ঘৃণা, সুখ বা দুঃখের বিশেষ বিশেষ সংবেদন। এই সংবেদন অতিরিক্ত আত্মাকে আমি কখনও প্রত্যক্ষ করি না।" বিচ্ছিন্ন সংবেদনরাশিকে ঐক্যবন্ধ করার জন্য হিউম বলেছেন অনুষঙ্গ নীতির কথা। সাদৃশ্য, সান্নিধ্য এবং কার্য-করণ নীতির দ্বারাই বিচ্ছিন্ন সংবেদনরাশি ঐক্যবন্ধ হয় বলে নিজের মত প্রকাশ করেছেন হিউম। হিউমের মতে ঈশ্বরও প্রত্যক্ষলব্ধ নয়। তাই ঈশ্বরেরও কোনো অস্তিত্ব থাকতে পারে না। এইভাবে হিউম জড়দ্রব্য, আত্মা এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন।

কিন্তু দ্রব্য-বিষয়ক অভিজ্ঞতাবাদী মতও গ্রহণযোগ্য নয়। লক অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক হয়েও অভিজ্ঞতা বহির্ভূত ঈশ্বর, আত্মা ও জড়দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। এতে তাঁর নিজের মতের অসঙ্গতি সূচিত হয়। তাছাড়া গুণের অজ্ঞাত আধাররূপে দ্রব্যের অস্তিত্ব মানার কী যৌক্তিকতা থাকতে পারে তার কোনো সন্তোষজনক উত্তর তাঁর দর্শনে নেই। আসলে এই অসঙ্গতি দূর করার জন্যই বার্কলি আত্মগত ভাববাদ প্রবর্তন করেছিলেন। কিন্তু দ্রব্য সম্পর্কে বার্কলির মতও সন্তোষজনক নয়। বার্কলি যে যুক্তিতে জড়দ্রব্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন সেই যুক্তিতে ঈশ্বরও আত্মার অস্তিত্বও অস্বীকৃত হওয়া উচিত। কিন্তু বার্কলি তা করেন নি। হিউমের মতও ত্রুটিহীন নয়। হিউম মন বা আত্মাকে এবং জড়দ্রব্যকে সমজাতীয় দ্রব্য বলায় অনেকের আপত্তি এখানে। হিউমের মতের প্রধান ত্রুটি এই যে এই মতবাদ ব্যক্তির অভিন্নতাকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। আমাদের অভিজ্ঞতা প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল হলেও মনের ঐক্য থাকার জন্য আমাদের ব্যক্তি অভিন্নতা লোপ পায় না।

৪.৫ দ্রব্য বিষয়ে রাসেলের মত

সমসাময়িক পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মধ্যে দ্রব্য বিষয়ে যাঁদের মত উল্লেখযোগ্য তাদের অন্যতম রাসেল।

রাসেলের মতে সংবেদনে যা সাক্ষাৎভাবে জানা যায় তাকে বলে ইন্দ্রিয়োপাশত্ত (sense-datum)– বর্ণ, গন্ধ, কাঠিন্য, পেলবতা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়োপাত্ত। আর এগুলিকে সাক্ষাৎভাবে জানার নাম সংবেদন। ইন্দ্রিয় - উপাত্তগুলি ব্যক্তিভেদে ভিন্ন। সংবেদনকালই ইন্দ্রিয় -উপাত্তর স্থিতিকাল। ইন্দ্রিয়-উপাত্তগুলির কোনো কারণগত ধর্ম নেই। ইন্দ্রিয়-উপাত্তের ক্ষেত্রে অবভাস ও তত্ত্বের পার্থক্য নেই। এই সকল বৈশিষ্ট্যের কারণে ইন্দ্রিয়-উপাত্তকে বস্তুর গুণ বা ধর্ম বলা যায় না। ফলে গুণের আধার হিসেবে কিছু স্বীকারের প্রয়োজন হয় না। আমরা সাধারণভাবে টেবিল, চেয়্যার প্রভৃতিকে যে দ্রব্য বলি সেগুলিকে রাসেল ভৌত বস্তু (physical object) আখ্যা দিয়েছেন। ভৌতবস্তুর সঙ্গে ইন্দ্রিয়-উপাত্তর কার্যকারণ সম্পর্ক আছে। ভৌতবস্তু কারণ, ইন্দ্রিয় উপাত্ত কার্য। *The Problems of Philosophy* গ্রন্থে রাসেল বলেছেন যে ভৌতবস্তু কেবল ইন্দ্রিয়-উপাত্তের সমষ্টি নয়। অনুমানের দ্বারা ভৌতবস্তুকে জানা যায়।

তবে রাসেলের এই অবস্থানের পরিবর্তন দেখা যায় তাঁর *Our Knowledge of the External World* গ্রন্থে। এই গ্রন্থে ভৌতবস্তুকে তিনি আর অনুমেয় বলেন নি, তিনি একে বলেছেন যৌক্তিক বিনির্মাণ। এরকম যৌক্তিক বিনির্মাণ বলতে কী বোঝায়? প্রসঙ্গত রাসেল ব্যবহার করেছেন একটি শব্দ 'perspective' বা 'পরিপ্রেক্ষিত'। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে ভৌতবস্তুর বিভিন্ন সংবেদন পাওয়া যায়। বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে আমরা ভৌতবস্তু সম্বন্ধে একটা ধারণা গঠন করি বলে অভিমত প্রকাশ করেন রাসেল। ভৌতবস্তুগুলি পরিপ্রেক্ষিতগুলির সমন্বিত রূপ।

তবে রাসেলের এই মত পারিভাষিক জটিলতায় ভারাক্রান্ত। দার্শনিক মহলে তাই এই মত খুব বেশি প্রভাব ফেলে নি।

৪.৬ দ্রব্য বিষয়ে এয়ারের মত

এয়ার যৌক্তিক অভিজ্ঞতাবাদী। যৌক্তিক অভিজ্ঞতাবাদের মূল তত্ত্ব অর্থের যাচাই কারণ তত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুসারে যাচাইযোগ্যতা হলো ইন্দ্রিয়ানুভবগম্যতা। অর্থাৎ অভিজ্ঞতায় যদি কোনো বাক্যকে সত্য বা মিথ্যা বলা যায় তাহলে সেই বাক্য হবে অর্থবহ, অন্যথায় সে বাক্য হবে অর্থহীন।

ভৌতবস্তুবিষয়ক এয়ারের মত বিধৃত হয়েছে তাঁর *The Foundations of Empirical Knowledge* গ্রন্থে। তিনি তখন অবভাসবাদী। অবভাসবাদ অনুসারে ভৌতবস্তু সম্বন্ধীয় বাক্য ইন্দ্রিয়-উপাত্তের

ভাষার রূপান্তরযোগ্য। এই রূপান্তরকরণের পারিভাষিক নাম reduction বা পর্যবসান প্রক্রিয়া। *The Problem of Knowledge* গ্রন্থে তিনি দেখিয়েছেন যে অবভাসবাদী হলেন পর্যবসানবাদী। পর্যবসানবাদী হলেন যৌক্তিক নির্মাণবাদী। পর্যবসান প্রক্রিয়া দু'টি শর্ত-নির্ভর:

(এক) জ্ঞানতত্ত্বের দিক থেকে ক-বিষয়টি খ-বিষয়ের গোড়ার স্তরের, এবং

(দুই) ক-বিষয়ক এবং খ-বিষয়ক উক্তি দু'টির একটি সত্য হলে অপরটি মিথ্যা হতে পারবে না।

এয়ারের মতে এই দুটি শর্ত পূরণ হলেই বলা যাবে যে ক-বিষয়ক উক্তি খ-বিষয়ক উক্তিতে পর্যবসিত হতে পারে। ক-বিষয়টি হবে খ-বিষয়ের যৌক্তিক নির্মাণ (logical construction)। ভৌতবস্তু হবে সংশ্লিষ্ট ইন্দ্রিয়-উপাত্তের বিনির্মাণ। *The Foundations of Empirical Knowledge* গ্রন্থে এয়ার যে অবভাসবাদী ছিলেন তার সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

কিন্তু *The Problem of Knowledge* -এ এয়ারের এই মতের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই গ্রন্থে এয়ার অবভাসবাদের সমালোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন অবভাসবাদীকে এক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। প্রত্যক্ষ না করলেও ভৌত বস্তুর অস্তিত্ব ক্ষুন্ন হয় না। কিন্তু কেউ প্রত্যক্ষ না করলে ইন্দ্রিয় উপাত্ত থাকে না। ফলে ভৌত বস্তু ইন্দ্রিয় উপাত্তের সমষ্টি -একথা কেমন করে বলা যাবে? এয়ারের মতে এরূপ রূপান্তর সম্ভব হতে পারে ভৌতবিষয়ক বাক্যগুলিকে প্রাকল্পিক বাক্যে রূপান্তর করে। তিনি বলেন-প্রাকল্পিক বাক্যগুলির মধ্যে কতকগুলি বাক্য হবে প্রসক্তিবোধক বাক্য। প্রাকল্পিক বাক্যের বেলায় পূর্ব সত্য এবং অনুগ মিথ্যা হলে প্রাসঙ্গিক প্রাকল্পিক বাক্য হবে মিথ্যা, অন্যান্য সকল ক্ষেত্রেই বাক্যটি হবে সত্য।

তবে এয়ারের মতে অবভাসবাদের অসুবিধা আছে। অবভাসবাদ সত্য হলে উপযুক্ত পরিস্থিতিতে অন্ততঃ সম্ভবপর ইন্দ্রিয় উপাত্ত থাকা প্রয়োজন। বস্তুর বিবরণ থেকে আমরা উপাত্ত নিষ্কাশন করতে পারব। আবার বিপরীতক্রমে আমরা ইন্দ্রিয়-উপাত্তের উপস্থিতি থেকে অবরোহক্রমে বস্তুর অস্তিত্বের পৌঁছাতে পারব। কিন্তু দুঃখের বিষয় দু'টির কোনটাই বাস্তবে ঘটে না। তাই এয়ার বলেন, "The decisive objection to phenomenalism is that neither of these two requirements can be satisfisd."

ইন্দ্রিয়-উপাত্ত বিষয়ক কোনো বাক্য বা বাক্য-সমষ্টি থেকে বস্তুর অস্তিত্ব চূড়ান্ত ভাবে প্রমাণ করা যায় না। উপাত্তবিষয়ক বাক্যগুলি সত্য বা মিথ্যা হতে পারে-এর মধ্যে কোনো স্ব-বিরোধ নেই। উপাত্তবিষয়ক বাক্য থেকে বস্তুবিষয়ক বাক্য যৌক্তিকভাবে নিঃসৃত হয় না। তেমনি বলা যায় না যে বস্তু বিষয়ক বাক্য থেকে ইন্দ্রিয়-উপাত্তবিষয়ক বাক্য নিঃসৃত হবে।

৪.৭ নমুনা প্রশ্নাবলী

১। দ্রব্য বিষয়ে অ্যারিস্টটলের মত ব্যাখ্যা ও বিচার কর।

২। দ্রব্য বিষয়ে অভিজ্ঞতাবাদী মতের মূল বক্তব্যগুলি আলোচনা কর। এই মত কি সন্তোষজনক?

৩। দ্রব্য বিষয়ে বুদ্ধিবাদী মতের মূল বক্তব্য আলোচনা কর। এই মত কি সন্তোষজনক?

৪। দ্রব্য বিষয়ে এয়ারের মত আলোচনা কর। রাসেলের মতের সঙ্গে এই মতের কোনো সাদৃশ্য আছে কি?

৪.৮ গ্রন্থপঞ্জী

The Problem of Knowledge by A.J. Ayer.

The Foundations of Empirical Knowledge by A. J. Ayer

পাশ্চাত্য দর্শনের রূপরেখা - রমাপ্রসাদ দাস ও শিবপদ চক্রবর্ত্তী

জ্ঞানতত্ত্ব ও অধিবিদ্যা-কয়েকটি সমস্যা - ড. বিশ্বনাথ সেন।

পঞ্চম পাঠ

অবভাস ও তত্ত্ববস্তু এবং স্ট্রসনের মতে ব্যক্তির ধারণা

পাঠ সংকেত

৫.০ ভূমিকা

৫.১ অবভাস ও তত্ত্ববস্তু

৫.১.১ অবভাস সম্পর্কে সাধারণ মত

৫.১.২ অবভাস সম্পর্কে দার্শনিক মত

৫.১.২.১ অবভাস সম্পর্কে কান্টের মত

৫.১.২.২ অবভাস সম্পর্কে ব্র্যাড্‌লির মত

৫.১.২.৩ অবভাস ও তত্ত্ব বস্তুর সম্পর্ক প্রসঙ্গে ব্র্যাড্‌লি

৫.২ স্ট্রসনের মতে ব্যক্তির ধারণা

৫.৩ নমুনা প্রশ্নাবলী

৫.৪ গ্রন্থপঞ্জী

৫.০ ভূমিকা

দু'টি পরস্পর ভিন্ন বিষয় এই পাঠটির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। স্বাভাবিক কারণে এই পাঠটি দু'টি বিভাগে বিভক্ত হয়েছে। প্রথম বিভাগটিতে আলোচিত হয়েছে অবভাস ও তত্ত্ব বস্তুর সম্বন্ধ। আর দ্বিতীয় বিভাগটিতে আলোচিত হয়েছে স্ট্রসনের মতে ব্যক্তির ধারণা।

৫.১ অবভাস ও তত্ত্ববস্তু

তত্ত্ববস্তুর স্বরূপ নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। জড়বাদীরা জড়কে, আধ্যাত্মবাদীরা আত্মাকে তত্ত্ববস্তু বলে মনে করেন। জড়বাদীরা জড়ের সাহায্যে চৈতন্যের ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। তাতে চৈতন্যের নিত্যত্ব সিদ্ধ হয় না। চৈতন্যের নিত্যত্ব সিদ্ধির প্রয়াস আধ্যাত্মবাদীদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। মূলতঃ যারা আধ্যাত্মবাদী

তারা এক পরম চৈতন্যের কথা বলে থাকেন। ওই চৈতন্যই বিশ্বাত্মা, বাকি সব অর্থাৎ মানবীয় ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি প্রভৃতি প্রসূত অন্য সব অবভাস মাত্র।

৫.১.১ অবভাস সম্পর্কে সাধারণ মত

অতি সাধারণ বুদ্ধিতে বোঝা যায় যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বস্তুকে যেমন দেখায় তা তেমন নয়। প্রবাদ আছে- 'যা চক্‌চক্ করে তাই সোনা নয়'। জলে অর্ধনিমজ্জিত অবস্থায় লাঠিকে বাঁকা দেখায়। গোলাকার মুদ্রাকে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ডিম্বাকার বলে মনে হয়। এসকল ক্ষেত্রে সাধারণ লোক বলে যে, ঋজু লাঠিই প্রকৃত বস্তু, আর বাঁকা লাঠি তার অবভাস। অথচ যুক্তি বলবে যে বায়ুর মধ্যে লাঠিকে ঋজু দেখায়, জলে দেখায় বাঁকা। অতএব ঋজু বা বাঁকা লাঠি উভয়েই অবভাস। প্রকৃত বস্তু যে কী তা জানা কঠিন। মুদ্রাকেও কোনো পরিপ্রেক্ষিতে গোল, এবং কোনো পরিপ্রেক্ষিতে ডিম্বাকার দেখায়। উভয় আকারই অবভাস। অর্থাৎ আমরা যা কিছু দেখি তাই অবভাস। আর তত্ত্ববস্তু থেকে যায়।

৫.১.২ অবভাস সম্পর্কে দার্শনিক মত

অবভাসের সমস্যা, তত্ত্ববস্তুর সমস্যা, এই উভয়ের সম্পর্কবিষয়ক সমস্যা দর্শনের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। ধ্রুপদী দার্শনিকদের থেকে শুরু করে আধুনিক দার্শনিকরা অবধি সকলেই এসকল সমস্যা নিয়ে বিব্রত হয়েছেন।

৫.১.২.১ অবভাস সম্পর্কে কান্টের মত

কান্টের মতে দৃশ্যমান এই জগৎপ্রপঞ্চ তত্ত্ববস্তুর অবভাস। জ্ঞানের নানাবিধ দিক বিচার করে তিনি বলেন যে, আমাদের জ্ঞাননিরপেক্ষ তত্ত্ববস্তুর প্রভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়ির বিকার সৃষ্টি হয়। এই প্রভাবগুলিকে জ্ঞানের বিষয় হতে হলে ইন্দ্রিয়বৃত্তি (sensibility) এবং বুদ্ধিবৃত্তি (understanding) -র কতকগুলি নিজস্ব আকার ও প্রত্যয়ের দ্বারা সুশৃঙ্খলিত ও অর্থবহ হতে হয়। তাই ঘটপটাদি বিষয়সমূহ আমাদের জ্ঞানে প্রতিফলিত তত্ত্ববস্তুর অবভাস। তত্ত্ববস্তু একান্তই অজ্ঞাত থাকে। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত বিবিধ অনুভূতিকে দেশকালাবচ্ছিন্ন হতেই হয়। দেশ-কাল ইন্দ্রিয়বৃত্তির আকার হওয়ায় মানুষের প্রত্যক্ষের বহির্ভূত নয়। তাই প্রত্যক্ষ নিরপেক্ষ তত্ত্ববস্তুর কোনো দেশকালাবচ্ছেদ নেই। অথচ সব ইন্দ্রিয়ানুভবকেই দেশকালাবচ্ছিন্ন হতে হয় বলে ওগুলিকে তত্ত্ববস্তুর বলা হয়। এই ইন্দ্রিয়াভাসগুলি বুদ্ধিবৃত্তির নিজস্ব আকার বা প্রত্যয়রাজির দ্বারা সংশ্লিষ্ট হয়ে জ্ঞানের বিষয়ে রূপান্তরিত হয়। জ্ঞানের বিষয়ে রূপান্তরিত এই বিষয়গুলিই অবভাস। স্পষ্টতই কান্ট আভাস ও

অবভাসের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। অবভাসগুলি মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ও তন্নিষ্ঠ আকারাদির দ্বারা নির্মিত। আর সেই নির্মাণের উপাদান হলো অজ্ঞাত তত্ত্ববস্তুর ইন্দ্রিয়বৃত্তির দ্বারা গৃহীত আভাসসমূহ।

৫.১.২.২ অবভাস সম্পর্কে ব্র্যাড্‌লির মত

নব্য হেগেলপন্থী ব্র্যাড্‌লি কান্টসম্মত আভাস ও অবভাসের পার্থক্য অস্বীকার করেছেন। তিনি জ্ঞানে ভাসমান বিষয়মাত্রকে অবভাস বলেছেন এবং তার সঙ্গে তত্ত্ববস্তু বা পরমার্থ সতের পার্থক্য করেছেন। এ-বিষয়ে ব্র্যাড্‌লির মত খানিকটা তত্ত্ববিদ্যাগত। কান্টের মতো জ্ঞানবিদ্যাগত নয়। ব্র্যাড্‌লি কান্টসম্মত বৌদ্ধিক আকার এবং ইন্দ্রিয়বৃত্তির আকারগুলিকে স্ববিরোধী দেখাবার চেষ্টা করেছেন। দেশ-কাল, কার্য-কারণ, দ্রব্য-গুণ প্রভৃতি সম্বন্ধগুলি জ্ঞানগত যে কোন বিষয়নিষ্ঠ আকার। জ্ঞাননিষ্ঠ বিষয়মুখী জগতের মধ্যে এই সম্বন্ধগুলি থাকবে। অথচ এই সম্বন্ধগুলি স্ববিরোধী বলে তারা কখনও পরমার্থ তত্ত্ব হতে পারে না। যে তথ্য স্ববিরোধী তা নিজেই নিজেকে বাধিত করে। আর ওই রকম তথ্য আমাদের সুস্থিত চিন্তাকে তৃপ্ত করতে পারে না। আমাদের চিন্তা তাই পরম তৃপ্তির জন্য জ্ঞানরাজ্যের সীমা অতিক্রম করে চলে। পরম তত্ত্ব সুসঙ্গত, নির্বিরোধ, সম্বন্ধহীন এক অদ্বয় তত্ত্ব। ব্র্যাড্‌লির মতে এই পরমার্থ সৎ সর্বব্যাপী, সুসঙ্গত এক পরমা অনুভূতি বা সংবিৎ। এই মূলীভূত সংবিৎ থেকে সম্বন্ধাদিযুক্ত জ্ঞান বা ইচ্ছা অবভাসরূপে নিঃসৃত হয়। এই সীমিত অবভাসগুলি স্ববিরোধী বলে সুসঙ্গত পরমার্থে কোন স্থান নেই। অবশ্য ব্র্যাড্‌লি একথা স্বীকার করেন যে, অবভাসের স্ববিরোধ যদি কোনওক্রমে দূরীভূত হয় তাহলে ওই পরিশোধিত অবভাস পরমার্থের অংশীভূত হতে পারে। জ্ঞানগত অবভাস যতটা ব্যাপক ও সঙ্গত হবে, পরম তত্ত্ব ততটাই ওই অবভাসে প্রতিফলিত হবে।

সংক্ষেপে ব্র্যাড্‌লির মতে পরমার্থ এক সর্বব্যাপী ও চরম সঙ্গতিপূর্ণ সংবিৎ। অবভাসগুলি কম বা বেশি মাত্রায় সৎ হতে পারে। যে অবভাসের স্ববিরোধ দূর করার জন্য কম পরিমার্জন প্রয়োজন সেই অবভাস বেশি মাত্রায় সৎ। যে অবভাসের স্ববিরোধ দূর করার জন্য অধিকতর পরিমার্জন প্রয়োজন সেই অবভাস কম মাত্রায় সৎ। পরিশোধিত অবভাস পরমার্থে নিজের স্থান করে নিতে পারে।

অনেকে মনে করেন যে ব্র্যাড্‌লির পরমার্থ বা তত্ত্ববস্তুর স্বরূপ সংক্রান্ত মতবাদ অনেক অংশে হেগেলের মত অপেক্ষা স্পিনোজার মতের স্বগোত্রীয়। হেগেলের মতে সময়ের মধ্য দিয়ে পরমার্থের আত্মবিকাশ ঘটে। কিন্তু ব্র্যাড্‌লি হেগেলের এই মত মানেন না। বরং কালের অস্তিত্বের বিপক্ষে তিনি অনেক বাদানুবাদ করেছেন। তিনি বারবার বলেছেন যে, তত্ত্ববস্তু কালাতীত। পরমসত্তার কোনো ইতিহাস নেই, তার কোনো প্রগতি নেই। ব্র্যাড্‌লির এ-কথায় স্পিনোজার মতের সাদৃশ্যই প্রকটিত। অ-বিরোধ বা আন্তর ঐক্যের নীতিকে তিনি সত্য ও বাস্তবতা নির্ণয়ের চরম মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তবে উচ্চতম সমন্বয়ের ফলে বিরোধ শেষ হয়ে যায় বলে হেগেল যে অভিমত প্রকাশ করেছেন ব্র্যাড্‌লির আন্তর ঐক্যের নীতির সঙ্গে তার সাদৃশ্য আছে।

তবে ব্র্যাড্‌লি অনেক বিষয়ে হেগেল ও স্পিনোজার মত থেকে আলাদা মত পোষণ করেন। তিনি ঈশ্বরকে পরমসত্তা বা তত্ত্ববস্তু থেকে পৃথক বলে মনে করেন। ব্র্যাড্‌লির মতে ঈশ্বরকে তত্ত্ববস্তুর সঙ্গে এক করে ফেললে সে ঈশ্বর ধর্মের ঈশ্বর হতে পারেন না। যদি ঈশ্বরকে তত্ত্ববস্তু থেকে পৃথক করা হয় তাহলে তিনি অন্যান্য জাগতিক বিষয়ের মতো সসীম হয়ে পড়েন। তত্ত্ববস্তুতে পৌঁছাবার আগে ঈশ্বরের কোনো বিশ্রাম নেই। আর লক্ষ্যে পৌঁছাবার সাথে সাথে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব লোপ পাবে। ঈশ্বর তাই পরমসত্তার প্রতিভাস। ব্র্যাড্‌লির কথায় "For me the Absolute is God: God for me has no meaning outside of religious consciousness, and that essentially is practical. The Absolute for me connot be God, because in the end the Absolute is related to nothing, and there cannot be a practical relation between it and the finite will." অর্থাৎ ব্র্যাড্‌লির মতে তত্ত্ববস্তু বা পরমসত্তা ঈশ্বর নয়। ব্র্যাড্‌লির ধারণায় ধর্মচেতনার বাইরে ঈশ্বর অর্থহীন। ঈশ্বরের প্রয়োজন ব্যবহারিক। পরম সত্তা ঈশ্বর নয় কারণ তত্ত্ববস্তুর সঙ্গে পরিণামে কোনো কিছুর কোনো সংযোগ থাকতে পারে না।

ব্র্যাড্‌লি তাঁর *Appearance and Reality* গ্রন্থে তত্ত্ববস্তু, ঈশ্বর এবং অবভাসের সম্বন্ধ থেকে কয়েকটি অনুসিদ্ধান্ত টেনেছেন।

প্রথমতঃ এক অদ্বিতীয় স্বয়ংসম্পূর্ণ পরম তত্ত্বের মধ্যে ভাব ও অস্তিত্বের ভেদ বিলুপ্ত।

দ্বিতীয়তঃ, কালের প্রবাহের মধ্যে কোনো কিছুর স্বধর্মের অভিব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে বাস্তব নয়। কোনো জিনিসের নিজের মৌলিক বৈশিষ্ট্যের পক্ষে কালের মধ্যে অভিব্যক্ত হওয়া সম্ভবপর নয়। শাশ্বত সত্যসমূহ কোনো ক্ষেত্রেই দেশ-কালের গন্ডির মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু প্রত্যেক সত্যকেই প্রকাশ লাভ করতে হয়। এই প্রকাশের অর্থ এই নয় যে, ইন্দ্রিয়ানুভূতির সীমার মধ্যে তাকে যথার্থভাবে আবির্ভূত হতে হবে। শাশ্বত সত্যসমূহের দেশ-কালের মধ্যে প্রবেশ যেন প্রবেশের ভাণমাত্র এবং সেগুলির প্রকাশ নানাভাবে বিকৃত।

তৃতীয়তঃ, পরমার্থের ঐক্য গঠনে প্রতিটি প্রতীয়মান সত্তার অবদান আছে। বস্তুসত্তা ব্যতীত অবভাস অসম্ভব। কারণ অবভাস মানেই কোনো কিছুর অবভাস। আবার অবভাস ব্যতীত বস্তুসত্তাও অসম্ভব। কারণ অবভাসের বাইরে কিছু নেই। এই প্রসঙ্গে ব্র্যাড্‌লির একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য। ''অবভাস ছাড়া পরম বস্তু দেউলিয়া হতে বাধ্য।"

চতুর্থতঃ, পরমার্থের নিজের ক্রমিক উন্নতি বলে কিছুই থাকতে পারে না। পরমার্থের নিজের কোনো উত্থান-পতনের ইতিহাস নেই। এই প্রসঙ্গে ব্র্যাড্‌লির বিখ্যাত উক্তি ''পরমার্থের কোনো ঋতু নেই; ফল, ফুল ও পল্লবের সমুদ্গম সেখানে একই সঙ্গে এবং ইচ্ছামাত্র। আমাদের ধরণীর মতো সব সময়েই সেখানে শীত ও গ্রীষ্ম এবং আমাদের ধরণীর মতোই কখনই সেখানে শীতও নেই বা গ্রীষ্মও নেই।"

এই চারটি অনুসিদ্ধান্ত থেকে আর একটি অনুসিদ্ধান্তও ব্র্যাড্লি নিঃসৃত করেছেন। পঞ্চম অনুসিদ্ধান্তটি অভিব্যক্তির দার্শনিক স্বরূপ বিষয়ক। তাঁর মতে ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তরের উদ্ভব কালের মধ্যে কিভাবে হল এবং কি ক্রম অনুযায়ী সেগুলির উদ্ভব, ওই উদ্ভবের কারণ কি এই আলোচনাগুলি দর্শনের বিষয়গত নয়। দর্শনে ক্রমবিকাশের ধারণটি কালোপহিত হতে পারে না। দর্শনে 'উচ্চতর' বা 'নিম্নতর' শব্দদুটি এক বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটা মানদণ্ডের সঙ্গে তুলনা করে এই শব্দগুলির ব্যবহার অভিপ্রেত। সেখানে এই শব্দগুলি সত্তার মর্যাদা নির্ণায়ক। সুতরাং দার্শনিক দৃষ্টিতে ক্রমবিকাশ মানে কালের ধারার মধ্যে ক্রমবিকাশ নয়।

ব্র্যাড্লির মতানুসারে সর্ববিধ প্রতীয়মান সত্তা তথাভূতরূপে পারমার্থিক সত্য না হলেও সেগুলি অন্য কোনভাবে পরমার্থের অংশীভূত বা অঙ্গীভূত এবং এই জন্য পরমার্থতঃ সত্য। বিভিন্ন আপাত সত্যগুলির লক্ষণই এই যে সেগুলি অপূর্ণ ও অখণ্ড। সেগুলি রূপান্তরিত হয়ে পরমার্থের পূর্ণতা ও অখণ্ডতার মধ্যে সুসমঞ্জস রূপে বিদ্যমান। আপাত সত্যগুলির অপূর্ণতা ও অসংহতির প্রমাণস্বরূপ তিনি সেগুলির যে ধর্মটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন সেটি হচ্ছে এই যে সর্বপ্রকার ব্যবহারিক বা প্রাকৃত সত্তার গঠনে ভাব ও অস্তিত্বের মধ্যে যথেষ্ট ফারাক। এই ভেদটি পরম অর্থের মধ্যে নেই। তাঁর বিচারে পরমার্থ তাই যার মধ্যে ভাব ও অস্তিত্বের সামঞ্জস্য, সাদৃশ্য ও পূর্ণ সংযোগ আছে। তাই ব্র্যাড্লির সিদ্ধান্ত হচ্ছে- প্রতীয়মান জগৎ সত্য বা বাস্তব নয়।

ব্র্যাড্লির অপর বক্তব্য এই যে, পরমার্থের অবভাস সমূহের প্রয়োজন। অবভাস ব্যতীত বস্তুসত্তা অসম্ভব। কারণ অবভাসের বাইরে কোন কিছু নেই। এই জন্যই তিনি বলেছেন যে, অবভাস ছাড়া কোন ধনদৌলত পরমার্থের নেই।

কিন্তু ব্র্যাড্লির এই বক্তব্যগুলি কি অর্থে সত্য তা বোঝা কঠিন। পরমার্থের প্রয়োজন কি এবং অবভাসগুলি সেই প্রয়োজন কিভাবে মেটায় তা বোঝা দুষ্কর। শঙ্করাচার্যের ন্যায় তিনি অবভাসিত সত্তাগুলিকে মিথ্যা বলেন না। ব্র্যাড্লি স্বীকার করেছেন যে পরম চৈতন্যের বহুধা প্রকাশ হল এক অনির্বচনীয় ব্যাপার।

ব্র্যাড্লির দর্শনে শূন্যস্থান দুটি। প্রথমতঃ পরমার্থ সৎ কেন জীবজগৎ রূপে অবভাসিত? দ্বিতীয়তঃ এই অভভাস কিরূপে সম্ভব? ব্র্যাড্লি বলেন, পরমার্থ সৎ এক অর্থে অসত্য, অসুন্দর এবং অশিব। তবুও প্রশ্ন থেকে যায়- পূর্ণসৎ অসত্য, অসুন্দর এবং অশিবরূপে প্রতিভাত হয় কেন এবং কিরূপে? অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে ব্র্যাড্লির উক্তিটিই এক্ষেত্রে বিচারণীয়। পরমার্থ সতের কোন ঋতু নেই বা ক্রমবিকাশ নেই। অথচ শাশ্বত সত্যকে প্রকাশ লাভ করতেই হয় এবং অবভাসিত সত্তার সত্য ও বাস্তবতা অনুযায়ী শ্রেণীভেদ আছে। এখানেও ব্র্যাড্লির দর্শনের একটি ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। তা এই যে, অবভাসিত হওয়া যদি একটি বাস্তব প্রয়োজন হয় এবং অবভাসিত সত্তাগুলির বাস্তবতার যদি মাত্রাভেদ থাকে তাহলে ক্রমবিকাশ হল একটি মিথ্যা বা কাল্পনিক ব্যাপার। কিন্তু এরূপ বলা চলে কি? নিশ্চয়ই তা চলে না। তাই যদি হয় তাহলে ক্রমবিকাশের পারমার্থিক অর্থ কি? এই প্রশ্নের উত্তর ব্র্যাড্লির দর্শনে নেই।

ব্র্যাড্‌লি দেশ ও কালের মধ্যে প্রকাশকে প্রকাশের ভাণ বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন যে দার্শনিক বিচারে ক্রমবিকাশের অর্থ হল পরাকাষ্ঠা স্থানীয় স্বয়ংমতের সঙ্গে তুলনা করে বিভিন্ন প্রতীয়মান সত্তাগুলির বাস্তবতার মাত্রা নির্ণয়। এই দৃষ্টি থেকে কালোপহিত ক্রমবিকাশ দার্শনিক বিচারে অগ্রাহ্য। তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায়- কাল ব্যতীত ক্রমবিকাশ কি বুদ্ধিসম্মত? এবং কাল যদি পরমার্থতঃ বাস্তব না হয় তাহলে কালাতীত বা কালহীন অবস্থায় বিভিন্ন মাত্রায় প্রকাশের অর্থ বা তাৎপর্য কি? ব্র্যাড্‌লির দর্শনে এসকল প্রশ্নের কোন জবাব নেই।

৫.২ স্ট্রসনের মতে ব্যক্তির ধারণা

Individuals স্ট্রসনের একটি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এই গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম 'Persons'। এই শিরোনামটি থেকেই অধ্যায়টির আলোচ্য বিষয় স্পষ্টভাবে বুঝে নেওয়া যায়। তিনি এখানে ব্যক্তি নিয়ে বা Person নিয়ে আলোচনা করেছেন। আলোচনার শুরুতে তাঁর উত্থাপিত প্রশ্ন দুটি ঃ

(এক) 'Why are states of consciousness ascribed to anything?'

এই প্রশ্নের সঙ্গে সম্বন্ধ রেখেই দ্বিতীয় প্রশ্নটি উত্থাপিত করেছেন স্ট্রসন।

(দুই) 'Why to the same thing as corporeal characteristics?'

অর্থাৎ প্রশ্নদুটির মিলিত জিজ্ঞাসা - কোন কিছুর প্রতি চেতনার অবস্থা বা চৈতন্যমূলক গুণধর্ম আদৌ আরোপিত হয় কেন এবং যেখানে আমরা জড়ত্বীয় গুণধর্ম আরোপ করে থাকি সেখানেই আবার ওইরকম চৈতন্যমূলক গুণধর্ম আরোপের প্রয়োজন কি?

প্রশ্ন দুটির উত্তর দেবার আগে স্ট্রসন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কথাবার্তায় ব্যবহৃত বাক্‌ভঙ্গীকে পর্যালোচনা করে নেবার কথা বলেছেন। এরকম আলোচনায় নানারকম গুণধর্ম আরোপের প্রসঙ্গ লক্ষ্য করা যায়। আমরা নিজেদের প্রতি কর্ম ও অভিপ্রায় আরোপের প্রসঙ্গে কথা বলি। আমরা সংবেদন, প্রত্যক্ষণ, স্মৃতি প্রভৃতিও নিজেদের প্রতি আরোপ করে থাকি। আবার আমরা আমাদের দৈনিক বা শারীরিক গুণধর্মেরও কথা বলি। দেহের আকার-আকৃতি উচ্চতা ওজন প্রভৃতি দেহের আরোপযোগ্য দৈহিক গুণধর্মের পর্যায়ে পড়ে। এই যে দুই প্রকারের গুণ বা ধর্মের কথা বলা হয় তাদের আধারকে ব্যক্তি বলে চিহ্নিত করার প্রয়াসকে স্ট্রসন দুইভাবে বিভক্ত করেছেন। অন্য কথায়, দুই ধরনের গুণধর্মকে একই আধারে আরোপ করার প্রয়াসে দুরকম মতের কথা বলেছেন স্ট্রসন।

মতদুটির একটি কার্তেজীয় মত। এই মতে দৈহিক গুণকে একটি পদার্থে এবং চৈতন্যকে আর একটি ভিন্ন

পদার্থে আরোপ করার কথা বলা হয়। এর বিপরীত মতটিকে স্ট্রসন বলেছেন মালিক - শূন্যতাবাদ (no-ownership doctrine)। দ্বিতীয় মত অনুসারে চেতনাকে বা চৈতন্যমূলক ধর্মকে কোথাও আরোপের কথা বলা ঠিক নয়। একটি বিষয় এখানে লক্ষ্য করার মতো। দুটি মতবাদেই-একটি প্রশ্ন অবান্তর। প্রশ্নটি হল - আমরা কেন দুই প্রকার গুণকে একই পদার্থে আরোপ করে থাকি? প্রশ্নটির অবান্তর হবার কারণ আমরা এরকম আরোপ আদৌ করি না। আর দ্বিতীয় মতে এই প্রশ্নটি ছাড়া আরও একটি প্রশ্ন অবান্তর। তাহল- চেতনার বিভিন্ন প্রকাশ বা চৈতন্যমূলক ধর্মকে আমরা কোন কিছুতে আরোপ করি কেন? এই প্রশ্নটির অবান্তরতার কারণ নিরূপণ প্রসঙ্গেও স্ট্রসন বলেছেন চেতনার প্রকাশ কোথাও আরোপিত হয় না।

মালিক-শূন্যতাবাদে (no-ownership doctrine) -এ বলা হয় যে আমরা অভিজ্ঞতাগুলিকে ভুল ভাবে দেহে আরোপ করে থাকি। কিন্তু ভুলটি বুঝতে পারলে আমরা এমন কোন আধার খুঁজতে থাকি যেখানে চৈতন্য আরোপ করা যায়। আর তখনই আমরা আত্মা বা অহং (ego) কে কেবল চৈতন্যের আধার হিসেবে ধরে থাকি। কিন্ত এই অহংয়ের কোন প্রমাণ না থাকায় চৈতন্যকে কোথাও আরোপের কথা বলা যায় না।

Individuals গ্রন্থে স্ট্রসন মালিক-শূন্যতাবাদের তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে এই মতটি অসংলগ্ন এবং যুক্তির দিক থেকে গ্রহণযোগ্য নয়। আসলে কোনকিছুর মালিকানার প্রমাণ এই যে, যে যার মালিক তা হস্তান্তরযোগ্য। আর এই অর্থে চেতনার বিভিন্ন প্রকাশকে অন্যত্র হস্তান্তর করা যায় না। কাজেই চৈতন্যমূলক ধর্মের কোন মালিক (owner) নেই।

কিন্তু মালিক-শূন্যতাবাদীদের এই যুক্তিকে সঠিক যুক্তি বলে মনে করেন না স্ট্রসন। তাঁর মতে আমরা কথাবার্তা বলার সময় 'আমার যন্ত্রণা', 'আমার কৌতূহল', 'আমার আনন্দ' ইত্যাদি কথা বলে থাকি। এরকম ক্ষেত্রে স্ট্রসনের প্রশ্ন- 'আমার' শব্দটি কিভাবে ব্যাখ্যা করা হবে? স্ট্রসন একে দেহের গুণ বলে মানতে নারাজ। তিনি মনে করেন যে মানসিক অভিজ্ঞতার আধার হিসেবে ব্যক্তির ধারণা অনিবার্য। সুতরাং ব্যক্তির ধারণাকে মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

স্ট্রসন আরও বলেছেন যে, দু'টি মতবাদই অর্থাৎ কার্তেজীয় মতাবাদ ও মালিক-শূন্যতাবাদ উভয়ই দ্বৈতবাদ। কার্তেজীয় দ্বৈতবাদে দুটি পদার্থ- দেহ ও মন স্পষ্টভাবে স্বীকৃত। আর মালিক-শূন্যতাবাদে এই দ্বৈততা দেহ ও মালিকশূন্যতার মধ্যে। স্ট্রসন মনে করেন যে দু'টি মতবাদই ভ্রান্ত; কারণ মতদু'টিতে 'আমি' শব্দটির দুরকম প্রয়োগ স্বীকৃত হয়েছে। 'আমি' শব্দটি যদি একই অর্থে প্রযুক্ত হয় তাহলে 'আমি একজন ব্যক্তি'। ব্যক্তি হচ্ছে তাই-যার ক্ষেত্রে চৈতন্যমূলক গুণ এবং দৈহিক গুণ দুইই আরোপ করা যায়। কিন্তু স্ট্রসনের মতে, দুইয়ের সংমিশ্রণে গঠিত কোন যৌগিক ধারণা ব্যক্তির ধারণা হতে পারে না। ব্যক্তির ধারণা একেবারে মৌলিক বা অসংজ্ঞেয়। এরকম মৌলিক ধারণা আছে বলেই আমরা দুরকম, যথা M-বিধেয় ও P-বিধেয়র বিশ্লেষণ করতে

পারি। তাই স্ট্রসন বলেছেন "The concept of a person is logically prior to that of an individual consciousness."

আমরা নিজেদের প্রতি অভিজ্ঞতা বা চৈতন্যের বিভিন্ন প্রকাশ আরোপ করে থাকি। যে নীতি বা ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আমরা তা করি সেই একই নীতিতে আমরা অন্যের প্রতিও ঐ গুণগুলি আরোপ করে থাকি। এর জন্য পৃথক নীতির প্রয়োজন নেই। স্ট্রসন এইভাবে অহংসর্বস্ববাদ (solipsism) এবং অন্যান্য সকল সমস্যা এড়াবার চেষ্টা করেছেন। আমরা যদি প্রথমেই শুধু 'আমি' দিয়ে আরম্ভ করি 'আমরা' দিয়ে নয়, তাহলে কোন দিনই অহংসর্বস্ববাদের সমস্যার সমাধান করে যাবে না। আমরা নিজেদের প্রতি চৈতন্যের গুণ আরোপের বেলায় এটাও ধরে নিয়ে থাকি যে এই গুণগুলি আমাদের মতো অন্যদের প্রতি প্রযোজ্য।

প্রশ্ন হতে পারে-এই রকম আরোপ অন্যদের বেলায় সম্ভব কিভাবে? এই প্রশ্নের উত্তরে স্ট্রসন অন্যদের ব্যবহার বা ক্রিয়াকলাপ পর্যবেক্ষণ করার কথা বলেছেন। প্রশ্ন এখানেও-আমি নিজে কি তাহলে নিজের ব্যবহার দেখে নিজের প্রতি অভিজ্ঞতা আরোপ করি এমন কথা স্ট্রসন বলেছেন? স্ট্রসন বলতে চান যে আমার অভিজ্ঞতা আমারই। তার জন্য ব্যবহার জানা নিষ্প্রয়োজন। তাছাড়া ঐ ব্যবহার দেখবেই বা কে? সে তো আমিই। নিজের প্রতি চৈতন্যের আরোপ করার জন্য অন্য কিছুর উপর নির্ভরশীল হবার দরকার নেই। কিন্তু অন্যের ব্যবহার দেখে তাদের প্রতি চৈতন্য আরোপ করার বেলায় অন্য নীতির প্রয়োজন হয় না। স্ট্রসনের মতে, তার জন্য অনুমানেরও প্রয়োজন নেই; কারণ অন্যের প্রতি চৈতন্যের আরোপ হয়ে থাকে সরাসরি।

স্ট্রসন বলেন যে, ব্যক্তির ধারণা আমাদের পরিকাঠামোর মধ্যে জড়বস্তুর মতোই মৌলিক ধারণা অর্থাৎ অন্য কোন ধারণা জড়বস্তু ও ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু জড়বস্তু ও ব্যক্তির ধারণা কখনোই অন্য কোন কিছুর উপর নির্ভরশীল নয়। M-বিধেয় সমূহ —ওজন, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, অবস্থান প্রভৃতি ধর্ম জড় পদার্থে আরোপ করা চলে। অপরপক্ষে 'আমি ক্লান্ত', 'আমি আনন্দিত', 'আমি বিস্মৃত' এরকম বাক্যে ক্লান্তি, আনন্দ, বিস্মৃতি প্রভৃতি হচ্ছে P-বিধেয়। কারণ এগুলিকে কোন জড়পদার্থে আরোপের কথা ভাবা যায় না। কিন্তু ব্যক্তির প্রতি এই দুই রকম বিধেয়ই আরোপযোগ্য। ব্যক্তিকে বাদ দিলে চৈতন্যের প্রকাশ অব্যাখ্যাত থেকে যায়। আমরা যখনই নিজেকে ব্যক্তি হিসেবে বুঝি তখন আমরা অন্যকেও আমাদেরই মতন ব্যক্তি হিসেবে বুঝে থাকি। নিজের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে আমরা যা বুঝি, তা সহজভাবে বোঝা যায়।

এভাবে স্ট্রসন তাঁর *Invididuals* গ্রন্থে কার্তেজীয় দ্বৈতবাদ ও দেহ-মালিকশূন্যতার দ্বৈতবাদ কাটিয়ে বিশেষের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বিশেষ দু'রকম -মৌল ও অমৌল। জড় শরীর ও ব্যক্তি প্রথম প্রকার বিশেষের পর্যায়ভুক্ত। অর্থাৎ ব্যক্তির ধারণা মৌলিক। তার কারণ অন্য কোনো বিশেষের উপর নির্ভর না করে জড় শরীরের মতো ব্যক্তিকে সনাক্ত করা যায়। এই ব্যাখ্যাদান কালে স্ট্রসন দু'রকম বিধেয়ের উল্লেখ করেছেন- M-বিধেয় এবং

P-বিধেয়। বলাবাহুল্য, দ্বৈতবাদ কাটিয়ে ওঠার যে প্রয়াস স্ট্রসন নিয়েছেন তা উৎকর্ষসূচক। তবুও ব্যক্তির ব্যাখ্যায় এই দু'রকম ধারণা স্বীকৃত হওয়ায় অনেক দার্শনিকই এখানে দ্বৈততার আভাস লক্ষ্য করেছেন এবং স্ট্রসনের বিরুদ্ধে সমালোচনায় মুখর হয়েছেন।

৫.৩ নমুনা প্রশ্নাবলী

১। অবভাস সম্পর্কে সাধারণ মতটি ব্যাখ্যা কর। এই মতের সঙ্গে দার্শনিক মতের পার্থক্য দেখাও।

২। কান্ট কিভাবে আভাস ও অবভাসের মধ্যে পার্থক্য করেছেন? ব্র্যাড্‌লি কেন ওই পার্থক্য স্বীকার করেন নি?

৩। ব্র্যাড্‌লিকে অনুসরণ করে অবভাস ও তত্ত্ববস্তুর সম্বন্ধ ব্যাখ্যা কর। ওই সম্বন্ধ থেকে তিনি যে অনুসিদ্ধান্তগুলি টেনেছেন সেগুলি আলোচনা কর।

৪। স্ট্রসনকে অনুসরণ করে ব্যক্তির ধারণা আলোচনা কর।

৫.৪ গ্রন্থপঞ্জী

Appearance and Reality by F.H. Bradley

Individuals by P. F. Streawson

ধর্মদর্শন, সুশীল কুমার চক্রবর্তী

পাশ্চাত্য দর্শনের রূপরেখা, রমাপ্রসাদ দাস ও শিবপদ চক্রবর্তী

অস্তিবাদী দর্শন ও প্রতিভাস বিজ্ঞান, স্বপ্না সরকার

Philosophy V Part 2

ORIGINALITY REPORT

0%	0%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes	On	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	On		

Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author:	Soumen Mondal
Assignment title:	slot 21
Submission title:	Philosophy 8 Paper Part 2
File name:	Philosophy_8_total_Book_05.03.2019.pdf
File size:	3.6M
Page count:	176
Word count:	76,736
Character count:	338,152
Submission date:	29-Jul-2022 07:17AM (UTC-0700)
Submission ID:	1876569710

DPG. 068

এম. এ. পার্ট – টু

দর্শন

অষ্টম পত্র : (বিশেষ পত্র)

ফলিত নীতিবিদ্যা

ভারতীয় নীতিদর্শন প্রসঙ্গ

পরিবেশ নীতিশাস্ত্র

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

ডাইরেক্টরেট অব্ ডিস্ট্যান্স এডুকেশন

গোলাপবাগ, বর্ধমান – ৭১৩১০৪

পশ্চিমবঙ্গ

Copyright 2022 Turnitin. All rights reserved.

Philosophy 8 Paper Part 2

by Soumen Mondal

Submission date: 29-Jul-2022 07:17AM (UTC-0700)
Submission ID: 1876569710
File name: Philosophy_8_total_Book_05.03.2019.pdf (3.6M)
Word count: 76736
Character count: 338152

DPG. 068

এম. এ. পার্ট – টু

দর্শন

অষ্টম পত্র : (বিশেষ পত্র)

ফলিত নীতিবিদ্যা

ভারতীয় নীতিদর্শন প্রসঙ্গ

পরিবেশ নীতিশাস্ত্র

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
ডাইরেক্টরেট অব্ ডিস্ট্যান্স এডুকেশন
গোলাপবাগ, বর্ধমান – ৭১৩১০৪
পশ্চিমবঙ্গ

সম্পাদক

অধ্যাপিকা সবুজকলি সেন
দর্শন বিভাগ
বিশ্বভারতী

ড. কৃষ্ণা ভট্টাচার্য
দর্শন বিভাগ,
ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়

গ্রন্থস্বত্ব © ২০০৮

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
বর্ধমান - ৭১৩ ১০৪
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

পুনর্মুদ্রণ : ২০১৩
পুনর্মুদ্রণ নভেম্বর, : ২০১৩
পুনর্মুদ্রণ : ২০১৪
পুনর্মুদ্রণ : ২০১৫
পুনর্মুদ্রণ : ২০১৬
পুনর্মুদ্রণ : ২০১৯

প্রকাশনা

ডাইরেক্টর, ডিসট্যান্স এডুকেশন
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

আর্থিক সহায়তা

ডিসট্যান্স এডুকেশন কাউন্সিল
নয়াদিল্লি, ভারত

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ

ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা - ৭০০ ০৫৬

বর্তমান পুনমুদ্রণ-প্রসঙ্গে

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষা কার্যক্রম সংক্রান্ত পাঠ-উপকরণগুলি সম্পূর্ণ করার এক বিরাট দায়িত্ব পালন করেছেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান সহ সঅধিকাংশ প্রাক্তন ও সকল বর্তমান অধ্যাপকবৃন্দ। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাদের পরামর্শ ও সহায়তায় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষা কার্যক্রমের দর্শনের স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পাঠ-উপকরণগুলি শিক্ষার্থী ও সাধারণ পাঠকের দর্শন চর্চার অন্যতম সহায় ও সঙ্গী। এই পাঠ-উপকরণগুলির জুলাই, ২০১২ সংসস্করণ প্রায় নিশেঃষিত হওয়ার ডিসেম্বর, ২০১৩ পুনমুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগে গৃহীত হয়। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক স্মৃতিকুমার সরকারের নির্দেশে শিক্ষার্থী ও সাধারণ পাঠকের ব্যবহারিক সুবিধার্থে এই পুনমুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশের ক্ষেত্রে সামান্য পরিমার্জনার সুযোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দর্শনের এম. এ দ্বিতীয় বর্ষের পাঠ-উপকরণগুলি আগে বারোটি পর্যায়-গ্রন্থে বিন্যস্ত ছিল। বর্তমান সংস্করেণে বারোটি পর্যায়-গ্রন্থকে এক মলাটবন্দী করে পাঁচটি পর্যায়-গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশ করা হল। পাঠ-উপকরণগুলির সজ্জাক্রমের এই পরিবর্তন ব্যতীত পূর্ববর্তী সংস্করণের সবকিছুই অবিকল একই রয়েছে। এই কারণেই রয়ে গেছে মুদ্রণ প্রমাদগুলি। আশা করি অদূর ভবিষ্যতে সমস্ত মুদ্রণ প্রমাদকে সংশোধন করে মুদ্রণ ত্রুটিহীন পাঠ-উপকরণ আমরা প্রকাশ করতে পারব।

শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠ-উপকরণগুলি সময়মত পৌঁছে দিতে গিয়ে অত্যন্ত দ্রুততর সঙ্গে বর্তমান সংস্করণ প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক স্মৃতিকুমার সরকারের আনুপূর্বিক তত্ত্বাবধানে ও দূরশিক্ষা অধিকরণের কর্মীবৃন্দের এবং মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের কর্মীবৃন্দের সহায়তায় এই পাঠ-উপকরণগুলি সময়মত প্রকাশ করা গেল। তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

দর্শন অষ্টম পত্রের (অ্যাপ্লায়েড এথিকস্ বিশেষ পত্র) সংকলনে রয়েছে অষ্টম পত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অর্ধের একত্র সংকলন।

প্রসঙ্গত, শিক্ষার্থী ও সাধারণ পাঠকদের একটি বিশেষ ভ্রম সংশোধনের জন্য জানানো হচ্ছে যে- ''বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষা কার্যক্রমের পাঠক্রম নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে অভিন্ন এবং পরীক্ষাও গৃহীত হয় একই সঙ্গে'' এই ধারণা বর্তমান অবস্থায় যথাযথ নয়, বর্তমানে নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের জন্য সেমেস্টার সিস্টেম চালু হওয়ার বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষা কার্যক্রমের পাঠক্রম এখন আর নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে অভিন্ন নেই এবং পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে অভিন্ন নেই এবং পরীক্ষা ও আর একই সঙ্গে গৃহীত হয় না।

ড. মলয় রায়

কোরফ্যাকাল্টি - দর্শন

দূরশিক্ষা অধিকরণ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদকের নিবেদন

ভারতীয় ফলিত নীতিবিদ্যার পরিসর অত্যন্ত ব্যাপক। প্রদত্ত () টি — একটি অংশ মাত্র। এই () টি দুটি পর্যায়ে বিভক্ত। দুটি পর্যায়ের লেখক দুজন যথাক্রমে ডঃ মৃদুলা ভট্টাচার্য এবং অধ্যাপক অমরনাথ ভট্টাচার্য। প্রথম পর্যায়ে দুটি একক এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে একটি একক।

প্রথম পর্যায়ের দুটি এককে ডঃ মৃদুলা ভট্টাচার্য ভারতীয় প্রেক্ষাপটে নৈতিকতার মানদণ্ড এবং ন্যায়দর্শনও ভাস্কর দর্শনে মোক্ষর স্বরূপ-এর বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

আমি এই পর্যায় দুটি পাঠ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে —

(১) নৈতিকতার মানদণ্ড সম্পর্কে স্বল্প পরিসরে ছাত্র উপযোগী ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

(২) পাঠের উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

(৩) সারসংক্ষেপ প্রধান শব্দস্তম্ভ এবং নমুনা প্রশ্নাবলী যথাযথ নিবেশিত হয়েছে।

ডঃ মৃদুলা ভট্টাচার্য প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত করেছেন তাঁর বিষয়টি।

অধ্যাপক অমরনাথ ভট্টাচার্য পর্যায় '২' এর একটি এককে অর্থবেদের অর্ন্তগত 'পৃথিবীসূত্রে'র নির্ধারিত অংশের আলোচনা করেছেন। এই অংশটি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করে আমি এই মত পোষণ করি যে—

(১) ভারতীয় ফলিত নীতিবিদ্যা, পরিবেশ নীতি বিদ্যায় এই অংশটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোযন।

(২) এখানে প্রাচীন ভারতের পরিবেশে চেতনায় ভারতীয় () ভাবনার আলোচনা করা হয়েছে।

(৩) সংক্ষেপে অর্থবেদের বৈশিষ্ট্য, 'পৃথিবীসূত্র'র সংক্ষিপ্ত পরিচয় আলোচিত হয়েছে। মূল সংস্কৃতি বাংলা অনুবাদ অনবদ্য।

(৪) সারসংক্ষেপ প্রধান শব্দস্তম্ভ, নমুনা প্রশ্নাবলী যথাযথ নিবেশিত হয়েছে।

সম্পূর্ণ ()টি (পর্যায়-১ এবং পর্যায় ২) ছাত্র, গবেষক ও উৎসাহীদের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান।

১০/৪/২৩

সুবজকলিসেন
বিশ্বভারতী

সম্পাদকের নিবেদন

অধুনা ফলিত নীতিচর্চ্চা দর্শনালোচনায় একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে এই চর্চ্চা নতুন কিছু নয়। সামগ্রিকভাবে ভারতীয় দর্শন ধর্ম ও নীতিভিত্তিক। নীতিবিহীন দর্শন ভারতবর্ষে চর্চ্চিত হয় নি। একথা ঠিক নয় যে, একই প্রকার ধর্ম ও নীতির উপর ভিত্তি করে ভারতীয় দর্শন গড়ে উঠেছে। বরং, ধর্ম ও নীতির ভিন্নতা ও বহুমুখী চর্চ্চা এই দর্শনকে সমৃদ্ধ করেছে। ভারতবর্ষে শাস্ত্র আলোচনার শুরু থেকেই নৈতিক চিন্তা-ভাবনা ও নৈতিক আচরণ সমস্ত বিষয়ের আলোচনাকে নিজ গন্ডীভুক্ত করেছে। ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, সমস্ত শাস্ত্রীয় আলোচনার প্রাথমিক শর্ত হল নৈতিক আচরণ। ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, সমস্ত শাস্ত্রীয় আলোচনার প্রাথমিক শর্ত হল নৈতিক আচরণ। ভারতীয় নীতিতত্ত্বের মূল কথাই হল মানুষের সুষ্ঠু ও নৈতিক জীবন-যাপনের উদ্দেশ্যে এমন এক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া যার মাধ্যমে মানুষ সুষ্ঠুভাবে জীবন-যাপন করে মুক্তির পথে অগ্রসর হতে পারে। তাই এখানে অহিংসা, অনাসক্তি, সহানুভূতি, মৈত্রি, করুণা এবং শ্রদ্ধা প্রভৃতি নৈতিক গুণাবলী অতি উচ্চ পর্যায়ে প্রশংসিত হয়েছে। আমি নিশ্চিত যে, শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক প্রদ্যোত কুমার মন্ডল রচিত ভারতীয় নীতিবিদ্যার একক চতুষ্টয় নীতিবিদ্যালোচনার দিক-নির্দেশক রূপে বিবেচিত হবে। বিশেষ করে জৈন সম্মত পঞ্চব্রতের এরূপ উৎকৃষ্ট মানের মানের সহজ ও সুবোধ্য আলোচনা ইতিপূর্বে আমার চোখে পড়েনি। পাঠ-সহায়কগুলি ছাত্র-ছাত্রীদের ভীষণভাবে কাজে লাগবে বলে আমি মনে করি। এই রচনা গুরুগম্ভীর বিষয়কে ভাষার বিষয়কে ভাষার জটাজাল থেকে মুক্ত করে সরল বাংলা ভাষায় সহজ বোধগম্য করার দিক থেকে পথিকৃৎ বলা যায়। পাঠার্থীদের পক্ষে এটা অতি মূল্যবান প্রাপ্তি।

রচনাটি চারটি এককে বিভক্ত। প্রতিটি এককের শেষে সারাংশ, গুরুত্বপূর্ণ সব্দসমূহের অর্থ, সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী ও বিস্তারিত গ্রন্থপঞ্জী রচনাটিকে সমৃদ্ধ করেছে। এরূপ পাঠ-সহায়ক হাতে পেয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা ও নবীন শিক্ষকরা যে ভীষন উপকৃত হবেন তা বলাই বাহুল্য।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই পাঠ-উপকরণগুলি সম্পাদনা করার দায়িত্ব আমার উপর অর্পন করে আমাকে বাধিত করেছেন। যাথাসাধ্য সেই দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছি। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এবং কর্মসচিব,দূরশিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা, সহ-অধিকর্তা এবং দর্শনের কোর ফ্যাকাল্টি সদস্যদের এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

কৃষ্ণা ভট্টাচার্য
এ্যাসোসিয়েট, দর্শন বিভাগ
ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়।

সম্পাদকের নিবেদন

পরিবেশ রক্ষণাবেক্ষণ আজকের যুগে একটি জরুরী সমস্যা। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, বিবর্তন এই নিয়ে আলোচনা বহুদিন ধরেই চলেছে। জমি, খনি, জল, অরণ্য-সম্পদ অতিক্রম করে আমরা আজ নভশ্চরণ, মহাশূন্য গবেষণাকে গবেষণাকে স্পর্শ করেছি। এই সমস্তই আমাদের পরিবেশের অন্তর্গত। প্রাণীর জীবনধারণের অবস্থা, প্রাণীর সমাজ এবং তাদের বাসস্থানের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সংক্রান্ত অনুশীলনের বিজ্ঞান হল পরিবেশ-বিদ্যা। প্রথমে পরিবেশ-বিদ্যা জীববিদ্যার কাঠামোর মধ্যেই একটি বিষয়রূপে পরিগণিত হত। প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে প্রজাতির বিবর্তনের ডারউইন প্রচারিত মতবাদে মনে করা হত যে প্রতিটি জীব-প্রজাতি এবং তার বাসস্থানের মধ্যেকার মিথস্ক্রিয়ার ব্যাপারটি জৈব-বিবর্তন বায়ুমণ্ডলের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার সমস্যাগুলি তীব্র হয়ে ওঠায় পরিবেশ বিদ্যার সীমানা প্রসারিত হয়েছে। মানবসমাজের সচেতনতার জন্য পরিবেশবিদ্যাকে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাগুলির (ভৌতবিজ্ঞান, রসায়ণ মতো পরিবেশবিদ্যা কথাটিকেও দুটি সংযুক্ত অথচ ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা যেতে পারে। (ক) পরিবেশগত মিথস্ক্রিয়ার প্রকৃত প্রক্রিয়াটি এবং (খ) এর তত্ত্ব টি।

অধ্যাপক ডঃ সন্তোষ কুমার পাল লিখিত পরিবেশ-নীতিশাস্ত্র (Enviornmental Ethics) দূরশিক্ষার পাঠ-উপকরণে এই বিষয়গুলি নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। এই পাঠ-উপকরণে চারটি একক আছে। প্রথম এককের তিনটি অংশে পরিবেশ নীতিত্ত্বর মূল বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। প্রথম এককের দ্বিতীয় অংশ মানবকেন্দ্রিকতাবাদ এবং তৃতীয় অংশে প্রজাতিবাদ আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় এককেরও দুটি অংশ। প্রথম অংশে প্রাণকেন্দ্রিতাবাদ ও চতুর্থ এককে বাস্তু-নারীবাদ আলোচিত হয়েছে। এই পাঠ-উপকরণে সমকালীন পরিবেশে যেটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অর্থাৎ কেবলমাত্র মানুষ নয়, মানবেতর প্রাণী, কীট-পতঙ্গ পর্যন্ত সমপ্ত জীবকে নৈতিকতার দৃষ্টিতে সমান ভাবে বিবেচনা করা হবে তাদের অধিকার কতখানি—এমন কি প্রকৃতি, নদী, জলের অধিকার আছে কি-না তারও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে যে বিতর্কগুলি আছে তার আলোচনা এখানে করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রকৃতির অর্ন্তগত জীব-অজীব কুলের সকল সদস্যদের অধিকার সম্পর্কে পরিবেশ-নীতিচিন্তার কথা বলা হয়েছে। মানবকেন্দ্রিকতা এবং তার অতিক্রমমনীয়তা সম্পর্কীয় আলোচনা বিস্তৃতভাবে করা হয়েছে। গভীর বাস্তুবাদ আলোচনা বর্তমান পৃথিবীতে একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। এই অংশটিও প্রাঞ্জলভাবে আলোচিত হয়েছে। নারীর সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক এবং নারী প্রকৃতি ও পশুর সঙ্গে পুরুষের সম্পর্ক প্রসঙ্গে যে বাস্তু-নারীবাদ গড়ে উঠেছে—সেই আলোচনা সম্পর্কে এই পাঠ-উপকরণে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আছে।

এই পাঠ-উপকরণটি দূর-শিক্ষার ছাত্র ছাত্রীদের উপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। উপরন্তু, কেবলমাত্র দর্শনের ছাত্রছাত্রীরাই নয়, পরিবেশনীতিশাস্ত্র সম্পর্কে উৎসুক ব্যক্তিরাও এর দ্বারা উপকৃত হবেন।

০১.১২.১১

সবুজকলি সেন
বিশ্বভারতী

অবতরণিকা

একটি সভ্য সমাজ নৈতিক পরিকাঠামোয় গড়ে ওঠে। লক্ষ্যণীয় যে, প্রাচীন ভারতে সমাজচিন্তকেরা, দেশ, কাল ও গোষ্ঠীভেদে নৈতিক ও অনৈতিক কর্ম নিয়ে নান মত পোষন করেছেন। এর কারণ হল, নৈতিকতার মানদণ্ড নিয়ে তাদের মধ্যে মতানৈক্য। কাজেই নৈতিক জীবন বা সমাজ গড়তে হলে নৈতিক মান দণ্ডগুলি সমিক্ষা করা দরকার।

নীতি-শিক্ষার্থীকে নৈতিক মানদণ্ড সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ নিয়ে 'The Ethics of the Hindus' গ্রন্থটির কিছু নির্ধারিত অংশ এবং ন্যায় ও অদ্বৈতবেদান্তের মতে মোক্ষের স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত করার উদ্দেশ্যে ন্যায়দর্শন ও বেদান্তেদর্শনের কিছু নির্ধারিত অংশ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগ স্নাতকোত্তর শ্রেণীর এ্যাপ্লায়েড এথিকস্-এর পাঠক্রমে অন্তর্ভূক্ত করেছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইরেক্টরেট্ অব্ ডিসট্যান্স এডুকেশন-এর পক্ষ থেকে নির্ধারিত অংশের ওপর পাঠ-উপকরণ তৈরি করার জন্য আমার ওপর পাঠ-উপকরণ তৈরি করার জন্য আমার ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়।

এখানে আমি সমগ্র পাঠ্যাংশ দুটি ইউনিটে ও প্রতিটি ইউনিট কয়েকটি অনুচ্ছেদে ভাগ করে দূর-শিক্ষার্থীর উপযোগী করে পাঠ-উপকরণটি লিখেছি। দূর-শিক্ষার্থীরা পাঠ-উপকরণগুলির দ্বারা উপকৃত হবে — আমি এরূপ প্রত্যাশা করি।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইরেক্টরেট্ অব্ ডিসট্যান্স এডুকেশন-এর কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট সদস্য যাঁরা আমাকে পাঠ-উপকরণগুলি লেখার সুযোগ করে দিয়েছিলেন, তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

মৃদুলা ভট্টাচার্য্য

অবতরণিকা

আজ বিশ্বায়নের যুগ। আমরা চাই প্রগতি। প্রগতি মানে পুরাতনকে পরিহার করা নয়। অতীতের যা কিছু গ্রহণীয় তাকে গ্রহণ করা ও যা কিছু বর্জনীয় তাকে বর্জন করা হল 'প্রগতি'। আজ এক শ্রেণীর মানুষের স্বার্থপরতা ও লোলুপতার জন্য সমগ্র ভূখণ্ডের পরিবেশ নানাভাবে দূষিত হচ্ছে। কোথাও শব্দদূষণ, কোথাও বায়ুদূষণ, কোথাও নির্বিচারে প্রাণীহত্যা, আবার কোথাও দেখা যাচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদের দ্বিধাহীন অপচয়। আমরা আগামী প্রজন্মের জন্য উদ্বিগ্ন। তাই আজ আমরা পরিবেশচর্চা, পরিবেশ-চর্যা ও পরিবেশ-পরিষেবায় যত্নশীল হয়েছি। এই প্রেক্ষাপটে বৈদিক যুগে পরিবেশ সম্পর্কে ঋষিদের ভাবনার সঙ্গে পরিচিত হওয়া একান্ত প্রাসঙ্গিক।

যজ্ঞানুষ্ঠান 'ত্রয়ী' বিদ্যার উপজীব্য বিষয়। কিন্তু প্রাকৃতিক, জাগতিক ও পারিবারিক ক্রিয়াকলাপ অথর্ববেদের মুখ্য বিষয়। ঋষি অথবা প্রকৃতিকে কত আপন করে নিয়েছিলেন তা স্নাতকোত্তর দূরশিক্ষার্থীকে অবহিত করার উদ্দেশ্যে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগ 'পৃথিবীসূক্তে'র কিছু নির্ধারিত অংশ স্নাতকোত্তর শ্রেণীর এ্যাপ্লায়েড এথিকস্-এর পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করেছে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইরেক্টরেট্ অব্ ডিসট্যান্স এডুকেশন-এর কর্তৃপক্ষ 'পৃথিবীসূক্ত' ভিত্তি করে পাঠ-উপকরণ প্রস্তুত করার জন্য আমার ওপর দায়িত্বভার অর্পণ করে।

অথর্ববেদের পৃথিবীসূক্তের নির্ধারিত সমগ্র পাঠ্যাংশ আমি একটি ইউনিটে ও ইউনিটটি কতকগুলো অনুচ্ছেদে ভাগ করে দূরশিক্ষার নির্ধারিত নীতিরতক অনুসরণে পাঠ-উপকরণটি প্রস্তুত করেছি। দূর-শিক্ষার্থীরা এর দ্বারা উপকৃত হলে আমার শ্রম সার্থক হবে।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইরেক্টরেট্ অব্ ডিসট্যান্স এডুকেশন-এর কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট সদস্য পাঠ-উপকরণটি লেখার সুযোগ দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করেছেন।

অমরনাথ ভট্টাচার্য

প্রথম অর্ধ : ভারতীয় নীতি-দর্শনের প্রসঙ্গ

অধ্যাপক অমরনাথ ভট্টাচার্য
ভূতপূর্ব অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক প্রদ্যোত কুমার মন্ডল
ভূতপূর্ব অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

ড. মৃদুলা ভট্টাচার্য

অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

দ্বিতীয় অর্ধ : পরিবেশ-নীতিশাস্ত্র (এনভায়রণমেন্টাল এথিকস্)

ড: সন্তোষ কুমার পাল
সহযোগী অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ

সূচিপত্র

প্রথম অর্ধ ঃ ভারতীয় নীতিদর্শনের প্রসঙ্গ

	বিষয়	পৃষ্ঠা
একক - ১	ভারতীয় প্রেক্ষাপটে নৈতিকতার মানদন্ড	৩
একক - ২	ন্যায় ও শংকরের দর্শনে মোক্ষ	১৩
একক - ৩	পৃথিবীসূক্ত পরিবেশ চেতনা	২৭
একক - ৪	পঞ্চব্রত ও অহিংসা অনুব্রত	৪১
একক - ৫	সত্য অনুব্রত	৫৫
একক - ৬	অস্তেয় অনুব্রত, ব্রহ্মচর্য অনুব্রত, অপরিগ্রহ অনুব্রত	৬৩
একক - ৭	পঞ্চ মহাব্রত, চিকীর্ষা ও দ্বেষ	৭৩

দ্বিতীয় অর্ধ ঃ পরিবেশ-নীতিশাস্ত্র

একক - ১	প্রথম অংশ পরিবেশ-নীতিতত্ত্ব : অবতরণিকা	৯১
	দ্বিতীয় অংশ মানবকেন্দ্রিকতাবাদ (Anthropocentrism)	৯৫
	তৃতীয় অংশ প্রজাতিবাদ (Speciesism)	১০২
একক - ২	প্রথম অংশ প্রাণকেন্দ্রিকতাবাদ (Biocentrism)	১০৯
	দ্বিতীয় অংশ প্রাণীর অধিকারতত্ত্ব (Animal Rights)	১১৫
একক - ৩	বাস্তুকেন্দ্রিকতাবাদ (Ecocentrism)	১২৪
একক - ৪	বাস্তুনারীবাদ (Eco-feminism)	১৪৪

পর্যায়-১

নৈতিক মানদণ্ড ও মোক্ষ

ড. মৃদুলা ভট্টাচার্য্য

অধ্যাপিকা

দর্শন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

ইউনিট -১ ঃ ভারতীয় প্রেক্ষাপটে নৈতিকতার মানদণ্ড

পাঠপরিকল্পনা

১.১ প্রাক্‌কথন

১.২ পাঠের উদ্দেশ্য

১.৩ লোকোপদেশ (Tradition) ও লোকপ্রসিদ্ধি (Consensus)

১.৩.১ লোকোপদেশ (Tradition) —একটি নৈতিক মানদণ্ড

১.৩.২ লোকোপদেশের সমালোচনা

১.৩.৩ লোকপ্রসিদ্ধি (Consensus) ও তার প্রকারভেদ

১.৩.৩.১ নীতিনির্ণয়ে উপকার (well-being) ও অপকার (Ill-being)

১.৩.৩.২ নীতিনির্ধারণে অনুগ্রহ (Increase of Life) ও পীড়া (Decrease of Life)

১.৩.৩.৩ নীতিনির্ধারণে শাস্ত্রোক্ত বিধি (Moral Law)

১.৩.৩.৪ কেবল ঐকমত্যই (Consensus) নীতিনির্ধারক

১.৪ লোকস্থিতি (Social Stability) ও লোকসিদ্ধি (Social End)

১.৪.১ লোকস্থিতি (Social Stability) — একটি নৈতিক মানদণ্ড

১.৪.২ লোকস্থিতির সমালোচনা ও লোকসিদ্ধি সমর্থন

১.৫ নীতিনির্ধারণে চার্বাক সুখবাদ (Hedonism) ও তার সমালোচনা

১.৫.১ চার্বাক সুখবাদ বিশ্লেষণ

১.৫.২ গ্রন্থকার মৈত্রের মন্তব্য

১.৫.৩ চার্বাক সুখবাদের সমালোচনা

১.৬ নীতিনির্ধারণে প্রেয় ও শ্রেয়

১.৭ সারসংক্ষেপ

১.৮ প্রধান শব্দগুচ্ছ

১.৯ নমুনা-প্রশ্নাবলী

১.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১.১ প্রাক্কথন

সভ্যতার জন্মলগ্ন থেকেই মানুষ সুন্দর সমাজ গড়তে চায়। সমাজের প্রতিষ্ঠা ও অগ্রগতি ভালো-মন্দ, নৈতিক-অনৈতিক কাজকর্মের ওপরই নির্ভর করে। তাই যুগে যুগে মানুষ সভ্য সমাজে কোন্‌টি ভালো, কোন্‌টি মন্দ, কোন্‌টি নৈতিক, কোন্‌টি অনৈতিক তা নির্ধারণ করার জন্য সচেষ্ট হয়েছে। কিন্তু মানব-সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, দেশ-কাল, কুল-সম্প্রদায় প্রভৃতি ভেদে ভালো-মন্দ নির্ণয়ে তারতম্য রয়েছে। মূল কথা, ভালো-মন্দ, নৈতিক-অনৈতিক বিষয়ের মানদণ্ড কি হবে তা নিয়ে মতবৈষম্য লক্ষিত হয়। এর ফলে কোনও দেশে, কোন কালে, কোন সমাজে বা কোন সম্প্রদায়ে যেটি নৈতিক বলে বিবেচিত হয় দেশান্তরে, কালান্তরে, ভিন্ন সমাজে বা ভিন্ন সম্প্রদায়ে সেটি অনৈতিক বলে গৃহীত হয়। কাজেই নৈতিকতার মানদণ্ড বা মাপকাঠি কি হবে তা স্থির করা একান্ত আবশ্যক।

১.২ পাঠের উদ্দেশ্য :

নীতিবোধ ও মূল্যবোধ বিষয়ে সমাজের মানুষকে সচেতন করতে হলে নৈতিকতার মানদণ্ড বোঝা দরকার। কিন্তু নৈতিকতার মাপকাঠি কি হবে এ বিষয়ে ভারতবর্ষে নানা সময়ে নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা মত গড়ে ওঠে। কেউ বলেন, ঐতিহ্য, কেউ বলেন, সমাজের উপকার, কেউ বলেন, সমাজের স্থিতিশীলতা, কেউ বলেন, সমাজের কল্যাণবোধ, কেউ বলেন, পার্থিব সুখ আর উপনিষদের ঋষিরা বলেন, প্রেয় ও শ্রেয় নৈতিকতার মানদণ্ড। লোকোপদেশ, লোকপ্রসিদ্ধি, লোকস্থিতি, লোকসিদ্ধি, সুখবাদ, প্রেয় ও শ্রেয়কে নৈতিক মানদণ্ড বলা হয় কেন তা বিশ্লেষণ করাই এ পাঠের উদ্দেশ্য।

১.৩ লোকোপদেশ (Tradition) ও লোকপ্রসিদ্ধি (Consensus)

১.৩.১ লোকোপদেশ (Tradition) — একটি নৈতিক মানদণ্ড :

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে নানাগোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মধ্যে আচার, ব্যবহার ও প্রথা অনুযায়ী ভালো-মন্দ, নৈতিক-অনৈতিক কর্ম নির্ধারণ করার ব্যবস্থা ছিল। দেশাচার ও কুলাচার অনুযায়ী পাপ-পূণ্য, মঙ্গল-অমঙ্গল প্রভৃতি নির্ধারিত হত। ওই আচার-ব্যবহারকেই 'লোকোপদেশ' বলা হয়। লোকোপদেশ একপ্রকার লোকপ্রথা। সুতরাং একশ্রেণীর প্রাচীন নীতিবিদ্‌রা মনে করতেন, সদাচারই নৈতিকতার পরিচায়ক। দেখা যায়, অনেক স্মার্ত মণীষী আচারবান হবার জন্য সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে উপদেশ দিতেন। আচার বলতে সদাচারকে বোঝানো হয়েছে। আচারহীন মানুষকে স্বয়ং বেদও পুণ্যবান করতে পারে না— এ ছিল তাঁদের বক্তব্য।

১.৩.২ লোকোপদেশের সমালোচনা :

'The Ethics of the Hindus' শীর্ষক গ্রন্থে গ্রন্থকার সুশীল কুমার মৈত্র লোকোপদেশকে নৈতিক মানদণ্ড রূপে ব্যাখ্যা করার পর দেখিয়েছেন, অনেকে একে মানদণ্ড রূপে স্বীকার করেন নি। দেশভেদে, কালভেদে ও কুলভেদে আচারে ভেদ থাকায় নৈতিকতার সর্বজনগ্রাহ্য নীতি নির্ধারণ সম্ভবপর হবে না।

১.৩.৩ লোকপ্রসিদ্ধি (Consensus) ও তার প্রকারভেদ

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে অনেক দার্শনিক লোকপ্রসিদ্ধিকে নৈতিক মানদণ্ড বলতেন। তাঁদের মতে কেবল লোকপ্রথা, বিশ্বাস বা আচার নৈতিকতার নিরূপক হতে পারে না। নীতিনির্ধারণে সমাজের মানুষের ঐকমত্য আবশ্যক। যেসব সদাচার বা বিশ্বাস সমাজে স্বীকৃতিলাভ করে থাকে তাদের দ্বারাই কোন্‌টি ভালো, কোন্‌টি মন্দ, কোন্‌টি মঙ্গলজনক, কোন্‌টি অমঙ্গলজনক তা বিবেচিত হয়। গ্রন্থকার একেই 'লোকপ্রসিদ্ধি' বলেছেন। কাজেই নিছক সদাচার বা প্রথা নৈতিক মানদণ্ড হতে পারে না। যে সব প্রথাকে সমাজের অধিকাংশ মানুষ নৈতিক বলে মনে করে, কেবল সে সব প্রথা নীতিবোধের মানদণ্ড বলে বিবেচিত হয়। এটি হল লোকপ্রসিদ্ধির মূল কথা।

১.৩.৩.১ নীতি নির্ণয়ে উপকার (Well-being) ও অপকার (Ill-being) :

একটি শ্রেণীর প্রাচীন নীতিবিদ্‌ বলতেন, নৈতিকতা নির্ধারণে সমাজের মানুষের ঐকমত্য গৌণ। প্রকৃত মানদণ্ড হল, মানুষের উপকার ও অপকার। যা মানুষের উপকারে লাগে তাকে ভালো ও যা অপকার করে তাকে মন্দ বলে বুঝতে হবে। কাজেই যে সব লোকপ্রথা বা বিশ্বাস সম্বন্ধে মানুষের ঐকমত্য আছে এবং যা মানুষের উপকার সাধন করে সেটি নৈতিকতার প্রকৃত মানদণ্ড, কেবলমাত্র ঐকমত্য নয়।

১.৩.৩.২ নীতি নির্ধারণে অনুগ্রহ (Increase of Life) ও পীড়া (Decrease of Life)

অপর এক শ্রেণীর ভারতীয় নীতিবিদ্‌ বলেন, লোকপ্রথা এবং বিশ্বাস সম্বন্ধে ঐকমত্য মানুষের কেবল উপকার-অপকারের দ্বারাই নৈতিক মানদণ্ড রূপে বিবেচিত হতে পারে না। তাঁরা বলেন, ঐকমত্য তখনই নৈতিকতার মানদণ্ড হবে যখন তা মানুষের মানসিক ও জৈবিক উভয় উপকার সাধন করবে। কেবলমাত্র সুখ বা দুঃখকে ঐকমত্যের ভিত্তি না বুঝে দেখতে হবে ঐ প্রথা বা বিশ্বাস মানুষের জীবনের উৎকর্ষ সাধন করছে কিংবা অপকর্ষ সাধন করছে। মূল কথা, ঐকমত্যের ভিত্তি উপকার বা অপকারকে মানসিক ও জৈবিক দুটি দৃষ্টিকোণ হতে বিবেচনা করতে হবে। মানসিক উপকার ও অপকার বলতে যথাক্রমে সুখ ও দুঃখকে বোঝানো হয় এবং জৈবিক উপকার ও অপকার বলতে গ্রন্থকার মৈত্র যথাক্রমে অনুগ্রহ ও পীড়াকে বুঝিয়েছেন। 'অনুগ্রহ' শব্দের অর্থ জীবনের উৎকর্ষ আর 'পীড়া' শব্দের অর্থ জীবনধারণে অপকর্ষ। কাজেই লোকপ্রথা সম্বন্ধে সেরূপ ঐকমত্য নীতির নির্ধারক হবে যা মানুষের সুখ ও অনুগ্রহ কিংবা দুঃখ ও পীড়া উৎপাদন করে।

১.৩.৩.৩ নীতিনির্ধারণে শাস্ত্রোক্ত বিধি (Moral Law) :

কোনও কোনও প্রাচীন নীতিবিদ্ বলেন, সমাজের ঐকমত্য নীতির নির্ধারক হলেও নৈতিক বিধিবাক্যই ঐকমত্যের ভিত্তি হবে। উপকার-অপকার, কিংবা অনুগ্রহ— পীড়া ঐকমত্যের ভিত্তি হতে পারে না। তাঁদের মতে নৈতিক বিধিবাক্যই ভালো-মন্দ, পাপ-পূণ্য প্রভৃতির নির্ধারক। লৌকিক উপায়ে অজ্ঞাতবিষয়ের জ্ঞাপক শাস্ত্রীয় বাক্যকে বিধিবাক্য বলে। বিধিবাক্য কোন্‌টি সুকর্ম ও কোন্‌টি কুকর্ম; কোন্‌টি নৈতিক কর্ম ও কোন্‌টি অনৈতিক কর্ম তা নির্দেশ করে থাকে। বেদ, উপনিষদ্ ও ধর্মশাস্ত্র সর্ববিধ নৈতিক নির্দেশ দিয়ে থাকে। উপনিষদের ঋষি ও ধর্মশাস্ত্রের প্রবক্তারা বলেন, মানুষ নিজ কর্মের দ্বারাই পরিচালিত হয়। এ জন্মের কৃত কর্মের ফল সব সময় লোকে এ জন্মে লাভ করে না। কর্মজন্য সংস্কার বা অদৃষ্ট হতে সে পরজন্মে ফল লাভ করে। অদৃষ্ট যদি পূণ্যকর্ম হতে জন্মায় তাহলে ওই ব্যক্তিকে পুণ্যাত্মা বলা হয়। আর অদৃষ্ট যদি কুকর্ম, অনৈতিক কর্ম বা পাপ কর্ম হতে উৎপন্ন হয় তবে ওই ব্যক্তিকে পাপী বলা হয়। তাই বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হয়েছে ''পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন''। সুতরাং পাপ-পূণ্য বা ভালো-মন্দ নির্ধারিত হয় মানুষের নিজের কর্মের দ্বারা। আর পুণ্য কর্ম ও পাপ কর্ম নির্ণীত হয় বেদ, উপনিষদ ও ধর্মশাস্ত্রের বিধানের দ্বারা। সুতরাং শাস্ত্রীয় বিধানের দ্বারা সমর্থিত ঐকমত্যই নীতির মানদণ্ড হবে — একথা অনেকে বলে থাকেন।

১.৩.৩.৪ কেবল ঐকমত্যই (Consensus) নীতিনির্ধারক :

কোনও কোনও নীতিবিদ্ বলে থাকেন, শুধু ঐক্যমত্যই নীতির নির্ধারক হবে। নীতি নির্ধারণে ঐকমত্যকে গৌণ বলা যাবে না। উপকার-অপকার কিংবা অনুগ্রহ পীড়া কিংবা নৈতিক বিধিবাক্য বা অনুজ্ঞা বাক্য ঐকমত্যের ভিত্তি হতে পারে না। যে লোকপ্রথা বা বিশ্বাসের ওপর সমাজের লোক একমত, এরূপ ঐকমত্যই ভালো-মন্দ নীতির নির্ণায়ক হবে। ঐকমত্যই স্বয়ং নীতি নির্ণয়ে প্রমাণ।

১.৪ লোকস্থিতি (Social Stability) ও লোকসিদ্ধি (Social End) :

১.৪.১ লোকস্থিতি — একটি নৈতিক মানদণ্ড

লোকোপদেশ ও লোকপ্রসিদ্ধিতে দেখানো হয়েছে, লোকপ্রথা, বিশ্বাস ও পরম্পরালব্ধ আচার-ব্যবহার নৈতিক জীবনের পরিচায়ক। কিন্তু এ সব আচার-ব্যবহারের সামাজিক উপযোগিতা স্পষ্টত উল্লিখিত হয় নি, যদিও পরোক্ষভাবে তাদের সমাজিক উপযোগিতা স্বীকার করা হয়েছে। তাই অন্য শ্রেণীর নীতিবিদ্‌রা সমাজে আচার-ব্যবহারের উপযোগিতা যাচাই করে ভালো-মন্দ বিচার করতেন। তাঁদের কাছে নীতিনির্ধারণে আচার-ব্যবহারের ভূমিকা গৌণ, মুখ্য উদ্দেশ্য সমাজের স্থিতিশীলতা বা সামাজিক কল্যাণ। লোকস্থিতিতে সমাজব্যবস্থাকে ও লোকসিদ্ধিতে সমাজকল্যাণকে নীতির মানদণ্ড বলা হয়।

যে সকল নীতিতত্ত্ববিদ্ লোকস্থিতিকে নীতি নির্ণয়ের মানদণ্ড বলেন তাঁদের মতে নৈতিক বিধিনিষেধের দ্বারাই সমাজে স্থিতিশীলতা সম্ভব। একথা ঠিক, ভারতীয় দর্শনে অধিবিদ্যা, প্রমাণতত্ত্ব, নীতিবিদ্যা প্রভৃতি স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত হয় নি। তবে প্রাচীন ভারতের সমাজে প্রচলিত আচার-ব্যবহারগুলোকে নীতিগতভাবে সমর্থনের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। এজন্যই তৎকালে শাস্ত্রের প্রবক্তারা বর্ণ ও বর্ণধর্ম, আশ্রম ও আশ্রমধর্ম, কুল ও কুলাচার, লোক ও লোকাচার, দেশ ও দেশাচার — এই সব বিশেষ বিশেষ আচারকে অবশ্য করণীয় বলেছেন। আশ্রমভেদে কিংবা কুল, লোক বা দেশ ভেদে যে আচারের ভেদ আছে তা অনুসরণ করা নীতিগতভাবে সঠিক। এর ব্যতিক্রম হলে তা অনৈতিক হবে। তাই ভগবদ্‌গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন, ক্ষত্রিয় হওয়ায় অর্জুনের পক্ষে যুদ্ধ করা অবশ্য কর্তব্য। অর্জুন যদি ক্ষত্রিয় হিসাবে ক্ষাত্রধর্মের অনুষ্ঠান করা থেকে বিরত হন তবে তা ক্ষাত্রনীতিবহির্ভূত হবে। সমাজে স্থিতিশীলতার জন্য প্রচলিত আচার-ব্যবহারের নৈতিক সমর্থন অপেক্ষিত।

১.৪.২ লোকস্থিতির সমালোচনা ও লোকসিদ্ধি সমর্থন :

কোনও কোনও নীতিতত্ত্ববিদ্ মনে করেন, লোকস্থিতিকে নৈতিক মানদণ্ড বললে নৈতিক জীবন হবে অন্য সাপেক্ষ। এর দ্বারা অন্য নিরপেক্ষ নীতিবোধ ও সমাজের সার্বিক প্রয়োজন সিদ্ধ হবে না। ধর্ম বা নীতি লোকস্থিতির দ্বারাই নির্ধারিত হবে। এর ফলে ধর্ম হতে সমাজ বা লোক বলবান হবে। দেশ, কুল, গোত্র ও আচারব্যবস্থা অনুযায়ী কন্যাদান, বিবাহ প্রভৃতি দ্বারাও ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের মধ্যে বন্ধন বা মৈত্রী এবং ভিন্ন প্রদেশের সঙ্গে নাগরিক সম্বন্ধও গড়ে উঠতে পারে। এর ফলে নৈতিকতা সামাজিক ব্যবস্থার ওপর পুরোপুরি নির্ভর করে। এজন্য অন্যসাপেক্ষ লোকস্থিতিকে অনেকে নৈতিক মানদণ্ড বলেন না।

একশ্রেণীর ভারতীয় নীতিতত্ত্ববিদ্ বলেন, নৈতিক মানদণ্ড সাম্প্রদায়িক ও প্রাদেশিক অন্য সাপেক্ষ নীতিতত্ত্বের সীমার উর্দ্ধে থাকবে। তাঁরা মনে করেন, কেবল নৈতিক বিধিনিষেধ সমাজের কল্যাণসাধন করতে পারে না। যার দ্বারা সমাজের নিয়ম-শৃঙ্খলা ও কল্যাণ উভয়ই সাধিত হয় সেটি হবে নৈতিকতার মানদণ্ড। একে গ্রন্থকার মৈত্র লোকসিদ্ধি বলেছেন। অনেক একে 'লোকশ্রেয়' বলে থাকেন।

১.৫ নীতিনির্ধারণে চার্বাক সুখবাদ (Hedonism) ও তার সমালোচনা :

১.৫.১ চার্বাক সুখবাদ বিশ্লেষণ :

চার্বাক দর্শন অভিজ্ঞতা নির্ভর। চার্বাকগণ প্রত্যক্ষ ছাড়া অন্য কোন প্রমাণ মানেন না। তাঁদের মতে ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও বায়ু এই চারটি ভূতপদার্থ সকল জাগতিক বস্তুর মূল উপাদান। তাঁরা চৈতন্য বা আত্মা বলে কোন স্বতন্ত্র পদার্থ স্বীকার করেন না। ভূতপদার্থগুলির সংমিশ্রণে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় দেহে চৈতন্য জন্মায়। তাই তাঁরা চৈতন্য বিশিষ্ট দেহকে আত্মা বলেন। একে 'ভূতচৈতন্যবাদ' বলে।

চার্বাকগণ জড়বাদী। তাঁদের মতে জীবনের উদ্দেশ্য হল সুখ ভোগ করা। ইন্দ্রিয়লব্ধ সুখ বা দৈহিক সুখই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। জীবনে যতটা বেশি সুখ পাওয়া যায় সে বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি সচেতন হয়ে থাকেন। একথা সত্য যে, পার্থিব জীবনে সুখ পেতে গেলে কিছুটা দুঃখও পেতে হয়। কিন্তু তার জন্য সুখ পরিহার করা অনভিজ্ঞ ব্যক্তির কথা। যেমন কাঁটা থাকে বলে মাছ খাওয়া পরিহার করা মূর্খতা ও ভিক্ষার্থীরা উপদ্রব করতে পারে এরূপ বিরক্তিবশত রন্ধন কার্য পরিহার করা মূঢ়তা, তেমনি দুঃখ সংবদ্ধ সুখকে পরিহার করা মূঢ়তারই পরিচয়। কাজেই অপরিহার্য দুঃখের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি সুখ ভোগ করাই নৈতিকতা। অধিক পরিমাণে সুখভোগ করার জন্য প্রচেষ্টা না করা অনৈতিক। তুল্যভাবে অপরিহার্য দুঃখের পরিমাণ বৃদ্ধি করাও অনৈতিক। কাজেই জীবনে উপকার এবং অপকারের দ্বারাই নৈতিকতা ও অনৈতিকতা নির্ধারিত হয়। যেহেতু দেহ সূক্ষ্ম ভূতপদার্থের দ্বারা গঠিত, সেহেতু দৈহিক বা ইন্দ্রিয়জ সুখই নীতির নির্ধারক। আগামী জীবনে অপার্থিব আনন্দের প্রত্যাশায় এ জীবনে দৈহিক সুখ অনভিজ্ঞ মূঢ় ব্যক্তিরাই পরিহার করেন। আগামী জীবন বলে কিছু নেই। দেহপাতের সাথে সাথেই আত্মা বিনষ্ট হয়। সুতরাং এ জীবনে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে সুখভোগ করাই সার্থক জীবনের পরিচয়। তাই সুখ বৃদ্ধি ও দুঃখ হ্রাসের জন্য বিচক্ষণতার সাথে জীবন পরিচালনা করা আবশ্যক। প্রয়োজন হলে ঋণ বা অন্য উপায়েও সুখ পাওয়ার জন্য সচেষ্ট হওয়া দরকার। তাই চার্বাকগণের নীতিগর্ভ নির্দেশ হল 'যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ'।

সার কথা হল, চার্বাক সুখবাদ স্থূল, ইন্দ্রিয়জ ও দেহকেন্দ্রিক। আত্মসুখই জীবন দর্শনের শেষ কথা। আত্মসন্তোষের জন্য পরের উপকারের কথা যাঁরা বলেন সেটি পরার্থবাদের আকারমাত্র। মূর্খ ব্যক্তিরাই ইন্দ্রিয়জ ও অতীন্দ্রিয় সুখের মধ্যে গুণগতভেদ করে থাকেন।

১.৫.২. গ্রন্থকার মৈত্রের মন্তব্য :

গ্রন্থকার সুশীল কুমার মৈত্র বলেছেন, চার্বাকেরা স্থূলসুখবাদ সমর্থন করতেন কিনা এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। বৃহস্পতি বা অন্য চার্বাক আচার্যগণের যে সব শ্লোক উদ্ধৃত হয় সেগুলোকে একদেশী চার্বাকগণের অতিরঞ্জিত উপহাস বলা চলে। বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থে সুশিক্ষিত ও ধূর্ত চার্বাক সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। গ্রন্থকার মৈত্র মনে করেন, এক শ্রেণীর চার্বাক মার্জিত সুখবাদ স্থাপনের জন্য স্থূল সুখবাদের ওপর কটাক্ষ করেছেন।

১.৫.৩ চার্বাক সুখবাদের সমালোচনা :

ভারতীয় দর্শনের সব কটি শাখাই, বিশেষ করে ন্যায়, সাংখ্য, পূর্বমীমাংসা ও বেদান্ত, চার্বাকগণের স্থূল সুখবাদ খণ্ডন করেছে। স্বাধীন চিন্তা অনুযায়ী যাঁরা জীবনদর্শনের পথ নির্দেশ করেছেন ভারতীয় আস্তিক দার্শনিকগণ তাঁদের দর্শন ও নৈতিকতার মানদণ্ডকে তীব্রভাবে সমালোচনা করেছেন।

কুমারিল ভট্ট মীমাংসাদর্শনে ভাট্টপ্রস্থান প্রবর্তন করেন। তিনি মীমাংসাদর্শনের ১ম অধ্যায়ের ১ম পাদের শবরভাষ্যের ওপর 'শ্লোকবার্ত্তিক' নামে একটি বার্ত্তিকগ্রন্থ লিখেছেন। এ গ্রন্থের চোদনাসূত্রের ভাষ্যে তিনি চার্বাক সুখবাদ খন্ডন করেছেন। তিনি বলেছেন, অনুগ্রহ ধর্মের ও পীড়া অধর্মের লক্ষণ হতে পারে না। নৈতিকতার এরূপ মানদণ্ড মানলে জপ, ধ্যান প্রভৃতি কর্মের অনুষ্ঠানকে ধর্ম ও মদ্যপানাদিকে অধর্ম বলা যাবে না। তাছাড়া, মূর্চ্ছা বা সংজ্ঞাহীন অবস্থায় লোকে ইন্দ্রিয়জ দুঃখ খুব কম অনুভব করে, এই অবস্থায় সুখকে ইন্দ্রিয়জ সুখের চাইতেও ভালো বলে মনে হয়। ইন্দ্রিয়জ সুখের দ্বারাই যদি ধর্ম অর্জিত হয় তাহলে ক্রোশ বা কামবশত গুরুপত্নীর প্রতি অভিগমনও ধর্ম বলে গণ্য হবে। অনেক বলেন, চার্বাক সুখবাদ নৈতিক মানদণ্ড হতে পারে না, যেহেতু সুখ অস্থায়ী এবং দুঃখের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ায় সুখ বিশুদ্ধ নয়।

'সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যে'র প্রণেতা বিজ্ঞানভিক্ষু নানা যুক্তিতে চার্বাক সুখবাদ খণ্ডন করেছেন। তাঁর মতে পার্থিব সুখ কখনও স্থায়ী তৃপ্তি দিতে পারে না। পার্থিব সুখের দ্বারা যে সব জাগতিক উপকার লাভ করা যায় তাও কালের ব্যবধানে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ও পুনরায় দুঃখের অনুবৃত্তি ঘটে। কাজেই পার্থিব সুখের দ্বারা দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটে না। পার্থিব সুযোগ-সুবিধা মানুষকে সাময়িক স্বস্তি দিতে পারে, কিন্তু সময়ের ব্যবধানে ক্ষুধা, তৃষ্ণার মত ব্যক্তি আবার দুঃখ পেয়ে থাকে। বিজ্ঞানভিক্ষু মনে করেন, পার্থিব সুখ তত্ত্বত দুঃখ থেকে ভিন্ন নয়। যেহেতু ঐ সুখের দ্বারা সাময়িক পরিতৃপ্তি ঘটলেও সুখী ব্যক্তি এর দ্বারা অন্যকে বঞ্চিত করে। এ জন্য সে পাপের ভাগী হয়।

সুখ সর্বদা দুঃখসম্পৃক্ত হয় কিনা এ বিষয়ে উদ্যোতকর তাঁর 'ন্যায়বার্ত্তিক' টীকায় বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। 'ন্যায়বার্ত্তিক' হল বাৎস্যায়নভাষ্যের ওপর উদ্যোতকরের লেখা একটি প্রামাণিক টীকা গ্রন্থ। এ গ্রন্থে তিনি সুখ ও দুঃখের মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে তিনটি মত সংকলন করেছেন। কেউ কেউ বলেন, সবই স্বরূপত দুঃখ, স্বরূপত সুখ বলে কিছু নেই। এটি ক্ষণভঙ্গবাদী বৌদ্ধগণের মত। এটি এক প্রকার জাগতিক দুঃখবাদ। উদ্যোতকর এই মতটি পরিহার করেছেন, যেহেতু অভিজ্ঞতালব্ধ সুখকে কেউ প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। কেউ কেউ বলেন, সুখ হল দুঃখবিকল্প অর্থাৎ দুঃখবিশেষ, স্বরূপত সুখ বলে কিছু নেই। উদ্যোতকর এই মতটিও পরিহার করেছেন। স্বরূপত সুখ না মানলে ও সুখকে দুঃখবিশেষ বললে ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট পরিহার এ দু প্রকার প্রবৃত্তি ব্যাখ্যা করা যাবে না। তাছাড়া, নৈতিকতার দৃষ্টিতেও এ পক্ষটি গ্রহণযোগ্য নয়। সুখ দুঃখবিশেষ হলে প্রতিপক্ষ অসম্ভব হওয়ায় নৈতিক উপদেশ নিরর্থক হবে। এ বিষয়ে তৃতীয় পক্ষটি হল, সুখ স্বরূপত আছে, যেহেতু প্রত্যেকেই তা অনুভব করে থাকে। তবে বিশুদ্ধ সুখ বলে কিছু নেই। দুঃখ বিমিশ্রিত সুখই লোকে অনুভব করে। উদ্যোতকর এই পক্ষটি সমর্থন করেছেন। তাঁর মতে দুঃখের মত সুখ স্বরূপত থাকলেও তাদের মধ্যে অবিনাভাব সম্বন্ধ আছে। সুখ ও দুঃখ উভয়ে সমাননিমিত্ততা, সমানাধারতা ও সমানোপলভ্যতা আছে। যে কারণ হতে সুখ উৎপন্ন হয়, সে কারণ হতেই দুঃখ উৎপন্ন হয়। একে 'সমাননিমিত্ততা' বলে। আর যে আধারে সুখ অনুভূত হয়, সেই আধারেই দুঃখ অনুভূত হয়, একে 'সমানাধারতা' বলে। যে মনের দ্বারা সুখের উপলব্ধি হয়, সে মনের দ্বারাই দুঃখের উপলব্ধি হয়। উদ্যোতকর একে 'সমানোপলভ্যতা' বলেছেন। সুতরাং তাঁর মতে বিশুদ্ধ সুখ নেই, সুখ দুঃখানুবিদ্ধ।

১.৬ নীতিনির্ধারণে প্রেয় ও শ্রেয়

উপনিষদের ঋষি ও অদ্বৈতবাদীরা বলতেন, সাধ্য পুরুষার্থই নৈতিকতার মানদণ্ড। পুরুষ যা পেতে চায় তাকে সাধ্য পুরুষার্থ বলে। লৌকিক দৃষ্টিতে সুখ হল সাধ্য পুরুষার্থ আর তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে মোক্ষ হল সাধ্য পুরুষার্থ। একেই পরম পুরুষার্থ বলে। উপনিষদে পার্থিব সুখকে প্রেয় ও মোক্ষকে শ্রেয় বলা হয়েছে। প্রেয়ের প্রয়োজন হল অভ্যুদয়লাভ আর শ্রেয়ের প্রয়োজন হল মুক্তি লাভ। প্রেয় ও শ্রেয় মানুষের ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে। উভয়ের দ্বারা প্রযুক্ত হয়ে লোকে কর্মে প্রবৃত্ত হয়। যিনি শ্রেয়কে অবলম্বন করেন তার চরম কল্যাণ বা নি:শ্রেয়স লাভ হয়। আর যিনি প্রেয়কে বরণ করেন তিনি পরম কল্যাণ বা নিঃশ্রেয়স লাভ থেকে বিচ্যুত হন। প্রেয় ও শ্রেয় উভয়ের আকাঙ্ক্ষাই মানুষের ভেতরে থাকে। উভয়ের মধ্যে শ্রেয় স্বত:পরিপূর্ণ ও কল্যাণস্বভাব। আর প্রেয় হল কেবলমাত্র সুখস্বভাব। শ্রেয় ব্যক্তির পরিতৃপ্তি বা আত্মসন্তোষ বহন করে আর প্রেয় কেবল বিষয়সুখ বা পার্থিব সুখ উৎপাদন করে। পার্থিব সকল সুখই আত্মপ্রীতির আভাস মাত্র। তাই আত্মপ্রীতি হল নৈতিকতার মানদণ্ড। সকল কামনার মূল হল আত্ম কামনা। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ীর কথোপকথনের মধ্যে আত্মপ্রীতিকেই সকল কামনার মূল বলা হয়েছে। উপনিষদের ঋষি বলেছেন, ভার্যা স্বামীকে ভালোবাসে, স্বামীর জন্য নয়, নিজেকে ভালোবাসে বলেই স্বামীকে ভালোবাসে। আবার স্বামী ভার্যার জন্য ভার্যাকে ভালোবাসে না, নিজেকে ভালোবাসে বলেই ভার্যাকে ভালোবাসে। তুল্যভাবে পিতা পুত্রের জন্য পুত্রকে ভালোবাসে না, নিজেকে ভালোবাসে বলেই পুত্রকে ভালোবাসে। এখানে উপনিষদের ঋষি বলতে চেয়েছেন, আত্মপ্রীতি সকল কামনার মূল, কোনও পার্থিব বিষয়কে পাবার ইচ্ছা হল নিজের আত্মার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধির ইচ্ছার আভাস। তবে শ্রেয় এবং প্রেয় মানুষকে ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনে আকর্ষণ করে। লোকে যোগ ও মোক্ষের জন্য প্রেয়কে বরণ করে। প্রার্থিত বস্তুর প্রাপ্তিকে যোগ এবং প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণকে ক্ষেম বলে। প্রেয়ের সাধন অপরাবিদ্যা আর শ্রেয়ের সাধন পরাবিদ্যা। মানুষের মধ্যে শ্রেয় ও প্রেয়কে পাবার আকাঙ্ক্ষা পরস্পর মিশ্রিত হয়ে থাকে। অবিবেকী ব্যক্তি শ্রেয় ও প্রেয়কে পৃথক্ করতে পারে না। শ্রেয় নিত্যসুখ বা প্রেয় অনিত্য সুখ দিয়ে থাকে তা সে বুঝতে পারে না, যেহেতু তাদের বুদ্ধি বাসনার দ্বারা কলুষিত থাকে। এজন্যই সাধারণ মানুষ প্রেয়কে শ্রেয় বলে বোঝে। কিন্তু বিবেকী ব্যক্তি প্রেয় ও শ্রেয় অর্থাৎ অনিত্যসুখ ও নিত্যসুখকে পৃথক্ করে নিয়ে প্রেয় থেকে শ্রেয়কে শ্রেষ্ঠ বলে বরণ করে।

১.৭ সার সংক্ষেপ

নৈতিকতার বিভিন্ন মানদণ্ড এই পাঠে আলোচিত হয়েছে। প্রাচীনকালে ভারতে অনেকে লোকোপদেশ অর্থাৎ দেশাচার ও কুলাচার অনুযায়ী পাপ, পুণ্য, মঙ্গল ও অমঙ্গল প্রভৃতি নির্ধারণ করতেন, যাকে 'লোকোপদেশ' বলা হত। কিন্তু দেশ, কাল ও কুলভেদে আচারে ভেদ থাকায় অন্যেরা নিছক লোকপ্রথাকে মানদণ্ড বলেন নি। অনেকে বলতেন, যে লোকপ্রথা বিষয়ে মানুষের ঐকমত্য আছে সেটিই হবে নৈতিকতার মানদণ্ড, যাকে 'লোকপ্রসিদ্ধি' বলা হত। আবার কেউ কেউ বলেতেন, ঐকমত্য গৌণ, যা মানুষের উপকার ও অপকার করে সেটিই হবে নৈতিক মানদণ্ড। আর এক শ্রেণীর নীতিবিদ্রা বলতেন, যে লোকপ্রথা

মানুষের জীবনের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ সাধন করে উহাই হবে নীতির নির্ধারক। আবার কেউ বলতেন, শাস্ত্রীয় বিধিবাক্যের দ্বারা সমর্থিত ঐকমত্য নীতির মানদণ্ড। অপর শ্রেণীর মতে নীতি নির্ধারণে আচার-ব্যবহারের ভূমিকা গৌণ, মুখ্য ভূমিকা হল সমাজে স্থিতিশীলতা বা সামাজিক কল্যাণ। অন্য এক শ্রেণীর নীতিবিদ্ বলতেন, যার দ্বারা সমাজে নিয়ম-শৃঙ্খলা ও কল্যাণ সাধিত হয়, সেটি হবে নৈতিকতার মানদণ্ড। জড়বাদী চার্বাকেরা বলেন, অপরিহার্য দুঃখের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি সুখ ভোগ করাই নৈতিকতা। উপনিষদে ঋষিরা প্রেয় ও শ্রেয়ের মধ্যে ভেদ করেছেন। প্রেয় হল অনিত্য বিষয়সুখ, আর শ্রেয় হল চরম কল্যাণ যা মানুষের পরিতৃপ্তি বা আত্মপ্রীতি বহন করে। প্রেয় বা পার্থিব সুখ শ্রেয়ের আভাসমাত্র।

১.৮ প্রধান শব্দগুচ্ছ

দেশাচার ও কুলাচার অনুযায়ী ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য প্রভৃতি নির্ধারণ করাকে 'লোকোপদেশ' বলে। এটি এক প্রকার লোকপ্রথা। এ মতে সদাচারই নৈতিকতার পরিচায়ক।

শাস্ত্রোক্ত বিধি :

শাস্ত্রীয় বিধিবাক্য বলতে বোঝায় বেদোক্ত বিধিবাক্য। এরূপ বিধি সমাজে লোকপ্রথার ঐকমত্যের ভিত্তি। এর দ্বারা সুকর্ম-কুকর্ম, নৈতিক-অনৈতিক কর্ম, পাপ-পুণ্য নির্ধারিত হয়।

লোকস্থিতি :

সমাজে স্থিতিশীলতা বা সামাজিক কল্যাণকে 'লোকস্থিতি' বলে। লোকস্থিতি নীতির মানদণ্ড। এ মতে নৈতিক বিধি-নিষেধের দ্বারাই সমাজে স্থিতিশীলতা সম্ভব। সমাজের স্থিতিশীলতার জন্য প্রচলিত আচার-ব্যবহারের নৈতিক সমর্থন থাকা অপেক্ষিত।

শ্রেয় ও প্রেয় :

পার্থিব বা বিষয়সুখকে প্রেয় ও অপার্থিব পরম কল্যাণকে শ্রেয় বলে। প্রেয় অনিত্য সুখ ও শ্রেয় নিত্য সুখ। প্রেয় যোগ ও ক্ষেমকে নিয়ে আসে আর শ্রেয় আত্মপ্রীতি নিয়ে আসে। অবিবেকী ব্যক্তি প্রেয়কে আর বিবেকী ব্যক্তি শ্রেয়কে বরণ করে।

১.৯ নমুনা-প্রশ্নাবলী :

Essay Type

1. Explain Carvaka Hedonism and criticize it after S. K. Maitra.

Short Type

1. Write a comprehensive note on Censensus (Lokaprasiddhi) as a Moral Standard.
2. Write a note on Tradition (Lokopadesa) as a Moral Standard.

১.১০ গ্রন্থপঞ্জী :

Maitra S. K. : *The Ethics of the Hindus*, The University of Calcutta, Calcutta (1963)

... **কঠোপনিষদ**, ১।২।১-৪, **উপনিষদ্‌গ্রন্থাবলী**, ১ম ভাগ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা (১৯৮৭)

ইউনিট - ২ ঃ ন্যায় ও শংকরের দর্শনে মোক্ষ

পাঠপরিকল্পনা

২.১ প্রাক্‌কথন

২.২ পাঠের উদ্দেশ্য

২.৩ দুঃখ ও তার প্রকারভেদ

২.৩.১ দুঃখের স্বরূপ

২.৩.২ দুঃখের প্রকারভেদ

২.৪ ন্যায় দর্শনে মোক্ষ

২.৪.১ ন্যায়শাস্ত্র পাঠের অধিকারী

২.৪.২ ন্যায় মতে মোক্ষের স্বরূপ

২.৪.৩ ন্যায়মতে নিঃশ্রেয়স লাভের ক্রম

২.৪.৪ আনন্দমোক্ষবাদের স্বরূপ ও তার খন্ডন

২.৫ শংকরের মতে মোক্ষের স্বরূপ ও মোক্ষের সাধন

২.৫.১ অদ্বৈতমতে বেদান্তপাঠের অধিকারী

২.৫.২ শংকরের মতে মোক্ষের স্বরূপ

২.৫.২.১ স্বস্বরূপাবস্থিতিই মোক্ষ

২.৫.২.২ বদ্ধাবস্থা ও মুক্তাবস্থার ভেদ

২.৬ সারসংক্ষেপ

২.৭ প্রধান শব্দগুচ্ছ

২.৮ নমুনা-প্রশ্নাবলী

২.৯ গ্রন্থপঞ্জী

২.১ প্রাক্‌কথন

লোকে যা কামনা করে তাকে পুরুষার্থ বলে। তাই কাম হল পুরুষার্থ। কাম পরিপূরণের উপায় বা সাধনকেও পুরুষার্থ বলা হয়। কাম চরিতার্থের জন্য প্রয়োজন ধর্ম ও অর্থ। কাজেই ধর্ম ও অর্থ হল সাধন পুরুষার্থ এবং কাম সাধ্য পুরুষার্থ। এটি হল লৌকিক দৃষ্টি। 'আমার সুখ হোক্' বা 'আমার দুঃখ না হোক্' এটি প্রাণীমাত্রই চায়। সাংসারিক জীবনে লোকে আপাত সুখ বা দুঃখের সাময়িক অভাবের দ্বারা পরিতৃপ্ত হলেও তত্ত্ববুভুৎসুর লক্ষ্য এরূপ সীমিত সুখ বা দুঃখের সাময়িক অভাব নয়। তাঁরা চান অনন্ত সুখ বা দুঃখের আত্যন্তিক নাশ। এটি হল মোক্ষ নামে পরম পুরুষার্থ। মুক্তি, কৈবল্য, নির্বাণ প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দ মোক্ষের সমার্থক।

ভারতীয় দর্শনের সব কটি শাখাই মোক্ষের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্বদ্ধ। মোক্ষ সকল সম্প্রদায়ের লক্ষ্য হলেও মোক্ষের স্বরূপ নিয়ে বাদীগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কারও মতে অনন্ত সুখ প্রাপ্তি মুক্তি। কারও মতে দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশ হল মুক্তি। কেউ আবার স্বস্বরূপে অবস্থিতিকে মুক্তি বলেন। কারও মতে মুক্তি হল মহানির্বাণ। কেউ বলেন, মুক্তি হল কৈবল্যপ্রাপ্তি। কারও মতে সালোক্যপ্রাপ্তি মুক্তি। কেউ আবার সাযুজ্যকে মুক্তি বলেন। কেউ ব্রহ্মপ্রাপ্তিকে মুক্তি বলেন। কেউ অজ্ঞান নিবৃত্তিকে মুক্তি বলেন। মুক্তি সম্পর্কে এরূপ মতবৈষম্য থাকলেও বন্ধনিবৃত্তি প্রত্যেকেরই অভিপ্রেত।

২.২ পাঠের উদ্দেশ্য

অদ্বৈত বেদান্তকে 'মোক্ষশাস্ত্র' বলে। এ মতে তত্ত্বজ্ঞানের ফলে মোক্ষলাভ হয়। ন্যায়দর্শনকে 'প্রমাণশাস্ত্র' বলা হয়। এ দর্শনটিও ষোলটি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানের মাধ্যমে পরম্পরাক্রমে মুক্তি স্বীকার করেছে। মুক্তি উভয় দর্শনের লক্ষ্য হলেও মুক্তির স্বরূপ নিয়ে এদের মধ্যে মতভেদ আছে। দুঃখের স্বরূপ, মুখ্য ও গৌণ দুঃখ, ন্যায় ও বেদান্ত পাঠের অধিকারী এবং ন্যায় ও শংকরের দর্শনে মোক্ষের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা - এ পাঠের উদ্দেশ্য।

২.৩ দুঃখ ও তার প্রকারভেদ

২.৩.১ দুঃখের স্বরূপ

মূল

বাধনালক্ষণং দুঃখম্। (ন্যায়সূত্র ১.১.২১)

অনুবাদ

(সকল প্রমেয় পদার্থই) দুঃখের সঙ্গে অনুষক্ত হওয়ায় দু:খ (বলে বুঝতে হবে)।

মূল

বাধনা পীড়া তাপ ইতি। তয়াহনুবিদ্ধমনুষক্তমবিনির্ভাগেণ বর্ত্তমানং দু:খযোগাদ্দু:খমিতি। (তদেব, ব্যৎস্যায়নভায্য)

অনুবাদ

বাধনা শব্দের অর্থ পীড়া, তাপ। তার সঙ্গে (ঐ ভাবনার সঙ্গে) অনুবিদ্ধ অর্থাৎ অনুযক্ত নিয়ত সম্বন্ধবিশিষ্ট হয়ে বর্ত্তমান (দেহ প্রভৃতি সকল প্রমেয়) (মুখ্য) দু:খের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় দু:খ (বলে কথিত হয়)।

মহর্ষি গৌতম ন্যায় দর্শনে বাধনাকে দুঃখ বলেছেন। পীড়া ও তাপকে ‘বাধনা’ বলে। যা প্রতিকূলরূপে বেদনীয় তাকে দুঃখ বলে। দুঃখ সকল জীবেরই পরিচিত। সূত্রকার গোতম দুঃখের অনুযঙ্গরূপ সম্বন্ধ যাতে আছে তাকেও দুঃখ বলেছেন। শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব ও ফল এ নয়টি প্রমেয়পদার্থ দুঃখানুযক্ত বলে দুঃখ।

২.৩.২ দুঃখের প্রকারভেদ

বার্ত্তিককার উদ্যোতকর ২১ প্রকার দুঃখ, স্বীকার করেছেন। যেমন ছ' প্রকার ইন্দ্রিয়, এদের গ্রাহ্য ছ' প্রকার বিষয়, ছ' প্রকার প্রত্যক্ষজ্ঞান, শরীর, সুখ ও দুঃখ। এদের মধ্যে দুঃখকে মুখ্য দুঃখ বলা হয়। পূর্বোক্ত ২০ টি দুঃখের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় গৌণভাবে দুঃখ পদবাচ্য। কাজেই দুঃখ প্রধানত দ্বিবিধ-মুখ্য দুঃখ ও গৌণ দুঃখ। শরীর দুঃখের আয়তন বলে দুঃখ। ইন্দ্রিয়সমূহ, তাদের বিষয় ও ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান দু:খের সাধন হওয়ার তাদেরকে দু:খ বলে। সুখ দু:খানুযঙ্গ হওয়ায় তাকে গৌণভাবে দু:খ বলা হয়। যা স্বরূপত দু:খ তাকে মুখ্য দু:খ বলে। এজন্য নৈয়ায়িকগণ প্রমেয় পদার্থের মধ্যে দু:খের উদ্দেশ করেছেন, সুখের উদ্দেশ করেন নি। কিন্তু সুখ সকলেরই মানস প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কোন সুখই দু:খসম্বদ্ধশূন্য নয়। সুখের পূর্বে ও পরে অবশ্যই দু:খ থাকে। কাজেই মুমুক্ষু ব্যক্তিরা সুখকেও দু:খ বলে ভাবনা করেন।

হীন, মধ্যম ও উৎকৃষ্ট ভেদেও দু:খের ভেদ করা হয়। নরকবাসী গণের দু:খকে উৎকৃষ্ট, পশুদের দু:খকে মধ্যম ও মনুষ্যদের দু:খকে হীন বলা হয়। দেবতা ও বীতরাগ মানুষের দু:খ হীনতর।

২.৪ ন্যায় দর্শনে মোক্ষ

২.৪.১ ন্যায়শাস্ত্র পাঠের অধিকারী

যে ব্যক্তির ফলভোগের অধিকার থাকে তারই কর্মে অধিকার থাকে। কোন গ্রন্থপাঠে সেই ব্যক্তির অধিকার থাকে যে ঐ গ্রন্থের ফল চায়। ন্যায়শাস্ত্র পাঠের দু প্রকার প্রয়োজন দেখা যায় -একটি লৌকিক নি:শ্রেয়স, অপরটি পরম নি:শ্রেয়স অর্থাৎ অপবর্গ। সকল শাস্ত্রে অধ্যেতা ন্যায়শাস্ত্র পাঠের গৌণ অধিকারী। এজন্য ন্যায়শাস্ত্রকে সকল শাস্ত্রের প্রদীপ স্বরূপ বলা হয়েছে। গৃহ্য, শ্রৌত প্রভৃতি সকল ধর্মের অনুষ্ঠাতারা ন্যায়শাস্ত্র পাঠের গৌণ অধিকারী। মোক্ষার্থী ব্যক্তি ন্যায়শাস্ত্র পাঠের মুখ্য অধিকারী। কোনও কোনও নৈয়ায়িক বলেন, যিনি দু:খের আত্যন্তিক বিয়োগ চান, তিনি ন্যায়শাস্ত্র পাঠের যোগ্য অধিকারী। নব্য নৈয়ায়িক গঙ্গেশ বলেন, যিনি সুখ ও দু:খ উভয়ই পরিহার করতে চান তিনি ন্যায়শাস্ত্র পাঠের মুখ্য অধিকারী।

২.৪.২ ন্যায়মতে মোক্ষের স্বরূপ

মূল

তদত্যন্তবিমোক্ষোঽপবর্গ:। (ন্যায়সূত্র ১.২.২২)

অনুবাদ

তার সঙ্গে (মুখ্য ও গৌণ সকল প্রকার দু:খের সঙ্গে) অত্যন্ত বিয়োগ অপবর্গ।

মূল

তেন দু:খেন জন্মনাঽত্যন্তং বিমুক্তিরপবর্গ:।

কথম্? উপাত্তস্য জন্মনো হানমন্যস্য চানুপাদানম্।

এতামবস্থামপর্যন্তামপবর্গং বেদয়ন্তেঽপবর্গবিদ:। (তদেব, বাৎস্যায়নভাষ্য)

অনুবাদ

সেই জন্মরূপ দু:খের সঙ্গে আত্যন্তিক বিয়োগ (হল) অপবর্গ। (ইহা) কিরূপ? গৃহীত জন্মের ত্যাগ ও অন্য জন্মের অগ্রহণ। এরূপ অবধিশূন্য অবস্থাকে অপবর্গবিদ্‌গণ অপবর্গ বলে জানেন।

সূত্রকার মহর্ষি গোতম সকল দু:খের অত্যন্ত বিমুক্তিকে অপবর্গ বলেছেন। মোক্ষ ও অপবর্গ সমার্থক শব্দ। তাঁর মতে মোক্ষ হল পরম নিঃশ্রেয়স। মুক্তিদশায় শরীর প্রভৃতির ত্যাগ ও পুনর্গ্রহণের সমাপ্তি হয়। প্রলয়কালেও জীবের কোন দু:খভোগ হয় না, যেহেতু তখন জীবের শরীরাদি থাকে না। কিন্তু প্রলয় অবস্থা মুক্ত অবস্থা নয়। তাই ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলেছেন, মুক্তিতে জীবের সকল দু:খের সর্বতোভাবে অবসান হয়। কিন্তু প্রলয়কালে জীবের দু:খের অবসান ঘটলেও তাকে দু:খের চিরনিবৃত্তি বলা যায় না। কারণ পুনরায় যখন সৃষ্টি শুরু হয়, তখন জীব অদৃষ্ট অনুযায়ী শরীরাদি ধারণ করে ও নানা দু:খ ভোগ করে। কাজেই প্রলয়কালীন জীবের পুনরায় জন্ম হয়, কিন্তু মুক্ত জীবের জন্ম হয় না। প্রলয়কালীন দু:খশূন্যতার সীমা আছে, কিন্তু মোক্ষে দু:খ শূন্যতার সীমা নেই। মোক্ষ হলে জীবের পুনরাবৃত্তি হয় না।

ন্যায়সূত্রবৃত্তির প্রণেতা বিশ্বনাথের মতে মোক্ষ দু:খের আত্যন্তিক নিবৃত্তি। সকল প্রাণী যাকে মনের দ্বারা প্রতিকূল বলে অনুভব করে তাকে মুখ্য দু:খ বলে । মুখ্য দু:খের চিরতরে বিনাশই অপবর্গ। কিন্তু ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের মতে মুখ্য দু:খ ও শরীরাদি গৌণ দু:খের আত্যন্তিক বিয়োগ হল অপবর্গ। এ জন্মের ত্যাগ ও অন্য জন্মের পুনরায় অগ্রহণকে জন্মরূপ দু:খের অত্যন্ত বিয়োগ বলা হয়। সুতরাং বাৎস্যায়নের মতে শরীর প্রভৃতি সকল প্রকার দু:খশূন্য স্বরূপাবস্থানই অপবর্গ।

মূল

তদভয়মজরমমৃত্যুপদং ব্রহ্ম ক্ষেমপ্রাপ্তিরিতি। (তদেব, বাৎস্যায়নভাষ্য)

অনুবাদ

উহা (জীবের পূর্বোক্তি মুক্ত অবস্থা) অভয়, অজর, অমৃত্যুপদ, ব্রহ্ম ক্ষেমপ্রাপ্তি।

ভাষ্যকার জীবের মুক্ত অবস্থাকে অভয়, অজর, অমৃত্যুপদ, ব্রহ্ম ও ক্ষেমপ্রাপ্তি বলেছেন। নির্বাণলাভের পর জীবের সংসারভয় থাকে না। নির্বাণমুক্তির কখনও কোন পরিবর্তন না হওয়ায় একে 'অজর' বলা হয়। নৈয়ায়িকগণ মুক্তিকে চিত্তের চিরনির্বাণ বলেন না। কাজেই ন্যায় মতে অপবর্গ প্রদীপের নির্বাণের তুল্য নয়। মুক্ত জীবাত্মার নির্বাণমুক্তি হলেও তার চিত্তের নাশ হয় না। এজন্য ভাষ্যকার মুক্ত অবস্থাকে 'অমৃত্যুপদ' বলেছেন। ব্রহ্ম অমৃত্যুপদ। ব্রহ্মের সঙ্গে অপবর্গের সাদৃশ্য আছে -একথা বোঝানোর জন্য তাকে অমৃত্যুপদ বলা হয়। এরূপ মুক্তিপ্রাপ্তিকে ভাষ্যকার 'ক্ষেমপ্রাপ্তি' বলেছেন। ভাষ্যকারের মতে মুক্ত জীবাত্মা কখনই ব্রহ্ম হন না, কিন্তু ব্রহ্মের সঙ্গে তার পরম সাদৃশ্য লাভ হয়।

২.৪.৩ ন্যায়মতে নি:শ্রেয়স লাভের ক্রম

মূল

যদা তু তত্ত্বজ্ঞানান্মিথ্যাজ্ঞানমপৈতি, তদা মিথ্যাজ্ঞানাপায়ে দোষা অপযন্তি,
দোষাপায়ে প্রবৃত্তিরপৈতি, প্রবৃত্ত্যপায়ে জন্মাপৈতি, জন্মাপায়ে দু:খমপৈতি,
দু:খাপায়ে চাত্যন্তিকোহপবর্গো নি:শ্রেয়সমিতি। (ন্যায়সূত্র ১.১.২, বাৎস্যায়নভাষ্য)

অনুবাদ

যখন তত্ত্বজ্ঞান হতে মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্ত হয়, তখন মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তিতে (তার কার্য) রাগাদি দোষ নিবৃত্ত হয়, দোষের নিবৃত্তিতে (ধর্মাধর্মরূপ) প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হয়, প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হলে জন্ম নিবৃত্ত হয়, জন্মের নিবৃত্তিতে দু:খের নিবৃত্তি হয় এবং দু:খের (আত্যন্তিক) নিবৃত্তি হলে আত্যন্তিক অপবর্গরূপ নি:শ্রেয়স লাভ হয়।

ন্যায় মতে প্রমাণ, প্রমেয় প্রভৃতি ষোলটি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানের ফলে নি:শ্রেয়স লাভ হয়। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা সাক্ষাৎ অপবর্গ প্রাপ্তি হয় না। ন্যায়সূত্রকার গোতম তত্ত্বজ্ঞান ও অপবর্গ প্রাপ্তির মধ্যে ক্রম স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে দু:খের কারণ জন্ম, জন্মের কারণ প্রবৃত্তি (অর্থাৎ কায়িক, বাচিক ও মানসিক শুভ ও অশুভ কর্ম অর্থাৎ ধর্ম ও অধর্ম), প্রবৃত্তির কারণ দোষ অর্থাৎ রাগ, দ্বেষ ও মোহ ও দোষের কারণ মিথ্যাজ্ঞান। মিথ্যাজ্ঞান আবার নানা প্রকার হয়। তত্ত্বজ্ঞান হলে সকল প্রকার মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্ত হয়। এর

ফলে মিথ্যাজ্ঞানের কার্য রাগাদি দোষ নিবৃত্ত হয়। দোষ সমূহ নিবৃত্ত হলে তাদের কার্য ধর্মাধর্মরূপ প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হয়। প্রবৃত্তির নিবৃত্তিতে জন্মের নিবৃত্তি হয়। জন্মের নিবৃত্তিতে দু:খের নিবৃত্তি ঘটে। এ ভাবে তত্ত্বজ্ঞান পরম্পরাক্রমে দু:খের অত্যন্ত বিয়োগের হেতু হয়।

ন্যায় মতে মুক্তি দু প্রকার- অপর নি:শ্রেয়স ও পর নি:শ্রেয়স। তত্ত্বজ্ঞানের ফলে শরীর থাকাকালীন জীবের যে মুক্তি ঘটে তাকে অপর নি:শ্রেয়স বলা হয়। কেউ কেউ একে জীবন্মুক্তি বলেন। আর তত্ত্বজ্ঞানীর প্রারব্ধ কর্ম ভোগের পর শরীরপাত হলে পর নি:শ্রেয়স লাভ হয়। একে বিদেহ মুক্তি বলা হয়।

২.৪.৪ আনন্দমোক্ষবাদের স্বরূপ ও তার খন্ডন

মূল

নিত্যং সুখমাত্মনো মহত্ত্বন্মোক্ষেহভিব্যজ্যতে,

তেনাভিব্যক্তেনাত্যন্তং বিমুক্ত: সুখী ভবতীতি কেচিন্মন্যন্তে।

অনুবাদ

আত্মার মহৎ পরিমাণের ন্যায় (আত্মার) নিত্যসুখ মোক্ষদশায় অভিব্যক্ত হয়। ঐ অভিব্যক্ত নিত্যসুখের দ্বারা বিমুক্ত (আত্মা) অত্যন্ত সুখী হন একথা কেউ কেউ স্বীকার করেন।

মুক্তিকালে মুক্ত জীবের কোনরূপ দু:খ অনুভব হয় না - এ বিষয়ে সকল দার্শনিক একমত। কিন্তু ওই সময় মুক্ত জীবের সুখানুভব হয় কিনা এ বিষয়ে দার্শনিকদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। কেউ কেউ বলেন, নিত্যসুখের অভিব্যক্তি হল মুক্তি। এটি ভাট্ট মত বলে পরিচিত। কিন্তু কুমারিল ভট্ট এ মতটি উল্লেখ করেছেন ও খন্ডন করেছেন। কাজেই এটি কুমারিল ভট্টের মত নয়। কুমারিল ভট্টের পূর্বে তুতাত ভট্ট নামে একজন প্রাচীন মীমাংসক ছিলেন। মুক্তিতে নিত্য সুখের অনুভব হয় একথা তিনি স্বীকার করতেন। এজন্য তাকে 'আনন্দমোক্ষবাদী' বলা হয়। শুধু প্রাচীন মীমাংসক নন, এক শ্রেণীর প্রাচীন নৈয়ায়িক মুক্তিতে নিত্যসুখের অনুভব মানতেন। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের পূর্বে এরূপ ন্যায়মত প্রচলিত ছিল। ভাসর্বজ্ঞ ন্যায়সার গ্রন্থে এ মতটি সমর্থন করেছেন। তাঁদের দৃষ্টিতে নিত্যসুখের অনুভব বিশিষ্ট দু:খের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হল অপবর্গ।

মূল

তেষাং প্রমাণাভাবাদনুপপত্তি:। ন প্রত্যক্ষং নানুমানং নাগমো

বা বিদ্যতে, নিত্যং সুখমাত্মনো মহত্ত্বন্মোক্ষেহভিব্যজ্যত ইতি।

(ন্যায়সূত্র ১.১.২২, বাৎস্যায়নভাষ্য)

প্রমাণের অভাববশত: তাদের (উক্ত মতের) উপপত্তি হয় না। মহৎ পরিমাণের ন্যায় মোক্ষে আত্মার নিত্য সুখ অভিব্যক্ত হয় এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই, অনুমান প্রমাণ নেই বা আগমপ্রমাণও নেই।

ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন ন্যায়সূত্রের ভাষ্যে এই মত খন্ডন করেছেন। তাঁর মতে মুক্তিদশায় মুক্ত জীবের নিত্য সুখের অনুভূতি হয় - এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ, কিংবা অনুমান বা কোন আগমবাক্য নেই। মোক্ষকালে জীবের সুখানুভব থাকে না। বস্তুত কোন সুখই সর্বতোভাবে দু:খসম্বন্ধশূন্য হয় না। আনন্দমোক্ষবাদীরা বলেন, সর্বব্যাপী জীবাত্মায় নিত্যসুখ থাকলেও সংসারদশায় তার অনুভূতি হয় না, কেবল মুক্তিকালেই তার অনুভূতি হয়। এ মতের খন্ডনে ভাষ্যকার বলেছেন, অভিব্যক্তি বলতে এখানে জ্ঞানকেই বুঝতে হবে। ওই জ্ঞান নিত্য, কি অনিত্য তা বিচার করা দরকার। যদি আনন্দমোক্ষবাদীরা ওই জ্ঞানকে নিত্য বলেন তবে মুক্ত আত্মার সঙ্গে সংসারী জীবের কোন ভেদ থাকবে না। যেহেতু এ মতে মুক্তি ও সংসার উভয়কালেই জীব নিত্যসুখ অনুভব করে। এর ফলে সংসারী জীবও নিত্য সুখের ভোগী হবে। আর যদি নিত্যসুখের অভিব্যক্তিকে অনিত্য বলা হয় তাহলে তার উৎপত্তির হেতু মানতে হবে। কেবল আত্ম-মন:সংযোগকে নিত্যসুখানুভবের হেতু বলা যাবে না, এর সহকারী কারণ স্বীকার করতে হবে। ধর্মকে নিত্য সুখানুভবের সহকারী কারণ বললে ঐ ধর্মের কারণও বলতে হবে। যোগজ সমাধিকে ধর্মের সহকারী কারণ স্বীকার করলে যোগজ সমাধির সমাপ্তির সাথে সাথে ধর্মও থাকবে না, যেহেতু সকল প্রকার ধর্মই চরম ফলের দ্বারা বিনষ্ট হয়ে থাকে। কাজেই ঐ ধর্ম সম্পূর্ণ ক্ষয়প্রাপ্ত হলে নিত্যসুখের অনুভবও নিবৃত্ত হবে। মুক্তিতে যদি নিত্যসুখের কোন অনুভব না থাকে তাহলে বিদ্যমান নিত্যসুখের সঙ্গে অনিত্য সুখের কোন ভেদ থাকবে না। এজন্য মোক্ষে নিত্যসুখের অভিব্যক্তি হয় একথা বাৎস্যায়ন মানেন না।

২.৫ শংকরের মতে মোক্ষের স্বরূপ ও মোক্ষের সাধন

২.৫.১ অদ্বৈতমতে বেদান্তপাঠের অধিকারী

গ্রন্থ চার প্রকার - কাব্য, শাস্ত্র, কাব্যশাস্ত্র ও শাস্ত্রকাব্য। শাস্ত্রকার গণ যখন 'শাস্ত্রগ্রন্থ' লেখেন, তখন বিশেষ পাঠককে উদ্দেশ্য করেই তাঁরা গ্রন্থ রচনা করেন। যে গ্রন্থে কোন বিশেষ মতবাদ স্থাপন করা হয় কিংবা কোন উপদেশ দেওয়া হয় তাকে শাস্ত্রগ্রন্থ বলে। সকল পাঠক শাস্ত্রগ্রন্থ পড়তে আগ্রহী হন না। তাছাড়া, অনুপযুক্ত পাঠক শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করুক্ এটা শাস্ত্রপ্রণেতারাও চান না। এজন্য শাস্ত্রকারেরা শাস্ত্রের শুরুতে গ্রন্থটি পাঠের অধিকারী কে হবেন, গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ই বা কি, গ্রন্থ পাঠে ফল কি ও গ্রন্থের সাথে ফলের সম্বন্ধ কিরূপ এ বিষয়ে আলোকপাত করে থাকেন। এ চারটিকে একত্রে 'অনুবন্ধচতুষ্টয়' বলে। অনুবন্ধচতুষ্টয়ের জ্ঞান না থাকলে পাঠকের শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠে আগ্রহ জন্মায় না।

অদ্বৈতবেদান্তীরা বলেন, মুমুক্ষব্যক্তি বেদান্ত পাঠের যোগ্য অধিকারী। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য - এ তিনটি বর্ণেরই উপনয়নে অধিকার। উপনীত ত্রৈবর্ণিককে ছটি বেদাঙ্গের সঙ্গে নিয়মিত ভাবে নিয়মপূর্বক বেদাধ্যয়ন করতে হয়। বেদাধ্যয়ন হতে বেদবাক্যের আপাত অর্থ সে অধিগত করে। এরপর বিভিন্ন কর্ম সম্বন্ধে তার জ্ঞান জন্মায়। এদের মধ্যে কাম্যকর্ম ও নিষিদ্ধকর্মকে পরিহার করে সে নিত্য, নৈমিত্তিক, উপাসনাত্মক ও

প্রায়শ্চিত্ত কর্ম অনুষ্ঠান করে। এ কর্মগুলি ব্রহ্মচারীর কর্তব্য আশ্রমকর্ম। এ কর্তব্যকর্ম নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত হলে শিক্ষার্থীর চিত্ত নির্মল হয়। ঐ নির্মলচিত্ত শিক্ষার্থীর তখন ব্রহ্মই একমাত্র নিত্য, অন্য সব অনিত্য এই ভেদজ্ঞান হয়। এর ফলে তার ঐহিক ও পারত্রিক সকল ফলভোগের প্রতি বৈরাগ্য জন্মায়। শিক্ষার্থীর চিত্তে বৈরাগ্য জাগলে চিত্ত শান্ত হয়। অন্তরিন্দ্রিয়ের এরূপ সংযমকে 'শম' বলে। মন সংযত হলে বহিরিন্দ্রিয়গুলিও সংযত হয়। জিতেন্দ্রিয় ঐ পাঠক তখন ফলাকাঙ্খা পরিহার করে কর্ম করে। এ সময়ে তার শীত, গ্রীষ্ম, প্রভৃতি দ্বন্দ্বে সহিষ্ণুতা জন্মায়। এরপর গুরু ও বেদাদিবাক্যে তার গভীর শ্রদ্ধা আসে। তখন তার চিত্তে একাগ্রতা জন্মায়। এর পর মুক্তির জন্য প্রবল ইচ্ছা জাগে। একে 'সাধনচতুষ্টয়' বলে। এরূপ মুমুক্ষু ব্যক্তি অদ্বৈতমতে বেদান্ত পাঠের অধিকারী।

শংকর ও তার অনুগামী বেদান্তীরা বলেন, বেদবিহিত কর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা বেদান্তপাঠের অধিকারীকে প্রথমে সামাজিক কর্তব্য পালন করতে হয়। নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হলে বেদান্ত পাঠে অধিকার আসে না। নৈতিক শিক্ষালাভের পর শিক্ষার্থীকে অধ্যাত্ম শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হয়। কাজেই সাধনচতুষ্টয় সম্পন্ন বেদান্তপাঠের অধিকারী আচারবান ও অধ্যাত্মজ্ঞানবান হবেন এটি অদ্বৈত বেদান্তীর বক্তব্য।

২.৫.২ শংকরের মতে মোক্ষের স্বরূপ

২.৫.২.১ স্বস্বরূপাবস্থিতিই মোক্ষ

আচার্য শংকর নির্গুণ অদ্বৈতবাদের প্রধান প্রবর্তক। তাঁর দর্শনকে ঔপনিষদ্ দর্শনও বলে। মুখ্যত উপনিষদ্ বাক্যকে উপজীব্য করে শংকর তাঁর অদ্বৈতবেদান্তদর্শন প্রণয়ন করেন। তাঁর মতে নির্গুণ, নির্বিকার, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম একমাত্র সত্য বস্তু। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের স্বরূপ। ব্রহ্মের সৎ-স্বরূপতা, চিৎ-স্বরূপতা ও আনন্দ-স্বরূপতা মূলত অভিন্ন। এক ব্রহ্ম অনাদি অজ্ঞানের প্রভাবে নানারূপে প্রতিভাত হন। দৃশ্যমান নামরূপ জগতের নিজস্ব স্বরূপ এটি মায়ার খেলা। শংকর জগতের পারমার্থিক সত্তা না মানলেও ব্যবহারিক সত্তা মানেন। এজন্য তাঁর দর্শনে জাগতিক রীতি-নীতি ও নৈতিকতা সংসারদশায় সমর্থিত হয়েছে। মুমুক্ষুব্যক্তি বেদান্ত অধ্যয়নের ফলে যখন জাগতিক নীতিবোধ হতে অতিজাগতিক নীতিবোধে উন্নীত হন, তখন মুক্ত পুরুষ ভেদের মধ্যে অভেদ দর্শন করেন। এটি বেদান্তের তাত্ত্বিক স্তর - মূল্যবোধের সর্ব্বোচ্চভূমি। একে মোক্ষাবস্থা বলে।

মূল

সম্পদ্যার্বিভাব: স্বেন শব্দাৎ । (ব্রহ্মসূত্র ৪.৪.১)

অনুবাদ

(স্বপ্রকাশ আত্মাকে আত্মরূপে সাক্ষাদ্ভাবে) অনুভব করে (তত্ত্বার্থী ব্যক্তির আত্মস্বরূপের) অভিব্যক্তি হয়, যেহেতু ('স্বস্বরূপে অভিব্যক্তি হন') এই শ্রুতিবাক্যে 'স্ব' শব্দ প্রযুক্ত হয়েছে।

মূল

কেবলেন এব আত্মনা আবির্ভবতি, ন ধর্মান্তরেণ ইতি।
কুত:? ''স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে'', ইতি স্বশব্দাৎ।
অন্যথা হি স্বশব্দেন ইতি বিশেষণম্ অনবকঌপ্তং
স্যাৎ। (তদেব, শাংকর ভাষ্য)

অনুবাদ

(মোক্ষাবস্থায় জীব) কেবল আত্মস্বরূপে আবির্ভূত হন, (দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি) অন্য (আগন্তক) ধর্মযুক্তরূপে নয়। (মোক্ষ অনাগন্তুক) কি প্রকারে হবে? যেহেতু ''স্বস্বরূপে অভিব্যক্ত হন'' এরূপ (অনাগন্তুকতার বোধক) স্ব-শব্দের প্রয়োগ আছে। অন্য প্রকার হলে (অর্থাৎ মোক্ষ দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি বিশেষ ধর্মযুক্ত হলে) স্ব শব্দের দ্বারা বিশেষিত করা অসঙ্গত হয়ে পড়বে।

ব্রহ্মসূত্রকার মহর্ষি বাদরায়ণ ছান্দোগ্য শ্রুতিবাক্য ভিত্তি করে 'সম্পদ্যার্বিভাব: স্বেন শব্দাৎ' এ সূত্রটি রচনা করেছেন। ছান্দোগ্য শ্রুতিবাক্যটি হল - 'এবমেবৈষ সম্প্রসাদোহস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে' অর্থাৎ এ সুষুপ্ত জীব এ স্থূল শরীর হতে উত্থিত হয়ে, স্থূল শরীরে 'অহং' অভিমান পরিত্যাগ করে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়ে স্বস্বরূপে অবস্থান করেন। উক্ত ব্রহ্মসূত্র ও শ্রুতিবাক্য অবলম্বনে শংকর দেখিয়েছেন, জীবাত্মার স্বস্বরূপে অবস্থিতিই হল মোক্ষ। এখানে সংশয় হতে পারে, জীব যেমন দেবলোক প্রভৃতির উপযোগী শরীর ধারণ করে সেরূপ মুক্তপুরুষও আগন্তুক কোন শরীর ধারণ করেন অথবা আত্মস্বরূপেই অভিব্যক্ত হন। এরূপ সংশয় নিরসনের জন্য শংকর তাঁর ভাষ্যে বলেছেন, মোক্ষে জীব নিজস্বরূপ প্রাপ্ত হন। স্বরূপ প্রাপ্তি বলার অর্থ এ নয় যে, জীব মোক্ষে আগন্তুক কোন ধর্ম লাভ করে। যেটি যার স্বরূপ সেটি তাতে সর্বদা বর্তমান থাকে। জীবের স্বরূপ জীবে নিত্য বর্ত্তমান থাকলেও অজ্ঞানের ফলে সংসার দশায় তা তিরোহিত বলে মনে হয়। মোক্ষে অজ্ঞানের আবরণ অপসারিত হলে জীবের স্বরূপ আবির্ভূত হয় এ কথা বলা হয়। কিন্তু তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে আর্বিভাব ও তিরোভাব দুই-ই ভ্রান্তি। তবে স্বরূপের উপলব্ধি হলে জীব বন্ধন হতে মুক্ত হন ও নিজের স্বরূপে অবস্থান করেন। এজন্য বন্ধনের নিবৃত্তি হলেই মোক্ষ হয়। তাতে কোন নতুন কিছু লাভ হয় না। বন্ধন কেটে গেলেই স্বরূপবোধ আবির্ভূত হয়। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা বন্ধের নিবৃত্তি হলে মোক্ষ হয় বলে মোক্ষকে গৌণভাবে তত্ত্বজ্ঞানের ফল বলা হয়। যেমন রোগ নিবৃত্ত হলে অ-রোগ জন্মায়, তেমনি অজ্ঞানের নিবৃত্তি হলে মোক্ষলাভ হয়। পূর্ব অবস্থাকে অপেক্ষা করেই মোক্ষের উৎপত্তির কথা বলা হয়।

এখানে সংশয় হতে পারে, মুক্তিতে জীব পরমাত্মা হতে পৃথগ্‌ভাবে অবস্থান করেন অথবা অভিন্নভাবে অবস্থান করেন। 'তত্ত্বমসি', 'অহম্ ব্রহ্মাস্মি' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে বর্ণিত হয়েছে যে মোক্ষে মুক্ত জীব পরমাত্মার সঙ্গে অবিভক্তভাবে অবস্থান করেন। যেমন নির্মল জলে নির্মল জলবিন্দু প্রক্ষিপ্ত হলে সেরূপই হয়ে যায়, তেমনি একত্বদর্শী ব্যক্তির আত্মা পরমাত্মার সাথে একত্বপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। 'অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ' এই সূত্রের ভাষ্যে শংকর বলেছেন, মুক্তিতে জীব পরব্রহ্মের সঙ্গে অবিভাগ হন। 'অবিভাগ' শব্দের অর্থ অভেদ। অন্যস্থলে শংকর অবিভাগ বলতে নিরবশেষ এরূপ অর্থ করেছেন। সুষুপ্তি এবং প্রলয়ে জীব ব্রহ্মে লীন হয়। একে সাবশেষ লয় বলে। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের ফলে মুক্ত জীবের যে লয় হয় তাকে নিরবশেষ লয় বলে। নুনের টুকরো যেমন সমুদ্রে পড়লে গলে যায়, সমুদ্রে একেবারে মিশে যায়, তেমনি মুক্তজীবও ব্রহ্মে বিলীন হয়।

২.৫.২.২ বদ্ধাবস্থা ও মুক্তাবস্থার ভেদ

অজ্ঞান অবস্থায় জীব যখন থাকে তখন তাকে জীবের বদ্ধাবস্থা বলে। অজ্ঞানের ফলে তিনটি অবস্থা জীবের দেখা দেয় - জাগ্রদবস্থা, স্বপ্নাবস্থা ও সুষুপ্তাবস্থা। তিনটি অবস্থায় যথাক্রমে জীবের স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এ তিন প্রকার শরীর থাকে। বদ্ধাবস্থায় আত্মা ত্রিবিধ শরীরে 'আমি', 'আমার' এরূপ অভিমান করে। জাগ্রদবস্থায় দেহ অন্ধ হলে জীব যেন অন্ধ হয়ে পড়ে। স্বপ্নকালে স্বপ্নদর্শী জীব ভয়াদি দর্শন করে, ক্রন্দনাদি করে। আর সুষুপ্তিতে কোন বিশেষ জ্ঞান না থাকায় সে যেন বিনাশপ্রাপ্ত বলেই মনে হয়। বদ্ধাবস্থায় আত্মাকে 'ছায়াত্মা' বলা হয়। শরীরাভিমানী 'ছায়াত্মা' প্রিয় ও অপ্রিয়ের দ্বারা লিপ্ত হয়।

অজ্ঞান নিবৃত্তির পর জীব যখন মুক্তিলাভ করে তাকে সদ্যমুক্তি বলে। এটি মুক্তাবস্থা। এ অবস্থায় আত্মার দেহে 'অহম্' অভিমান থাকে না। এ অবস্থায় জীব অশরীরভাব প্রাপ্ত হয় বলে তাকে সুখ-দু:খ স্পর্শ করে না। মুক্ত জীব নিজের স্বরূপে অবস্থান করেন। তিনি ব্যাকৃত ও অব্যাকৃত হতে ভিন্ন। মুক্তাবস্থা বলতে অবস্থাত্রয়রহিত সর্বদু:খশূন্য নিজের স্বরূপে অবস্থিতিকে বোঝায়।

২.৬ সারসংক্ষেপ

ন্যায়দর্শন অনুযায়ী দু:খের স্বরূপ আলোচিত হয়েছে। বাধনাকে দু:খ বলে। বাধনা বলতে বোঝায় পীড়া ও তাপকে। দু:খ প্রতিকূলরূপে বেদনীয়। মুখ্য ও গৌণ ভেদে দু:খ দু প্রকার। দু:খের অনুষঙ্গরূপ সম্বন্ধ যাতে আছে, তাকে গৌণ দু:খ বলে। প্রমেয় পদার্থ গৌণ দু:খ। দু:খানুষঙ্গ হওয়ায় সুখকেও গৌণভাবে দু:খ বলে। আর যা স্বরূপত দু:খ তাকে মুখ্য দু:খ বলে। অন্য দর্শনের অধ্যেতা ও সকল ধর্মের অনুষ্ঠাতা ন্যায়শাস্ত্র পাঠের গৌণ অধিকারী। আর মোক্ষার্থী ব্যক্তি ন্যায়শাস্ত্র পাঠের মুখ্য অধিকারী। ন্যায় মতে দু:খের অত্যন্ত বিমুক্তি হল অপবর্গ। এ জন্মের ত্যাগ ও অন্য জন্মের পুনরায় অগ্রহণকে জন্মরূপ দু:খের অত্যন্ত বিয়োগ বলে। ন্যায় মতে অভয়, অজর, অমৃত্যুপদ, ব্রহ্ম ও ক্ষেমপ্রাপ্তি হল জীবের মুক্ত অবস্থা। ন্যায়সূত্রকার গোতম তত্ত্বজ্ঞান ও অপবর্গ প্রাপ্তির মধ্যে ক্রম স্বীকার করেছেন। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তিতে দোষ নিবৃত্ত হয়, দোষের নিবৃত্তিতে প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হয়, প্রবৃত্তির নিবৃত্তিতে জন্মের নিবৃত্তি হয়, জন্মের নিবৃত্তিতে দু:খের নিবৃত্তি হয়। দু:খের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হলে অপবর্গ হয়। আনন্দমোক্ষবাদীর মতে নিত্যসুখের অভিব্যক্তিই হল মুক্তি। এরূপ প্রাচীন ভাট্টমত নৈয়ায়িকের দৃষ্টিতে প্রমাণাভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। নিত্যযুগের অভিব্যক্তিকে নিত্য বা অনিত্য কোনটি বলা চলে না।

সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন মুমুক্ষুব্যক্তি বেদান্ত পাঠের অধিকারী। নৈতিক শিক্ষায় ও অধ্যাত্মশিক্ষায় শিক্ষিত না হলে বেদান্তপাঠে অধিকার আসে না। শংকরের মতে মূল্যবোধের সর্বোচ্চভূমিকে মোক্ষাবস্থা বলে। জীবের নিজস্বরূপে অভিব্যক্তি মুক্তি। মুক্তিতে জীব শরীরে 'অহম্' অভিমান পরিত্যাগ করে স্বস্বরূপে অবস্থান করেন। সংসারদশায় অজ্ঞানের ফলে জীবের স্বরূপ তিরোহিত বলে মনে হয়। মোক্ষে অজ্ঞানের আবরণ দূরীভূত হলে জীবের স্বরূপ আবির্ভূত হয়। শংকরের দৃষ্টিতে আর্বিভাব ও তিরোভাব উভয়ই ভ্রান্তি। তবে বদ্ধ অবস্থায় জীবের দেহে 'অহম্' অভিমান থাকে, কিন্তু মুক্ত অবস্থায় থাকে না। শংকরের মতে মোক্ষ গৌণভাবে তত্ত্বজ্ঞানের ফল। মুক্তিতে একত্বদর্শীর আত্মা ব্রহ্মে লীন হয়।

২.৭ প্রধান শব্দগুচ্ছ

দু:খ

বাধনাকে দু:খ বলে। বাধনা বলতে বোঝায় পীড়া ও তাপকে। দু:খ প্রতিকূলরূপে বেদনীয়। একে মুখ্য দু:খ বলে। দু:খের অনুষঙ্গরূপ সম্বন্ধ যাতে আছে, তাকে গৌণ দু:খ বলা হয়। এজন্য সকল প্রমেয় পদার্থকে নৈয়ায়িকগণ গৌণ দু:খ বলেন। দু:খানুষঙ্গ হওয়ায় সুখকেও মুমুক্ষু ব্যক্তিরা দু:খ বলে বোঝেন। হীন, মধ্যম ও উৎকৃষ্ট ভেদেও দু:খের ভেদ করা হয়।

অপবর্গ

নৈয়ায়িকগণ সকল দু:খের অত্যন্ত বিমুক্তিকে অপবর্গ বলেন। মোক্ষ ও অপবর্গ সমার্থক শব্দ। মুক্তিতে শরীর প্রভৃতির ত্যাগ ও পুনর্গ্রহণের সমাপ্তি হয়। প্রলয়ে শরীরাদি থাকে না। কিন্তু পুনরায় সৃষ্টিতে জীব অদৃষ্ট অনুযায়ী শরীর ধারণ করে ও দু:খভোগ করে। সুতরাং প্রলয়াবস্থা অপবর্গ নয়, যেহেতু তখন জন্মরূপ দু:খের অত্যন্ত বিয়োগ হয় না।

সাধনচতুষ্টয়

বেদান্ত পাঠের অধিকারীর চারটি অন্তরঙ্গ যোগ্যতাকে সাধনচতুষ্টয় বলে। এ চারটি সাধন হল নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ইহামুত্রফলভোগবিরাগ, শমদমাদি ষট্‌সম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্ব। আত্মা নিত্য ও আত্মা ভিন্ন সব কিছু অনিত্য-এরূপ বোধকে নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক বলে। জাগতিক ও পারত্রিক ফলভোগের প্রতি বৈরাগ্যকে ইহামুত্রফলভোগবিরাগ বলা হয়। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা ও সমাধিকে শমদমাদি ষট্ সম্পত্তি বলে। মুক্তি পাবার প্রবল ইচ্ছাকে মুমুক্ষুত্ব বলে।

বদ্ধাবস্থা

জীবের অজ্ঞান অবস্থাকে বদ্ধাবস্থা বলে। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি -এ তিনটি জীবের বদ্ধাবস্থা। জাগ্রৎকালে জীবের স্থূলশরীর, স্বপ্নে সূক্ষ্মশরীর ও সুষুপ্তিতে কারণশরীর থাকে। বদ্ধাবস্থায় জীবের দেহে 'অহম্' অভিমান হয়। এ অবস্থায় জীব এক আত্মাকে নানা বলে বোঝে ও দু:খভোগ করে।।

২.৮ নমুনা-প্রশ্নাবলী

Essay Type

1. Explain the concept of ***apavarga***, according of Nyaya.

Short Type

1. Write short note on ***moksa***, according to Sankara.
2. What is meant by ***anandamoksavada***?

২.৯ গ্রন্থপঞ্জী

বাদরায়ণ, ***বেদান্তদর্শন***, ৪র্থ অধ্যায়, চিদ্‌ঘনানন্দ পুরী ও আনন্দ ঝা সম্পাদিত, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা (১৯৯৭)

গোতম, ***ন্যায়দর্শন***, ১ম খন্ড, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলিকাতা (১৯৮১)

Badarayana, ***The Vedanta-Sutras***, Part -II, trans. G. Thibaut, Motilal Banarasidass, Delhi (1981)

Gotama, ***The Nyaya -Sutras of Gautama***, ed.Ganganath Jha, Vol. I, Motilal Banarasidass, Delhi (1999.

পর্যায়-২

পৃথিবীসূক্ত

(নির্ধারিত অংশ)

ড. অমরনাথ ভট্টাচার্য

ভূতপূর্ব অধ্যাপক

দর্শন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

ইউনিট -৩ ঃ পৃথিবীসূক্তে পরিবেশ-চেতনা

পাঠপরিকল্পনা

৩.১ উপক্রমণিকা

৩.১.১ প্রাচীন ভারতে পরিবেশ-মনস্কতা

৩.১.২ অথর্ববেদের পরিচয়

৩.১.৩ অথর্ববেদের বৈশিষ্ট্য

৩.২ পাঠের উদ্দেশ্য

৩.৩ পৃথিবীর নিসর্গবর্ণনা ও কবির প্রার্থনা

৩.৩.১ পৃথিবীসূক্তের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

৩.৩.২ পৃথিবীর নিসর্গবর্ণনা

৩.৩.৩ ভূমিমাতার কাছে ভৌমপুত্রের বর প্রার্থনা

৩.৪ পৃথিবীসূক্তে পরিবেশ-সচেতনতা

৩.৫ সারসংক্ষেপ

৩.৬ প্রধান শব্দগুচ্ছ

৩.৭ নমুনা-প্রশ্নাবলী

৩.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৩.১ উপক্রমণিকা

৩.১.১ প্রাচীন ভারতে পরিবেশ-মনস্কতা

সমাজের অগ্রগতির দুটি দিক - সভ্যতা ও সংস্কৃতি। সভ্যতা হল বহির্মুখী অন্বেষণ ও সংস্কৃতি হল অন্তর্মুখী অন্বেষণ। প্রাচীন ভারতে সভ্যতার চাইতে সংস্কৃতি গঠনই বেশী প্রাধান্য পেয়েছে। নীতিধর্ম ছাড়া কোন আদর্শ সংস্কৃতি গড়ে উঠতে পারে না। তাই প্রাচীন ভারতে মনীষীরা নীতিধর্মের পঠন-পাঠন, অনুসরণ ও অনুশীলনে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কী বেদ, কী উপনিষদ্, কী দৃশ্যকাব্য, কী শ্রব্যকাব্য, কী চারুকলা, কী নৃত্যকলা, কী দর্শন- সর্বত্রই নীতিধর্মের উপদেশ লক্ষ্য করা যায়। এরই প্রভাবে সেকালের মানুষের জীবন হয়ে উঠেছিল নৈতিকতায় সমৃদ্ধ।

গ্রীক দর্শন অধিবিদ্যা ও জ্ঞানতত্ত্ব দিয়ে শুরু হয়। কালক্রমে প্রয়োজনের তাগিদে নীতিতত্ত্ব গ্রীক দর্শনে অনুপ্রবিষ্ট হয়। এর পর অ্যারিস্টটলের হাত ধরে গ্রীকদর্শনে তর্কশাস্ত্রের অনুপ্রবেশ ঘটে। কিন্তু প্রাচ্য দর্শনে অধিবিদ্যা, জ্ঞানতত্ত্ব, নীতিতত্ত্ব ও তর্কবিদ্যা এমন কি ভাষাতত্ত্বও যুগপৎ প্রবর্তিত হয়।পাশ্চাত্যের মতো প্রাচ্যদর্শন গুলোতে নীতিবিদ্যা স্বতন্ত্র শাখারূপে উপস্থাপিত হয় নি। দর্শনগুলোর সামগ্রিক পরিকাঠামোর সঙ্গে নীতিতত্ত্ব ওতপ্রোতভাবে সম্বদ্ধ ছিল। এর ফলে দর্শন-শিক্ষার্থীর জীবন ও আচরণ নীতিপথে পরিচালিত হত। আসলকথা, আচার্য্যের নৈতিক জীবন ধারা ও আচার-ব্যবহারের দ্বারা তৎকালের শিক্ষার্থীরা অনুপ্রাণিত হত। প্রাচীন সংস্কৃত মহাকাব্য ও নাটকে তৎকালীন সমাজের এক মনোজ্ঞ প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। মহাকবি ও নাট্যকারেরা তাঁদের রচনায় কখনও সমাজের প্রকৃত চিত্র, কখনও বা সংকীর্ণতার ভয়াবহ পরিণতি দেখিয়ে নতুন প্রজন্মকে সুপথে পরিচালনায় প্রয়াসী হতেন। মহাকবিরা যেখানে প্রকৃতির বিভিন্ন ঋতুর বর্ণনা দিয়েছেন তার মধ্য দিয়ে তাঁরা প্রকৃতির সাথে মানুষের অন্তরঙ্গতা ও পরিবেশ-চেতনা বিবৃত করেছেন। মহাকবি মাঘের ‘শিশুপালবধ’ মহাকাব্যে শরতের বর্ণনা এ বিষয়ে এক জীবন্ত দৃষ্টান্ত। পরিবেশ-চর্য্যার প্রেক্ষিতে নাট্যকার কালিদাসের ‘অভিজ্ঞানশকুন্তলম্’ নাটকের চতুর্থ অঙ্কে শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রাকালে তপোবনের চিত্রটি উল্লেখ করা যেতে পারে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, সকল প্রকার কাব্যের মধ্যে নাটক রমণীয়, সকল নাটকের মধ্যে ‘অভিজ্ঞানশকুন্তলম্’ নাটকটি উৎকৃষ্ট, এই নাটকটির সব কটি অঙ্কের মধ্যে চতুর্থ অঙ্কটি অতীব আকর্ষণীয়, আবার চতুর্থ অঙ্কের মধ্যে শকুন্তলার পতিগৃহে গমন-বেলাটি সর্বাপেক্ষা রমণীয়। এ রমণীয়তার কারণ শকুন্তলার স্বামীর উদ্দেশ্যে গমন নয়, কিংবা নিছক কাব্যসৌন্দর্য্যও নয়। রমণীয়তার কারণ হল, তপোবনের বৃক্ষ-লতা-পশুপক্ষীর সাথে শকুন্তলার নিবিড় অন্তরঙ্গতা প্রদর্শন। কবি এখানে দেখিয়েছেন, তপোবনের সমগ্র প্রকৃতির সাথে তপোবনের ঋষিদের একাত্মবোধ। এটি সেকালের মানুষের পরিবেশ-সচেতনতার সাক্ষ্য বহন করছে।

৩.১.২ অথর্ববেদের পরিচয়

বেদ আর্যগণের প্রাচীনতম গ্রন্থ। এটি নিছক ধর্মগ্রন্থ নয়। একে সকল বিদ্যার ভাণ্ডার বলা চলে। বেদকে ‘ত্রয়ী’ নামে অভিহিত করা হয়, যেহেতু বেদের ঋক্, সাম ও যজু -এই তিনটি বিভাগ। প্রবাদ আছে যে, অথর্বঋষি তিনপ্রকার বেদের কোন কোন অংশ নিয়ে ও নতুন কিছু বিষয় সংযোজন করে অথর্ববেদ প্রচার করেন। বিষ্ণু পুরাণ অনুযায়ী ক্রিয়াপ্রধান যজুর্বেদই একমাত্র বেদ ছিল। বেদব্যাস যজু:প্রধান বেদকে চারভাগ

করেন। এর ফলে চাতুর্হোত্রের উদ্ভব হয়। ঋগ্বেদের ঋত্বিক্‌কে হোতা, সামবেদের ঋত্বিক্‌কে উদ্‌গাতা, যজুর্বেদের ঋত্বিক্‌কে অধ্বর্যু ও অথর্ববেদের ঋত্বিক্‌কে ব্রহ্মা বলা হত। বৈদিক যুগে ঋক্ , সাম ও যজু — এ তিনটি বেদ বলে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। ব্রহ্মার কোন স্বতন্ত্র বেদ ছিল না। তবে তাঁকে সব বিষয়ে পারদর্শী হতে হত। কিন্তু অথর্ববেদীরা দাবি করেন, ব্রহ্মা নামে ঋত্বিকের বেদ হল অথর্ববেদ। তবে ব্রহ্মা যজ্ঞস্থলে যে সকল ঋত্বিকের ওপর কর্তৃত্ব করতেন এটি সুবিদিত। এজন্যই কোন কোন স্থলে অথর্ববেদকে ব্রহ্মবেদও বলা হত।

অথর্ববেদের প্রকৃতনাম 'অথর্বাঙ্গিরস বেদ'। এই বেদ হতে অবগত হওয়া যায় যে, পূর্বে অথর্ব ও অঙ্গিরা বংশীয়দের অনেক মন্ত্র ছিল ও ঐ সব মন্ত্রের একত্র সংকলনে অথর্ববেদের উদ্ভব হয়। তবে বৈদিক সাহিত্যে 'অথর্ব' নামটি ক্রমশ প্রাধান্য পায়। এজন্য একে কখনও 'অথর্বণ্‌বেদ' বা অথর্বণ্‌দের বেদ বলা হত। বর্তমানে এটি 'অথর্ববেদ' নামে পরিচিত। অথর্ববেদের ন'টি শাখা ছিল। এদের মধ্যে কেবল পৈপ্পলাদ ও শৌনকীয় এই দুটি শাখা বর্তমানে পাওয়া যায়। আজ আমরা অথর্ববেদ বলতে সাধারণত শৌনকীয় শাখার অথর্ববেদকেই বুঝে থাকি।

অথর্ববেদ সংস্কৃতভাষায় গদ্য ও পদ্যে রচিত । সম্ভবত এটি গদ্যে সংস্কৃতভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন। এ বেদটি ২০ টি কান্ডে বিভক্ত। তথ্য অনুযায়ী অথর্ববেদের সূক্তগুলির শ্রেণীবিভাগ করা অসম্ভব হলেও ব্লুম্‌ফিল্ড এগুলোর ১৪ প্রকার শ্রেণীবিভাগ করেছেন। এই সূক্তগুলি হল, -১)ভৈষজ্য সূক্ত ২) আয়ুষ্যসূক্ত ৩) আভিচারিকসূক্ত ৪) স্ত্রীকর্ম সূক্ত ৫) সাংমনস্যসূক্ত ৬) রাজকর্ম সূক্ত ৭) দক্ষিণাসূক্ত ৮) পৌষ্টিকসূক্ত ৯) প্রায়শ্চিত্তসূক্ত ১০) দার্শনিকসূক্ত ১১) বিংশকান্ডসূক্ত ১২) শ্রৌতকর্মবিষয়কসূক্ত, ১৩) কুন্তাপসূক্ত ও ১৪) বিবিধসূক্ত। এই সব সূক্তগুলির মধ্যে পৌষ্টিক শ্রেণীর সূক্তই সর্বাপেক্ষা অধিক। এগুলোকে কাম্যবস্তুলাভের মন্ত্র বলা চলে। পৃথিবীসূক্তটি একপ্রকার পৌষ্টিকসূক্ত।

৩.১.৩ অথর্ববেদের বৈশিষ্ট্য

যজ্ঞ সম্পাদন করার জন্য বেদকে ঋক্, সাম ও যজু -এই তিনভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল। অথর্ববেদ মূলত যাগাদির উপযুক্ত ছিল না। অথর্ববেদে দেবতার উদ্দেশ্যে স্তুতি থাকলেও পারিবারিক ক্রিয়াকলাপ ও ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারই এ বেদের মুখ্য বিষয়। অথর্ববেদকে ভারতীয় যাদুবিদ্যার মূল বলা চলে। অভিচারমন্ত্র এ বেদের একটি বড় অংশ জুড়ে আছে। 'অভিচার' কথাটির অর্থ হল শত্রুর ক্ষতিসাধনের অনুকূল ব্যাপার। মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ প্রভৃতি নানাপ্রকার অভিচার এই বেদে লক্ষ্য করা যায়। 'ভৈষজ্যমন্ত্র' এই বেদের একটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য। 'ভৈষজ্য' শব্দটির অর্থ রোগনিরাময়ের জন্য শান্তিপূর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠান। চিকিৎসাশাস্ত্র ও ভৈষজ্যবিদ্যা সম্ভবত ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে অথর্ববেদেই সর্বপ্রথম পাওয়া যায়। সে যুগে শল্যবিদ্যা ও অস্থিবিদ্যারও উন্নতি হয়েছিল। অথর্ববেদের যুগে গোবধ নিষিদ্ধ ছিল। অথর্ববেদে বিধবাবিবাহ ও পতির জীবিত অবস্থায় পত্নীর অন্য পতিগ্রহণের উল্লেখ আছে। এ বেদে ব্রাত্যদের ভূয়সী প্রশংসা বিধৃত আছে। বেদটি উন্নত দার্শনিক চিন্তায় সমৃদ্ধ। তবে ঋষি অথর্বা দার্শনিক চিন্তার উৎকর্ষকে দুর্বোধ্যতার আবরণে

সাধারণের কাছ থেকে আড়াল করেছিলেন। ঋষি কালকেই সৃষ্টির উৎস ও নিয়ন্তা বলেছেন। অথর্ববেদীরা মূলত সাধারণ জনগণের প্রয়োজন ও সুখ নিয়ে ভাবিত হলেও স্থলবিশেষে যজ্ঞানুষ্ঠানেরও বিধান দিতেন। কখনও কখনও অথর্ববেদের বিধান অনুসারে যাগাদি অনুষ্ঠিত হত। রামায়ণে উল্লেখ আছে, রাজা দশরথ অথর্ববেদ অনুসারে পুত্রেষ্টিযাগ করেছিলেন। এ বেদের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল যে, ঋষি প্রকৃতিকে অতি আপন করে নিয়েছিলেন, যার ফলে সেকালে প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ দুই-ই সংরক্ষিত ছিল।

৩.২ পাঠের উদ্দেশ্য

মানুষ প্রকৃতির অঙ্গ। মানুষের শরীরকে পার্থিব শরীর বলে। অন্য চারটি ভূতের অংশ মানুষের শরীরে থাকলেও পৃথিবীর অংশই প্রধান। মানুষ পৃথিবীতে জন্মায়, এতেই লালিত-পালিত হয় ও পরিশেষে পৃথিবীতেই লীন হয়। পৃথিবীর নিসর্গ বর্ণনা ও জীবকুলের সাথে পৃথিবীর নিবিড় সম্পর্ক পৃথিবীসূক্তের আলোকে বিশ্লেষণ করাই এ পাঠের উদ্দেশ্য।

৩.৩ পৃথিবীর নিসর্গ বর্ণনা ও কবির প্রার্থনা

৩.৩.১ পৃথিবীসূক্তের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

অথর্ববেদের দ্বাদশকান্ডে পৃথিবীসূক্ত আম্নাত হয়েছে। ভূমিপুত্র কবি অথর্বা সূক্তটির ঋষি। পৃথিবীসূক্তকে ভূমিসূক্তও বলা হয়। ঋগ্‌বেদে সাধারণত দ্যু ও পৃথিবী যুগ্মভাবে উপাসিত হতেন। এঁদেরকে 'দ্যাবাপৃথিবী ' বা 'দ্যাবাভূমী' বলা হত। তবে ঋগ্‌বেদে অতিক্ষুদ্রাকার পৃথ্বীসূক্ত আছে। সূক্তটি মাত্র তিনটি মন্ত্রে গ্রথিত। এখানে ভূমিপুত্র অতি এককভাবে পৃথিবীকে স্তুতি করেছেন। পৃথ্বি, পৃথ্বী, পৃথিবী ও ভূমি সমার্থক শব্দ। তবে বৈদিক সাহিত্যে পৃথ্বী বা পৃথিবীর চাইতে ভূমি শব্দটি আরও প্রাচীন। যাতে সব হচ্ছে বা হবে তাকে ভূমি বলে। যা ক্রমাগত বিস্তৃত হচ্ছে তাকে পৃথিবী বলে। পৃথিবীসূক্তের কোন দেবতা নেই। সম্প্রদায় অনুসারে গ্রামপত্তন, রক্ষণ, পার্থিব শান্তি প্রভৃতি ভৌম কর্মে সূক্তটির বিনিয়োগ হত।

পৃথিবীসূক্তে পৃথিবীর এক মনোজ্ঞ নিসর্গবর্ণনা আছে। ভাষ্যকার সায়ণ সূক্তটিকে 'প্রভূতনিসর্গবর্ণন' নামে অভিহিত করেছেন। এখানে কাব্য সৌন্দর্য্যের সঙ্গে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের এক অনুপম মিলন ঘটেছে। সূক্তটিতে কবি অথর্বা পৃথিবীকে মাতৃরূপে নিরীক্ষণ করেছেন। সূক্তটি ভূমিমাতার প্রতি সন্তানের এক আবেগভরা অভিব্যক্তি।

৩.৩.২ পৃথিবীর নিসর্গ বর্ণনা

মূল

যার্ণবেধি সলিলমগ্র আসীৎ....। (অথর্ববেদ ১২/৮)

অনুবাদ

(সৃষ্টির) পূর্বে যে পৃথিবী সমুদ্রের মধ্যে জলরূপে ছিল.....।

কালের বিবর্তনে গ্রহ-উপগ্রহের আকর্ষণ-বিকর্ষণের ফলে সূর্যের এক জ্বলন্ত ভগ্নাংশ বিশ্লিষ্ট হয়। ঐ জ্বলন্ত উত্তাপের আকর্ষণে বহু সহস্র বছর ধরে বর্ষণের ফলে জলার্ণবের সৃষ্টি হয়। অথর্ববেদের ঋষি অনুভব করেছেন, এ বৈচিত্র্যময়ী পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বে ঐ সমুদ্রে লীন ছিল।

মূল

সত্যং বৃহদৃতমুগ্রং দীক্ষা তপো ব্রহ্ম যজ্ঞ: পৃথিবীং ধারয়ন্তি। (তদেব ১২/১)

অনুবাদ

বৃহৎ সত্তা, উগ্র ঋত (তেজস্বী মহাজাগতিক নিয়ম), দীক্ষা (কল্যাণময় কর্মপূর্ব শুভ সংকল্প), তপস্যা (শুভকর্ম), যজ্ঞ (ত্যাগব্রত) ও ব্রহ্ম (সত্যজ্ঞান) পৃথিবীকে ধারণ করে আছে।

দৃশ্যমান পৃথিবীকে ধারণ করে আছে কতকগুলি মৌলিক ধর্ম। ঋষি বলেছেন, পরম সত্তা, বহমান কর্মচক্র, শুভ সংকল্প, শুভকর্ম ও সত্যজ্ঞান পৃথিবীকে ধারণ করে আছে। পৃথিবী এদের সকলের অধীনে থেকে নিজস্ব কক্ষপথে আবর্ত্তিত হচ্ছে। পৃথিবীবাসীকেও মহাজাগতিক কর্মচক্রের অধীনস্থ বুঝে সৎ-চিন্তা, সৎ-কর্ম ও সত্যের পথ ধরে চলতে হবে - এটি ভাবার্থ।

মূল

অসংবাধং বধ্যতো মানবানাং যস্যা উদ্বত: প্রবত: সমং বাহু।

নানা বীর্য্যা ওষধীর্যাবিভর্ত্তি পৃথিবী ন: প্রথতাং রাধ্যতাং ন:।।

(তদেব ১২/২)

অনুবাদ

যে (পৃথিবীর) মানুষের মধ্যে উঁচু নীচু নানা ভেদ থাকলেও (তারা) পরস্পর নির্বাধে থাকে, যে (পৃথিবী) নানা গুণসম্পন্ন ওষধিসমূহ ধারণ করেন, (সেই) পৃথিবী আমাদের জন্য বিস্তৃত হোন, আমাদেরকে সমৃদ্ধ করুন।

মূল

যস্যাং সমুদ্র উত সিন্ধুরাপো যস্যামন্নং কৃষ্টয় সংবভুবু:।

যস্যামিদং জিন্বতি প্রাণদেজৎ সা নো ভূমি: পূর্বপেয়ে দধাতু।। (তদেব ১২/৩)

অনুবাদ

যার মধ্যে (যে পৃথিবীতে) সমুদ্র, নদী ও জলরাশি (আছে) , যার মধ্যে খাদ্য, কর্ষণাদি সম্ভব হয়, যার মধ্যে (জীব) প্রাণবান ও গমনশীল হয়, সেই ভূমি আমাদের জন্য প্রথম পানীয় জল ধারণ করুন।

মূল

বিশ্বম্ভরা বসুধানী প্রতিষ্টা হিরণ্যবক্ষা জগতো নিবেশানী।

বৈশ্বানরং বিভ্রতী ভূমিরগ্নিমিন্দ্রবৃষভা দ্রবিণে নো দধাতু।। (তদেব ১২/৬)

অনুবাদ

যিনি বিশ্বকে ভরণপোষণ করেন, যিনি সকল সম্পদের ধারয়িত্রী, (যিনি) দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিতা, স্বর্ণবক্ষা, জগতের স্থাপনকারিণী, যিনি বৈশ্বানর অগ্নিকে ধারণ করেন, ইন্দ্র যাঁর বৃষ (ষাঁড়), সেইভূমি সম্পদ দিয়ে আমাদেরকে ধারণ করুন।

এ পৃথিবীতে আছে সমুদ্র, নদী ও কৃষিক্ষেত্র। মানুষ, পশু-পক্ষী, বৃক্ষ-লতা প্রভৃতি পৃথিবীকে আশ্রয় করে আছে। তিনি সমগ্র বিশ্বকে ভরণপোষণ করেন। তাই ঋষি তাঁকে 'বিশ্বম্ভরা' বলেছেন। এখানে নানা জাতি, নানা বর্ণ, নানা ধর্মের মানুষ আছে। তবু তারা পরস্পর বাধাহীনভাবে অবস্থান করে। পৃথিবী সকল সম্পদের প্রকৃত অধিকারিণী। স্থলভাগে নদী, গিরি, অরণ্য প্রভৃতি প্রকৃতির সকল সম্পদ পৃথিবীরই। এজন্য কবি পৃথিবীকে 'বসুধানী' বলেছেন। আর তলদেশে জল, তেল, কয়লা , সোনা প্রভৃতি খনিজ সম্পদে পৃথিবী সমৃদ্ধ আছেন। এজন্য ঋষি তাঁকে 'হিরণ্যবক্ষা' বলেছেন। তিনি শুধু সম্পদের অধিকারিণী নন, সকল সম্পদের দানকারিণীও । পৃথিবী অগ্নিকে ধারণ করেন। এজন্য পৃথিবীকে 'অগ্নিবাসা' বলা হয়।

এ পৃথিবীর প্রহরায় আছেন সকল দেবতা। তাঁরা নিরলসভাবে অনন্তশূন্যে ঘূর্ণায়মান ছোট্ট পৃথিবী গ্রহকে প্রাণীকুলের বাসযোগ্য করার জন্য শৃঙ্খলা রক্ষা করে থাকেন। এ ভ্রাম্যমান পৃথিবীতে কত গিরিমালা আছে, কোথাও আবার তারা তুষারাবৃত। ইন্দ্ররক্ষিতা পিঙ্গলবর্ণা, কৃষ্ণবর্ণা, রক্তবর্ণা, নানা বৈচিত্র্যে বিশ্বরূপা পৃথিবীকে নিরীক্ষণ করে কবি অভিভূত। তাই কবি অথর্বা পৃথিবীতে সুখে অক্ষতরূপে বাস করতে চান। এরূপ প্রকৃতি বর্ণনা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

মূল

ত্বজ্জাতাস্ত্বয়ি চরন্তি মর্ত্যাস্ত্বং বিভর্ষি দ্বিপদস্ত্বং চতুষ্পদ:।

তবেমে পৃথিবী পঞ্চ মানবা...............................।। (তদেব ১২/১৫)

অনুবাদ

(হে পৃথিবী) মানুষেরা তোমা থেকে উৎপন্ন হয়ে তোমাতে বিচরণ করে। দ্বিপদ ও চতুষ্পদকে তুমি ভরণপোষণ কর। এ পঞ্চ মানব তোমার.........।

দ্বিপদ ও চতুষ্পদ প্রাণীর লীলাভূমি হল এই পৃথিবী। তারা এখানে জন্মায় ও তাতে বিচরণ করে। এ পৃথিবীতেই 'পঞ্চজন' বসবাস করে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও নিষাদ্‌কে পঞ্চজন বলা হত। কেউ আবার পঞ্চজন বলতে মানবজাতিকেই বুঝিয়েছেন। পৃথিবী সকল মানুষের বাসভূমি। এখানে প্রাণের স্পন্দন আছে। এটি হল জন্ম-মৃত্যুর অনুকূল পরিমন্ডল। সূর্য আলোকরশ্মির দ্বারা এ পৃথিবী সদা প্রাণবান করে রেখেছে।

মূল

অগ্নির্ভূম্যামোষধীষ্বগ্নিমাপো বিভ্রত্যগ্নিরশ্মসু।

অগ্নিরন্ত: পুরুষেষু গোষ্বশ্বেষ্বগ্নয়:।। (তদেব ১২/১৯)

অনুবাদ

পৃথিবীতে অগ্নি (আছে), ওষধিসমূহে (অগ্নি আছে)। জলরাশি অগ্নিকে ধারণ করে। অগ্নি প্রস্তরসমূহে (আছে) । অগ্নি মানুষের ভেতরে (আছে) । অগ্নি গো ও অশ্বসমূহেও (আছে)।

মূল

অগ্নির্দিব আতপত্যগ্নের্দেবস্যোর্বন্তরিক্ষম্।

অগ্নিং মর্তাস: ইন্ধতে হব্যতাহং ঘৃতপ্রিয়ম্।। (তদেব ১২/২০)

অনুবাদ

অগ্নি (সূর্যরূপে) দ্যুলোক তপ্ত করেন। বিস্তৃত অন্তরিক্ষ অগ্নিদেবতার (স্থান)। মানুষেরা হবির্বহনকারী ঘৃতপ্রিয় অগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করে।

ঋষি অথর্বা পৃথিবীর মধ্যে অগ্নির বিশ্বরূপ নিরীক্ষণ করেছেন। পৃথিবীর স্থাবর, জঙ্গম সব কিছুতেই অগ্নি পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। অগ্নি ভূমিতে আছে, বৃক্ষলতায় আছে, জলে আছে ও প্রস্তরমধ্যে আছে। পশু-মানুষ সকলের মধ্যে দাহাগ্নি আছে। অগ্নির জন্যই জীব বেঁচে থাকে। পৃথিবী অগ্নিকে নিয়েই প্রাণবান একথা ঋষি বলতে চেয়েছেন।

কবি পৃথিবীকে 'ইন্দ্রগুপ্তা' বলেছেন। ইন্দ্র সকল প্রকার বলের প্রতীক। কম্পমানা পৃথিবীকে ইন্দ্র প্রতিরুদ্ধ করেছেন। ইন্দ্র বলবত্তার জন্যই পৃথিবীকে অধিকার করেন। পৃথিবীর ওপর বলহীন ব্যক্তির কোন অধিকার নেই। এজন্য বলা হয় বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।

৩.৩.৩ ভূমি মাতার কাছে ভৌম পুত্রের বর প্রার্থনা

মূল

মাতা ভূমি: পুত্রো অহং পৃথিব্যা:। (তদেব ১২/১২)

অনুবাদ

পৃথিবীই মাতা, আমি পৃথিবীর পুত্র।

মূল

উরুং লোকং পৃথিবী ন: কৃণোতু। (তদেব ১২/১)

অনুবাদ

পৃথিবী আমাদের জন্য এ লোককে বিস্তৃত করুন।

মূল

ভগং বর্চ: পৃথিবী নো দধাতু। (তদেব ১২/৫)

অনুবাদ

পৃথিবী আমাদের জন্য ঐশ্বর্য্য ও ঔজ্জ্বল্য ধারণ করুন।

মূল

সা নো ভূমি: পূর্বপেয়ে দধাতু। (তদেব ১২/৩)

অনুবাদ

সেই পৃথিবী আমাদের জন্য প্রথম পানীয় জল ধারণ করুন।

মূল

সা নো ভূমিস্ত্বিষিং বলরাষ্ট্রে দধাতূত্তমম্। (তদেব ১২/৮)

অনুবাদ

সে ভূমি তেজ, শক্তি ও উত্তম রাষ্ট্র (আমাদের জন্য) ধারণ করুন।

মূল

মা নো দ্বিক্ষত কশ্চন। (তদেব ১২/১৮)

অনুবাদ

আমাদের কেউ যেন হিংসা না করে।

মূল

সা নো মধু প্রিয়ং দহাম। (তদেব ১/৭)

অনুবাদ

সে পৃথিবী আমাদেরকে মধুময় বিষয় সমূহ প্রদান করুন।

কবি অথর্বা পৃথিবীকে মাতৃরূপে অনুভব করেছেন এবং নিজেকে 'ভূমিপুত্র' বলে উপস্থাপন করেছেন। মাতার কাছে সন্তান যেমন নানা দাবী করে তেমনি ভূমি মাতার কাছে ভৌম পুত্র নানা বর প্রার্থনা করেছেন। তাঁর প্রথম প্রার্থনা হল - পৃথিবী আমাদের জন্য নিজেকে আরও বিস্তৃত করুন। শুধু বিস্তৃত নয়, তিনি সমৃদ্ধিও প্রার্থনা করেছেন। নানা খনিজ সম্পদ ও ভেষজ সম্পদের দ্বারা তিনি আরও সমৃদ্ধ হোন। ঋষির আরেকটি প্রার্থনা - পৃথিবী আমাদের জন্য জল ধারণ করুন। সেযুগে কৃষিকার্য একমাত্র জীবিকা ছিল। জল ছাড়া কৃষিকার্য সম্ভব নয়। জল ছাড়া জীবনধারণও অসম্ভব। তাই জলের জন্য কবির প্রার্থনা। কবি চেয়েছেন, ভূমি মাতা গোধন ও খাদ্যের দ্বারা আমাদেরকে ধারণ করুন। এ পৃথিবী আমাদের জন্য ঐশ্বর্য্য ও ঔজ্জ্বল্য ধারণ করুন। পৃথিবী মাতার কাছে কবি উত্তম রাষ্ট্র, তেজ ও শক্তি প্রার্থনা করেছেন। স্বর্ণময়ী ভূমি মাতার কাছে কবির আকূতি, আমাদের যেন কেউ হিংসা না করে। আমাদের যারা হিংসা করে, যারা আমাদের শত্রুতা করে ভূমিমাতা মনরূপ আয়ুধের দ্বারা তাদেরকে বশীভূত করুন। পাহাড়, পর্বত, বৃক্ষ-লতা, জীব-জন্তু - সবই মধুময় হোক - ভূমি মাতার আছে কবির এই হার্দিক প্রার্থনা।

৩.৪ পৃথিবীসূক্তে পরিবেশ-সচেতনতা

অথর্ববেদের পৃথিবীসূক্তটি সে যুগের মানুষের পরিবেশ চেতনার সাক্ষ্য বহন করছে। কবি অথর্বা মানুষের সাথে পৃথিবীর অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ দেখিয়েছেন। তিনি পৃথিবীকে মাতৃরূপে ও নিজেকে পুত্ররূপে অভিহিত করেছেন। মাতা ও সন্তানের সম্পর্ক অতি নিকটতম ও অন্তরঙ্গ। তিনি গিরিমালাকে ভূমিমাতার স্তন্যরূপে ও প্রবহমান জলরাশিকে তাঁর দুগ্ধরূপে অনুভব করেছেন। এ দৃষ্টিতে পৃথিবীকে দেখলে পরিবেশ প্রীতি জাগবে।

ভূমিপুত্র অথর্বা ভূমিমাতার কাছে জলধারণের জন্য প্রার্থনা করেছেন। এ থেকে পরিস্ফুট হয় যে, সে যুগের ঋষি জলের অপচয় না করে আগামী প্রজন্মের জন্য জল সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। তাছাড়া, তিনি সে যুগের একমাত্র জীবিকা কৃষিকার্যের জন্যও জলসংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন।

পৃথিবীসূক্তের ঋষি সকলকে স্মরণ করে দিয়েছেন যে, পৃথিবীর উপরিভাগে বা ভূগর্ভে যে সম্পদ আছে তা পৃথিবীরই ধন, মানুষের নয়। পশু-পক্ষী, বৃক্ষ-লতা প্রত্যেকেই এ ধনের অংশীদার। কবি বলতে চেয়েছেন, লোকে যেন যথেচ্ছভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ ভোগ না করে ও নির্বিচারে বৃক্ষচ্ছেদন ও পশুহত্যা না করে।

পৃথিবীসূক্তের ঋষি ভূমিমাতার কাছে প্রার্থনা করেছেন - একটি কল্যাণময় রাষ্ট্র, যেখানে লোকেরা পরস্পর বিদ্বেষ পোষণ করবে না। প্রত্যেক সমাজেই মানুষের মধ্যে ঈর্ষা, বিদ্বেষ লক্ষ্য করা যায়। সে যুগের সমাজেও মানুষের মধ্যে বিদ্বেষ ছিল। তাই কবি অনুভব করেছিলেন, মানুষে-মানুষে বিদ্বেষ সুষ্ঠু সমাজগঠন ও পরিবেশ সংরক্ষণে অন্তরায়।

সূক্তটিতে কবি ঔষধি-সমূহের মনুষ্যজীবনে কার্যকারিতা তুলে ধরেছেন। তিনি ওষধির সঙ্গে মানুষের এক পারস্পরিক সম্বন্ধ উপস্থাপন করেছেন। বৃক্ষ-লতা প্রভৃতি যেমন নিজেদের জীবন ধারণের জন্য মানুষের সাহায্য অপেক্ষা করে, তেমনি মানুষও রোগের প্রকোপ হতে রক্ষা পাবার জন্য প্রাণদায়ী ওষধির ওপর নির্ভর করে। কবি এখানে বলতে চেয়েছেন, মানুষের জীবনে পরিবেশের অবিচ্ছেদ্য প্রভাব।

কবির আকূতি - বৃক্ষ-লতা মধুময় হোক্। গিরি-পর্বত মধুময় হোক্। ওষধি-বনস্পতি মধুময় হোক্। পশু-পক্ষী মধুময় হোক্। মানব জাতি মধুময় হোক্। ভোগ্য-পেয় মধুময় হোক্। এককথায়, সমগ্র পৃথিবী মধুময় হোক্। সবই মধুময় হলে পরিবেশ সর্বপ্রকার দূষণ হতে মুক্ত হবে - এটি কবির প্রত্যাশা।

আজকের পরিবেশ দূষণের প্রেক্ষিতে পৃথিবীসূক্তটি আমাদের দিশারী হতে পারে।

৩.৫ সারসংক্ষেপ

অথর্ববেদের পৃথিবীসূক্তে আছে - ভূমিমাতার প্রতি ভৌমপুত্র কবি অথর্বার এক আবেগভরা অভিব্যক্তি। ক্রমাগত বিস্তৃত হচ্ছে বলে একে 'পৃথিবী' বলে । পৃথিবীসূক্তকে ভূমিসূক্তও বলা হয়। যাতে সব হচ্ছে বা হবে তাকে 'ভূমি' বলে। নানা বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ এ পৃথিবীকে ধারণ করে আছে কতকগুলো মৌলিক ধর্ম। পৃথিবীতে আছে সমুদ্র, নদী ও কৃষিক্ষেত্র। পৃথিবীর উপরিভাগে ও মধ্যভাগে যে সব সম্পদ রয়েছে তাদের অধিকারী পৃথিবী। পৃথিবীতে পঞ্চজন বসবাস করে। এখানে আছে প্রাণের স্পন্দন। পৃথিবী অগ্নিকে নিয়ে প্রাণময়। ইনি ইন্দ্রগুপ্তা ও বীরভোগ্যা। পৃথিবীর কাছে কবি অথর্বা পৃথিবীর বিস্তার, সমৃদ্ধি, ঐশ্বর্য্য, ঔজ্জ্বল্য ও জলধারণ প্রার্থনা করেছেন। দ্বেষরহিত রাষ্ট্র, তেজ ও শক্তি পৃথিবী মাতার কাছে কবির প্রার্থিত বিষয়। পৃথিবীকে মাতৃরূপে ও নিজেকে পুত্ররূপে উপস্থাপন করে কবি পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের এক অন্তরঙ্গ সম্পর্ক দেখিয়েছেন। সূক্তটিতে কৃষিকার্য ও আগামী প্রজন্মের জন্য জলসংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে। মানুষ ও পরিগত পশু-পক্ষী, স্থাবর -অস্থাবরের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা পরিবেশ চেতনার পরিচয় দিচ্ছে। 'সমগ্র পৃথিবী মধুময় হোক্' - ঋষির এরূপ প্রার্থনা হল দূষণমুক্ত পরিবেশের জন্য আকূতি।

৩.৬ প্রধানশব্দগুচ্ছ

অথর্ববেদ

অথর্ববেদের প্রকৃত নাম 'অথর্বাঙ্গিরসবেদ'। একে 'অথর্বণ্‌বেদ'ও বলা হত। বর্তমানে এটি অথর্ববেদ নামে পরিচিত। এ বেদের নয়টি শাখার মধ্যে বর্তমানে শৌনকীয় শাখাই পাওয়া যায়। বেদটি সংস্কৃত ভাষায় গদ্য ও পদ্যে রচিত। পারিবারিক ক্রিয়াকলাপ ও ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার অর্থববেদের মুখ্য বিষয়। আভিচারিক কর্ম বেদটির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। চিকিৎসা শাস্ত্র, ভৈষজবিদ্যা, শল্যবিদ্যা ও অস্থিবিদ্যা এ বেদে আলোচিত হয়েছে। এ বেদ অনুযায়ী কখনও কখনও যাগাদি অনুষ্ঠিত হত।

পৃথিবী

পৃথ্বি, পৃথ্বী, ভূমি ও পৃথিবী সমার্থক শব্দ। ক্রমাগত বিস্তৃত হচ্ছে বলে একে 'পৃথিবী' বলে। কতকগুলি মৌলিক ধর্ম পৃথিবীকে ধারণ করে আছে। এখানে আছে সমুদ্র, নদী ও কৃষিক্ষেত্র। পৃথিবী মানুষ, জীব-জন্তু, গাছপালা প্রভৃতির আশ্রয়। এটি সকলের লীলাভূমি। পৃথিবী খনিজ প্রভৃতি সম্পদের অধিকারিণী ও দাত্রী। ঋষি পৃথিবীকে ইন্দ্রগুপ্তা ও বীরভোগ্যা বলেছেন।

পঞ্চজন

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও নিষাদ্‌কে পঞ্চজন বলে। কারও মতে হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্যু, ব্রহ্মা ও যজমান পঞ্চজন। কেউ বলেন, অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষে উৎপন্ন পঞ্চচৈতন্য বিশিষ্ট মানুষই হল পঞ্চজন। কারও কারও মতে পঞ্চজন বলতে সাধারণভাবে মানবজাতিকে বোঝায়।

৩.৭ নমুনা-প্রশ্নাবলী

Essay Type

1. Give a description of Prithivi, after 'Prthivi-sukta' of the Atharvaveda.

Short Type

1. What is meant by the term Pancajana.
2. Write a note on Prithivisukta.

৩.৮ গ্রন্থপঞ্জী

অথর্ববেদ (শৌনকীয়), বিশ্ববন্ধু সম্পাদিত, দ্বাদশকান্ড, হোসিয়ারপুর (১৯১৬)

বৈদিক সংকলন (প্রথম খন্ড), ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্য ও তারকনাথ অধিকারী সম্পাদিত, সংস্কৃত বুক্ ডিপো কলকাতা।

মুখোপাধ্যায় গোবিন্দগোপাল, ***বৈদিক সাহিত্য সংকলন***, ১ম খন্ড, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান (১৯৬৫).

Atharva-Veda-Samhita, Trans. W. D. Whitney, Vol.II , Motilal Banarasidass, Delhi (1962).

ভারতীয় নীতি-দর্শনের প্রসঙ্গ

অধ্যাপক প্রদ্যোত কুমার মন্ডল

দর্শন বিভাগ

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

একক - ৪

পঞ্চ ব্রত ও অহিংসা অনুব্রত

বিষয়-সূচী

৪.০.০ প্রেক্ষাপট

৪.০.১ পাঠ্য বিষয়

৪.০.২ পঞ্চব্রত

৪.০.২.১ অনুব্রত ও মহাব্রত

৪.০.৩.১ অহিংসা : পঞ্চ অনুব্রতের প্রথম অনুব্রত

৪.০.৩.২ অহিংসা অনুব্রতের অতিচার

৪.০.৪ সারাংশ

৪.০.৫ কতিপয় শব্দের অর্থ

৪.০.৬ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৪.০.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৪.০.০ প্রেক্ষাপট

জৈন ধর্ম অতি প্রাচীন ধর্ম। জিনদের দ্বারা প্রবর্তিত বলে এই ধর্মের নাম জৈনধর্ম। 'জিন' শব্দের অর্থ যিনি জয় করেছেন। এই জয় যুদ্ধ জয় নয়, কামনা বাসনার জয়। যিনি কামনা-বাসনা, রাগ-দ্বেষাদি জয় করেছেন তিনিই জিন। জৈন দর্শনে জিনদের 'অর্হৎ' বা 'তীর্থঙ্কর নামে অবিহিত করা হয়। যিনি চতুর্বিধ তীর্থ বা সংঘ স্থাপন ক'রে তাদের নিয়মাবদ্ধ করেন তিনিই তীর্থঙ্কর। মূলতঃ ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরোধিতা করেই বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের উৎপত্তি হয়। কঠোর তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধন—এই দুই ধর্মের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। কঠোর তপস্যার দ্বারা উপলব্ধ সত্য ভিত্তিক এই দুই ধর্ম স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল। জৈনধর্মে 'ধর্ম' শব্দটি নিম্নোক্ত দুটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় :

(১) ব্যক্তির কর্তব্য এবং দৈহিক তথা আধ্যাত্মিক কার্যাবলী। এই অর্থে ধর্ম হল একটি জীবনচর্যা।

(২) সেই সকল কার্য যা পরিণামে সুখ এবং আত্মোপলব্ধির সহায়ক। এই অর্থে ধর্ম হল এক প্রকার ইষ্টিমার্গ বা মুক্তিমার্গ।

জৈন দর্শনে 'ধর্ম' শব্দটি ব্যক্তির আধ্যাত্মিক কর্তব্যকে নির্দেশ করে। জৈনমতে ত্রিরত্নের সম্যক্ অনুশীলনের মাধ্যমে যে ব্যক্তি সমস্ত কামনা-বাসনা, কর্ম ও কর্মফলকে বিনষ্ট করতে পারেন, তিনিই সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে মোক্ষলাভ করেন। কর্মের প্রভাব থেকে জীব যখন সম্পূর্ণ মুক্ত হয় তখন সে অনন্তচতুষ্টয়ের (অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত বিশ্বাস, অনন্ত বীর্য, অনন্ত আনন্দের) সন্ধান পায়।

জৈনধর্মে একাধারে সন্ন্যাস ও গার্হস্থ্যধর্ম। শ্রমণদের জন্য নির্দেশিত যথার্থ আচরণ বা ধর্ম 'সাধুধর্ম' এবং শ্রাবক বা সাধারণ মানুষের জন্য নির্দেশিত যথার্থ আচরণ বা গার্হস্থ্যধর্ম নামে পরিচিত। 'শ্রমণ' বলতে বোঝায় জৈনধর্মাবলম্বী সাধু বা সন্ন্যাসী। লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, জৈনধর্ম মূলত একটি শ্রমণ ধর্ম। যাঁরা শ্রম বা তপস্যার দ্বারা জগতকে জয় করেন তাদের বলা হয় শ্রমণ। শ্রমণদের ধর্মকে বলা হয় শ্রমণধর্ম। 'শ্রাবক' শব্দের অর্থ হ'ল জৈন ধর্মাবলম্বী সাধারণ মানুষ। 'শ্রাবক' শব্দটি জৈন টীকাকারগণ নানা ভাবে ব্যাখ্যা করে থাকেন। তপাগচ্ছীয় রত্নশেখর তাঁর 'শ্রাদ্ধবিধি' নামক গ্রন্থে 'শ্রাবক' শব্দের তিনটি ভিন্ন অর্থ দিয়েছেন। প্রথমত, ধাতুগত দিক থেকে 'শ্রাবক' শব্দটি 'শ্রু' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন। 'শৃণোতি যঃ সঃ শ্রাবকঃ'—এইরূপ সমাস নিষ্পন্ন 'শ্রাবক' শব্দের অর্থ 'শ্রোতা'। যিনি গুরুর উপদেশ শ্রবণ করেন তিনিই শ্রাবক। দ্বিতীয়ত, 'শ্রাবক শব্দের বিশেষণগত অর্থ হল যার পাপ ধুয়ে মুছে যায় (শ্রবন্তি যস্য পাপানি)। তৃতীয়ত, আশ্রয়ের দিক থেকে 'শ্রাবক' শব্দের অর্থ হল ধর্মের আশ্রয় বা ধর্মী (শ্রদ্ধালুতাং শ্রাতি ইতি শ্রাবকঃ)। শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস সহকারে যিনি ধর্মকে আশ্রয় করে থাকেন তিনিই শ্রাবক। যে অর্থই গ্রহণ করা হোক না কেন শেষ পর্যন্ত শ্রাবক বলতে জৈন ধর্মাবলম্বী বা জৈন ধর্মে বিশ্বাসী সাধারণ মানুষকেই বোঝান হয়। শ্রাবক তিনিই যিনি গুণশ্রেণীর পঞ্চম স্তরে উন্নীত হয়েছেন এবং তীর্থঙ্কর, গুরু এবং ধর্মের প্রতি যাঁর দৃঢ় বিশ্বাস আছে। জৈনমতে যিনি পঞ্চদোষ (অতিচার) বিরহিত নন তিনি আদৌ কোন ব্রত পালনের যোগ্য নন। এই পঞ্চদোষ হ'ল শঙ্কা (সন্দেহ); কাা (অপর মতানুসারী হওয়ার বাসনা); বিতিগিচ্ছা (কর্মফল সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা); পরপাখণ্ড পরশংসা (ভণ্ড বা কপটের প্রশংসা) এবং পাখণ্ড সন্থন (ভণ্ডের সাথে মেলামেশা)। এই পাঁচটি অতিচার থেকে যিনি মুক্ত তিনিই ব্রত অনুশীলনের উপযুক্ত।

উপাসকদশাঙ্গ অনুসারে শ্রাবকের দ্বাদশ ব্রত পালনীয় :

(১) পাঁচটি অনুব্রত

(২) তিনটি গুণব্রত ও

(৩) চারটি শিক্ষাব্রত

পাঁচটি অনুব্রত হ'ল অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ ব্রতের শিথিল অনুশীলন। তিনটি গুণব্রত হল দিগ্‌ব্রত, দেশাবকাশিক ব্রত এবং অনর্থদণ্ডব্রত। গুণব্রত বাহ্যিক আচরণকে সুশৃঙ্খল করে। চারটি শিক্ষাব্রত হল সাময়িক ব্রত, পৌষধোপবাস ব্রত, উপভোগপরিভোগ পরিমাণ ব্রত এবং অতিথিসংবিভাগব্রত। শিক্ষাব্রত চিত্তশুদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করে। বিভিন্ন জৈন শাস্ত্রে বিভিন্ন প্রকার শ্রাবকের কথা বলা হয়েছে।

৪.০.১. পাঠ্য বিষয়

পাঠ-সহায়কের বর্তমান এককটি জৈন নীতিতত্ত্বে আলোচিত পঞ্চব্রত বিষয়ক। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. পাঠক্রমে ফলিত নীতিবিদ্যা বিশেষ পত্র রূপে অন্তর্ভুক্তি হয়েছে। এই বিশেষ পত্রটি দুটি অর্ধ বিশিষ্ট দুটি পত্রে বিন্যস্ত। দূরশিক্ষা বিভাগে এম. এ. পাঠক্রমে চতুর্থ ও অষ্টম পত্র হল বিশেষ পত্র। বর্তমান পাঠ-সহায়কটি অষ্টম পত্রের ফলিত নীতিতত্ত্বের প্রথম অর্ধের অন্তর্গত একটি অংশ কেন্দ্রিক। এই অর্ধে ভারতীয় নীতিতত্ত্বের নির্বাচিত কিছু অংশ অন্তর্ভুক্ত। বর্তমান ও পরবর্তী তিনটি এককে জৈন সম্প্রদায়ের পঞ্চব্রত (অনুব্রত ও মহাব্রত) আলোচিত হবে। চতুর্থ এককে ন্যায় সম্প্রদায় সম্মত চিকীর্ষা ও দ্বেষের আলোচনা অন্তর্ভুক্ত হবে।

৪.০.২ পঞ্চব্রত

সম্যক্ দর্শন, সম্যক্ জ্ঞান এবং সম্যক্ চারিত্র্যকে জৈনদর্শনে মোক্ষমার্গ রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। সম্যক চারিত্র্যের অন্তর্গত পঞ্চব্রত জৈন নীতিতত্ত্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। পঞ্চব্রতগুলি হল যথাক্রমে অহিংসা, অনৃত বা সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, মহাবীর এই পঞ্চব্রতের উদ্‌গাতা। মহাবীরের পূর্বে পার্শ্বনাথের সময়ে চতুর্যাম ধর্ম প্রচলিত ছিল। এই চতুর্যাম ধর্ম হল— অহিংসা, অনৃত বা সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ। এখানে ব্রহ্মচর্যকে স্বতন্ত্রভাবে ব্রতরূপে গণনা করা হয়নি। এটি অপরিগ্রহ ব্রতের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত ছিল। মহাবীর তাঁর সময়কালে স্বতন্ত্র ব্রতরূপে ব্রহ্মচর্যকে পঞ্চব্রতের অন্তর্গত করেন। অনুমান করা যেতে পারে যে, পার্শ্ব এবং মহাবীরের মধ্যবর্তী সময়ে নৈতিকতা এবং সংঘের অবনমন ঘটেছিল। সম্ভবত সেই কারণেই মহাবীর পার্শ্বনাথের চতুর্যামের সঙ্গে ব্রহ্মচর্যকে যুক্ত করে জৈনধর্মে পঞ্চব্রতের প্রচলন করেন।

তত্ত্বার্থসূত্রে বলা হয়েছে হিংসা, মিথ্যাত্ব, স্তেয়, অব্রহ্মচর্য এবং পরিগ্রহ থেকে বিরত হওয়াকেই বলা বয় ব্রত। বিপরীতভাবে বললে অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ হল জৈনসম্মত পঞ্চব্রত। (১) অহিংসা হল সকল প্রকার জীবের প্রতি হিংসা বা অনিষ্ট থেকে বিরত থাকা। (২) সত্য ব্রত হল অসত্য

ভাষণ পরিত্যাগ করা এবং প্রিয়, হিতকর ও যথার্থ বাক্য প্রয়োগ করা। (৩) অস্তেয় হল দানব্যাতীত অন্য ভাবে পণ্যদ্রব্য গ্রহণ না করা। (৪) ব্রহ্মচর্য হল মৈথুন বা যৌনসম্ভোগ থেকে বিরত থাকা। (৫) অপরিগ্রহ হল আসক্তি পরিত্যাগ করা।

পঞ্চব্রতের প্রথম ব্রত হল অহিংসা। অহিংসা ব্রতের কথা সর্ব প্রথমে বলার কারণ অহিংসাই হল সকল ব্রতের ভিত্তিস্বরূপ ও মুখ্য ব্রত। অপরাপর ব্রতগুলি যথা সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ পরোক্ষভাবে অহিংসাকেই প্রতিফলিত করে। অর্থাৎ অপরাপর ব্রতগুলিতে অহিংস আচরণেরই নির্দেশ আছে। যেমন, অসত্য বা মিথ্যাবাক্য বাচিক হিংসারই নামান্তর। আবার পরদ্রব্য অপহরণ একপ্রকার হিংসাচার ছাড়া আর কিছুই নয়। অব্রহ্মচর্য অপরের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পাবে, পরিগ্রহ দ্বারা ব্যক্তি প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্রব্য অধিকার করে। ফলে অন্যেরা বঞ্চিত হয়। অপরকে বঞ্চিত করাও হিংসা। এই ব্রতগুলি কায়মনোবাক্যে পালন করা কর্তব্য।

৪.০.২.১ অনুব্রত ও মহাব্রত

একজন সন্ন্যাসীর পক্ষে এই পঞ্চব্রত যত কঠোর ও পরিপূর্ণভাবে পালন করা সম্ভব, একজন গৃহীর পক্ষে তা সম্ভব নয়। এসত্য উপলব্ধি করে জৈনগণ গৃহীর জন্য এই পঞ্চব্রতের একটি সহজ রূপ নির্দেশ করেছেন। পঞ্চব্রতের এই সহজ ও শিথিল রূপ **'অনুব্রত'** নামে পরিচিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, ব্রহ্মচর্য ব্রত অনুযায়ী একজন শ্রমণের পক্ষে সকল প্রকার যৌন সম্ভোগ নিষিদ্ধ কিন্তু একজন গৃহীর পক্ষে কেবলমাত্র পরস্ত্রী সম্ভোগ নিষিদ্ধ। আবার অহিংসা ব্রত সন্ন্যাসী বা শ্রমণের পক্ষে সর্বোতভাবে জীবের অনিষ্ঠসাধন থেকে বিরত থাকার ব্রত, কিন্তু একজন গৃহীর পক্ষে তা কেবলমাত্র ত্রস জীবের অনিষ্ঠসাধন থেকে বিরত থাকার ব্রত। তত্ত্বার্থসূত্রে বলা হয়েছে এই ব্রতগুলি (অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ) যখন শ্রাবকদের দ্বারা নিজ নিজ সামর্থ্যানুসারে আংশিক ভাবে বা নমনীয় ভাবে অনুসৃত হয় তখন তাকে বলা হয় **অনুব্রত,** আবার এই একই ব্রতসমূহ যখন সম্পূর্ণ রূপে এবং শৈথিল্যবর্জিতরূপে শ্রমণদের দ্বারা কঠোর ভাবে পালিত হয় তখন তাকে বলা হয় **মহাব্রত**। মহাব্রত হল সাধুধর্ম অর্থাৎ সাধু এবং সাধ্বীর অবশ্য পালনীয় ব্রত এবং অনুব্রত হল গার্হস্থ্যধর্ম বা শ্রাবক-শ্রবিকার অবশ্য পালনীয় ব্রত। প্রকৃতপক্ষে, মুমুক্ষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে গৃহী বা শ্রাবকজীবন, শ্রমণজীবনের ক্ষেত্রপ্রস্তুতকারীরূপেই বিবেচিত হয়। এখন আমরা শ্রাবকের পালনীয় আচরণ বিধিসমূহ বা ব্রতগুলি ক্রমান্বয়ে আলোচনা করব।

তত্ত্বার্থসূত্রে অহিংসা, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য প্রভৃতিকে নৈতিকতার ধর্ম বলা হয়েছে এবং এগুলিকে সংবরের উপায়রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রতিটি ব্রতের দুটি রূপ বা প্রকৃতি — অনাসক্তি এবং আসক্তি। অনাসক্তি সহকারে অহিংসাসাদিব্রত পালন করলে তা কর্মের আস্রবকে প্রতিহত করে কিন্তু আসক্তি সহকারে ব্রত পালন করলে শুভকর্মাস্রবের কারণ হয়। জৈনগণ মনে করেন যে, সর্বদা নিরাসক্ত হয়ে ব্রতের অনুশীলন করা কর্তব্য। আমার এখন ক্রমান্বয়ে পঞ্চব্রতের শিফিল রূপ বা পঞ্চ অনুব্রতের আলোচনা করব। প্রকৃতপক্ষে, মুমুক্ষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে গৃহী বা শ্রাবকজীবন, শ্রমণজীবনের ক্ষেত্রপ্রস্তুতকারীরূপেই বিবেচিত হয়।

৪.০.৩.১ অহিংসা : পঞ্চ অনুব্রতের প্রথম অনুব্রত

পাঁচটি অনুব্রতের প্রথম অনুব্রত অহিংসা। জৈন নীতিতত্ত্বে অনুব্রতকে বলা হয় স্থূল প্রণতিপাত বিরমণ। এই অনুব্রতে গৃহী বা শ্রাবককে স্থূল বা মুখ্য হিংসা থেকে বিরত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। সকল প্রকার জীবের প্রতি হিংসা বা অনিষ্ট থেকে বিরত থাকাই হল অহিংসা। শুধু কর্মে নয়, চিন্তা বা বাক্যেও কোন জীবের প্রতি হিংসা করা বা হিংসা কর্ম সমর্থন করা উচিত নয়। অহিংসা শধুমাত্র জৈনদর্শনেই স্থান পেয়েছে এমন নয়। মহাভারত, মনুস্মৃতি, উপনিষদ, বেদ প্রভৃতিতেও অহিংসার উল্লেখ পাওয়া যায়। আবার বৌদ্ধ, যোগ প্রভৃতি দর্শনেও কঠোরভাবে অহিংসা পালনের কথা বলা হয়েছে। তবে জৈনদর্শনে অহিংসা এক অধিক গুরুত্ব পেয়েছে এই কারণে যে জৈনদর্শনে অহিংসা একই সঙ্গে শ্রমণ ও শ্রাবকদের পক্ষে পালনীয় ধর্ম। জৈন দর্শনে হিংসা বলতে শুধুমাত্র সহিংসা কর্মকেই বোঝায় না, সহিংস চিন্তন ও সহিংস বাক্যকেও বোঝায়। জৈন দর্শনে চিন্তনজনিত হিংসা হ'ল ভাব হিংসা এবং কর্মজনিত এবং বাক্যজনিত হিংসা হ'ল দ্রব্যহিংসা। সমস্ত কর্মের মূল হ'ল চিন্তন। কর্মে প্রতিফলিত হিংসার মূল থাকে চিন্তনের মধ্যে। সুতরাং হিংসার একেবারে গোড়ার কথা হ'ল ভাবহিংসা।

বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে শুধুমাত্র হত্যা নয়, যে কোন প্রাণের প্রতি যে কোন ধরনের আঘাতই হিংসা। জীবের আলোচনা প্রসঙ্গে জৈনগণ দশটি প্রাণের উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল পঞ্চেন্দ্রিয়, মন, বাক্য, কায়, আয়ু এবং শ্বাস। এই দশটি প্রাণের যে কোনটির প্রতি আঘাতই হল হিংসা, শুধুমাত্র শরীরের প্রতি আঘাত নয়। বাক্য এবং মননের (চিন্তন) উপর আঘাত হানাও হিংসা। অপরের বাক্স্বাধীনতা হরণ বা অপরের স্বাধীন চিন্তা ভাবনায় বাধা সৃষ্টি করা, বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাউকে দিয়ে কোন কাজ করানো — এগুলি সবই হিংসা।

'অহিংসা' প্রকৃতপক্ষে একটি নঞর্থক পদ। হিংসার অভাব বা হিংসার পরিহার হল অহিংসা। হিংসার ধারণা সুপষ্ট না হলে তাই অহিংসার ধারণা স্পষ্ট হতে পারেনা। জৈন নীতিতত্ত্বে অহিংসার ব্যাখ্যায় হিংসার বিস্তৃত আলোচনা লক্ষ করা যায়। জৈনধর্মে অহিংসার পরিধি অহিংসা কর্মের গণ্ডি পেরিয়ে চিন্তা ও বাক্যেব গণ্ডিতে প্রবেশ করায় অহিংসা তথা হিংসার পরিধিও অনেক ব্যাপকতর রূপ পরিগ্রহ করেছে। জৈনশাস্ত্রে একশত আট প্রকার হিংসার পরিচয় পাওয়া যায়। সকল প্রকার হিংসার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞান ব্যতীত মুমুক্ষু ব্যক্তির পক্ষে কোন ভাবেই হিংসা পরিহার করা সম্ভব নয়। অহিংসা সংক্রান্ত আলোচনার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে আমরা এখানে জৈনসম্মত বিভিন্ন প্রকার হিংসার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে পারি।

জৈন শাস্ত্রকারগণ প্রথমে হিংসাকে তিনটি প্রধান বিভাগে ভাগ করেছেন। এই তিনটি প্রধান বিভাগ আবার বহুবিধ উপবিভাগে বিভক্ত। এই তিনটি প্রধান বিভাগ এবং তাদের উপবিভাগগুলি নিম্নরূপে উপস্থাপন করা যেতে পারে :

(১) কৃত (ব্যক্তির স্বকৃত হিংসা);

(২) কারিত (অপর ব্যক্তিকে দিয়ে হিংসাত্মক কর্ম করানোর হিংসা) এবং

(৩) অনুমোদন (অপরের হিংসাত্মক কাজকে অনুমোদন জনিত হিংসা)।

উপরিউক্ত ত্রিবিধ হিংসা আবার কায়, মন এবং বাক্য দ্বারা সম্পাদিত হতে পারে। এইভাবে হিংসার সংখ্যা হবে নয় (৩ × ৩)। এই নয় প্রকার হিংসা হল নিম্নরূপ :

কৃত — কায়, মন, বাক্য দ্বারা সম্পাদিত তিন প্রকার কৃত হিংসা,

কারিত — কায়, মন, বাক্য দ্বারা সম্পাদিত তিন প্রকার কারিত হিংসা

অনুমোদিত —কায়, মন, বাক্য দ্বারা সম্পাদিত তিন প্রকার অনুমোদিত হিংসা,

জৈন মতে হিংসার তিনটি স্তর আছে। এই তিনটি স্তর হল :

(১) সংরম্ভ (সহিংসা কার্য করার চিন্তন);

(২) সমারম্ভ (সহিংসা কার্য করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ) এবং

(৩) আরম্ভ (বাস্তবে হিংসাত্মক কার্য ঘটানো)।

উক্ত নয় প্রকার হিংসা আবার এই তিনটি স্তরে বিভক্ত হয়ে হিংসার সংখ্যা দাঁড়ায় সাতাশে। এই সাতাশ প্রকার হিংসা চারটি কষায় — ক্রোধ, মান, মায়া এবং লোভের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, মোট হিংসার সংখ্যা দাঁড়ায় (২৭ × ৪) একশো আটটি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে উক্ত একশো আট প্রকার হিংসা পরিহার করা গৃহী বা শ্রাবকদের পক্ষে সম্ভবপর নয়, তবে শ্রমণগণ এগুলি অবশ্যই পরিহার করে থাকেন।

গৃহীগণ অনাক্রমণাত্মক দ্বিন্দ্রিয়, ত্রিন্দ্রিয়, চতুরিন্দ্রিয় এবং পঞ্চেন্দ্রিয় ত্রস জীবের অনিষ্ট সাধন থেকে সারাজীবন বিরত থাকার সংকল্প গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, দ্বীন্দ্রিয় থেকে পঞ্চেন্দ্রিয় ত্রস জীব যদি আক্রমণাত্মক না হয় তাহলে ঐ সকল জীবের প্রতি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হিংসা ('সংকল্পী হিংসা') থেকে শ্রাবককে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। এরূপ বিধান বিশেষ অর্থদ্যোতক। যে ক্ষেত্রে ঐ ধরনের জীব, কোন ব্যক্তির প্রতি বা তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত অন্য বক্তির প্রতি আক্রমণাত্মক হয়, কিংবা ঐ সব জীবের প্রতি কোন আঘাত যদি অনিচ্ছাকৃত হয় বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত না হয় তাহলে ঐ সব জীবের প্রতি আঘাত এই ব্রততে নিষিদ্ধ হয়নি বা তার দ্বারা এই ব্রত লঙ্ঘন করা বোঝায় না। এই নিয়ম শুধুমাত্র গৃহীদের প্রতিই প্রযোজ্য কারণ তাঁরা সকল প্রকার হিংসা থেকে বিরত থাকতে পারে না। তাই কায়মনোবাক্য, কৃত-কারিত এবং অনুমোদনাত্মক — এই তিন প্রকারের হিংসা থেকে বিরত থাকা শ্রাবকদের কর্তব্য বলে বিবেচিত হয়েছে। বলা হয়েছে, ''দ্বিন্দ্রিয় এবং এর অধিক ইন্দ্রিয় যুক্ত জীবের প্রতি, কায়মনোবাক্য এবং কৃত-কারিত এবং মনোনত — এই ত্রিবিধ উপায় দ্বারা সংকল্পীয় হিংসা থেকে বিরত হওয়াকে বলা হয় অহিংসাব্রত। এখানে স্মরণ করা প্রয়োজন যে, শ্রমণগণ সংসারত্যাগী। সেজন্য তাঁরা যেভাবে অহিংসাব্রত পালনে সক্ষম গৃহীদের পক্ষে তা আদৌ সম্ভব নয়। কারণ গৃহীদের প্রাত্যহিক জীবনে এমন কিছু কিছু কর্ম করতেই হয়, যাতে জীবের অনিষ্ট সাধিত হয়। একথা মাথায় রেখেই গৃহীদের জন্য ব্রত শিথিল করা হয়েছে। এই শিথিলতার কারণ, প্রথমত জীবিকা বা পেশার বাধ্যবাধকতা এবং দ্বিতীয়ত শত্রুদের হাত থেকে নিজেকে এবং দেশকে রক্ষা করা। এই দুটি ক্ষেত্রেই কিছু **অবশ্যম্ভাবী হিংসা** জড়িত থাকে। এসব ক্ষেত্রে হিংসা সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে যাবার কোনো উপায় থাকে না। পেশা নির্বাচনের ক্ষেত্রে একজন গৃহী যে অবশ্যম্ভাবী হিংসার সম্মুখীন হন তাকে বলা হয় **উদ্যমী হিংসা**। শ্রাবকের উন্নতির কেবলমাত্র

অষ্টম স্তরেই (প্রতিমা) এরূপ হিংসা বর্জন করা সম্ভব। দ্বিতীয়ত, দেশরক্ষার স্বার্থে শ্রাবক যে প্রয়োজনীয় হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করে, তাকে বলা হয় **বিরোধী হিংসা**। শ্রাবকের পক্ষে তৃতীয় প্রকার অবশ্যম্ভাবী হিংসা শ্রাবকের খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে জড়িত, যেমন - রন্ধনাদি। এরূপ হিংসাকে বলা হয় **আরম্ভ হিংসা**। প্রাথমিক স্তরে আরম্ভহিংসা থেকেও বিরত থাকা শ্রাবকের পক্ষে সম্ভব হয় না। চতুর্থপ্রকার হিংসা হল **সংকল্পী হিংসা**। সংকল্পী হিংসা থেকে শ্রাবককে সর্বতোভাবে বিরত থাকার কথা বলা হয়েছে। সংকল্পী হিংসা হ'ল, কষায়ের বশবর্তী হ'য়ে কৃত হিংসা। এই ধরণের হিংসা বাস্তব জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য নয়, কর্তব্য সম্পাদনের জন্যও অত্যাবশ্যক নয়।

তবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, সংকল্প হিংসাকে বাদ দিয়ে, অপর তিনপ্রকার অবশ্যম্ভাবী হিংসা, যা শ্রাবকগণ পরিস্থিতির সম্মুখীন হ'য়ে করে থাকেন — তাও অবশেষে পরিত্যাগ করতে হয়। মুমুক্ষু ব্যক্তি যখনই আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চতর স্তরে আসীন হন, তিনি ধীরে ধীরে এই প্রকার কর্মকে কমিয়ে আনতে থাকেন এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে এগুলি থেকে বিরত হন এবং শ্রমণত্ব গ্রহণ করেন। অহিংসা ব্রত পালনের জন্য জৈনধর্মে গৃহীদের ক্ষেত্রে কতকগুলি খাদ্যগ্রহণ নিষিদ্ধ করেছেন যা জীবনধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যক নয়, একই সঙ্গে তাতে অনেক জীবের প্রাণহানি হয়। যেমন, উপরিউক্ত মদ, মাংস বা মধু প্রভৃতি গ্রহণের ক্ষেত্রে এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য। মদ প্রস্তুত কালে মদে প্রচুর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবাণু জন্মে যা মদকে গেঁজিয়ে তুলতে সাহায্য করে। মদ গ্রহণ করলে ঐ জীব গুলির প্রাণ নাশ হয়। আবার মধু সংগ্রহ কালেও বহু জীবের প্রাণ ধ্বংস হয়। আর মাংস ভক্ষণে তো সরাসরি জীবের প্রাণনাশের কারণ হয়। এমনকি মাখনেও প্রচুর জীবাণু থাকে বলে জৈনরা বিশ্বাস করেন, সেজন্য মাখন গ্রহণেও নিষিদ্ধ হয়েছে। আর মধু, মদ, এবং মাংস সহযোগে মাখনকে বলা হয়েছে 'মহাবিকৃতি'। এছাড়া পাঁচপ্রকার উদুম্বর ফল (ডুমুর জাতীয় অধিক দানা ও বীজযুক্ত ফল) শ্রাবকদের পক্ষে বর্জনীয়। এগুলিকে বলা হয় মূল গুণ। এছাড়া রাত্রিভোজন থেকে বিরত হওয়াও মূলগুণের অন্তর্ভুক্ত।

৪.০.৩.২. অহিংসানুব্রতের অতিচার

অতিচারের অর্থ ব্রত লঙ্ঘমজনিত দোষ। জৈনশাস্ত্রে প্রতিটি অনুব্রতেরই পাঁচটি ক'রে অতিচার উল্লেখ আছে। অহিংসা অনুব্রতের অতিচার গুলি হল — (১) বন্ধ, (২) বধ, (৩) চবিচ্ছেদ, (৪) অতিভাররোপণ এবং (৫) অন্নপান নিরোধ।

(১) বন্ধ—হল গবাদি পশু প্রভৃতিকে বেঁধে রাখা।

(২) বধ—হল প্রাণীকে কষ্ট দেওয়া। যেমন অত্যধিক প্রহার করা।

(৩) চবিচ্ছেদ—হল প্রাণীর শরীর থেকে কোন অঙ্গ কেটে নেওয়া। তবে কোন ডাক্তার যদি চিকিৎসার্থে তা করেন তা অতিচারের অন্তর্ভুক্ত হয় না।

(৪) অতিভার রোপন—হল প্রাণী বা ভৃত্যের উপর অতিরিক্ত ভার চাপিয়ে দেওয়া।

(৫) অন্নপাননিরোধ—হল জীবের অনিষ্ট সাধনের অভিপ্রায় খাদ্য ও পানীয় থেকে বঞ্চিত করা হল অন্নপাননিরোধ। তবে চিকিৎসাধীন জীবের ক্ষেত্রে এটি অতিচার অন্তর্ভুক্ত হয় না।

ধর্মের ক্ষেত্রেও হিংসাকে জৈনরা সমর্থন করেন না। তাঁদের মতে, তথাকথিত ধর্মীয় আচরণের নিমিত্ত পশুহত্যা সমর্থনযোগ্য নয়। প্রতিটি ধর্মের অভ্যন্তরীণ নীতি হ'ল অহিংসা, দয়া এবং প্রেম। তথাপি বহু ক্ষেত্রে আমরা ধর্মের নামে বহু হিংসাত্মক কার্যকলাপ লক্ষ করি। জৈনরা প্রবলভাবে এই হিংসাত্মক কার্যকলাপের বিরোধিতা করেন।

৪.৩.২. সারাংশ

জৈনধর্ম একাধারে সন্ন্যাস ও গার্হস্থ্ধর্ম। শ্রমণদের জন্য নির্দেশিত যথার্থ আচরণ বা ধর্ম 'সাধুধর্ম' এবং শ্রাবক বা সাধারণ মানুষের জন্য নির্দেশিত যথার্থ আচরণ বা ধর্ম 'গৃহস্থধর্ম' নামে পরিচিত। যাঁরা শ্রম বা তপস্যা দ্বারা জগতকে জয় করেন তাঁদের বলা হয় শ্রমণ। শ্রমণদের ধর্মকে বলা হয় শ্রমণধর্ম। 'শ্রাবক' শব্দের অর্থ হ'ল জৈন ধর্মাবলম্বী সাধারণ মানুষ। জৈনধর্ম মূলত: একটি শ্রমণ ধর্ম।

সম্যক্ দর্শন, সম্যক্ জ্ঞান এবং সম্যক্ চারিত্র্যকে জৈনদর্শনে মোক্ষমার্গরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। সম্যক্ চারিত্র্যের অন্তর্গত পঞ্চব্রত জৈন নীতিতত্ত্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। পঞ্চব্রতগুলি হল যথাক্রমে **অহিংসা, অনৃত বা সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ**। তত্ত্বার্থসূত্রে বলা হয়েছে হিংসা, মিথ্যাত্ব, স্তেয়, অব্রহ্মচর্য এবং পরিগ্রহ থেকে বিরত হওয়াকেই বলা হয় ব্রত। বিপরীতভাবে বললে অহিংসা, ,সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ হল জৈনসম্মত পঞ্চব্রত। (১) অহিংসা হল সকল প্রকার জীবের প্রতি হিংসা বা অনিষ্ট বিরত থাকা। (২) সত্য ব্রত হল অসত্য ভাষণ পরিত্যাগ করা এবং প্রিয়, হিতকর ও যথার্থ বাক্য প্রয়োগ করা। (৩) অস্তেয় হল দানব্যতীত অন্যভাবে পন্যদব্য গ্রহণ না করা। (৪) ব্রহ্মচর্য হল মৈথুন বা যৌনসম্ভোগ থেকে বিরত থাকা। (৫) অপরিগ্রহ হল আসক্তি পরিত্যাগ করা। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, মহাবীর এই পঞ্চব্রতের উদ্‌গাতা। মহাবীরের পূর্বে পার্শ্বনাথের সময়ে চাতুর্যাম সময়ে চাতুর্যাম ধর্ম প্রচলিত ছিল। এই চাতুর্যাম ধর্ম হল- অহিংসা, সত্য, অস্তেয় এবং অপরিগ্রহ। এখানে বহ্মচর্যকে স্বতন্ত্রভাবে ব্রতরূপে গণনা করা হয় নি। এটি অপরিগ্রহ ব্রতের মধ্যেই অন্তর্ভূক্ত ছিল। মহাবীর তাঁর সময়কালে স্বতন্ত্র ব্রতরূপে ব্রহ্মচর্যকে পঞ্চব্রতের মধ্যেই অন্তর্ভূক্ত ছিল। মহাবীর তাঁর সময়কালে   স্বতন্ত্র ব্রতরূপে ব্রহ্মচর্যকে পঞ্চব্রতের অন্তগর্ত করেন। তত্ত্বার্থসূত্রে বলা হয়েছে হিংসা, মিথাত্ব, স্তেয়, অব্রহ্মচর্য এবং পরিগ্রহ থেকে বিরত হওয়াকেই বলা হয় ব্রত। বিপরীতভাবে বললে অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহই হল পঞ্চ ব্রত।

পঞ্চব্রতের প্রথম ব্রত হল অহিংসা। অহিংসা ব্রতের কথা সর্ব প্রথমে বলার কারণ অহিংসাই হল সকল ব্রতের ভিত্তস্বরূপ ও মুখ্য ব্রত। অপরাপর ব্রতগুলিতে যথা সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ পরোক্ষভাবে অহিংসাকেই প্রতিফলিত করে। অর্থাৎ অপরাপর ব্রতগুলিতে অহিংস আচরণেই নির্দেশ আছে। যেমন; অসত্য বা মিথ্যাবাক্য বাচিক হিংসারই নামান্তর। আবার পরদ্রব্য অপহরণ এক প্রকার হিংসাচার ছাড়া আর কিছুই নয়। অবহ্মচর্য অপরের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে, পরিগ্রহ দ্বারা ব্যাক্তি প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্রব্য অধিকার করে। ফলে অন্যেরা বঞ্চিত হয়। অপরকে বঞ্চিত করাও হিংসা। এই ব্রতগুলি কায়মনোবাক্যে পালন করা কর্তব্য। তবে একজন সন্ন্যাসীর পক্ষে এই পঞ্চব্রত যত কঠোর ও পরিপূর্ণভাবে পালন করা সম্ভব, একজন গৃহীর পক্ষে তা সম্ভব নয়। এসত্য উপলব্ধি করে জৈনগণ গৃহীর জন্য এই পঞ্চব্রতের একটি সহজ রূপ নির্দেশ করেছেন। পঞ্চব্রতের

এই সহজ ও শিথিল রূপ '**অনুব্রত**' নামে পরিচিত। অহিংসা ব্রত সন্ন্যাসী বা শ্রমণের পক্ষে সর্বোতভাবে জীবের অনিষ্ঠসাধন থেকে বিরত থাকার ব্রত, কিন্তু একজন গৃহীর পক্ষে তা কেবলমাত্র ত্রস জীবের অনিষ্ঠসাধন থেকে বিরত থাকা ব্রত। তত্ত্বার্থসূত্রে বলা হয়েছে এই ব্রতগুলি (অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ) যখন শ্রাবকদের দ্বারা নিজ নিজ সামর্থ্যানুসারে আংশিক ভাবে বা নমনীয় ভাবে অনুসৃত হয় তখন তাকে বলা হয় অনুব্রত, আবার এই একই ব্রতসমূহ যখন সম্পূর্ণ রূপে এবং শৈথিল্যবর্জিতরূপে শ্রমণদের দ্বারা কঠোর ভাবে পালিত হয় তখন তাকে বলা হয় **মহাব্রত**।

জৈন দর্শনে হিংসা বলতে শুধুমাত্র সহিংস কর্মকেই বোঝায় না, সহিংস চিন্তন ও সহিংস বাক্যকেও বোঝায়। জৈন দর্শনে চিন্তনজনিত হিংসা হ'ল ভাব হিংসা এবং কর্মজনিত এবং বাক্যজনিত হিংসা হ'ল দ্রব্যহিংসা। সমস্ত কর্মের মূল হ'ল চিন্তন। কর্মে প্রতিফলিত হিংসার মূল থাকে চিন্তনের মধ্যে। সুতরাং হিংসার একেবারে গোড়ার কথা হ'ল ভাবহিংসা।

জীবের আলোচনা প্রসঙ্গে জৈনগণ দশটি প্রাণের উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল পঞ্চেন্দ্রিয়, মন, বাক্য, কায়, আয়ু, এবং শ্বাস। এই দশটি প্রাণের যে কোনটির প্রতি আঘাতই হল হিংসা, শুধুমাত্র শরীরের প্রতি আঘাত নয়। বাক্য এবং মননের (চিন্তন) উপর আঘাত হানাও হিংসা। অপরের বাক্‌স্বাধীনতা হরণ বা অপরের স্বাধীন চিন্তা ভাবনায় বাধা সৃষ্টি করা, বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাউকে দিয়ে কোন কাজ করানো- এগুলি সবই হিংসা।

'অহিংসা' প্রকৃতপক্ষে একটি নঞর্থক পদ। হিংসার অভাব বা হিংসার পরিহার হল অহিংসা। হিংসার ধারণা সুস্পষ্ট না হলে তাই অহিংসার ধারণা স্পষ্ট হতে পারেনা। জৈন নীতিতত্ত্বে অহিংসার ব্যাখ্যায় হিংসার বিস্তৃত আলোচনা লক্ষ করা যায়। জৈন শাস্ত্রকারগণ প্রথমে হিংসাকে তিনটি প্রধান বিভাগে ভাগ করেছেন। এই তিনটি প্রধান বিভাগ আবার বহুবিধ উপবিভাগে বিভক্ত। এই তিনটি প্রধান বিভাগ এবং তাদের উপবিবাগগুলি নিম্নরূপে উপস্থাপন করা যেতে পারে:

(১) কৃত (ব্যক্তির স্বকৃত হিংসা);

(২) কারিত (অপর ব্যক্তিকে দিয়ে হিংসাত্মক কর্ম করানোর হিংসা) এবং

(৩) অনুমোদন (অপরের হিংসাত্মক কাজকে অনুমোদনজনিত হিংসা)।

উপরি উক্ত ত্রিবিধ হিংসা আবার কায়, মন এবং বাক্য দ্বারা সম্পাদিত হতে পারে। এইভাবে হিংসার সংখ্যা হবে নয় (৩ * ৩)। এই নয় প্রকার হিংসা আবার (১) সংরম্ভ (সহিংস কার্য করার চিন্তন); (২) সমারম্ভ (সহিংস কার্য করার জন্য উদ্যেগ গ্রহণ) এবং (৩) আরম্ভ (বাস্তবে হিংসাত্মক কার্য ঘটানো)-- এই তিনটি স্তরে বিভক্ত হয়ে হিংসার সংখ্যা দাঁড়ায় সাতাশ। এই সাতাশপ্রকার হিংসা চারটি কষায় - ক্রোধ, মানা, মায়া, এবং লোভের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, মোট হিংসার সংখ্যা দাঁড়ায় (২ * ৪) একশ আটটি।

শ্রমণগণ সংসারত্যাগী। সেজন্য তাঁরা যেভাবে অহিংসাব্রত পালনে সক্ষম গৃহীদের পক্ষে তা আদৌ সম্ভব নয়। কারণ গৃহীদের প্রাত্যহিক জীবনে এমন কিছু কিছু কর্ম করতেই, হয়, যাতে জীবের অনিষ্ট সাধিত হয়। একথা মাথায় রেখেই গৃহীদের জন্য ব্রত শিথিল করা হয়েছে। এই শিথিলতার কারণ প্রথমতঃ জীবিকা বা

পেশার বাধ্যবাধকতা এবং দ্বিতীয়তঃ শত্রুদের হাত থেকে নিজেকে এবং দেশকে রক্ষা করা। এই দুটি ক্ষেত্রেই কিছু অবশ্যম্ভাবী হিংসা জড়িত থাকে। এসব ক্ষেত্রে হিংসা সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে যাবার কোন উপায় থাকে না। পেশা নির্বাচনের ক্ষেত্রে একজন গৃহী যে অবশ্যম্ভাবী হিংসার সম্মুখীন হন তাকে বলা হয় উদ্যমী হিংসা। শ্রাবকের উন্নতির কেবলমাত্র অষ্টম স্তরেই (প্রতিমা) এরূপ হিংসা বর্জন করা সম্ভব। দেশরক্ষার স্বার্থে শ্রাবক সে প্রয়োজনীয় হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করে, তাকে বলা হয় বিরোধী হিংসা। শ্রাবকের পক্ষে তৃতীয় প্রকার অবশ্যম্ভাবী হিংসা শ্রাবকের খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে জড়িত, যেমন— রন্ধনাদি। এরূপ হিংসাকে বলা হয় আরম্ভহিংসা। প্রাথমিক স্তরে আরম্ভহিংসা থেকেও বিরত থাকা শ্রাবকের পক্ষে সম্ভব হয় না। চতুর্থপ্রকার হিংসা হল সংকল্পী হিংসা। সংকল্পী থেকে শ্রাবককে সর্বতোভাবে বিরত থাকার কথা বলা হয়েছে। সংকল্পীহিংসা হ'ল, কষায়ের বশবর্তী হ'য়ে কৃত হিংসা। এই ধরণের হিংসা বাস্তব জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য নয়, কর্তব্য সম্পাদনের জন্যও অত্যাবশ্যক নয়। তবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, সংকল্পী হিংসাকে বাদ দিয়ে, অপর তিনপ্রকার অবশ্যম্ভাবী হিংসা, যা শ্রাবকগণ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে, বাধ্য হয়ে করে থাকেন— তাও অবশেষে পরিত্যাগ করতে হয়।

৪.০.৫. কতিপয় শব্দের অর্থ

জিন

'জিন' শব্দের অর্থ যিনি 'জয় করেছেন'। এ জয় যুদ্ধ-জয় নয়, কামনা বাসনায় জয়। যিনি কামনা-বাসনা, রাগ-দ্বেষাদি জয় করেছেন তিনিই জিন। জিনদের দ্বারা প্রবর্ত্তিত বলে এই ধর্মের মান জৈনধর্ম।

তীর্থঙ্কর

যিনি চতুর্বিধ তীর্থ বা সংঘ স্থাপন ক'রে তাদের নিয়মাবিদ্ধ করেন তিনিই তীর্থঙ্কর। জৈনদর্শনে জিনদের 'অর্হৎ' বা 'তীর্থঙ্কর' নামে অভিহিত করা হয়।

শ্রমণ

'শ্রমণ' বলতে বোঝায় জৈনধর্মাবলম্বী সাধু বা সন্নাসী। যাঁরা শ্রম বা তপস্যা দ্বারা জগতকে জয় করেন তাঁদের বলা হয় শ্রমণ। শ্রমণের ধর্মকে বলা শ্রমণধর্ম। লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, জৈনধর্ম মূলত: একটি শ্রমণ ধর্ম।

শ্রাবক

'শ্রাবক' শব্দের অর্থ হ'ল ধর্মাবলম্বী সাধারণ মানুষ। 'শ্রাবক' শব্দটি জৈন টীকাকারগণ নানা ভাবে ব্যাখ্যা করে থাকেন। তপাগচ্ছীয় রত্নশেখর তাঁর 'শ্রাদ্ধবিধি' নামক গ্রন্থে 'শ্রাবক' শব্দের তিনটি ভিন্ন অর্থ দিয়েছেন। প্রথমত, ধাতুগত দিক থেকে 'শ্রাবক' শব্দটি 'শ্রু' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন। সমাস নিষ্পন্ন 'শ্রাবক' শব্দের অর্থ 'শ্রোতা'। যিনি গুরুর উপদেশ শ্রবণ করেন তিনিই শ্রাবক। দ্বিতীয়ত, 'শ্রাবক' শব্দের বিশেষণগত অর্থ হল যার পাপ ধুয়ে মুছে যায় (শ্রবন্তি যস্য পাপানি)। তৃতীয়ত, আশ্রয়ের দিক থেকে 'শ্রাবক' শব্দের অর্থ হল ধর্মের আশ্রয় বা ধর্মী (শ্রদ্ধালুতাং শ্রাতি ইতি শ্রাবকঃ)। শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস সহকারে যিনি ধর্মকে আশ্রয় করে থাকেন তিনিই শ্রাবক। যে অর্থই গ্রহণ করা হোক না কেন শেষ পর্যন্ত শ্রাবক বলতে জৈন ধর্মাবলম্বী বা জৈন ধর্মে বিশ্বাসী সাধারণ মানুষকেই বোঝান হয়।

অনুব্রত

জৈনগণ গৃহীর জন্য পঞ্চব্রতের একটি সহজ ও শিথিল রূপ নির্দেশ করেছেন। পঞ্চব্রতের এই সহজ ও শিথিল রূপ '**অনুব্রত**' নামে পরিচিত। তত্ত্বার্থসূত্রে বলা হয়েছে এই ব্রতগুলি (অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ) যখন শ্রাবকদের দ্বারা নিজ নিজ সামর্থ্যানুসারে আংশিক ভাবে বা নমনীয় ভাবে অনুসৃত হয় তাকে বলা হয় অনুব্রত।

মহাব্রত

ব্রতসমূহ যখন সম্পূর্ণ রূপে এবং শৈথিল্যবর্জিতরূপে শ্রমণদের দ্বারা কঠোর ভাবে পালিত হয় তখন তাকে বলা হয় **মহাব্রত**। মহাব্রত হল সাধুধর্ম অর্থাৎ সাধু এবং সাধ্বীর অবশ্য পালনীয় ব্রত এবং অনুব্রত হল গৃহস্থধর্ম বা শ্রাবক-শ্রাবিকার অবশ্য পালনীয় ব্রত।

জৈনধর্ম একাধারে সন্ন্যাস ও গৃহস্থধর্ম বা শ্রাবক-শ্রবিকার অবশ্য পালনীয় ব্রত।

জৈনধর্ম একাধারে সন্ন্যাস ও গৃহস্থধর্ম।

সাধুধর্ম

শ্রমণদের জন্য নির্দেশিত যথার্থ আচরণ বা ধর্ম হল সাধুধর্ম।

গৃহস্থধর্ম

শ্রাবক বা সাধারণ মানুষের জন্য নির্দেশিত যথার্থ আচারণ বা ধর্ম হল গৃহস্থধর্ম।

অতিচার

অতিচারের অর্থ ব্রত লঙ্ঘনজনিত দোষ। জৈনশাস্ত্রে প্রতিটি অনুব্রতেরই পাঁচটি ক'রে অতিচারের উল্লেখ আছে।

উদ্যমী হিংসা

পেশা নির্বাচনের ক্ষেত্রে একজন গৃহী যে অবশ্যম্ভাবী হিংসার সম্মুখীন হন তাকে বলা হয় উদ্যমী হিংসা।

বিরোধী হিংসা

দেশরক্ষার স্বার্থে শ্রাবক যে প্রয়োজনীয় হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করে, তাকে বলা হয় বিরোধী হিংসা।

আরম্ভহিংসা

যে অবশ্যম্ভাবী হিংসা শ্রাবকের খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে জড়িত তাকে বলা হয় আরম্ভহিংসা।

সংকল্পী হিংসা

সংকল্পীহিংসা হ'ল, কষায়ের বশবর্তী হ'য়ে কৃত হিংসা।

চবিচ্ছেদ

চবিচ্ছেদ হল প্রাণীর শরীর থেকে কোন অঙ্গ কেটে নেওয়া হল প্রাণীর শরীর থেকে অঙ্গ কেটে নেওয়া।

৪.০.৬. সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

1. What is *vrata?*
2. What are the different constituent *vrata-s of pañchavrata?*
3. What is ment by *aticāra?*
4. Who is a *srāvaka?*
5. Who is a *sramana*?
6. What is *bhāva himsā*?
7. What is *dravya himsā*?
8. What is *kanyālika?*
9. What is *gabāñka*?
10. What is *bhumi alīka*?
11. What is *svapanmrsā*?
12. What is *birodhi himsā*?
13. What is cabiccheda?
14. What is udyami *himsā*?

রচনাধর্মী প্রশ্ন :

1. Explain, in brief, the *pañca* anvrata of the jainas.
2. Explan *ahimsā* as one of the *anuvrata-s* of the Jainas. What are the different types of *aticāra* of *ahimsā* anuvratavrata?
3. Distinguish between *anuvrata* and *mahāvrata*. Explain *sarya* as one of the *anuvrata-s* of the Jainas.

৪.০.৭. গ্রন্থপঞ্জী

১। মহাপ্রজ্ঞ আচার্য্য অহিংসার এক অদৃশ্য দিক, পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশি০০০ক অনুব্রত সমিতি, ১৯৯৮।

২। মুনিজী, শ্রীসুজয, জৈনধর্ম ও শাসনাবলী, শ্রীঅখিলভারতীয় স্বারক জৈন সংগঠন, ১ম সংস্করণ, ৬ই মে ২০০০।

৩। শ্যামসুখা, পূরণচাঁদ, ভগবান মহাবীর ও জৈনধর্ম, জৈনভবন, কলিকাতা, ১ম প্রকাশ, কার্তিক, ১৩৮১।

৪। সেন, অমূল্যচন্দ্র, জৈনধর্ম, বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ, ১ম প্রকাশ ১৩৫৮, শ্রাবণ।

5. Ahimsa, Anekanta and Jainism, Sethia Tara (ed.), Motilal Banarsidass, Delhi, 1st Edition 2004.

6. Babb, A. Lawrence, Ascetics and King in a jain Ritual Culture, Motilal Banarshidass, Delhi, 1st Indian Edition 1998.

7. Bhargava, Dayanand, Jaina Ethics, Motilal Banarsidass, Delhi, 1st Edition 1968.

8. Stevenson, Sinclair, The Heart of Jainism, Munshiram Monaharlal, New Delhi, 1st Indian Edition, Nov. 1970.

9. Studies in Jainism, The Ramkrishna Mission Institute of Culture, 1st Edition 1997.

10. Tattvartha Sutra That Which Is, Trance. By Tatia, Nathmal, Motilal Banarsidass, Delhi, 1st Indian Edition 2007.

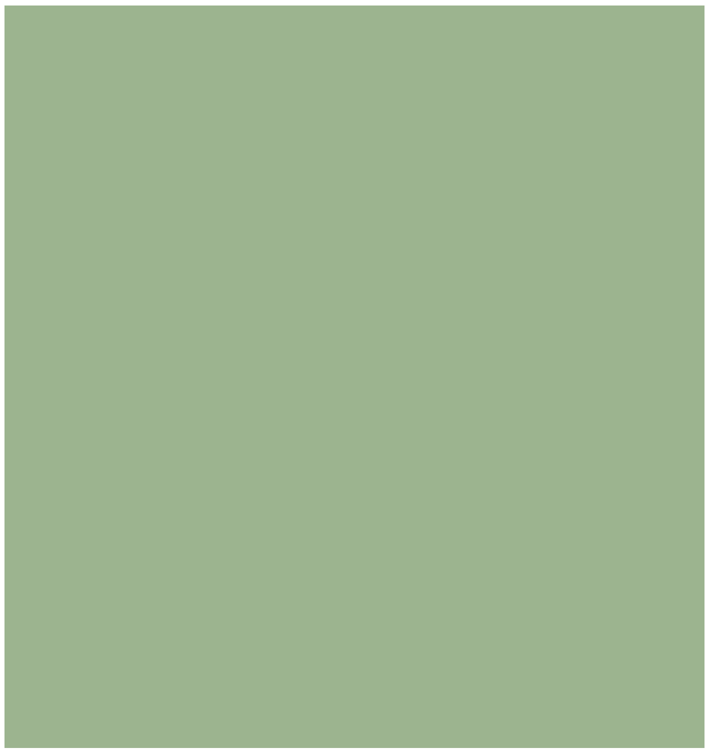

একক - ৫

সত্য অনুব্রত

বিষয়-সূচী

৫.০.১ অনৃত বা সত্য ঃ পঞ্চ অনুব্রতের দ্বিতীয় অনুব্রত

৫.০.১.১ পঞ্চবিধ মিথ্যা

৫.০.১.২ সত্যানুব্রতের অতিচার

৫.০.২ সারাংশ

৫.০.৩ কতিপয় শব্দের অর্থ

৫.০.৪ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৫.০.৫ গ্রন্থপঞ্জী

৫.০.১ অনৃত বা সত্য ঃ পঞ্চ অনুব্রতের দ্বিতীয় অনুব্রত

জৈনশাস্ত্রে সত্যবাদিতাকে মহৎগুণরূপে অভিহিত করা হয়েছে। একজন মিথ্যাবাদী এজন্মে এবং পরজন্মেও দুঃখ ভোগ করে থাকেন। একজন সত্যবাদী কখনোই বক্তব্যকে অতিরঞ্জিত করেন না এবং অভদ্র বা অশ্লীল বাক্য বলেন না। সর্বদা উপকারী বাক্য, সমতাপূর্ণ বাক্য এবং সহানুভূতিশীল বাক্য ব্যবহারই সত্যব্রতের আদর্শ। সত্যানুব্রতের অর্থ হল সর্বপ্রকার মিথ্যা থেকে বিরত থাকা। মিথ্যা থেকে সর্বতোভাবে বিরত থাকতে হলে মিথ্যা সম্বন্ধে সম্যক পরিচয় থাকা প্রয়োজন। সত্যানুব্রতের আলোচনায় স্বাভাবিকভাবেই তাই মিথ্যার আলোচনা এসে পড়ে।

৫.০.১.১ পঞ্চবিধ মিথ্যা

জৈন শাস্ত্রে পঞ্চবিধ মিথ্যা থেকে গৃহস্থ বা শ্রাবককে বিরত থাকার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এই পঞ্চবিধ মিথ্যা হল নিম্নরূপ ;

(১) কন্যালীক,

(২) গবালীক,

(৩) **ভূমি-অলীক,**

(৪) **স্থাপনমৃষা,** এবং

(৫) **কূটসাক্ষ্য।**

কন্যালীক

কন্যালীক হল বৈবাহিক বিষয়ে মিথ্যা ভাষণ। বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে অনেক সময় কন্যাপক্ষ তাঁদের কন্যার দোষগুলি গোপন করেন এবং গুণগুলিকে অতিরঞ্জিত ক'রে পাত্রপক্ষের সামনে উপস্থাপন করেন— এটিই কন্যালীক মিথ্যাচার। এই ধরনের মিথ্যাচার থেকে বিরত থাকাই সত্যানুব্রত। বিয়ের ক্ষেত্রে শ্রাবক কখনোই, মেয়ের বয়স, রূপ বা শারীরিক প্রতিবন্ধকতা গোপন করবেন না।

গবালীক

গবালীকের অর্থ হ'ল গবাদিপশু যেমন- গোরু, ঘোড়া প্রভৃতি বিনিময়ের ক্ষেত্রে পশুগুলির শক্তি-সামর্থ্য সম্বন্ধে মিথ্যাভাষণ। সত্যব্রতটি বাণিজ্যিক সততার সঙ্গে যুক্ত। একজন শ্রাবকের পক্ষে গবাদি পশু বিক্রয় বা বিনিময়ের সময় পশুগুলি বাস্তবে যে পরিমাণ গুণসম্পন্ন, তার থেকে বেশি গুণসম্পন্ন বলা উচিত নয়।

ভূমি-অলীক

ভূমি-অলীকের অর্থ হ'ল, জমি বিনিময়ের ক্ষেত্রে মিথ্যাভাষণ এবং জমির স্বত্ব প্রমাণাদি বিষয়ে মিথ্যাভাষণ বা মিথ্যাচার। সত্যানুব্রত এই ধরনের মিথ্যাচার থেকে শ্রাবককে বিরত থাকতে নির্দেশ দেয়।

স্থাপনমৃষা

স্থাপনমৃষার অর্থ হ'ল গচ্ছিত বিষয়ের অপব্যবহার এবং গচ্ছিত বিষয় প্রত্যর্পণ করতে শ্রাবকের অনীহা। একজন শ্রাবকের পক্ষে গচ্ছিত বিষয়ের অপব্যবহার করা ও গচ্ছিত প্রত্যর্পণ করতে অনীহা থাকা উচিত নয়।

কূটসাক্ষ্য

কূটসাক্ষ্যের অর্থ হ'ল আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা। আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। একজন শ্রাবকের এরূপ কাজ করা উচিত নয়।

উমাস্বাতি মিথ্যাচরণের তুলনামূলকভাবে একটি সংক্ষিপ্ত প্রকারভেদ উল্লেখ করেছেন। প্রকারভেদটি নিম্নরূপঃ

(১) **সত্যের অস্বীকৃতি,**

(২) **খামখেয়ালি উক্তি,** এবং

(৩) **নীচ মন্তব্য।**

(১) সত্যের অস্বীকৃতির অর্থ হ'ল মিথ্যা বক্তব্যের দ্বারা সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আত্মা ও পারলৌকিক বলে কিছু নেই বলে দাবি করা।

(২) খামখেয়ালি উক্তি হল গোরুকে ঘোড়া বা ঘোড়াকে গোরু বলে দাবি করা।

(৩) নীচ মন্তব্য হল অপরের প্রতি বেদনাদায়ক মন্তব্য। কর্কশ বাক্যপ্রয়োগ, পরনিন্দা, প্রভৃতিকে বলা হয় নীচ মন্তব্য।

জৈন নীতিতত্ত্বে সত্যতা ও মিথ্যাত্বের সংমিশ্রণের উপর ভিত্তি ক'রে বাক্যের একটি শ্রেণীবিভাগ লক্ষ করা যায়। শ্রেণীবিভাগটি নিম্নরূপ ঃ

(১) সত্যসত্য অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে সত্য,

(২) অসত্যসত্য অর্থাৎ সত্যতা ও মিথ্যাত্বর সংমিশ্রণে যেখানে মিথ্যাত্বের প্রাধান্য,

(৩) সত্যাসত্য - সত্যতা ও মিথ্যাত্বের সংমিশ্রণ যেখানে সত্যতার প্রাধান্য, এবং

(৪) অসত্যাসত্য - সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা।

এই চার প্রকার বাক্যের মধ্যে কেবল প্রথম বাক্যই সত্যানুব্রতীর ব্যবহার করা উচিত।

৫.০.১.২ সত্যানুব্রতের অতিচার

তত্ত্বার্থসূত্রে সত্যানুব্রতের পাঁচটি অতিচারের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই পাঁচটি অতিচার হল ঃ

(১) মিথ্যা উপদেশ

(২) রহস্য আভ্যাখ্যান

(৩) কূটলেখ ক্রিয়া

(৪) ন্যাসাপহার

(৫) সাকারমন্ত্রভেদ

মিথ্যোপদেশ

মিথ্যোপদেশ হ'ল এমন বাক্য, কথন যা অপরের ভোগান্তির কারণ হ'তে পারে অথবা এমন বাক্য উচ্চারণ যা কোন বিতর্কে জয়লাভের জন্য অসৎপথের নির্দেশ প্রদান করে। মিথ্যোপদেশ মোক্ষ বা স্বর্গ প্রাপ্তির পক্ষে হানিকর।

রহস্য আভ্যাখ্যান

রহস্যাভ্যাখ্যান হ'ল অপরের গোপন কার্যাবলী প্রকাশ করা। একজনের গোপন কার্যাবলী কর্তার নিজস্ব ব্যাপার। একজনের গোপনতা অন্যের ভঙ্গ করা উচিত নয়।

কূটলেখ ক্রিয়া

যা প্রকৃতপক্ষে একজন বলেননি বা করেননি তা ঐ ব্যক্তি বলেছেন বা করেছেন বলে লিখিত যে অভিযোগ তাকে বলা হয় কূটলেখ ক্রিয়া।

ন্যাসাপহার

তত্ত্বার্থসূত্রানুসারে চতুর্থ প্রকার অতিচার হ'ল ন্যাসাপহার। এর অর্থ হ'ল, গচ্ছিত বিষয় সম্পর্কে অসততা। উদাহরণস্বরূপে বলা যায়, একজন ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির কাছে পাঁচশ টাকা গচ্ছিত রাখার পর ভুলে যান সে ঠিক কত টাকা জমা রেখেছেন। এমতাবস্থায় যদি দ্বিতীয় ব্যক্তিটি তাঁকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে বলেন যে, প্রথম ব্যক্তি তার কাছে মাত্র চারশ টাকা গচ্ছিত রেখেছিলেন তাহলে তার এই অসততাকে বলা হয় ন্যাসাপহার।

সাকারমন্ত্রভেদ

তত্ত্বার্থসূত্রানুসারে সত্যানুব্রতের পঞ্চম অতিচার হ'ল সাকারমন্ত্রভেদ। এর অর্থ কোন ব্যক্তির মুখাবয়বের অভিব্যক্তি দেখে তার অভিপ্রায় অনুমান ক'রে তা অন্যের নিকট ব্যক্ত করা।

৫.০.২ সারাংশ

সত্য ঃ পঞ্চ অনুব্রতের দ্বিতীয় অনুব্রত

জৈনশাস্ত্রে সত্যবাদিতাকে মহৎগুণরূপে অভিহিত করা হয়েছে। একজন সত্যবাদী কখনোই বক্তব্যকে অতিরঞ্জিত করেন না এবং অভদ্র বা অশ্লীল বাক্য বলেন না। সত্যানুব্রতের অর্থ হল সর্বপ্রকার মিথ্যা থেকে বিরত থাকা। সত্যানুব্রতের আলোচনায় স্বাভাবিকভাবেই তাই মিথ্যার আলোচনা এসে পড়ে। জৈন শাস্ত্রে পঞ্চবিধ মিথ্যা থেকে গৃহস্থ বা শ্রাবককে বিরত থাকার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এই পঞ্চবিধ মিথ্যা হল নিম্নরূপ;

(১) কন্যালীক,

(২) গবালীক,

(৩) ভূমি-অলীক,

(৪) স্থাপনমৃষা, এবং

(৫) কূটসাক্ষ্য।

উমাস্বাতি মিথ্যাচরণের তুলনামূলকভাবে একটি সংক্ষিপ্ত প্রকারভেদ উল্লেখ করেছেন। প্রকারভেদটি নিম্নরূপ ঃ

(১) সত্যের অস্বীকৃতি,

(২) খামখেয়ালি উক্তি, এবং

(৩) নীচ মন্তব্য।

তত্ত্বার্থসূত্রে সত্যানুব্রতের পাঁচটি অতিচারের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই পাঁচটি অতিচার হল ঃ

(১) মিথ্যা উপদেশ

(২) রহস্য আভ্যাখ্যান

(৩) কূটলেখ ক্রিয়া

(৪) ন্যাসাপহার

(৫) সাকারমন্ত্রভেদ।

জৈন নীতিতত্ত্বে সত্যতা ও মিথ্যাত্বের সংমিশ্রণের উপর ভিত্তি ক'রে বাক্যের একটি শ্রেণীবিভাগ লক্ষ করা যায়। শ্রেণীবিভাগটি নিম্নরূপ ঃ

(১) সত্যসত্য অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে সত্য,

(২) অসত্যসত্য অর্থাৎ সত্যতা ও মিথ্যাত্বর সংমিশ্রণে যেখানে মিথ্যাত্বের প্রাধান্য,

(৩) সত্যাসত্য - সত্যতা ও মিথ্যাত্বের সংমিশ্রণ যেখানে সত্যতার প্রাধান্য, এবং

(৪) অসত্যাসত্য - সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা।

৫.০.৩ কতিপয় শব্দের অর্থ

সত্যানুব্রত

সত্যানুব্রতের অর্থ হল সর্বপ্রকার মিথ্যা থেকে বিরত থাকা।

কন্যালীক

কন্যালীক হল বৈবাহিক বিষয়ে মিথ্যাভাষণ।

গবালীক

গবালীকের অর্থ হ'ল গবাদিপশু যেমন- গোরু, ঘোড়া প্রভৃতি বিনিময়ের ক্ষেত্রে পশুগুলির শক্তি-সামর্থ্য সম্বন্ধে মিথ্যাভাষণ।

ভূমি-অলীক

ভূমি-অলীকের অর্থ হ'ল, জমি বিনিময়ের ক্ষেত্রে মিথ্যাভাষণ এবং জমির স্বত্ব প্রমাণাদি বিষয়ে মিথ্যাভাষণ বা মিথ্যাচার।

স্থাপনমৃষা

স্থাপনমৃষার অর্থ হ'ল গচ্ছিত বিষয়ের অপব্যবহার এবং গচ্ছিত বিষয় প্রত্যর্পণ করতে শ্রাবকের অনীহা।

কূটসাক্ষ্য

কূটসাক্ষ্যের অর্থ হ'ল আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা। আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। একজন শ্রাবকের এরূপ কাজ করা উচিত নয়।

রহস্যাভ্যাখ্যান

রহস্যাভ্যাখ্যান হ'ল অপরের গোপন কার্যাবলী প্রকাশ করা।

কূটলেখ ক্রিয়া

যা প্রকৃতপক্ষে একজন বলেননি বা করেননি তা ঐ ব্যক্তি বলেছেন বা করেছেন বলে লিখিত যে অভিযোগ তাকে বলা হয় কূটলেখ ক্রিয়া।

ন্যাসাপহার

ন্যাসাপহারের অর্থ হ'ল, গচ্ছিত বিষয় সম্পর্কে অসততা।

সাকারমন্ত্রভেদ

সাকরমন্ত্রভেদের অর্থ হল কোন ব্যক্তিমুখাবয়বের অভিব্যক্তি দেখে তার অভিপ্রায় অনুমান ক'রে তা অন্যের নিকট ব্যক্ত করা।

৫.০.৪ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

1. What is meant by *satya* ?
2. Which are the different kinds of *mithyā* ?
3. Which are the *aticāra of satyānuvrata* ?
4. What is meant by *adattadānavirati* ?
5. What are different kinds of *cauryavṛtti* ?
6. Which are the *aticāras of asteyānuvrata* ?
7. What is meant by *"brahmacarya"* ?

8. Which are the *aticāras of brahmacaryānuvrata* ?

9. What is *gabālika* ?

10. What is *bhumi alika* ?

11. What is *svapanmrsā* ?

রচনাধর্মী প্রশ্ন :

1. Explain the significance of the satyānvrata of the Jainas.

2. Explain asteya as one of the anuvrata-s of the Jainas. What are the different types of aticāra-s of asteyānuvratavrata ?

3. Distinguish between anuvrata and mahāvrata. Explain satya as one of the anuvrata-s of the Jainas.

4. Explain brahmacarya as one of the anuvrata-s of the Jainas.

৫.০.৫ গ্রন্থপঞ্জী

১. মহাপ্রজ্ঞ আচার্য, অহিংসার এক অদৃশ্য দিক, পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক অনুব্রত সমিতি, ১৯৯৮।

২. মুনিজী, শ্রীসুজয, জৈনধর্ম ও শাসনাবলী, শ্রীঅখিলভারতীয় স্মারক জৈন সংগঠন, ১ম সংস্করণ, ৬ই মে, ২০০০।

৩. শ্যামসুখা, পূরণচাঁদ, ভগবান মহাবীর ও জৈনধর্ম, জৈনভবন, কলিকাতা, ১ম প্রকাশ, কার্তিক, ১৩৮১।

৪. সেন, অমূল্যচন্দ্র, জৈনধর্ম, বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ, ১ম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৩৫৮।

5. Ahimsa, Anekanta and Jainism, Sethia Tara (ed.), Motilal Banarsidass, Delhi, 1st Edition 2004.

6. Babb, A. Lawrence, Ascetics and King in a Jain Ritual Culture, Motilal Banarsidass, Delhi, 1st Indian Edition 1998.

7. Bhargava, Dayanand, Jaina Ethics, Motilal Banarsidass, Delhi, 1st Edition 1968.

8. Stevenson, Sinclair, The Heart of Jainism, Munshiram Monaharlal, New Delhi, 1st Indian Edition, Nov. 1970.

9. Studies in Jainism, The Ramkrishna Mission Institute of Culture, 1st Edition 1997.

10. Tattvartha Sutra That Which is, Trans. By Tatia, Nathmal, Motilal Banarsidass, Delhi, 1st Indian Edition 2007.

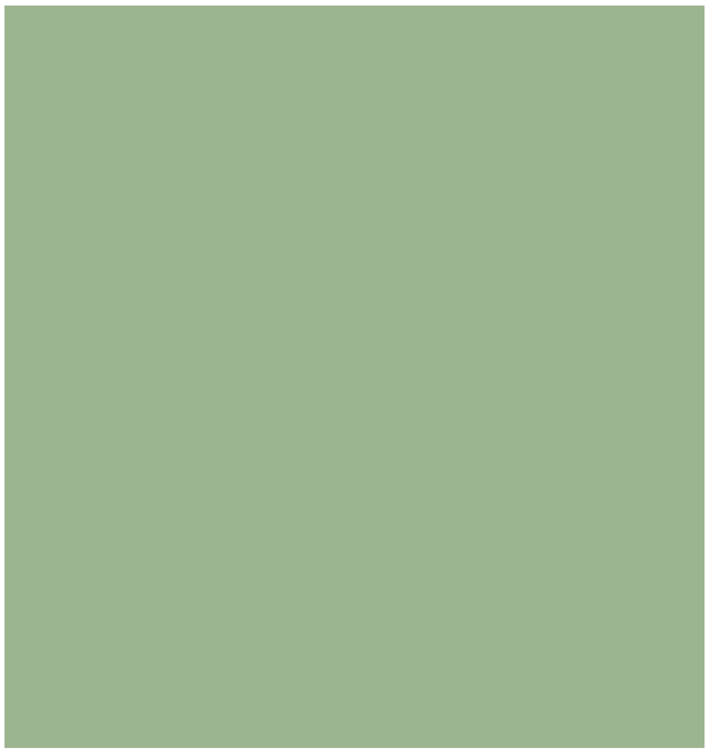

একক - ৬

অস্তেয় অনুব্রত, ব্রহ্মচর্য অনুব্রত, অপরিগ্রহ অনুব্রত

বিষয়-সূচী

৬.০.১ অস্তেয় ঃ পঞ্চ অনুব্রতের তৃতীয় অনুব্রত

৬.০.১.১ অস্তেয় অনুব্রতের অতিচার

৬.০.২ ব্রহ্মচর্য ঃ পঞ্চানুব্রতের চতুর্থ অনুব্রত

৬.০.২.১ ব্রহ্মচর্য অনুব্রতের অতিচার

৬.০৩. অপরিগ্রহ অনুবত

৬.০.৩.১ অপরিগ্রহ অনুব্রতের অতিচার

৬.০.৪ সারাংশ

৬.০.৫ কতিপয় শব্দের অর্থ

৬.০.৬ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৬.০.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৬.০.১. অস্তেয় ঃ পঞ্চ অনুব্রতের তৃতীয় অনুব্রত

গৃহীদের জন্য তৃতীয় অনুব্রত হ'ল অস্তেয়ানুব্রত। অস্তেয় অর্থ স্তেয় বা চৌর্য থেকে বিরতি। অস্তেয় অনুব্রতকে জৈন দর্শনে অদত্তাদান থেকে বিরতি বলা হয়। 'অদত্ত' শব্দের অর্থ যা প্রদত্ত হয়নি। 'আদান' শব্দের অর্থ গ্রহণ; 'বিরতি'-র অর্থ বিরত হওয়া বা সংযম। তাই 'অদত্তাদানবিরতি'-র অর্থ হল, যা প্রদত্ত হয়নি তা গ্রহণ থেকে বিরতি। এই অর্থে 'অদত্তাদান' শব্দের বিস্তৃতি, 'স্তেয়' শব্দের বিস্তৃতির তুলনায় অধিকতর ব্যাপক। শ্রমণ এবং শ্রমণাগণ শুধুমাত্র 'স্তেয়' বা চৌর্য থেকে বিরতি হবেন তাই নয় তাঁরা অপ্রদত্ত কোন জিনিস গ্রহণ করবেন না। তবে গৃহী বা শ্রাবকদের ক্ষেত্রে এই অনুব্রতটি অদত্তাদানের তুলনায় অস্তেয় নীতিকেই নির্দেশ করে। অদত্তাদানের যা বিস্তৃতি একজন গৃহীর পক্ষে বাস্তবে সবসময় তা মান্য করা অসম্ভব। সুতরাং গৃহী বা শ্রাবকগণ কেবল চৌর্য থেকে বিরত থাকবেন এটুকুই বলা যায়। অস্তেয় অনুব্রতকে শ্রাবককে পাঁচ প্রকার চৌর্যবৃত্তি থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই পাঁচ প্রকার মুখ্য চৌর্যবৃত্তি হ'ল :

(১) চুরি করার উদ্দেশ্য নিয়ে কোন বাড়ির দেওয়াল বা সীমানা ভাঙা,

(২) থলির গিঁট খোলা,

(৩) তালা ভাঙা,

(৪) মাটিতে পড়ে থাকা কোন জিনিস গ্রহণ করা, এবং

(৫) অন্যের জিনিস লুঠ করা।

এই ব্রতে চৌর্য অথবা যা অপ্রদত্ত জিনিস পরিত্যাগ করার কথা (অদত্তাদান বিরমণ ব্রত) বলা হয়েছে। যা কিছু অপ্রদত্ত, নিহিত, পতিত অথবা বিস্মৃত তা গ্রহণ করা বা অপরকে প্রদান করা অনুচিত।

৬.০.১.১. অস্তেয় অনুব্রতের অতিচার

অধিকাংশ জৈনাচার্যগণ অস্তেয় অনুব্রতের পাঁচটি অতিচারের কথা বলেছেন। তত্ত্বার্থসূত্রের ক্রমানুসারে এই পাঁচটি অতিচার নিম্নরূপ ঃ-

(১) স্তেনপ্রয়োগ,

(২) তদাহৃতাদান,

(৩) বিরুদ্ধরাজ্যাতিক্রম,

(৪) হীনাধিকমানোন্মান, এবং

(৫) প্রতিরূপক ব্যবহার।

(১) স্তেনপ্রয়োগ

স্তেনপ্রয়োগের অর্থ হ'ল চৌর্যরূপ কুকর্মে সহায়তা বা প্ররোচনা দেওয়া। চোরদের অর্থ সাহায্য কারও এই অতিচারের অন্তর্ভুক্ত।

(২) তদাহৃতাদান

তদাহৃতাদানের অর্থ চৌর্য দ্বারা প্রাপ্ত দ্রব্য গ্রহণ কার। চৌর্য দ্রব্য বিনা মূল্যে অথবা স্বল্পমূল্যে গ্রহণ করাও এই অতিচারের অন্তর্ভুক্ত।

(৩) বিরুদ্ধরাজ্যাতিক্রম

অস্তেয় অনুব্রতের তৃতীয় অতিচার হ'ল বিরুদ্ধরাজ্যাতিক্রম। এর অর্থ, অপর কোন দেশের সম্পদ অবৈধভাবে অধিগ্রহণ করা। অবৈধ ব্যবসা বা নিয়ম বহির্ভূত মজুত করাও জৈন নীতিতত্ত্বে চৌর্য বৃত্তি বলে গণ্য হয়।

(৪) হীনাধিকমানোন্মান

এর অর্থ হল ঋণকৃত নগদের উপর অস্বাভাবিক হারে সুদ গ্রহণ। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে একজনের কাছ থেকে বেশি পরিমাণ দ্রব্য গ্রহণ করা বা ওজনে ও মাপে কম পরিমাণ দ্রব্য অন্য ব্যক্তিকে প্রদান করাও এর অন্তর্ভুক্ত।

(৫) প্রতিরূপক ব্যবহার

প্রতিরূপক ব্যবহারের অর্থ হ'ল, সোনা, রূপা, পিতল, তামা, তেল, ঘি, দুধ, দই, প্রভৃতি খাদ্যে এমন দ্রব্য

মেশানো যার সঙ্গে বর্ণ, ওজন এবং অন্যান্য ধর্মের উক্তদ্রব্যগুলির সাযুজ্য আছে। এক কথায় ভেজাল দ্রব্য তৈরী করা বা বিক্রয় করা এই অতিচারের অন্তর্গত।

উক্ত অতিচারগুলি শ্রাবককে অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে। অস্তেয় ব্রত লঙ্ঘন করার শাস্তি।

৬.০.২. ব্রহ্মচর্য পঞ্চানুব্রতের চতুর্থ অনুব্রত

জৈনদর্শনে ব্রহ্মচর্যানুব্রতের অর্থ 'স্থূল মৈথুন বিরমণ' বা অনৈতিক যৌনতা থেকে বিরত হওয়া। একজন শ্রাবকের পক্ষে ব্রহ্মচর্য হল সারাজীবন নিজের স্ত্রীর সঙ্গেই সন্তোষপূর্ণভাবে জীবন অতিবাহিত করার এবং স্ত্রী ব্যতীত অপর কোন নারীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক থেকে বিরত থাকার সংকল্প গ্রহণ করা। পাপের ভয়ে বা অন্য কোন কারণে যিনি নিজে অপর ব্যক্তির স্ত্রীর নিকট গমন করেন না বা অন্য কাউকে দিয়ে একাজ করান না তিনি ব্রহ্মচর্য অনুব্রত পালন করে থাকেন। জৈনমতে নিজ স্ত্রী ব্যতীত সকল নারীকে মা, বোন অথবা কন্যারূপে জ্ঞান করা আবশ্যক। যৌন প্রবৃত্তির দশটি সহগামী বিষয় হল ঃ মদ, মাংস, জুয়া, নাচ-গান, দেহসজ্জা, অতিশয় উত্তেজনা, লাম্পট্য লক্ষ্যহীন ঘোরাঘুরি প্রভৃতি।

৬.০.২.১ ব্রহ্মচর্যানুব্রতের অতিচার

ব্রহ্মাচর্যানুব্রতের অতিচারসমূহও পঞ্চবিধ। এই অতিচারগুলি যথাক্রমে —

(১) ইত্বরিকপরিগৃহীতা গমন,

(২) অপরিগৃহীতা গমন,

(৩) অনঙ্গক্রীড়া,

(৪) পরবিবাহকরণ,

(৫) কামভোগতীব্রাভিলাষ

(১) ইত্বরিকপরিগৃহীতা গমন ঃ 'ইত্বরা' শব্দের অর্থ বারবণিতা অথবা রক্ষিতা। ইত্বরিকপরিগৃহীতা গমনের অর্থ অর্থের বিনিময়ে কোন রমণীর নিকট গমন এবং সাময়িক সময়কালের জন্য তাকে রক্ষিতারূপে রাখা।

(২) অপরিগৃহীতা গমন ঃ অপরিগৃহীতা গমনের অর্থ হ'ল বারবণিতা, বিধবা অথবা অনাথা নারীর নিকট গমন। একজন বিধবা নারী বা অপর কোন নারী, যাকে বিবাহ করা সম্ভব নয়, তার সঙ্গে সাময়িক সম্বন্ধ রাখা।

(৩) অনঙ্গক্রীড়া ঃ ব্রহ্মচর্যানুব্রতের তৃতীয় অতিচার হ'ল অনঙ্গক্রীড়া। অনঙ্গক্রীড়ার অর্থ হ'ল, যে অঙ্গ স্বাভাবিক ভাবে যৌনক্রিয়ার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত নয় সেই অঙ্গ দ্বারা যৌনসম্ভোগ, অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর সঙ্গে যৌনকার্য দ্বারা বিবাহ সিদ্ধ করা প্রভৃতি। এটিকে অস্বাভাবিক যৌনক্রিয়া রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেজন্য এই অতিচার থেকে গৃহীদের বিরত থাকার কথা বলা হয়েছে।

(৪) পরবিবাহকরণ ঃ পরবিবাহকরণের অর্থ নিজ সন্তানাদি ব্যতিরেকে, অন্যের বিবাহে মধ্যস্থতা করা। অর্থাৎ এমন কারো বিবাহ বিষয়ে মধ্যস্থতা করা যে বা যারা গৃহীব্যক্তির সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত নয় এবং

তাদের দায়িত্বও ঐ ব্যক্তির নয়। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি মৃদু অতিচার এবং সামাজিক নৈতিকতায় পরিত্যাজ্যও নয়।

(৫) কামভোগতীব্রাভিলাষ : এর অর্থ হল যৌন সম্ভোগের প্রতি সুতীব্র আকর্ষণ। এটিকে অতিচারের অন্তর্ভুক্ত করার নিহিতার্থ এই যে, একজন পুরুষ শুধুমাত্র যে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গেই যৌন সম্পর্ক স্থাপন করবেন তাই নয়, নিজ স্ত্রীর সঙ্গেও এই যৌনসম্ভোগ মাত্রাতিরিক্ত হবে না। যৌন সম্ভোগের নিমিত্ত কৃত্রিম উপায় গ্রহণ করাও এই অতিচারের অন্তর্ভুক্ত।

ব্রহ্মচর্য ব্রতভঙ্গের শাস্তি যা ভয়ঙ্কর তা ভাষায় প্রকাশযোগ্য নয়। বহু শিক্ষিত জৈন বাল্যবিবাহের কুফল সম্বন্ধে অনুভব করতে শুরু করেছেন যা এই ব্রতে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। ব্রহ্মচর্য ব্রতের আলোচনার মধ্যে দিয়ে একজন আদর্শ শ্রাবকের জীবন কেমন হওয়া উচিত— এ বিষয়ে জৈনমত সুস্পষ্ট হয়। এই আলোচনার মধ্য দিয়ে জৈনদের বাস্তববোধ এবং অত্যুৎকৃষ্ট নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়।

৬.০.৩ অপরিগ্রহ : পঞ্চ অনুব্রতের পঞ্চম অনুব্রত

পঞ্চম গার্হস্থ ব্রতকে জৈনশাস্ত্রে 'অপরিগ্রহ অনুব্রত', 'পরিগ্রহ পরিমাণ ব্রত', 'স্থূলপরিগ্রহ বিরমণ ব্রত', 'ইচ্ছাপরিমাণব্রত' প্রভৃতি শব্দ দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে। এই সমস্ত সমার্থক শব্দগুচ্ছ থেকে ব্রতটি সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়। অপরিগ্রহ হল পরিগ্রহের বিপরীত। পরিগ্রহ হল গ্রহণ। সুতরাং অপরিগ্রহ হল পরিগ্রহের বিপরীত। পরিগ্রহ হল গ্রহণ। সুতরাং অপরিগ্রহ বলতে বোঝায় অ-গ্রহণ। তবে জৈনমতে, শুধুমাত্র অগ্রহণকে অপরিগ্রহ বলা যায়না। সেই প্রকার অ-গ্রহণই অপরিগ্রহ যা আসক্তিযুক্ত। তত্ত্বার্থসূত্রে বলা হয়েছে মূর্ছা হল পরিগ্রহ। মূর্ছার অর্থ হল আসক্তি। তাই অপরিগ্রহ হল অনাসক্তি। দশবৈকালিক সূত্রেও মূর্ছা বা আসক্তিকে পরিগ্রহ বলা হয়েছে। উত্তরাধ্যায়ন সূত্রে বলা হয়েছে বাসনা সমূহ আকাশের ন্যায় অনন্ত। সেজন্য পুনঃ পুনঃ এদের পূরণ করার চেষ্টা না করে বরং এদের মূল উৎপাটিত করার চেষ্টা করাই বাঞ্ছনীয়। অপরিগ্রহের নিহিতার্থ শুধুমাত্র অধিকৃত বস্তুর সীমা নির্ধারণ নয়, বরং ইচ্ছা ও বাসনার সীমা নির্দেশ করা। জৈনগণ অতি বিচক্ষনতার সঙ্গে উপলব্ধি করেছিলেন যে, বাসনা সমূহকে সংযত করাই প্রকৃত অপরিগ্রহ এর এবং দ্বারাই প্রলোভনমুক্ত জীবনযাপন করা সম্ভব হতে পারে।

জৈনশাস্ত্র পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে, কেবল আসক্তিই পরিগ্রহ নয়। পরিগ্রহ হল আসক্তি এবং অধিকার ভোগ উভয়ই। সেজন্য অপরিগ্রহ এককভাবে অনাসক্তি বা অনধিকারের কোনোটিই নয়, বরং একই সঙ্গে অনাসক্তি এবং অনধিকার উভয়ই। পরিগ্রহ দ্বিবিধ—আভ্যন্তর এবং বাহ্য। আভ্যন্তর পরিগ্রহ হল আসক্তি এবং বাহ্য পরিগ্রহ হল অধিকার।

বাহ্য পরিগ্রহকে দুভাগে ভাগ করা যায়—জড় ও চেতন। জড় পরিগ্রহের অর্থ বাহ্য জড়বস্তুর প্রতি আসক্তি, যেমন জামা-কাপড়, ঘরবাড়ি প্রভৃতি এবং চেতন পরিগ্রহ হল সমস্ত সজীব বস্তুর প্রতি আসক্তি যেমন স্ত্রী, সন্তান দাস-দাসী প্রভৃতি। জৈন আচার্যগণ বিভিন্ন বাহ্য পরিগ্রহের তালিকা প্রকাশ করেছেন—

যেমন,

১) ক্ষেত্র (জমি)

২) বাস্তু (ঘরবাড়ি)

৩) হিরণ্য (স্বর্ণমুদ্রাদি)

৪) সুবর্ণ (সোনা)

৫) ধন (গৃহপালিত পশু প্রভৃতি

৬) দাসী (পরিচারিকা)

৭) দাস (পরিচারক)

৮) কুপ্য (রত্নাদি)

৯) শয্যাশন (বিছানা)

১০) অন্যান্য আরামদায়ক বস্তুসমূহ।

৬.০.৩.১. অপরিগ্রহ অনুব্রতের অতিচার

অপরিগ্রহ অনুব্রতের পাঁচটি অতিচার-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। এই পাঁচটি অতিচার হল—

১) ক্ষেত্র-বাস্তু প্রমাণাতিক্রম,

২) হিরণ্য-সুবর্ণ প্রমাণাতিক্রম,

৩) ধন-ধান্য প্রমাণাতিক্রম,

৪) দ্বিপদ-চতুষ্পদ প্রমাণাতিক্রম,

৫) কুপ্যধাতু প্রমাণাতিক্রম।

১) ক্ষেত্র-বাস্তু প্রমাণাতিক্রম।

ক্ষেত্র-বাস্তু প্রমাণাতিক্রমের অর্থ হল জমি এবং গৃহাদি সংক্রান্ত ভোগাধিকারের নির্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘন করা। অন্যভাবে বললে, জমি বা ঘরবাড়ি প্রভৃতি অধিকৃত বিষয়াদিকে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাখতে ব্যর্থ হওয়া।

২) হিরণ্য-সুবর্ণ প্রমাণাতিক্রম

এই অতিচারের অর্থ হল রূপা ও সোনা সঞ্চিত রাখার নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করা। এই সোনা-রূপা গহনার আকারে থাকতে পারে বা অন্যভাবেও থাকতে পারে।

৩) ধন-ধান্য প্রমাণাতিক্রম

এর অর্থ শস্য এবং সম্পদের জন্য নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করা। অর্থাৎ যে পরিমাণ শস্য এবং সম্পদ একজন শ্রাবকের থাকা বিধেয় তার তুলনায় অধিক শস্য এবং সম্পদ বিধেয়।

৪) দ্বিপদ-চতুষ্পদ প্রমাণাতিক্রম

এই অতিচারের অর্থ হল ভৃত্য, শিশু এবং পশু অধিকারের নির্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘন করা।

(৫) কুপ্যধাতু প্রমাণাতিক্রম

অন্যান্য গার্হস্থ জিনিসপত্র যেমন বাসনপত্র প্রভৃতির সঞ্চয়ের নির্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘন করা।

অপরিগ্রহ অনুব্রতের আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে, অপরিগ্রহ অনুব্রতের নিহিতার্থ হল স্বল্প-সন্তোষ। একজন শ্রাবক, তিনি অল্পে সন্তুষ্ট থাকবেন এবং এই ভাবে তিনি তাঁর আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক জীবনের প্রতি ন্যায় সাধন করবেন। স্বল্প সন্তোষ যেমন অনাসক্তির মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিকতার পথ প্রশস্ত করে তেমনি আবার সমাজীবনে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করতে সাহায্য করে। কারণ একের অধিক চাহিদা অপরের বঞ্চনার কারণ হয়। সুতরাং শুধুমাত্র আধ্যাত্মিকতার নিরিখে নয়, সামাজিকতার মাপকাঠিতেও গৃহীদের এই ব্রতর অনুশীলন প্রশংসার্থ।

৬.০.৪ সারাংশ

অস্তেয় : পঞ্চ অনুব্রতের তৃতীয় অনুব্রত

গৃহীদের জন্য তৃতীয় অনুব্রত হল অস্তেয়ানুব্রত। অস্তেয় অনুব্রতের অর্থ স্তেয় বা চৌর্য থেকে বিরতি। অস্তেয় অনুব্রতকে জৈন দর্শনে অদত্তাদান থেকে বিরতি বলা হয়। 'অদত্ত' শব্দের অর্থ যা প্রদত্ত হয় নি। 'আদান' শব্দের অর্থ গ্রহণ; 'বিরতি'-র অর্থ বিরত হওয়া বা সংযম। তাই 'অদত্তাদানবিরতি'-র অর্থ হল, যা প্রদত্ত হয়নি তা গ্রহণ থেকে বিরতি। এই অর্থে 'অদত্তাদান' শব্দের বিস্তৃতি, 'স্তেয়' শব্দের বিস্তৃতির তুলনায় অধিকতর ব্যাপক। অদত্তাদানের যা বিস্তৃতি একজন গৃহীর পক্ষে বাস্তবে সবসময় তা মান্য করা অসম্ভব। সুতরাং গৃহী বা শ্রাবকগণ কেবল চৌর্য থেকে বিরত থাকবেন এটুকুই বলা যায়। অস্তেয় অনুব্রতে শ্রাবককে পাঁচ প্রকার চৌর্যবৃত্তি থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই পাঁচ প্রকার মুখ্য চৌর্য্যবৃত্তি হল :

১) চুরি করার উদ্দেশ্য নিয়ে কোনো বাড়ির দেওয়াল বা সীমানা ভাঙা,

২) থলির গিঁট খোলা,

৩) তালা ভাঙা,

৪) মাটিতে পড়ে থাকা কোনো জিনিস গ্রহণ করা এবং

৫) অন্যের জিনিস লুঠ করা।

এই ব্রতে চৌর্য অথবা যা অপ্রদত্ত জিনিস পরিত্যাগ করার কথা (অদত্তাদান বিরমণ ব্রত) বলা হয়েছে। যা কিছুঅপ্রদত্ত, নিহিত, পতিত অথবা বিস্মৃত তা গ্রহণ করা বা অপরকে প্রদান করা অনুচিত।

অস্তেয় অনুব্রতের অতিচার

অধিকাংশ জৈনচার্যগণ অস্তেয় অনুব্রতের পাঁচটি অতিচারের কথা বলেছেন। তত্ত্বার্থসূত্রের ক্রমানুসারে এই পাঁচটি অতিচার নিম্নরূপ ঃ—

(১) স্তেনপ্রয়োগ,

(২) তদাহৃতাদান,

(৩) বিরুদ্ধরাজ্যাতিক্রম,

(৪) হীনাধিকমানোন্মান এবং

(৫) প্রতিরূপক ব্যবহার।

উক্ত অতিচারগুলি শ্রাবককে অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে। অস্তেয় ব্রত লঙ্ঘন করার শাস্তি হল, ভবিষ্যতে দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করা অথবা ক্রীতদাস হয়ে জন্মানো।

ব্রহ্মচর্য ঃ পঞ্চানুব্রতের চতুর্থ অনুব্রত

জৈনদর্শনে ব্রহ্মচর্যানুব্রতের অর্থ 'স্থূল মৈথুন বিরমণ' বা অনৈতিক যৌনতা থেকে বিরত হওয়া। একজন শ্রাবকের পক্ষে ব্রহ্মচর্য হল সারাজীবন নিজের স্ত্রীর সঙ্গেই সন্তোষপূর্ণভাবে জীবন অতিবাহিত করার এবং নিজ স্ত্রী ব্যতীত অপর কোনো নারীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক থেকে বিরত থাকার সংকল্প গ্রহণ করা। ব্রহ্মচর্যানুব্রতের অতিচারসমূহও পঞ্চবিধ। এই অতিচারগুলি যথাক্রমে—

(১) ইত্বরিকপরিগৃহীতাগমন,

(২) অপরিগৃহীতাগমন,

(৩) অনঙ্গক্রীড়া,

(৪) পরবিবাহকরণ,

(৫) কামভোগতীব্রাভিলাষ।

অপরিগ্রহ অনুব্রত

পঞ্চম গার্হস্থ ব্রতকে জৈনশাস্ত্রে অপরিগ্রহ অনুব্রত বলা হয়। অপরিগ্রহ হল পরিগ্রহের বিপরীত। পরিগ্রহ হল গ্রহণ। সুতরাং অপরিগ্রহ বলতে বোঝায় অ-গ্রহণ। তবে জৈনমতে, শুধুমাত্র অগ্রহণকে অপরিগ্রহ বলা যায় না। সেই প্রকার অ-গ্রহণই অপরিগ্রহ যা আসক্তিযুক্ত। জৈনশাস্ত্র পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে, কেবল আসক্তিই পরিগ্রহ নয়। পরিগ্রহ হল আসক্তি এবং অধিকার ভোগ উভয়ই। পরিগ্রহ দ্বিবিধ — আভ্যন্তর এবং বাহ্য। আভ্যন্তর পরিগ্রহ হল আসক্তি এবং বাহ্য পরিগ্রহ হল অধিকার।

বাহ্য পরিগ্রহকে দুভাগে ভাগ করা যায়- জড় ও চেতন। জড় পরিগ্রহের অর্থ বাহ্য জড়বস্তুর প্রতি আসক্তি, যেমন জামা-কাপড় ঘরবাড়ি প্রভৃতি এবং চেতন পরিগ্রহ হল সমস্ত সজীব বস্তুর প্রতি আসক্তি যেমন স্ত্রী, সন্তান দাস-দাসী প্রভৃতি। জৈন আচার্যগণ বাহ্য পরিগ্রবের দীর্ঘ তালিকা প্রকাশ করেছেন।

অপরিগ্রহ অনুব্রতের পাঁচটি অতিচারের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই পাঁচটি অতিচার হল —

১) ক্ষেত্র-বাস্তু প্রমাণাতিক্রম,

২) হিরণ্য-সুবর্ণ প্রমাণাতিক্রম,

৩) ধন-ধান্য প্রমাণাতিক্রম,

৪) দ্বিপদ-চতুষ্পদ প্রমাণাতিক্রম,

৫) কুপ্যধাতু প্রমাণাতিক্রম।

৬.০.৫. কতিপয় শব্দের অর্থ

অদত্তাদান বিরতি

'অদত্ত' শব্দের অর্থ যা প্রদত্ত হয়নি। 'আদান' শব্দের অর্থ গ্রহণ; 'বিরতি'-র অর্থ বিরত হওয়া বা সংযম। তাই 'অদত্তাদান বিরতি'-র অর্থ হল, যা প্রদত্ত হয়নি তা গ্রহণ থেকে বিরতি।

স্তেনপ্রয়োগ

স্তেনপ্রয়োগের অর্থ হল চৌর্যরূপ কুকর্মে সহায়তা বা প্ররোচনা দেওয়া।

তদাহৃতাদান

তদাহৃতাদানের অর্থ চৌর্য দ্বারা প্রাপ্ত দ্রব্য গ্রহণ করা। চৌর্য দ্রব্য বিনা মূল্যে অথবা স্বল্পমূল্যে গ্রহণ করাও এই অতিচারের অন্তর্ভুক্ত।

বিরুদ্ধারাজ্যাতিক্রম

বিরুদ্ধারাজ্যাতিক্রমের অর্থ হল অপর কোনো দেশের সম্পদ অবৈধভাবে অধিগ্রহণ করা।

হীনাধিকমানোন্মান

হীনাধিকমানোন্মানের অর্থ হল ঋণকৃত নগদের উপর অস্বাভাবিক হারে সুদ গ্রহণ।

প্রতিরূপক ব্যবহার

ভেজাল দ্রব্য তৈরি করা বা বিক্রয় করাকে বলে প্রতিরূপক ব্যবহার।

ইত্বরিকপরিগৃহীতাগমন

ইত্বরিকপরিগৃহীতাগমনের অর্থ অর্থের বিনিময়ে কোনো রমণীর নিকট গমন এবং সাময়িক সময়কালের জন্য তাকে রক্ষিতারূপে রাখা।

অপরিগৃহীতাগমন

অপরিগৃহীতাগমনের অর্থ হল বারবণিতা, বিধবা অথবা অনাথা নারীর নিকট গমন।

৬.০.৬. সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

1. What is meant by '*aparigrha*'?

2. Which are the *aticāra-s* of *aparigrhānuvrata*?

3. What is meant by *adattadānavirati* ?

4. What are different kinds of *cauryavrtti* ?

5. Which are the *aticāras* of *asteyānuvrata*?

6. What is meant by "*brahmacarya*"?

7. Which are the *aticaras* of *brahmacaryānuvrata*?

8. What is *gabālika*?

9. What is *bhumi alika*?

10. What is *svapanmrsā*?

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

1. Explain the significance of the *aparigrhānuvrata* of the jainas.
2. Explain *asteya* as one of the *anuvrata-s* of the jainas. What are the different types of *aticara of asteyānuvratavrata*?
3. Explain *brahmacarya* as one of the *anuvrata-s* of the jainas.
4. Explain *aparigrahānuvrata*. Which are the *aticāra-s* of *aparigrhāanuvrata*? Explain.

৬.০.৭. গ্রন্থপঞ্জী

১। মহাপ্রজ্ঞ আচার্য, অহিংসার এক অদৃশ্য দিক, পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক অনুব্রত সমিতি, ১৯৯৮।

২। মুনিজী, শ্রীসুজয, জৈনধর্ম ও শাসনাবলী, শ্রীঅখিলভারতীয় স্বারক জৈন সংগঠন, ১ম সংস্করণ, ৬ই মে ২০০০।

৩। শ্যামসুখা, পূরণচাঁদ, ভগবান মহাবীর ও জৈনধর্ম, জৈনভবন, কলিকাতা।

৪। সেন, অমূল্যচন্দ্র, জৈনধর্ম, বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ, ১ম প্রকাশ ১৩৫৮, শ্রাবণ।

৫। ন্যায় দর্শন, গৌতম, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কৃত বঙ্গানুবাদ সহ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।

৬। ভাষাপরিচ্ছেদ সিদ্ধান্তমুক্তাবলী সহ, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, পঞ্চানন শাস্ত্রী কৃত বঙ্গানুবাদ সহ।

7. Ahimsa, Anekanta and jainism, Sethia Tara (ed.), Motilal Banarsidass, Delhi, 1st Edition 2004

8. Babb, A. Lawrence, Ascetics and King in a jain Ritual Culture, Motilal Banarsidass, Delhi, 1st Indian Edition 1998.

9. Bhargava, Dayanand, Jaina Ethics, Motilal Banarsidass, Delhi, 1st Edition 1968.

10. Stevenson, Sinclair, The Heart of Jainism, Munshiram Monaharlal, New Delhi, 1st Indian Edition, Nov. 1970.

11. Studies in jainsm, The Ramkrisna Mission Institute of Culture, 1st Edition 1997.

12. Tattvartha Sutra That Which Is, Trans. By Tatia, Nathmal, Motilal Banarsidass, Delhi, 1st Indian Edition 2007.

13. S.K Maitra The Ethics of the Hindus, Calcutta University, 1963.

14. I.C. Sharma, Ethical Philosophies of Indin, George Allen & Unwin, 1965.

একক ৭

পঞ্চ মহাব্রত, চিকীর্ষা ও দ্বেষ

বিষয়- সূচী

৭.০.১. পঞ্চ মহাব্রত

৭.০.১.১ অহিংসা মহাব্রত

৭.০.১.১.১ অহিংসা মহাব্রতের পঞ্চ ভাবনা

৭.০.১.২. সত্য মহাব্রত

৭.০.১.২.১. সত্য মহাব্রতের পঞ্চ ভাবনা

৭.০.১.৩. অস্তেয় মহাব্রত

৭.০১.৩.১. অস্তেয় মহাব্রতের পঞ্চ ভাবনা

৭.০.১.৪. ব্রহ্মচর্য মহাব্রত

৭.০.১.৪.১. ব্রহ্মচর্য মহাব্রতের পঞ্চ ভাবনা

৭.০.১.৫. অপরিগ্রহ মহাব্রত

৭.০.১.৫.১. অপরিগ্রহ মহাব্রতের পঞ্চ ভাবনা

৭.০.২. চিকীর্ষা

৭.০.৩. দ্বেষ

৭.০.৪ সারাংশ

৭.০.৫ কতিপয় শব্দের অর্থ

৭.০.৬. সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৭.০.৭. গ্রন্থপঞ্জী

৭.০.১. পঞ্চ মহাব্রত

জৈনশাস্ত্রানুযায়ী শ্রাবক এবং শ্রমণগণ যে ব্রতসমূহ পালন করেন তা প্রকৃতপক্ষে একই ব্রত তফাৎ শুধু তাদের পালন বা অনুশীলনের মাত্রায়। যে ব্রতগুলি শ্রাবকগণ শিথিল ও পরিমিত ভাবে পালন করেন, শ্রমণগণ সেই ব্রতগুলিই সর্বোচ্চ মাত্রায় ও কঠোরভাবে পালন করে থাকেন। মাত্রায় উচ্চতা ও কঠোরতার নিরীখেই অনুব্রতগুলি মহাব্রতে উন্নীত হয়। আমরা এখন সংক্ষেপে এই পঞ্চ মহাব্রতের পরিচয় দিব।

৭.০.১.১ অহিংসা মহাব্রত

অহিংসা মহাব্রতের অর্থ হল সকল প্রকার হিংসা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা। শ্রমণগণ যেহেতু গৃহীদের তুলনায় উচ্চতর আধ্যাত্মিক স্তরে আসীন, সেহেতু তাঁরা কোন পরিস্থিতিতেই কোনরূপ সহিংস আচরণ করতে পারেন না। প্রতিটি জীবই বাঁচতে চায়। জীবকে হত্যা করা বা যে কোন প্রকার ক্ষতি করা অপরাধ জেনে একজন শ্রমণ তা করতে পারেন না। শ্রমণগণ কায়মনোবাক্যে হিংসা থেকে বিরত থাকেন। তাঁরা নিজে সহিংস কর্ম করেন না, অপরের সহিংস কর্ম সমর্থন করেন না এবং পরোক্ষভাবেও সহিংস কর্মের সাথে যুক্ত থাকেন না। অহংসানুব্রতে কেবলমাত্র ত্রস জীবের প্রতি অহিংস আচরণের কথা বলা হয়েছে কিন্তু অহিংস মহাব্রতে সর্বজীবের প্রতি সর্ব প্রকার অহিংস আচরণের কথা বলা হয়েছে।

৭.০.১.১.১. অহিংসা মহাব্রতের পঞ্চ ভাবনা

তত্ত্বার্থসূত্রে উমাস্বাতি প্রতিটি মহাব্রতের অনুসারী পঞ্চ পঞ্চ বাবনার উল্লেখ করেছেন। এই ভাবনা সকল মহাব্রতগুলিকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে সাহয্যকারী অনুনীতিরূপে গৃহীত হয়েছে।

অহিংসা মহাব্রতের অনুসারী পঞ্চভাবনা হ'ল :

(১) বাক্য প্রয়োগে সতর্কতা,

(২) মনোগুপ্তি,

(৩) ঈর্যাসমিতি,

(৪) আদাননিক্ষেপণ সমিতি ও

(৫) আলোকিত পানভোজন সমিতি

বাক্য প্রয়োগে সতর্কতার অর্থ হল কারো প্রতি এমন বাক্য প্রয়োগ না করা যাতে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হন। মনোগুপ্তির অর্থ হল মনকে সংযত করা। ঈর্যাসমিতির অর্থ হল সতর্কতার সঙ্গে গমনাগমন করা যাতে কোন জীবের ক্ষতি না হয়। আদাননিক্ষেপণের অর্থ হল প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ এমনভাবে ব্যবহার করা যাতে কোন জীবের ক্ষতি না হয়। আলোকিত পানভোজন সমিতির অর্থ হল সঠিকভাবে নিরীক্ষণ করার পরই খাদ্য গ্রহণ

করা। উপরিউক্ত অনু-নীতিগুলি মূল ব্রত অহিংসারই সাহায্যকারী নীতি, তাই এগুলিও মূল ব্রত অহিংসার আদর্শকেই প্রতিষ্ঠিত করে। অনু-নীতিগুলি নিহিতার্থ হ'ল কোনভাবেই জীবের অনিষ্টসাধন না করা।

৭.০.১.২. সত্য মহাব্রত

সত্য মহাব্রতের অর্থ হল মৃষাবাদ বা মিথ্যাভাষণথেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা। গৃহীরা আংশিক বা পরিমিতরূপে এই ব্রত পালন করেন। কিন্তু শ্রমণদের ক্ষেএ সামান্যতম মিথ্যাত্বেরও কোন স্থান নেই। শ্রমণগণ এমন মিথ্যা বলবেন না যা জীবের পক্ষে হানিকর। দশবৈকালিক সূত্রে এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। একজন শ্রমণ কখনই কর্কশ বাক্য ব্যবহার করেন না, বা এমন কোন বাক্য বলেন না যা অপরকে গভীরভাবে আঘাত করে। তিনি কখনো অপ্রীতিকর বাক্যও ব্যবহার করেন না। তিনি কখনোই ক্রুদ্ধ হয়ে বা আসক্তির বশবর্তী হয়ে কিংবা ভয় পেয়ে কোন উক্তি করবেন না এবং অপরের সম্বন্ধে কোন কৌতুককর মন্তব্য করবেন না। এই রূপ ভিক্ষুর ইন্দ্রিয়ের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়, তিনি কষায় মুক্ত হন এবং তাঁর অতীত পাপের মুল্লোচ্ছেদ হয়।

৭.০.১.২.১. সত্য মহাব্রতের পঞ্চ ভাবনা

সত্য মহাব্রতের সাহায্যকারী পাঁচটি ভাবনা হল ঃ

১) **ক্রোধ প্রত্যাখ্যান,**

২) **লোভ প্রত্যাখ্যান,**

৩) **ভীরুত্ব প্রত্যাখ্যান,**

৪) **হাস্য প্রত্যাখ্যান,**

৫) **অনুবীচীভাষণ।**

১) ক্রোধ প্রত্যাখ্যান বলতে বোঝায় একজন শ্রমণের ক্রোধ প্রত্যাখ্যান করা কর্তব্য কারণ এটি শুধুমাত্র মিথ্যাত্বের কারণ নয়, এটি হিংসারও কারণ।

২) লোভ প্রত্যাখ্যান হল লোভ থেকে বিরত থাকা। এটি সত্য আচরণের একটি সাহায্যকারী শর্ত। লোভ থেকে বহু পাপের জন্ম হয় এবং লোভ সত্যতার অন্যতম মুখ্য প্রতিবন্ধক।

৩) ভীরুত্ব প্রত্যাখ্যান বলতে বোঝায় ভয়কে জয় করা। এটি সত্যতা রক্ষার অন্যতম সহায়ক শর্ত।

৪) হাস্য প্রত্যাখ্যান হল হাস্যকৌতুকাত্মক প্রবণতা রোধ।

৫) অনুবীচীভাষণ হল সর্বদা সুচিন্তিত বাক্য প্রয়োগ। একজন শ্রমণের পক্ষে সুচিন্তিত বক্তব্য অবলম্বন করাই বিধেয়। সুচিন্তিত বাক্যে অনর্থ হবার সম্ভাবনা থাকেনা।

একটু লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, এই ভাবনাগুলি শুধু যে, সত্য মহাব্রতের প্রতিই উপযোগী তা নয়, সর্বক্ষেত্রেই এগুলি মূল্যবান। শ্রাবকদের ক্ষেত্রেও এই নীতিগুলি অত্যন্ত মূল্যবান বলে বিবেচিত হতে পারে।

৭.০.১৩ অস্তের মহাব্রত

অস্তেয় মহাব্রতের অর্থ হল সর্বপ্রকার অদত্তাদান বিরমণ। গৃহীদের ক্ষেত্রে এটি পরিমিত বা আংশিক ব্রত হলেও শ্রমণদের ক্ষেত্রে এর বিস্তৃতি সামগ্রিক। শ্রমণগণ সম্পূর্ণরূপে চৌর্যবৃত্তি থেকে বিরত হবেন। দশবৈকালিক সূত্রে বলা হয়েছে যে, একজন শ্রমণ স্বত্তাধিকারীর অনুমোদন ব্যতীত কোন সজীব বা অজীব বস্তু, স্বল্প বা বেশী পরিমাণ অথবা দাঁতের মাজনের মত তুচ্ছ জিনিসও নিজে গ্রহণ করেন না, অপরকে গ্রহণ করার নির্দেশ দেন না বা অন্যের এরূপ কাজ সমর্থনও করেন না। এইভাবে শ্রমণদের দ্বারা গৃহীত অস্তেয় মহাব্রত নির্দেশ করে যে, গ্রামে, শহরে, অথবা বনে, সচিত্ত বা অচিত্ত, পরিমাণে অল্প বা বহু, আকারে ছোট বা বড় কোন প্রকার জিনিসই তাঁরা স্বত্বাধিকারীর অনুমোদন ব্যতীত গ্রহণ করতে পারেন না। এই কার্য থেকে তিনি নিজে যে শুধুমাত্র বিরত থাকেন তাই নয়, অপরকে এরূপ কার্য করার নির্দেশ দেন না এবং অপরের কার্য অনুমোদনও করেন না। একজন শ্রমণ সর্বদা কায়িক, মানসিক এবং বাচিক চৌর্যের সংস্রব থেকে মুক্ত।

অদত্তাদানকে চার ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে যা শুধুমাত্র শ্রমণদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শ্রাবকদের ক্ষেত্রে নয়। এই বিভাগগুলি হল —

১) **স্বামী অদত্তাদান,**

২) **জীব অদত্তাদান,**

৩) **তীর্থ অদত্তাদান এবং**

৪) **গুরু অদত্তাদান।**

১) স্বামী অদত্তাদান : স্বত্বাধিকারীর বিনা অনুমতিতে কোন জিনিস, এমনকি একটা ঘাসের টুকরোও গ্রহণ করা এই অদত্তাদানের অন্তর্ভূক্ত।

২) জীব অদত্তাদান হল অভিভাবকের অনুমোদন ব্যতীত কোন ইচ্ছুক ছাত্রকে সংঘে নিয়োজিত করা।

৩) তীর্থ অদত্তাদান হল ভিক্ষা গ্রহণ করা বা এমন খাদ্য গ্রহণ করা যা তীর্থঙ্কর বা কেবলজ্ঞানীদের পক্ষে নিষিদ্ধ রূপে উপদীষ্ট হয়েছে।

৪) শেষতঃ স্বত্বধিকারী যে দ্রব্যটি শ্রমণকে দান করেন সেটি যদি তাঁর গুরুত্ব দ্বারা অনুমোদিত না হয়, তবে ঐ দানকে গুরু অদত্তাদান বলা হয়।

উপরিউক্ত শ্রেণীকরণ থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে, অদত্তাদানের অর্থ নিছক স্তেয় বা চৌর্য নয়। এর পরিধি আরো বিস্তৃত।

৭.০.১.৩.১ অস্তেয় মহাব্রতের পঞ্চ ভাবনা

অস্তেয় মহাব্রতের পাঁচটি ভাবনা নিম্নরূপ ঃ

(১) **শূন্যাগারবাস,**

(২) **বিমোচিত বাস,**

(৩) **পরোপরোধাকরণ,**

(৪) **ভৈক্ষশুদ্ধি,**

(৫) **সধর্মাবিসংবাদ।**

(১) শূন্যাগারবাস : নির্জনস্থানে বসবাস করা, যেমন পর্বতের গুহা প্রভৃতি।

(২) বিমোচিত বাস: পরিত্যক্ত গৃহে বাস করা।

(৩) পরোপরোধাকরণ : অপর শ্রমণের সঙ্গে বাসস্থান ভাগ করে নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না করা। এই ভাবনার নিহিতার্থ এই যে, যেটুকু সময়কাল একজন শ্রমণ কোন বাসস্থানে অতিক্রান্ত করবেন, তাতে তাঁর যেন মনে না হয় যে, সেটি তাঁর ব্যাক্তিগত সম্পত্তি।

(৪) ভৈক্ষশুদ্ধি : শ্রমণগণ মেন ভিক্ষা গ্রহণ করবেন যা শাস্ত্রসম্মত বা বিশুদ্ধ।

(৫) সধর্মাবিসংবাদ : সহ-শ্রমণের সঙ্গে ব্যবহার্য কোন জিনিস নিয়ে বাদানুবাদ থেকে বিরত থাকা। অর্থাৎ যে সমস্ত ব্যবহার্য জিনিস শ্রমণগণ মিলিতভাবে ব্যবহার করে থাকেন, সেগুলি নিয়ে কেউ কারো সঙ্গে বাদানুবাদে লিপ্ত হবেন না। এক্ষেত্রেও নিহিতার্থ এই যে কোন বিষয়কেই নিজ সম্মত্তি বলে মনে না করা।

৭.০.১.৪ ব্রহ্মচর্য মহাব্রত

বুৎপত্তিগতভাবে 'ব্রহ্মচর্য' শব্দের অর্থ, ব্রহ্মের নিমিত্ত আচার বা ব্রহ্মের সন্ধানে কৃত আচরণ। ব্রহ্ম চরম সত্য। সেই চরম সত্যকে লাভ করার লক্ষ্যে যে আচরণ তাই ব্রহ্মচর্য। জৈনদর্শনে ব্রহ্মচর্য বলতে ইন্দ্রিয় সংযমকে বোঝায়। ব্রহ্মচর্য ব্রতের পারিভাষিক প্রতিশব্দ হল 'মৈথুন-বিরমণ-ব্রত'। যার অথর্থ মৈথুন বা যৌন সম্ভোগ থেকে বিরত থাকা। তত্ত্বার্থসূত্রে বলা হয়েছে 'মৈথুন হল অব্রহ্ম'। মোক্ষের উপায়রূপে সম্যক দর্শন, জ্ঞান ও চরিত্রই হল ব্রহ্মাচর্যের সোপান। এই দিক থেকে ব্রহ্মাচর্যের বুৎপত্তিগত অর্থ থেকে জৈনদর্শনে স্বীকৃত ব্রহ্মচর্য মহাব্রতের ধারণার খুব বেশী প্রভেদ থাকে না। পূজ্যপাদের মতে, একে অপরকে স্পর্শ করার ফলে মোহনীয় কর্মের উদ্ভব হয় এবং তার ফলে মৈথুন সংঘটিত হয় এক্ষেত্রে সমলিঙ্গের দুই ব্যক্তির (স্ত্রী অথবা পুরুষ) ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। এমনকি দুটি পৃথক প্রজাতির যৌনতাও এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন, বিপরীত লিঙ্গের একটি মানুষ ও একটি পশু। এক কথায় মৈথুনের মধ্যে সমস্ত প্রকার যৌনতা অর্ন্তভুক্ত। শ্রমণদের ক্ষেত্রে মৈথুন বিরমন ব্রত উক্ত সকল প্রকার যৌনসম্ভোগ বা অব্রহ্ম থেকে বিরত থাকার ব্রত। এজন্য এটি ব্রহ্মচর্য মহাব্রত। শ্রমণের ক্ষেত্রে

সর্বতোভাবে যৌন সম্ভোগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শ্রমণগণ শুধু যে যৌনসম্ভোগ থেকে বিরত থাকেন তাই নয়, পঞ্চেন্দ্রিয়ের বিভিন্ন প্রকার সুখানুভূতি থেকেও তাঁরা বিরত থাকেন। উত্তরা ধ্যয়ন সূত্রে যথার্থ ব্রহ্মচর্যের দশটি শর্তের উল্লেখ করা হয়েছে। একজন শ্রমন সুখাদ্য গ্রহণ করবেন না, অতিরিক্ত খাদ্য বা পাণীয় গ্রহন করবেন না। কেনো অঙ্গসজ্জা করেন না, এবং শব্দ, বর্ণ স্বাদ, গন্ধ এবং স্পর্শের প্রতি যত্নবান হন না। যৌনতা বলতে এখানে শুধুমাত্র স্থূল বা প্রত্যক্ষ যৌনসম্ভোগকেই নির্দেশ করা হয়নি, সামান্যতম যৌন ইঙ্গিতবাহী কার্যকলাপকেও অন্তর্ভুক্ত বকরা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ , শ্রমণদের পক্ষে কোন নারীর সঙ্গে কথা বলা, একই আসনে আসন গ্রহণ করা, প্রভৃতিও নিষিদ্ধ হয়েছে।

৭.০.১.৪.১ ব্রহ্মচর্য মহাব্রতের পঞ্চ ভাবনা

তত্ত্বার্থসূত্রে ব্রহ্মচর্য মহাব্রতের অনুসারী পাঁচটি ভাবনার উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলি হল ঃ

(১) **স্ত্রীরাগকথাশ্রবণ,**

(২) **তন্মনোহরাঙ্গনিরীক্ষণ,**

(৩) **পূর্বরতানুস্মরণ,**

(৪) **বৃষ্যেষ্ঠরস,**

(৫) **স্বশরীরসংস্কারত্যাগ।**

(১) স্ত্রীরাগকথাশ্রবণ ঃ নারীর প্রতি আসক্তি সম্পর্কিত কোন গল্প বা কথা শ্রবণ করা শ্রমণের পক্ষে অনুচিৎ, কারণ তা থেকে যৌনবাসনা উত্থিত হতে পারে।

(২) তন্মনোহরাঙ্গনিরীক্ষণ ঃ নারীর যৌনতা উদ্দীপক অঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত না করা। কারণ তা থেকেও যৌনবাসনা জাগরিত হতে পারে।

(৩) পূর্বরতানুস্মরণ ঃ পূর্বে কৃত যৌনসম্ভোগের সুখানুভূতির স্মৃতিচারণ না করা। কারণ এই মানসিক ক্রিয়াটিও যৌনদ্দীপক।

(৪) বৃষ্যেষ্ঠরস ঃ সুখাদ্য ও পানীয় বর্জন করা।

(৫) স্বশরীরসংস্কারত্যাগ ঃ শরীরিক পরিমার্জনা থেকে বিরত যাতে যৌন উদ্দীপনার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

৭.০.১.৫ অপরিগ্রহ মহাব্রত

অপরিগ্রহ মহাব্রতের অর্থ সকল প্রকার অধিকার ভোগ থেকে বিরত থাকা। পরিগ্রহ হল মূর্ছা বা আসক্তি। সুতরাং অপরিগ্রহ মহাব্রতে শ্রমণদের সকল প্রকার আসক্তি থেকে বিরত থাকার কথা বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই আসক্তি শুধুমাত্র সম্পদ কেন্দ্রিক আসক্তিকে নির্দেশ করে। দিগম্বর সন্ন্যাসীগণ সর্বদা বিচরণশীল, তাঁরা বস্ত্র পরিধান করেন না। এমনকি সঙ্গে ভিক্ষাপাত্রও রাখেন না। অপরদিকে শ্বেতাম্বরগণ ন্যূনতম বস্ত্রাদি এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সঙ্গে রাখেন তাঁদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস ছাড়া অপর কোন দান গ্রহণ করেন না।

দশবৈকালিকসূত্রে এই পঞ্চম মহাব্রতের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, এই মহাব্রতটি হল ,জাগতিক সমস্ত বিষয়ে আসক্তি ত্যাগ করা। বনে, শহরে অথবা গ্রামে,কম অথবা বেশী, বেশি পরিমাণ অথবা অল্প পরিমাণ, জড় বা অজড়— যে কোন দ্রব্য গ্রহণ করা থেকে এক জন শ্রমণ কায়মনোবাক্যে বিরত থাকেন। অর্থাৎ, তিনি নিজে এরূপ বস্তু গ্রহণ করেন না, অপরকে গ্রহণ করার নির্দেশ দেন না এবং অপরের এরূপ কাজ সমর্থন করেন না।

আচারাঙ্গসূত্রে বলা হয়েছে যে, একজন শ্রমণ কোন উপহার পেলে অনন্দিত হবেন না, বা কোন কিছু না পেলে তিনি তা মজুত করে রাখেন না। আচারাঙ্গ সূত্রানুসারে একজন শ্রমণ যে বস্ত্র পরিধান করেন বা যে ভিক্ষাপাত্রে ভিক্ষা সংগ্রহ করেন সেটিও ভিক্ষালব্ধ। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে একজন শ্রমণ কেবলমাত্র একটিই ভিক্ষাপাত্র রাখতে পারেন।

এছাড়াও একটি মুখবস্ত্রিককা (যাতে মুখের মধ্যে কোন ক্ষুদ্র জীব প্রবেশ করতে না পারে), একটি দণ্ড, একটি চাদর, একটি ছাতা, পা মোছার জন্য একটি বস্ত্র খণ্ড শ্রমণাগ্ নিজেদের কাছে রাখতে পারেন। তবে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, এই নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলি তাঁরা কাছে রাখলেও এগুলির প্রতি যে কোন প্রকার।

৭.০.১.৫.১ অপরিগ্রহ মহাব্রতের পঞ্চ ভাবনা

অপরিগ্রহ মহাব্রতের পঞ্চভাবনা হল পঞ্চেন্দ্রিয়ের বিষয়ের প্রতি আসক্তি ও দ্বেষ বর্জন। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বিভিন্ন বিষয় হল ঃ

(১) শব্দ,
(২) রূপ,
(৩) গন্ধ,
(৪) রস এবং
(৫) স্পর্শ।

এই বিষয়গুলির মধ্যে কোন কোন জিনিস মনোজ্ঞ বা প্রীতিকর, আবার কোন কোন জিনিস অমনোজ্ঞ বা অপ্রীতিকর। প্রীতিকর বিষয়ের প্রতি আসক্তি বর্জন এবং অপ্রীতিকর বিষয়ের প্রতি দ্বেষ বর্জন অপরিগ্রহ মহাব্রতের অনুসারী ভাবনা।

৭.০.২ চিকীর্ষা

চিকীর্ষা ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে ‘প্রযত্ন’ নামক এক প্রকার গুণ। ‘এই কাজ আমি নিজের প্রযত্নের দ্বারা সিদ্ধ করব’— এইরূপ যে ইচ্ছা তাকেই বলে চিকীর্ষা। আমরা যখন বলি ‘আমি রান্না করব’ তখন এর দ্বারা আমরা এ কথাই বলতে চাই যে, আমি নিজ প্রযত্নে পাক কর্ম সম্পাদন করব। চিকীর্ষার দ্বিবিধ কারণ; ১) কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান এবং ২) ইষ্টসাধনতাজ্ঞান। যে বস্তু কৃতিসাধ্য নয় সে বস্তুতে চিকীর্ষা উৎপন্ন হয় না; যেমন চন্দ্রলাভে কৃতিসাধ্যতা

জ্ঞান না থাকার ঐবিষয়ে কোন চিকীর্ষা হয় না, অর্থাৎ চন্দ্র লাভ করার কোন ইচ্ছা আমাদের হয়না, ঐ সকল বিষয়ে কৃতিসাধ্যতা আমাদের নাই।

শুধু কৃতিসাধনতার অভাবেই যে চিকীর্ষার অভাব হয় তা নয়। যে সকল স্থানে ইষ্টসাধনতাজ্ঞানের অভাব থাকে সেখানেও চিকীর্ষা উৎপন্ন হয়না যেমন; ভোজনের পর পাক করার ইচ্ছা হয় না, কারণ ঐ ভোজন ইষ্ট নয়। ইষ্টসাধনতা জ্ঞানের অভাবে এক্ষেত্রে চিকীর্ষা থাকে না।

এই চিকীর্ষার প্রতি বলবৎ অনিষ্টসাধনতাজ্ঞান প্রতিবন্ধক হয়। যেমন, বিষ যুক্ত মধু বা অন্ন ভোজন করার ইচ্ছা কারও হয় না। কারণ বিষমিশ্রিত মধু বা অন্ন ভোজন কৃতসাধ্য এবং তৃপ্তিরূপ ইষ্টের সাধন হলেও মৃত্যুরূপ বলবৎ অনিষ্টের সাধনতাজ্ঞান থাকায় তা ভোজন করার ইচ্ছা কারও থাকেনা।

মতান্তরে বলবৎ দ্বেষ হল চিকীর্ষার প্রতিবন্ধক। কিন্তু এই মত সঠিক নয়। বিষ মিশ্রিত মধু বা অন্ন ভোজন লোকের স্বভাবত: দ্বেষ হয় না বরং, মরণরূপ অনিষ্টের সাধনতাজ্ঞান থাকলে তবেই বিষ মিশ্রিত মধু বা অন্ন ভোজন লোকের ইচ্ছা হয় না। ঐ অনিষ্টসাধনতাজ্ঞান না থাকলে বিষমিশ্রিত মধু বা অন্নভোজনে লোকের ইচ্ছা হতে কোন বাধা থাকেনা। যদি বলা হয় যে, মরণরূপ অনিষ্টসাধনতাজ্ঞানবশত:লোকের বিষমিশ্রিত মধু বা অন্নভোজনে দ্বেষ উৎপন্ন হয়, এবং সেই দ্বেষনিবন্ধন ঐ স্থলে চিকীর্ষা হয় না। এর উত্তরে বলা যায় যে, পূর্বের অনিষ্টসাধনতাজ্ঞানজন্য দ্বেষের প্রতিবন্ধকতা কল্পনা করার অপেক্ষায় অনিষ্টসাধনতাজ্ঞানকেপ্রতিবন্ধক বলে কল্পনা করাতেই লাঘব হয়। এক্ষেত্রে দ্বেষকে কারণ বলা হলে অনিষ্টসাধনতাজ্ঞান এবং অনিষ্টসাধনতাজ্ঞানজন্য দ্বেষ এই দ্বিবিধ কারণ স্বীকীর এবং দ্বেষ উৎপন্ন হওয়ার জন্য একটি অধিক ক্ষণ কল্পনা করতে হয়।

কেউ বলতে পারেন যে, কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান ও ইষ্টসাধনতাজ্ঞানের ন্যায় বলবৎ অনিষ্টের অজনকত্বের জ্ঞানকেও কারণ বলা হোক। এর উত্তরে বলা যায় যে, বলবৎ অনিষ্টের অজনকত্বের জ্ঞানকে কারণ বলা হলে তার জনকত্বের জ্ঞানকে প্রতিবন্ধক বলতে হয়, আবার এই প্রতিবন্ধকের অভাবকেও কারণ বলে স্বীকার করতে হয়। তাতে মহাগৌরব হয়। সেই তুলনায় কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান ও ইষ্টসাধনতাজ্ঞানকে কারণ বলে স্বীকার করা হলে লাঘব হয়।

৭.০.৩. দ্বেষ

ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে দ্বেষ আত্মার অন্যতম গুণরূপে নির্দিষ্ট। দ্বেষের অপর নাম ক্রোধ। যে বস্তু আমাদের অনিষ্টসাধন করে তার প্রতি আমাদের দ্বেষ বা ক্রোধ হয়। কেবল অনিষ্টের সাধন হলেই যে তার প্রতি দ্বেষ হয় তা নয়। কিন্তু কোন জিনিষ অনিষ্টের সাধন এইরূপ অনিষ্টসাধনতাজ্ঞান হলেই সেই বস্তুর প্রতি আমাদের দ্বেষ হয়। অজ্ঞাতসারে মানুষ বিষও ভক্ষণ করে না। দুখেঃর প্রতি সকলের দ্বেষ থাকে। সেই দুঃখের সাধন যে বস্তু তাতে দুঃখসাধনতা জ্ঞানজন্য দ্বেষ হয়। আবার, কেবল দুঃখসাধনতাজ্ঞানকেও দ্বেষের প্রতি কারণ বলা যায় না। যে অনিষ্ট সাধনতাজ্ঞান বলবৎ সেই অনিষ্ট সাধনতাজ্ঞানই দ্বেষের প্রতি কারণ।

অনেক ক্ষেত্রে ইষ্ট কার্য্যের সাধন করতে গিয়েও বহু দুঃখের সম্মুখীন হতে হয়। এরূপ দুঃখ ইষ্ট সাধনের অন্তরালে থাকে বলে যে দুঃখ একে নান্তরীয়ক বা আন্তরালিক দুঃখ বলা হয়। এই নান্তরীয়ক দুঃখ তুলনামূলকভাবে অধিক দুঃখের জনক হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অন্নপাকের জন্য কাষ্ঠাদির আহরণ করতে হয়, অগ্নির উত্তাপ সহ্য করতে হয়। এজন্য পাককর্মও একদিক থেকে দুঃখের কারণ। কিন্তু একথাও আমরা জানি যে এই দুখঃ সহ্য না করলে পাকরূপ ইষ্ট বস্তু সিদ্ধ হয় না। এইজন্য কাষ্ঠহরণাদিজন্য যে দুঃখ তা নান্তরীয়ক দুঃখ। নান্তরীয়কদুঃখজনক পাকাদিকার্যের প্রতি এই কারণে আমাদের দ্বেষ উৎপন্ন হয় না। অন্যভাবে বলা যায়, বলবৎ ইষ্টসাধনতাজ্ঞান দ্বেষের প্রতি প্রতিবন্ধক। অনিষ্টের অপেক্ষায় যদি বলবান হয় তাহলে ইষ্টসাধনতাজ্ঞান দ্বেষের প্রতি প্রতিবন্ধক হয়। পাকাদি কার্য বলবত্তর ইষ্ট হওয়ায় তা দ্বেষের প্রতিবন্ধক। এজন্য কাষ্ঠহরণাদিজন্য দুঃখ দ্বেষের কারণ হয়না। লাভ-লোকসান বিবেচনা করে লোকে কাজ করে। লোকসান অপেক্ষায় যে কাজে বেশী মানুষ সেই কাজই করে, তাতে প্রাথমিকভাবে কিছু লোকসান হলেও তার প্রতি লোকের দ্বেষ হয় না।

৭.০.৪. সারাংশ

পঞ্চ মহাব্রত

শ্রমণ বা শ্রমণাদের ব্রতকে বলা হয় মহাব্রত। জৈনশাস্ত্রানুযায়ী শ্রাবক এবং শ্রমণগণ যে ব্রতসমূহ পালন করেন তা প্রকৃতপক্ষে একই ব্রত তফাৎ শুধু তাদের পালন বা অনুশীলনের মাত্রায়। যে ব্রতগুলি শ্রাবকগণ শিথিল ও পরিমিতভাবে পালন করেন, শ্রমণগণ সেই ব্রতগুলিই সর্বোচ্চ মাত্রায় ও কঠোরভাবে পালন করে থাকেন। মাত্রার উচ্চতা ও কঠোরতার নিরীখেই অনুব্রতগুলি মহাব্রতে উন্নীত হয়।

অহিংস মহাব্রত

অনুব্রতের ন্যায় অহিংস হল প্রথম মহাব্রত। অহিংসা মহাব্রতের অর্থ হল সকল প্রকার হিংসা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা। জীবকে হত্যা করা বা যে কোনো প্রকার ক্ষতি করা অপরাধ জেনে একজন শ্রমণ তা করতে পারেন না। শ্রমণগণ কায়মনোবাক্যে হিংসা থেকে বিরত থাকেন। তাঁরা নিজে সহিংস কর্ম করেন না, অপরের সহিংস কর্ম সমর্থন করেন না এবং পরোক্ষভাবেও সহিংস কর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকেন না। অহংসানুব্রতে কেবলমাত্র ত্রস জীবের প্রতি অহিস আচরণের কথা বলা হয়েছে কিন্তু অহিংস মহাব্রতে সর্বজীবের প্রতি সর্ব প্রকার অহিংস আচরণের কথা বলা হয়েছে।

তত্ত্বার্থসূত্রে উমাস্বাতি প্রতিটি মহাব্রতের অনুসারী পঞ্চ ভাবনার উল্লেখ করেছেন। এই ভাবনা সকল মহাব্রতগুলিকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে সাহায্যকারী অনুনীতিরূপে গৃহীত হয়েছে।

অহিংসা মহাব্রতের অনুসারী পঞ্চভাবনা হ'ল—

১) বাক্য প্রয়োগ সতর্কতা, ২) মনোগুপ্তি, ৩) ঈর্ষাসমিতি, ৪) আদাননিক্ষেপণ সমিতি, ৫) আলোকিত পানভোজন সমিতি।

সত্য মহাব্রত

সত্য মহাব্রতের অর্থ হল মৃষাবাদ বা মিথ্যাভাষণ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা। গৃহীরা আংশিক বা পরিমিতরূপে এই ব্রত পালন করেন। কিন্তু শ্রমণদের ক্ষেত্র সামান্যতম মিথ্যাত্বেরও কোন স্থান নেই। শ্রমণগণ এমন মিথ্যা বলবেন না যা জীবের পক্ষে হানিকর। শ্রমণদের ইন্দ্রিয়ের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাঁরা কষায় মুক্ত হন এবং তাঁর অতীত পাপের মুলোচ্ছেদ হয়।

সত্য মহাব্রতের সাহায্যকারী পাঁচটি ভাবনা হলো ঃ

১) **ক্রোধ প্রত্যাখান,**

২) **লোভ প্রাত্যাখান,**

৩) **ভীরুত্ব প্রত্যাখান,**

৪) **হাস্য প্রত্যাখান,**

৫) **অনুবীচীভাষণ।**

অস্তেয় মহাব্রত

অস্তেয় মহাব্রতের অর্থ হল সর্বপ্রকার অদত্তাদান বিরমণ। শ্রমণগণ সম্পূর্ণরূপে চৌর্যবৃত্তি থেকে বিরত হবেন। একজন শ্রমণস্বত্তাধিকারীর অনুমোদন ব্যতীত কোন সজীব বা অজীব বস্তু, স্বল্প বেশী পরিমাণ অথবা দাঁতের মাজনের মত তুচ্ছ জিনিসও নিজে গ্রহণ করেন না, অপরকে গ্রহণ করার নির্দেশ দেন না বা অন্যের এরূপ কাজ সমর্থনও করেনা। এরূপ কার্য থেকে তিনি নিজে যে শুধুমাত্র বিরত থাকেন তাই নয়, অপরকে অরূপ কার্য করার নির্দেশ দেন না এবং অপরের এরূপ কার্য অনুমোদনও করেন না। একজন শ্রমণ সর্বদা কায়িক, মানসিক এবং বাচিক চৌর্যের সংস্রব থেকে মুক্ত।

অদত্তাদানকে চার ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে যা শুধুমাত্র শ্রমণদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শ্রাবকদের ক্ষেত্রে নয়। এই বিভাগগুলি হল—

১) **স্বামী অদত্তাদান,**

২) **জীব অদত্তাদান,**

৩) **তীর্থ অদাত্তদান এবং**

৪) **গুরু অদত্তাদান।**

উপরিউক্ত শ্রেণীকরণ থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে, অদত্তাদানের অর্থ নিছক স্তেয় বা চৌর্য নয়। এর পরিধি আরো বিস্তৃত।

অস্তেয় মহাব্রতের পাঁচটি ভাবনা নিম্নরূপ ঃ

১) **শূন্যাগারবাস,**

২) **বিমোচিত বাস,**

৩) **পরোপরোধাকরণ,**

৪) **ভৈক্ষশুদ্ধি,**

৫) **সধর্মাবিসংবাদ।**

ব্রহ্মচর্য মহাব্রত

শ্রমণদের ক্ষেত্রে ব্রহ্মচর্য ব্রত সকল প্রকার যৌনসম্ভোগ বা অব্রহ্ম থেকে বিরত থাকার ব্রত। বেশি প্রভেদ থাকে না। পূজ্যপাদের মতে, একে অপরকে স্পর্শ করার ফলে মোহনীয় কর্মের উদ্ভব হয় এবং তার ফলে মৈথুন সংঘটিত হয় এক্ষেত্রে সমলিঙ্গের দুই ব্যক্তির (স্ত্রী অথবা পুরুষ) ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। এমনকি দুটি পৃথক প্রজাতির যৌবনতাও এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন, বিপরীত লিঙ্গের একটি মানুষ ও একটি পশু। এক কথায় মৈথুনের মধ্যে সমস্ত প্রকার যৌনতা অন্তর্ভুক্ত। এজন্য এটি ব্রহ্মচর্য মহাব্রত। শ্রমণদের ক্ষেত্রে সর্বতোভাবে যৌন সম্ভোগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শ্রমণগণ শুধু যে যৌনসম্ভোগ থেকে বিরত থাকেন তাই নয়, পঞ্চেন্দ্রিয়ের বিভিন্ন প্রকার সুখানুভূতি থেকেও তাঁরা বিরত থাকেন। যৌনতা বলতে এখানে শুধুমাত্র স্থূল বা প্রত্যক্ষ যৌনসম্ভোগকেই নির্দেশ করা হয়নি, সামান্যতম যৌন ইঙ্গিতবাহী কার্যকলাপেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, শ্রমণদের পক্ষে কোনো নারীর সঙ্গে কথা বলা, একই আসনে আসন গ্রহণ করা প্রভৃতিও নিষিদ্ধ হয়েছে।

তত্ত্বার্থসূত্রে ব্রহ্মচর্য মহাব্রতের অনুসারী পাঁচটি ভাবনার উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলি হল ঃ

১) **স্ত্রীরাগকথাশ্রবণ,**

২) **তন্মনোহরাঙ্গনিরীক্ষণ,**

৩) **পূর্বরতানুস্মরণ,**

৪) **বৃষ্যেষ্টরস,**

৫) **স্বশরীরসংস্কারত্যাগ।**

অপরিগ্রহ মহাব্রতে

অপরিগ্রহ মহাব্রতের অর্থ সকল প্রকার আসক্তি ও অধিকারভোগ থেকে বিরত থাকা। পরিগ্রহ হল মূর্ছা বা আসক্তি। সুতরাং অপরিগ্রহ হল অনাসক্তি। অপরিগ্রহ মহাব্রতে শ্রমণদের সকল প্রকার আসক্তি থেকে বিরত থাকার কথা বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই আসক্তি শুধুমাত্র সম্পদকেন্দ্রিক নয়, যে কোনো প্রকার আন্তর আসক্তি বা বহির্জাগতিক বস্তুকেন্দ্রিক আসক্তিকে নির্দেশ করে। দিগম্বর সন্ন্যাসীগণ সর্বদা বিচরণশীল, তাঁরা বস্ত্র পরিধান করেন না। এমনকী সঙ্গে ভিক্ষাপাত্রও রাখেন না। অপরদিকে শ্বেতাম্বরগণ ন্যূনতম বস্ত্রাদি এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সঙ্গে রাখেন এবং তাঁদের নিতান্ত প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস ছাড়া অপর কোনো দান গ্রহণ করেন না।

একজন শ্রমণ আসক্তি থেকে কায়মনোবাক্যে বিরত থাকেন। অর্থাৎ, তিনি নিজে কোনো বস্তু গ্রহণ করেন না, অপরকে গ্রহণ করার নির্দেশ দেন না এবং অপরের এরূপ কার্য সমর্থন করেন না। তিনি যে বস্ত্র পরিধান

করেন বা যে ভিক্ষাপাত্রে ভিক্ষা সংগ্রহ করেন সেটিও ভিক্ষালব্ধ। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে একজন শ্রমণ কেবলমাত্র একটিই ভিক্ষাপাত্র সঙ্গে রাখতে পারেন। এছাড়াও একটি মুখবস্ত্রিকা, একটি দণ্ড, একটি চাদর, একটি ছাতা, পা মোছার জন্য একটি বস্ত্রখণ্ড শ্রমণাগণ নিজেদের কাছে রাখতে পারেন।

অপরিগ্রহ মহাব্রতের পঞ্চভাবনা হল পঞ্চেন্দ্রিয়ের বিষয়ের প্রতি আসক্তি ও দ্বেষ বর্জন। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বিভিন্ন বিষয় হল ঃ

১. **শব্দ,**

২. **রূপ,**

৩. **গন্ধ,**

৪. **রস এবং**

৫. **স্পর্শ।**

চিকীর্ষা

চিকীর্ষা ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে 'প্রযত্ন' নামক এক প্রকার গুণ। 'এই কাজ আমি নিজের প্রযত্নের দ্বারা সিদ্ধ করব' — এইরূপ যে ইচ্ছা তাকেই বলে চিকীর্ষা। আমরা যখন বলি 'আমি রান্না করব' তখন এর দ্বারা আমরা এ কথাই বলতে চাই যে, আমি নিজ প্রযত্নে পাক কর্ম সম্পাদন করব। চিকীর্ষার দ্বিবিধ কারণ (১) কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান এবং (২) ইষ্টসাধনতাজ্ঞান। যে বস্তু কৃতিসাধ্য নয় সে বস্তুতে চিকীর্ষা উৎপন্ন হয় না; যেমন, চন্দ্রলাভে কৃতিসাধ্যতা জ্ঞান না থাকায় ঐ বিষয়ে কোনো চিকীর্ষা হয় না, অর্থাৎ চন্দ্র লাভ করার কোনো ইচ্ছা আমাদের হয় না। অনুরূপভাবে বৃষ্টি বর্ষণ করার বা কাউকে অমর করার ইচ্ছা আমাদের হয় না। কারণ, ঐ সকল বিষয়ে কৃতিসাধ্যতা আমাদের নাই।

দ্বেষ

ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে দ্বেষ আত্মার অন্যতম গুণরূপে নির্দিষ্ট। দ্বেষের অপর নাম ক্রোধ। যে বস্তু আমাদের অনিষ্টসাধন করে তার প্রতি আমাদের দ্বেষ বা ক্রোধ হয়। কেবল অনিষ্টের সাধন হলেই যে তার প্রতি দ্বেষ হয় তা নয়। কিন্তু কোনো জিনিস অনিষ্টের সাধন এইরূপ অনিষ্টসাধনতাজ্ঞান হলেই সেই বস্তুর প্রতি আমাদের দ্বেষ হয়। অজ্ঞাতসারে মানুষ বিষও ভক্ষণ করে। কিন্তু জেনে শুনে কেউ তা করে না। মৃত্যুর সাধন জানলে কেউ বিষ ভক্ষণ করে না। দুঃখের প্রতি সকলের স্বাভাবিক দ্বেষ থাকে। সেই দুঃখের সাধন যে বস্তু তাতে দুঃখসাধনতা জ্ঞান জন্য দ্বেষ হয়। আবার, কেবল দুঃখসাধনতাজ্ঞানকেও দ্বেষের প্রতি কারণ বলা যায় না।যে অনিষ্ট সাধনতাজ্ঞান বলবৎ সেই অনিষ্ট সাধনতাজ্ঞানই দ্বেষের প্রতি কারণ।

৭.০.৫ কতিপয় শব্দের অর্থ

মনোগুপ্তি

মনোগুপ্তির অর্থ মনকে সংযত করা।

ঈর্যাসমিতি

ঈর্যাসমিতির অর্থ হল সতর্কতার সহিত গমনাগমন করা যাতে কোনো জীবের ক্ষতি হয় না।

আদাননিক্ষেপণ সমিতি

আদাননিক্ষেপণ সমিতির অর্থ হল প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ এমনভাবে ব্যবহার করা যাতে কোনো জীবের ক্ষতি না হয়।

অনুবীচীভাষণ

অনুবীচীভাষণ হল সর্বদা সুচিন্তিত বাক্য প্রয়োগ করা।

ভাবনা

প্রতিটি মহাব্রতের অনুসারী পঞ্চ ভাবনার উল্লেখ আছে। এই ভাবনা সকল মহাব্রতগুলিকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে সাহায্যকারী অনুনীতিরূপে গৃহীত হয়েছে।

শূন্যাগারবাস

শূন্যাগারবাসের অর্থ হল নির্জনস্থানে বসবাস করা, যেমন পর্বতের গুহা প্রভৃতি।

বিমোচিত বাস

বিমোচিত বাস হল পরিত্যক্ত গৃহে বাস করা।

পরোপরোধাকরণ

পরোপরোধাকরণ হল অপর শ্রমণের সঙ্গে বাসস্থান ভাগ করে নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না করা। একজন শ্রমণ যে বাসস্থানে থাকেন, তা তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়।

ভৈক্ষশুদ্ধি

ভৈক্ষশুদ্ধি বলতে বোঝায় শ্রমণগণ এমন ভিক্ষা গ্রহণ করবেন যা শাস্ত্রসম্মত বা বিশুদ্ধ।

সধর্মাবিসংবাদ

সধর্মাবিসংবাদ বলতে বোঝায় সহ-শ্রমণের সঙ্গে ব্যবহার্য কোনো জিনিস নিয়ে বাদানুবাদ থেকে বিরত থাকা। যে সমস্ত ব্যবহার্য জিনিস শ্রমণগণ মিলিতভাবে ব্যবহার করে থাকেন, সেগুলি নিয়ে কেউ কারো সঙ্গে বাদানুবাদে লিপ্ত হবেন না।

আদাননিক্ষেপণ সমিতি

আদাননিপেক্ষণ সমিতি বলতে বোঝায় প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ এমনভাবে ব্যবহার করা যাতে কোনো জীবের ক্ষতি না হয়।

আলোকিত পানভোজন সমিতি

আলোকিত পানভোজন সমিতি বলতে বোঝায় সঠিকভাবে নিরীক্ষণ করার পরই খাদ্য গ্রহণ করা। খাদ্য গ্রহণ কালে কোনো ভাবেই যেন জীবের অনিষ্টসাধন না হয়।

তীর্থ অদত্তাদান

তীর্থ অদত্তাদান বলতে বোঝায় এমন ভিক্ষা গ্রহণ করা যা তীর্থঙ্কর বা কেবলজ্ঞানীদের দ্বারা নিষিদ্ধ রূপে উপদিষ্ট হয়েছে।

গুরু অদত্তাদান

স্বত্বাধিকারী যে দ্রব্যটি শ্রমণকে দান করেন সেটি যদি তাঁর গুরুর দ্বারা অনুমোদিত না হয়, তবে ঐ দানকে গুরু অদত্তাদান বলা হয়।

চিকীর্ষা

চিকীর্ষা ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে 'প্রযত্ন' নামক এক প্রকার গুণ।

৭.০.৬ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

3. What is *mahāvrata*?
4. What is *bhāvanā*?
5. What are the *bhābanā-s* of *ahimsa mahavrata*?
6. What are the *bhābanā-s* of *satya mahāvrata*?
7. What are the *bhābanās* of *asteya mahāvraata*?
8. What are the *bhābanās* of *brahmacarya mahāvraat*?
9. What is *cikIrsa*?
10. What is *dvesa*?

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

1. Explain in brief the pañca mahāvarts of the Jaina monks.
2. What is mahāvrata? Explain the ahimsā mahāvrata of a Jaina monk. State the pañca bhābanās of ahimsā mahāvrata.

3. Explain *satya mahāvrata* and *asteya mahāvrata* stating their respective *bhabanā-s.*

4. Explain *ciklrsā* and *dvesa* after the Nyāya-Vaisesikas.

৭.০.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১। মহাপ্রজ্ঞ আচার্য, অহিংসার এক অদৃশ্য দিক, পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক অনুব্রত সমিতি, ১৯৯৮।

২। মুনিজী, শ্রীসুজয, জৈনধর্ম ও শাসনাবলী, শ্রীঅখিলভারতীয় স্বারক জৈন সংগঠন, ১ম সংস্করণ, ৬ই মে ২০০০।

৩। শ্যামসুখা, পূরণচাঁদ, ভগবান মহাবীর ও জৈনধর্ম, জৈনভবন, কলিকাতা।

৪। সেন, অমূল্যচন্দ্র, জৈনধর্ম, বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ, ১ম প্রকাশ ১৩৫৮, শ্রাবণ।

৫। ন্যায় দর্শন, গৌতম, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কৃত বঙ্গানুবাদ সহ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যদ।

৬। ভাষা পরিচ্ছেদ সিদ্ধান্তমুক্তাবলী সহ, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, পঞ্চানন শাস্ত্রী কৃত বঙ্গানুবাদ সহ।

7. Ahimsa, Anekanta and Jainism, Sethia Tara (ed.), Motilal Banarsidass, Delhi, 1st Edition 2004.

8. Babb, A. Lawrence, Ascetics and King in a Jain Ritual Culture, Motilal Banarsidass, Delhi, 1st Indian Edition 1998.

9. Bhargava, Dayanand, Jaina Ethics, Motilal Banarsidass, Delhi, 1st Edition 1968.

10. Stevenson, Sinclair, The Heart of Jainism, Munshiram Monaharlal, New Delhi, 1st Indian Edition, nov. 1970.

11. Studies in Jainism, The Ramkrishan Mission Institute of Culture, 1st Edition 1997.

12. Tattvartha Sutra That Which Is, Trans. By Tatia, Nathmal, Motilal Banarsidass, Delhi, 1st Indian Edition 2007.

13. S.K Maitra The Ethics of the Hindus, CalCutta University, 1963.

14. I.C. Sharma, Ethical Philosophies of Indian, George Allen & Unwin, 1965.

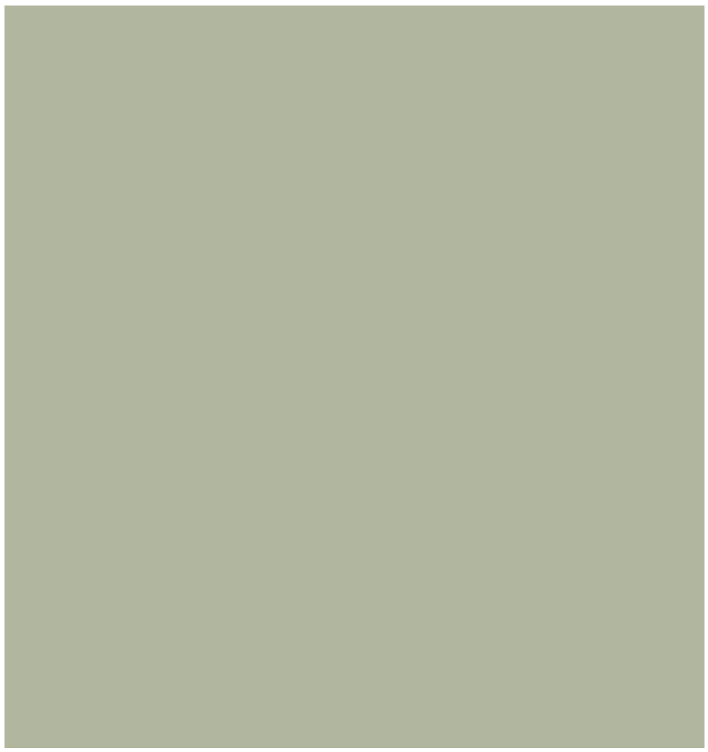

পরিবেশ-নীতিশাস্ত্র

অধ্যাপক সন্তোষ কুমার পাল

সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

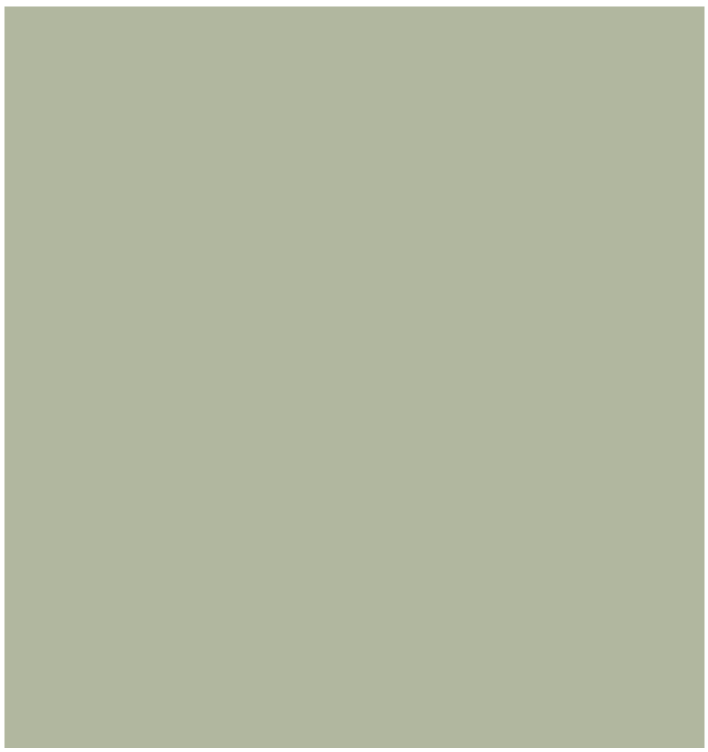

পাঠ একক - ১

প্রথম অংশ ঃ পরিবেশ নীতিতত্ত্ব ঃ অবতরণিকা

১.০ উদ্দেশ্য ঃ

এই পাঠ এককটি তিনটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে পরিবেশ-নীতিশাস্ত্রের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেব, যেখানে এই নীতিশাস্ত্রের সংজ্ঞা, বিতর্ক বিষয় ও প্রধান প্রধান নীতিতত্ত্বগুলির অবতারণা থাকবে। দ্বিতীয় অংশে মানবকেন্দ্রিকতাবাদের পর্যালোচনা করব। মানবকেন্দ্রিকতা বলতে কী বোঝায়, এর কোন প্রকরণগুলি নীতিগতভাবে আপত্তিজনক তার আলোচনা থাকবে এই অংশে। তৃতীয় অংশে প্রজাতিবাদের সমীক্ষা করব, প্রজাতিবাদী ভাবনার পিছনে যুক্তিগুলির বিচার করব।

১.১.১ প্রাক্‌কথন ঃ

পরিবেশ-প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা কোনো নতুন ঘটনা নয়। মানুষের পরিবেশ-চেতনা বহু প্রাচীন। তবে পরিবেশ-নীতিশাস্ত্রের বিষয়টি হাল-আমলের। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে পরিবেশ সম্পর্কে নতুন করে ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছে। বিজ্ঞানী তথা চিন্তাশীল মানুষ বুঝেছেন যে প্রকৃতি বা পরিবেশ সম্পর্কে আমাদের ধ্যান-ধারণার মধ্যে বেশ কিছু ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা আছে। আজকের বিজ্ঞানী, আজকের মানুষ উপলব্ধি করেছেন যে প্রকৃতি যেমন আমাদের অস্তিত্বের সার্থক স্ফুরণে ও সংরক্ষণে সহায়তা করে, আমাদেরও তেমন কিছু নৈতিক দায় ও কর্তব্য আছে পরিবেশ-প্রকৃতির প্রতি।

প্রকৃতির ক্ষমাহীন প্রতিরোধ—খরা, বন্যা, মহামারী , ভূমিকম্প, সুনামি ইত্যাদি আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছে যে প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক একতরফা নয়, পারস্পরিক। দেরিতে হলেও মানুষ আজ তা বুঝেছে এবং গত পঞ্চাশ-ষাট বছর ধরে মানুষের প্রকৃতি পাঠ উত্তরোত্তর নতুন মাত্রা লাভ করেছে। বায়ু-দূষণ, শব্দ-দূষণ থেকে শুরু করে জীববৈচিত্র্য, তেজস্ক্রিয়তা, বিশ্ব-উষ্ণায়ণ, জলবায়ুর অস্থিরতা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়েছে। এই সচেতনতার ফলে আমাদের বিদ্যাচর্চার বিভিন্ন শাখা আজ পরিবেশ চেতনায় সম্পৃক্ত হয়ে নতুন নতুন রূপলাভ করেছে। সাবেকি অর্থনীতির পাশাপাশি জন্ম নিয়েছে পরিবেশ-অর্থনীতি, তেমনি দর্শন তথা নীতিতত্ত্বের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে পরিবেশ-নীতিভাবনা।

মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, সেই মিথষ্ক্রিয়ার পটভূমি এবং ফলাফল এইসব বিষয়কে কেন্দ্র করে জায়মান নীতিসূত্রগুলো যে বিদ্যার আলোচ্য হয় সেই বিদ্যাকে পরিবেশ-নীতিশাস্ত্র (Environmental Ethics) বলে। পরিবেশ-নীতিশাস্ত্র সমকালীন ব্যবহারিক বা ফলিত নীতিবিদ্যার (Applied Ethics) গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। মানুষের যাবতীয় কর্মকাণ্ড, জীবনযাপন-রীতি এবং কর্মনীতি, এক কথায়, আমাদের যাবতীয় আচার-আচরণ বা উদ্যোগ, যা কোনো না কোনোভাবে প্রকৃতি-পরিবেশকে প্রভাবিত করে, তার সবই পরিবেশ-নীতিশাস্ত্রের বিবেচ্য-বিষয় তো হয়ই, একই সঙ্গে এ ধরনের কাজকর্মের মূলে যেসব কর্মনীতি এবং বিশ্ববীক্ষা কাজ করছে, সেগুলিও পরিবেশ-নীতিশাস্ত্রের বিবেচনার মধ্যে পড়ে। কেবলমাত্র মানুষই

নয়, জল-মাটি-বাতাস সহ পৃথিবী গ্রহের পুরো জীবমণ্ডল পরিবেশ-নীতিশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। শুধু তাই নয়, পৃথিবী ছাড়িয়ে সৌরজগতের যে বিশাল ব্যাপ্তি, যে মহাকাশ তাও আজ পরিবেশ-নীতিশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় বলে গণ্য হচ্ছে।

সমকালীন পরিবেশবাদের অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে তুলনা করলে বোঝা যায় চিরাচরিত সাবেকি পাশ্চাত্য নীতিবোধ মূলত মানবকেন্দ্রিক বা প্রজাতিবাদী, সেখানে কেবল মানুষের স্বার্থকেই গুরুত্বপূর্ণ ভাবা হয়েছে। মনে করা হয়েছে, মানুষেরই কেবল স্বতোমূল্য (intrinsic value) বা স্বগতমূল্য (inherent value) আছে। মনুষ্য প্রজাতিকে বাদ দিয়ে প্রাণীজগৎ তথা প্রকৃতির যে বিপুল আয়োজন তার নিজস্ব কোনো মূল্য, অর্থাৎ স্বগতমূল্য স্বীকৃত হয়নি। কিন্তু আজকের পরিবেশ ভাবনা আমাদের শিখিয়েছে, কেবল মানুষই নয় অন্যান্য প্রাণীকুল, গাছপালা, এমনকি প্রজাতি, বাস্তুতন্ত্র ইত্যাদি সব কিছুর নিজস্ব মূল্য স্বীকার্য। বলা বাহুল্য, সাবেকি নীতি-ভাবনা ও সমকালীন পরিবেশ-নীতিশাস্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। সাবেকি নীতিভাবনায় যেখানে মানুষের স্বার্থেরই স্বতোমূল্য স্বীকৃত হয়েছে সেখানে পরিবেশ-নীতিশাস্ত্র এই মানবকেন্দ্রিক মূল্য-ভাবনাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেই অগ্রসর হয়েছে। অ-মানব প্রাণী তথা প্রকৃতির মূল্য মানুষের প্রয়োজন তথা উপযোগিতার নিরিখে নিরূপিত হয়েছে এতকাল। মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হওয়ার অতিরিক্ত কোনো স্বতন্ত্র মূল্য (স্বগত মূল্য) প্রাণীর জন্য বা প্রকৃতির জন্য স্বীকৃত হয়নি। প্রকৃতি-পরিবেশের কেবল ব্যবহারিক মূল্য বা সহায়ক মূল্য (instrumental value) -ই স্বীকৃত হয়েছে, অর্থাৎ মানুষের প্রয়োজনে মানুষের স্বার্থে যতটুকু লাগে ততটুকুই তার মূল্য। সমকালীন পরিবেশ-ভাবনা এই সাবেকি নীতি-বিচারের ধারাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেই অগ্রসর হয়েছে।

১.১.২ পরিবেশ-নীতিশাস্ত্রের মূল বিতর্কসমূহ ঃ সমকালীন পরিবেশ-ভাবনা তথা পরিবেশ-নীতিশাস্ত্র যোগ হবে নিম্নে আলোচিত বিভিন্ন বিতর্ক তথা অভিমতকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে।

(১) সমকালীন পরিবেশ-নীতিশাস্ত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হল মানবেতর প্রকৃতি বা প্রাণীকুলের স্বগতমূল্য স্বীকার্য কিনা। এক দল পরিবেশ-নীতিতাত্ত্বিকের মতে, সংবেদন-সামর্থ্য (sentience) স্বগতমূল্য আরোপের মানদণ্ড হওয়া উচিত। সংবেদন-সামর্থ্য বলতে সুখ-দুঃখের অনুভব-সামর্থ্যকে বোঝায়। এই বিচারে মানুষ ছাড়াও উন্নত পশু-প্রাণীদের স্বগত মূল্য স্বীকার্য, যেহেতু তাদের সংবেদন-সামর্থ্যের বিষয়টি আজ প্রতিষ্ঠিত সত্য। অন্য আর এক দল পরিবেশবাদীর মতে, নিছক বোধসম্পন্নতা নয়, বৃদ্ধি বা আত্মসম্প্রসারণওকোনো কিছুর স্বগতমূল্য স্বীকারের নৈতিক ভিত্তি হতে পারে। এভাবে বিচার করলে প্রাণীজগৎ, উদ্ভিদ্জগৎ, এমনকী বাস্তুতন্ত্র, প্রভৃতি সমষ্টিগত সত্তারও নৈতিকমূল্য স্বীকার করতে হয়।

(২) সমগ্র জীবকুলের সকল সদস্য নৈতিক দৃষ্টিতে সমান বিবেচিত হবে কিনা তা পরিবেশ-নীতিশাস্ত্রের দ্বিতীয় বিতর্কের বিষয়। পোকামাকড়, মশামাছি, বটবৃক্ষ বা সাপের প্রাণের গুরুত্ব মানুষের জীবনের মতোই গুরুত্ব পাবে, নাকি এদের মধ্যে মাত্রাভেদ থাকবে? একদল সমদৃষ্টির কথা বলেন, আর একদল মূল্যের মাত্রার কথা বলেন।

(৩) তৃতীয় যে বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক তা হল প্রাণীকল্যাণ তথা পশুর অধিকার সংক্রান্ত। এক্ষেত্রেও গুরুতর মতভিন্নতা লক্ষিত হয়। একদিকে রয়েছেন প্রাণীকল্যাণবাদীরা; অন্যদিকে রয়েছেন সংরক্ষণবাদীরা, যাঁদের মতে প্রাণীকল্যাণ নয়, সমগ্র বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যের কথা মাথায় রেখে আমাদের পরিবেশ-নীতি চিন্তা করা উচিত। কিন্তু প্রাণীকল্যাণবাদী বা পশুর অধিকারের যাঁরা প্রবক্তা তাঁরা প্রাণীহত্যা সমর্থন করেন না, এমনকী পরিবেশের সামগ্রিক ভারসাম্যের স্বার্থেও।

(৪) বিতর্কের চতুর্থ বিষয়টি হল মূল্যভাবনার সঙ্গে নীতিদায়ের সম্পর্ক বিষয়ক। সমকালীন কিছু পরিবেশবিদ্ মনে করেন, মূল্যভাবনার সঙ্গে নীতিদায়ের পর্যাপ্ত সম্পর্ক নেই। কোনো সত্তার স্বগতমূল্য স্বীকার করলেই সেই সত্তার প্রতি আমাদের প্রত্যক্ষ নীতিদায় এসে যায় এবং আমরা তার প্রতি নীতিমাফিক আচরণ করতে শুরু করি। আর্নে নেস প্রমুখ নীতিদার্শনিকেরা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন প্রকৃতির সঙ্গে নিজের একাত্মতার অনুভব না হলে, বা প্রকৃতিকে আত্মসত্তার বিস্তৃত রূপ ভাবতে না পারলে, প্রকৃতির প্রতি আমাদের নীতিদায় ফলপ্রসূ হবে না।

(৫) বিতর্কের পঞ্চম বিষয়টি ব্যক্তি নিরপেক্ষ বিষয়গত মূল্য সম্পর্কিত। ব্যক্তি-চেতনা-নিরপেক্ষ বস্তুগতমূল্য বলে সত্যিই কি কিছু আছে? —এ প্রশ্নকে কেন্দ্র করে নীতিদর্শনে তীব্র মতবিরোধ আছে। বেশ কিছু চিন্তাবিদ্ মনে করেন, পরিবেশের মূল্য দেশ-কাল-পাত্রভেদে স্বতন্ত্র হতে পারে না। পরিবেশের যদি কোনো মূল্য থেকে থাকে তবে তা ব্যক্তি-নিরপেক্ষ এবং তা বস্তুগত। আবার যাঁরা বস্তুগত মূল্যের ধারণাকে সন্দেহের চোখে দেখেন সেই সাপেক্ষবাদীরা কোনো কিছু মূল্যবান বলতে কারোর না কারোর কাছে, বা কোনো না কোনো গোষ্ঠীর কাছে মূল্যবান — এরকম বোঝেন।

(৬) ষষ্ঠ বিতর্কটি হল পরিবেশ-ভাবনার সঙ্গে নারীবাদের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে। সমকালীন মননে ধরা পড়েছে, নারী ও প্রকৃতির অবস্থানের মধ্যে এক গভীর সাদৃশ্য রয়েছে এবং পরিবেশের উপর মানবপ্রভুত্বের ধারণাকে পুরুষতান্ত্রিক-প্রভুত্বকামিতার আলোকে বোঝা যেতে পারে।

এছাড়া, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি বর্তমান মানুষের দায়বদ্ধতা, দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন, পরিবেশ-বান্ধব প্রযুক্তি ইত্যাদি সম্পর্কিত বিতর্ক পরিবেশবাদ তথা পরিবেশ-নীতিশাস্ত্রের আলোচনাকে সচল রেখেছে।

১.১.৩ পরিবেশ-নীতিশাস্ত্রের তত্ত্বসমূহ ঃ

সমকালীন পরিবেশবাদের পর্যালোচনা করলে বোঝা যাবে সমকালীন পরিবেশ-নীতিশাস্ত্র নীতিবিচারের মঞ্চে একমাত্র মানুষেরই প্রবেশাধিকার আছে—এই সাবেকি মানবকেন্দ্রিকতাবাদ (Anthropocentrism) বা প্রজাতিবাদ (Speciesism)-কে প্রশ্নবিদ্ধ করেই বিকশিত হয়েছে। একদল নীতিবিদ মনে করেন, অনেক মনুষ্যেতর প্রাণী আছে, যাদের মানুষের মতো সুখ-দুঃখবোধের সামর্থ্য আছে; তাই তাদের দুঃখ-কষ্ট দেওয়া কতটা যুক্তিযুক্ত তা নৈতিক বিবেচনার বিষয়। এই ধরনের চিন্তা-ভাবনা থেকে উদ্ভূত হয়েছে প্রাণকেন্দ্রিকতাবাদ (Biocentrism) তথা সংবেদিতাবাদ (Sentientism)। অপর তাত্ত্বিকেরা মনে করেন, এই জগতের সকল কিছুরই নিজের মত করে বেড়ে ওঠা ও সার্থকভাবে টিকে থাকার অধিকার আছে। এঁদের মতে, প্রাণবান প্রকৃতি তথা নিষ্প্রাণ প্রকৃতি সব কিছুরই নৈতিক মূল্য আছে। এই ধরনের চিন্তাভাবনাই মূর্ততা লাভ করেছে বাস্তুকেন্দ্রিকতাবাদ

(Ecocentrism)-এ। অল্‌ডো লিওপোল্ডের ভূমি-নীতিতত্ত্ব (the Land Ethic) এবং আর্নে নেসের গভীর বাস্তুবাদ (Deep Ecology) বাস্তুকেন্দ্রিক নীতিতত্ত্বের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। অন্যদিকে, নারীবাদীরা প্রকৃতির অবস্থান ও নারীর অবস্থানের মধ্যে মিল খুঁজে পেয়েছেন। এঁদের মতে, নারী ও প্রকৃতি উভয়েই উৎপীড়ন ও বঞ্চনার শিকার। আরো বলতে চান, পুরুষের তুলনায় নারী অনেকবেশী প্রকৃতির সঙ্গে নৈকট্য অনুভব করে এবং তাই পরিবেশ-রক্ষায় নারীরা অনেক বেশী সফল হতে পারে। মনে করা হচ্ছে এই নারীগুণই আমাদের পরিবেশ-নীতিবোধ প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটাতে পারে। বাস্তুকেন্দ্রিক নারীবাদ বা নারীবাদী বাস্তুবাদ (Ecofeminism) এবং পরিবেশ সংক্রান্ত আলোচনায় তা কতটা উপযুক্ত সেই সম্পর্কে Environmental Ethics পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে আলোচনা হয়েছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে সমকালীন পরিবেশ-নীতিশাস্ত্রের আলোচনায় কম-বেশি চারপ্রকার আদর্শনিষ্ঠ তত্ত্ব আছেঃ মানবকেন্দ্রিকতাবাদ (Anthropocentrism), প্রাণকেন্দ্রিকতাবাদ (Biocentrism), বাস্তুকেন্দ্রিকতাবাদ (Ecocentrism) ও বাস্তুনারীবাদ (Ecofeminism)। পরবর্তী পাঠ-এককগুলিতে আমরা এই চারধরনের তত্ত্বের ব্যাখা ও বিচার করব।

পাঠ একক - ১

দ্বিতীয় অংশ ঃ মানবকেন্দ্রিকতাবাদ (Anthropocentrism)

১.২.১ প্রাক্‌কথন ঃ

সাধারণ অর্থে মানবকেন্দ্রিকতা বলতে সেই বিচারধারাকে বোঝায় যা মানুষকে সবকিছুর কেন্দ্রে স্থাপন করে। পরিবেশ-নীতিশাস্ত্রে মানবকেন্দ্রিকতাবাদ সেই মূল্যবোধ তথা আচরণধারাকে বোঝায় যা মনুষ্যেতর প্রাণী তথা প্রকৃতির স্বার্থ এবং ভারসাম্যের বিনিময়েও কেবল মানুষের স্বার্থই গণনা করে। যাই হোক, আমরা পাঠ্যসূচি অনুসরণ করে 'Anthropocentrism ঃ A Misunderstood Problem' টিম হেওয়ার্ডের এই প্রবন্ধ অনুযায়ী এই মানবকেন্দিকতাবাদের পর্যালোচনা করব।

টিম হেওয়ার্ডের মতে 'মানবকেন্দ্রিকতাবাদ' শব্দটির বস্তুতান্ত্রিক-নীতিশাস্ত্র তথা বাস্তরাজনীতিতে সেই ধরনের মনোভঙ্গি, মূল্যবোধ তথা আচার-আচরণকে সমালোচনা করার জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়, যা অন্যান্য প্রজাতি তথা পরিবেশের স্বার্থকে বিঘ্নিত করেও মানুষের স্বার্থকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে গণনা করে। তিনি যুক্তিসহকারে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে অভিধাটির এই প্রয়োগ-রীতি বিভ্রান্তিকর এবং বিপরীত ফলসৃষ্টিকারী (তাঁর ভাষায় 'misleading and counterproductive')। এর স্বপক্ষে তিনি বলেন, মানবকেন্দ্রিকতাবাদকে এই পৃথিবীতে মানুষের অবস্থান সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত সত্তাতাত্ত্বিক বা বিশ্বতাত্ত্বিক অভিমত হিসাবে সমালোচনা করা যায়। কিন্তু একে নৈতিক ভ্রান্তি হিসাবে বিচার করার মধ্যে এক ধারণাগত বিভ্রান্তি রয়েছে। তিনি বলেন, এই ধরনের বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ার কোনো প্রয়োজন নেই, কেননা নৈতিক মানবকেন্দ্রিকতাবাদ-বিরোধীদের মনে মানবকেন্দ্রিকতাবাদের দুর্বলতা বা ত্রুটি সম্বন্ধে যে বিচার রয়েছে তাকে বোঝানোর জন্য এর থেকে উপযুক্ত ভাষা বা অভিধা রয়েছে। তবে এখানে বিষয়টি নিছক শব্দার্থ সম্পর্কিতই নয়, এর মধ্যে বাস্তুতত্ত্বের নীতি এবং রাজনীতির ব্যাপার রয়েছে। সরাসরি মানবকেন্দ্রিকতাবাদের নিন্দা করা শুধু কিছু যথার্থ মানবিক বিচারধারকেই নিন্দা করে না, সেগুলি শেষ পর্যন্ত মানববিদ্বেষ (misanthropy)-এ পর্যবসিত হতে পারে। তাই মানবকেন্দ্রিকতাবাদের সমস্যাটিকে আরো সূক্ষ্মভাবে বোঝা জরুরী এবং তা করতে পারলে আমরা পরিবেশ-নীতিশাস্ত্রকে আরো সংহতভাবে বুঝতে পারবো।

টিম হেওয়ার্ড **পাঁচটি** অংশে বিভক্ত করে সমস্যাটিকে বোঝার চেষ্টা করেছেন। **প্রথম** অংশ তিনি দেখাবেন যে মানবকেন্দ্রিকতাবাদের বিরুদ্ধে প্রকৃত অভিযোগ হল এটা এই পৃথিবীতে মানুষের অবস্থান সম্পর্কে অনালোকিত এক অভিমত (an unenlightened view)। কিন্তু এই অভিমত বা দৃষ্টিভঙ্গী গৃহীত হোক বা না হোক তা কোনো সরাসরি নৈতিক তাৎপর্য বহন করে না। **দ্বিতীয়** অংশে তিনি দেখাবেন, বেশ কিছু ক্ষেত্রে মানবকেন্দ্রিকতাবাদের মোটেই আপত্তিকর নয়। তৃতীয় অংশে তিনি দেখিয়েছেন নীতিশাস্ত্রে মানবকেন্দ্রিকতাবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ত্রুটি-বিচ্যুতি বা সীমাবদ্ধতাকে প্রজাতিবাদ (speciesism) এবং মানবীয় স্বাজাত্যভিমান (human chauvinism)-এর ভাষায় আরো ভালোভাবে বোঝা যায়। কেন এই ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলিকে মানবকেন্দ্রিকতাবাদ বলে তুলে ধরলে আখেরে লাভ হয় না তা বোঝানোর জন্য **চতুর্থ** অংশে তিনি দেখাবেন যে যেকোনো নীতিশাস্ত্রে মানবকেন্দ্রিকতাবাদের এক অবিচ্ছেদ্য বা অপরিহার্য উপাদান আছে। এবং **পঞ্চম** অংশে এই সূত্র ধরেই তিনি দেখাবেন এই ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি কোনোভাবেই স্বরূপত মানুষের স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়।

১.২.২ মানবকেন্দ্রিকতাবাদ অতিক্রম করা বলতে কি বোঝাতে পারে ? (What it can mean to overcome anthropocentrism?)

মানবকেন্দ্রিকতাবাদের আক্ষরিক অর্থ মানুষকে কেন্দ্র করে সবকিছু বিচার করা। কিন্তু এর দ্বারা ঠিক কি বোঝায় তা স্বতোসিদ্ধ নয়, বরং সমস্যাকীর্ণ। আমরা প্রথমেই এর বিশ্বতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা এবং নৈতিক ব্যাখ্যার মধ্যে পার্থক্য করতে পারি। বিশ্বতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে মানুষকে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রে স্থাপন করা, সবকিছুর নিয়ামক হিসাবে বিচার করা মানবকেন্দ্রিক বিভ্রান্তি। আমরা এক মহত্তর সত্তারাজ্যের বাসিন্দা — এটাই সত্য। এই মানবকেন্দ্রিকতাকে মানুষ কাটিয়ে উঠতে পারে যদি সে জগতে তার অবস্থান বিষয়ে যথার্থভাবে আলোকিত হয়। এই আলোকপ্রাপ্তি বিজ্ঞানের পথ ধরে আসতে পারে, ধর্মের পথ ধরে আসতে পারে, বা অতীন্দ্রিয়বাদের মধ্য দিয়েও আসতে পারে।

আধুনিক বিজ্ঞান, বিশেষ করে বাস্তুবিজ্ঞানের গবেষণা এটা প্রমান করেছে যে মানবকেন্দ্রিকতাবাদের এই অভিমান যথার্থ নয়। বিবর্তনবাদ বরং এই সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করেছে যে আমরা একই প্রাকৃতিক বিবর্তনপ্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি, অন্যান্য প্রাণীকুলের সঙ্গে আমাদের যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে, এবং আমরা বাস্তুতান্ত্রিক কতকগুলি শর্তের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকি। তাই, মানুষকে অনুপম অদ্বিতীয় সত্তা হিসাবে দেখা বা তার কতকগুলো ক্ষমতা বা বৈশিষ্ট্যকে অনুপম বলে ব্যাখ্যা করা ঠিক নয়। এই অর্থে মানবকেন্দ্রিকতাবাদকে অতিক্রম করা পাশ্চাত্য আলোকদীপ্তি (The Western Enlightenment)-র এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

তবে আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানই মানবকেন্দ্রিক বিশ্ববীক্ষাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে এরকম নয়। প্রাচ্যের বেশ কিছু বিশ্ববীক্ষা আছে যেখানে আমরা মানবকেন্দ্রিকতার বিরোধী বিশ্ববীক্ষা পাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমরা হিন্দু, বৌদ্ধ এবং জৈনদের বিশ্বতত্ত্বের উল্লেখ করতে পারি যেগুলি এই অর্থে মানবকেন্দ্রিক নয়, বরং বস্তুকেন্দ্রিকতাবাদী।

টিম হেওয়ার্ডের বক্তব্য, বিশ্বতত্ত্ব সম্পর্কে আমাদের ধ্যান-ধারণা যাই হোক না কেন, নীতিশাস্ত্রের মানবকেন্দিকতাবাদের সমস্যাগুলিকে স্বতন্ত্রভাবে উত্থাপন করতে হবে। নৈতিক সমালোচনা অনুসারে মানবকেন্দিকতাবাদ হল সেই ভ্রান্তি যা অন্য সত্তাসমূহের স্বার্থের বিপরীতে কেবল মানুষের স্বার্থকেই অগ্রাধিকার দেয়। (তাঁর ভাষায়, 'the mistake of giving exclusive or arbitrarily preferential consideration to human interests as opposed to the interests of other beings')।

এখন, বিশ্বতাত্ত্বিক মানবকেন্দ্রিকতাবাদ এই নৈতিক অভিমতের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ যে কেবল মানুষেরই নৈতিক মূল্য আছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই বিশ্বতাত্ত্বিক মানবকেন্দ্রিকতাবাদ থেকে এই নীতিভাবনা সরাসরি নিঃসৃত হয় না। কেউ মানবকেন্দ্রিক সত্তাতত্ত্বের সমর্থক না হয়েও এই ধরনের নৈতিক অভিমতে স্থিত হতে পারে। সুতরাং যেসব যুক্তিতে মানবকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্বকে বর্জন করা যায় সেই যুক্তিগুলি নৈতিক মানবকেন্দ্রিকতাবাদের উফর সরাসরি প্রভাব ফেলবে এমন কোনো আবশ্যিকতা নেই। তাই, নীতিশাস্ত্রে মানবকেন্দ্রিকতাবাদ কেন ভ্রান্তদর্শী তা প্রতিপাদনের জন্য স্বতন্ত্র ব্যাখ্যার প্রয়োজন।

১.২.৩ মানবকেন্দ্রিকতাবাদের আপত্তিকর বা মন্দ দিক নয় কোনটি ? (What is not wrong with anthropocentrism?) ঃ

নীতিশাস্ত্রে মানবকেন্দ্রিকতাবাদের ধারণাটিকে অনেকে আত্মকেন্দ্রিকতাবাদ (egocentrism)- এর সঙ্গে তুলনা করে বোঝেন এবং এর ফলে এই ধারণাটি নঞর্থক তাৎপর্য পরিগ্রহ করেছে। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে আত্মকেন্দ্রিক

হওয়াকে যেমন নৈতিক বিচারে অনুচিত মনে করা হয় ঠিক তেমনি সমষ্টিগত বাস্তুতাত্ত্বিক ক্ষেত্রে মানবকেন্দ্রিক হওয়া অনুচিত বা মন্দ ভাবা নয়। কিন্তু ঘটনা হল, মানবকেন্দ্রিক হওয়া কতকগুলি ক্ষেত্রে অপরিহার্য; অনেক ক্ষেত্রে তা আপত্তিজনক তো নয়ই, বরং অভিপ্রেত। যেমন, মানুষের মতো চিন্তা করা ছাড়া মানুষের কোনো বিকল্প নাই। আমরা যেসব ইন্দ্রিয় জন্মসূত্রে পেয়েছি তার মাধ্যমেই জগতকে দেখি, বুঝি। এর কোনো বিকল্প নাই (ফ্রেডেরিক ফেরে একে 'perspectival anthropocentrism' বলেছেন)। ইহাও অপরিহার্য যে আমরা নিজেদের ব্যাপারে, নিজেদের প্রজাতির সদস্যদের ব্যাপারে আগ্রহী হব। অন্যান্য প্রাণীকুল যেমন নিজেদের স্বার্থের ব্যাপারে যত্ন নেয় তেমনি মানুষও তার আত্মীয়-স্বজনের বৈধ স্বার্থপূরণে আগ্রহী হয় এবং এই আচরণকে খারাপ বলা যায় না, বরং তা যথোচিত। ম্যারি মিড্‌গ্লে এই অভিমত পোষণ করেন যে মানবকেন্দ্রিক হওয়া অনেক ক্ষেত্রে সদর্থকভাবে অভিপ্রেত। অতীতে 'আত্মকেন্দ্রিক' শব্দটিকে আলংকারিক ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে সুগঠিত, সুষম ব্যক্তি-মানুষকে বোঝানোর জন্য, তেমনি মানবকেন্দ্রিক হওয়া বলতে মানবসত্তার সুষম ধারণা (টিম হেওয়ার্ডের ভাষায় 'having a well balanced conception of what it means to be a human')-কে বোঝায় যা মানবতা (humanity) রূপ আদর্শনিষ্ঠ ধারনার সঙ্গে সম্পৃক্ত। অধিকন্তু, অনেকে মনস্তাত্ত্বিক ও দার্শনিক এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে আত্ম-প্রেমকে যদি যথার্থ বোঝা হয় তাহলে দেখব তা অন্যকে ভালবাসায় পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। অর্থাৎ আমি যদি নিজেকে যথার্থ ভালোবাসতে না পারি তাহলে অন্যকেও ঠিক ঠিক ভালোবাসতে পারবো না। এই বিষয়টিকে কিঞ্চিৎ প্রসারিত করে বলতে পারি, মানুষ যদি তার প্রতিবেশীদের সঙ্গে কিভাবে ভদ্রস্থ ব্যবহার করবে জানে তাহলেই সে অন্য প্রজাতির সঙ্গে সভ্য-ভব্য ব্যবহার করতে শিখবে। বস্তুত মানুষের ভাল করার যে সদর্থক চিন্তা বা প্রযত্ন তা নিজে নিজেই মনুষ্যেতর সত্তার ভাল করার চিন্তাকে বাধা দেয় না।

এই সব প্রসঙ্গের অবতারণার অর্থ এই নয় যে মানবকেন্দ্রিকতাবাদে কোনো সমস্যা নেই। এগুলি এটাই ইঙ্গিত করে যে মানবকেন্দ্রিকতাবাদের ভ্রান্তদর্শিতা তথা মন্দত্বকে আরও যত্ন সহকারে নির্দ্দিষ্ট করা প্রয়োজন।

১.২.৪ নীতিশাস্ত্রে মানবকেন্দ্রিকতাবাদের কোন্ প্রকরণগুলি ভ্রান্তদর্শী বা মন্দ? (What is wrong with anthropocentrism in ethics?) ঃ

পরিবেশ নীতিশাস্ত্রে মানবকেন্দ্রিকতাবাদের যেটি আপত্তিজনক প্রকরণ তা হল অন্য প্রজাতির স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে, এমন কি, তাদের প্রাণের বিনিময়েও মানুষের স্বার্থকে গণনা করা। টিম হেওয়ার্ডের মতে, এইভাবে মানব-স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়টিকে আমরা যথাযথভাবে তুলে ধরতে পারব যদি আমরা 'প্রজাতিবাদ' (speciesism) এবং 'মানব-স্বাজাত্যভিমান' (human chauvinism) - এই পরিভাষা দুটি ব্যবহার করি। যদিও অনেকক্ষেত্রে এই পরিভাষা দুটিকে মানবকেন্দ্রিকতাবাদের বিকল্প হিসাবে গ্রহণ করা হয়, তথাপি এদের মধ্যে পার্থক্য করাটা জরুরী বলে হেওয়ার্ড মনে করেন।

প্রজাতিবাদ ঃ নিছক প্রজাতি সদস্যতার বিবেচনার ভিত্তিতে বৈষম্য করার প্রকরণটিকে প্রজাতিবাদ বলা হয়। লিঙ্গের ভিত্তিতে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে যে রকম পার্থক্য করা হয়, বা গাত্র-বর্ণের ভিত্তিতে শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে যে পার্থক্য করা হয় প্রজাতিবাদে আমরা সেরকম প্রজাতির নিরিখে মনুষ্যপ্রজাতির সঙ্গে অন্য প্রজাতির পার্থক্য করি। মানুষ ও মনুষ্যেত্বর স্বার্থের মধ্যে আমরা অনেক সময় পার্থক্য করি। কিন্তু তা যে সবসময় প্রজাতিবাদী হবে এমন নয়। কেউ তার নিজের প্রজাতির বৈধ স্বার্থ সম্পর্কে আগ্রহান্বিত হতে পারে অন্যপ্রজাতির সদস্যদের

স্বার্থকে বিঘ্নিত না করে। কিন্তু যখন কোনো মানুষ তার খেয়াল-খুশিমতো তার নিজের প্রজাপতির সদস্যদের অন্য প্রজাতির সদস্যদের তুলনায় অগ্রাধিকার দেয় তখন সেই ব্যক্তিকে প্রজাতিবাদী হিসেবে অভিযুক্ত করা যেতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মানুষ সংবেদনশীল প্রাণী বলে তাকে অনাবশ্যক শারীরিক কষ্ট দেওয়া যদি অন্যায় হয়, মন্দকাজ হয় তাহলে অন্যান্য সংবেদনশীল প্রাণীদের শারীরিকভাবে কষ্ট দেওয়া নৈতিক স্বেচ্ছাচারিতা (morally arbitary) হবে, যেখানে কোনো বিধি বা মানদন্ডকে সমগতিপূর্ণভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে না। এইজন্যই মনুষ্যেত্বর প্রাণীর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ প্রজাতিবাদ হিসাবে গণ্য হয়। এখানে প্রাণীকুলকে মানুষের জন্য, তাদের নিজের স্বার্থের ভাষায় বিচার করা হয়, কেবল মানুষের স্বার্থপূরণের উপায় হিসাবে দেখা হয়। কিন্তু যখন আমরা অপরাপর মানুষের সঙ্গে আচরণ করি তখন আমরা মানুষকে উদ্দেশ্য হিসেবে দেখি, অন্য কারোর উদ্দেশ্যাসাধনের উপায় হিসাবে দেখি না। মনে করি, মনুষ্যসত্তার এক বিশেষ ধরনের মর্যাদা এবং সম্মানযোগ্যতা (dignity and worthy of respect) আছে। এখন, মর্যাদা এবং সম্মানযোগ্যতা থাকা বলতে কি বোঝায় এই অধিনীতিতাত্ত্বিক প্রশ্নের উত্তর খোঁজা জরুরী হয়ে পড়ে। এই অধিনীতিতাত্ত্বিক স্তরেই আমরা মানবীয় স্বাজাত্যভিমানকে খুঁজে নিতে পারি।

মানবীয় স্বাজাত্যভিমানে (Human Chauvinism) ঃ যে বিচারধারার মাধ্যমে আমরা সেইসব প্রাসঙ্গিক পার্থক্যগুলিকেই মর্যাদালাভের তথা সম্মানযোগ্যতার শর্ত হিসাবে তুলে ধরি যা অব্যভিচারীভাবে মানুষের পক্ষে যায়। অর্থাৎ আমরা এমনভাবে সম্মানযোগ্যতাকে গণনা করি যাতে করে কেবল মানুষই এই সম্মানের যোগ্য হিসাবে প্রতিভাত হয়। বুদ্ধিবৃত্তি থাকা, উন্নত ভাষা ব্যবহার করা বা যথার্থ বিষয়ী হিসেবে নিজেকে তুলে ধরা, ইত্যাদি সামর্থ্যের ভাষায় যদি প্রাসঙ্গিক সম্মানযোগ্যতাকে সংজ্ঞায়িত করি তাহলে তা অবধারিতভাবে মানুষের পক্ষে যাবে এবং যাবতীয় প্রাণীকুলকে এর থেকে দূরে সরিয়ে দেবে। তবে মানবীয় স্বাজাত্যভিমান মূলত এক বিশেষ ধরনের প্রবণতা যাকে বুঝতে গেলে গভীর অনুসন্ধানের প্রয়োজন হয়। কিন্তু প্রজাতিবাদকে আমরা অন্যায়ের এক সুস্পষ্ট প্রকরণ হিসাবে বুঝতে পারি।

যাই হোক, প্রজাতিবাদ এবং মানবীয় স্বাজাত্যভিমানের মধ্যে এই পার্থক্য সব সময় মেনে চলা হয় না। কিন্তু টিম হেওয়ার্ডের মতে, এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য করাটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, মানবকেন্দ্রিকতাবাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত যে ত্রুটিগুলি অতিক্রম করা প্রয়োজন তা হল আদর্শনিষ্ঠ নীতিশাস্ত্রে প্রজাতিবাদকে অতিক্রম করা এবং প্রজাতিবাদী চিন্তাধারাকে বলবৎ রাখে যে স্বাজাত্যাভিমান তাকে অতিক্রম করা। মানবীয় স্বাজাত্যভিমানকে অতিক্রম করার জন্য প্রাথমিকভাবে প্রয়োজন শুভ বিশ্বাস এবং সহানুভূতিশীল নৈতিক প্রবণতার পরিচর্যা। হেওয়ার্ডের ভাষায়, '.......... overcoming human chauvinism requires primarily a degree of good faith and the development of a sympathetic moral disposition'. অন্যদিকে, প্রজাতিবাদকে অতিক্রম করার অর্থ নৈতিক বিচারের ক্ষেত্রে সঙ্গতির প্রতি নিষ্ঠা রাখা এবং অস্বেচ্ছাচারী বা বিধিনিষ্ঠ হওয়া। একই সঙ্গে মনুষ্যেত্বর প্রাণীকুল সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান ভান্ডারকে বাড়িয়ে তোলা, যা কোন্‌টি স্বেচ্ছাচারিতার আর কোন্‌টি স্বেচ্ছাচারিতা নয় তা নির্দ্দিষ্ট করে দেবে। হেওয়ার্ড মন্তব্য করেছেন, 'Overcoming speciesism requires a commitment to consistency and non-arbitrariness in moral judgement combined with the development of knowledge adequate to ascertaining what is and is not arbitary in our consideration of non-human beings.'

যদিও মানবীয় স্বাজাত্যভিমান তথা প্রাজাতিবাদকে অতিক্রম করার মধ্যে কি ব্যাপার সংশ্লিষ্ট আছে তা নীতিগতভাবে জানতে পারি, কিন্তু বাস্তবে এর থেকে সম্পূর্ণ অতিক্রমণ সম্ভব নয়। কেননা এর কিছু সীমাবদ্ধতা

আছে। পরবর্তী অংশে এই সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আমরা মনোযোগী হব এবং এর মধ্য দিয়েই আমরা বুঝতে পারবো মানবকেন্দ্রিকতাবাদের কোন্ প্রকরণগুলি অবিচ্ছেদ্য কিন্তু আপত্তিজনক নয়।

১.২.৫ নীতিশাস্ত্রে মানবকেন্দ্রিকতাবাদের একটি অপরিহার্য প্রকরণ (An ineliminable element of anthropocentrism in ethics)

নীতিতত্ত্বে মানবকেন্দ্রিকতাবাদের একটি অপরিহার্য উপাদান বা প্রকরণ রয়েছে যেটিকে সম্যক্ স্বীকৃতি না জানালে পরিবেশনীতিশাস্ত্রে উদ্দেশ্যকে সম্যক্ বোঝা যায় না এবং বাহ্যিক সমালোচনা থেকে নীতিশাস্ত্রকে রক্ষা করা যায় না। প্রজাতিবাদ অপরিহার্য নয়, কিন্তু মানবকেন্দ্রিকতাবাদে-র একটি উপাদান অপরিহার্য। বর্ণবাদের সঙ্গে তুলনা করলে প্রজাতিবাদ যে অপরিহার্য নয় তা বোঝা যায়; একজন শ্বেতাঙ্গ মানুষ শ্বেতাঙ্গ মানুষের চোখ দিয়েই জগৎটাকে দেখেন, শত চেষ্টা করলেও তিনি এড়াতে পারেন না। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে প্রজাতিবাদী হওয়া ছাড়া তার কাছে কোনো বিকল্প নাই। অসতর্কতা ও অভ্যাসবশে ঐ শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি বর্ণ-বিদ্বেষ সুলভ মনোভাব দেখিয়ে ফেলতে পারেন, বা বর্ণবাদী আচরণ করে ফেলতে পারেন যা তাকে সমালোচনার মুখোমুখি করিয়ে দিতে পারে। কিন্তু সমালোচক যেহেতু নির্দ্দিষ্ট করে বলতে পারেন তার কোন্ মনোভঙ্গি বর্ণবৈষম্যের প্রকাশক সেইহেতু সেগুলি নীতিগতভাবে সংশোধনযোগ্য। অনুরূপভাবে, প্রজাতিবাদী আচরণও নীতিগতভাবে সংশোধনযোগ্য। এতৎসত্ত্বেও বাস্তবে প্রজাতিবাদ ও বর্ণবাদের মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈসাদৃশ্য রয়েছে ঃ কৃষ্ণাঙ্গ সমালোচক তার সমালোচনাকে এমন ভাষায় ব্যক্ত করতে পারেন, যা শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তিটি বুঝতে পারবেন। কিন্তু মনুষ্যেত্বর প্রজাতির স্বার্থ সম্বন্ধে ভুল বোঝাবুঝির সুযোগ আছে। মনুষ্যেত্বর প্রাণী মানুষের ভাষায় এটা বুঝিয়ে দিতে পারে না যে কোন্ স্বর্থগুলি সম্পর্কে মানুষ তাদের প্রতি মনোযোগ দিচ্ছে না। তাই, অভিপ্রায় যতই ভাল হোক না কেন, মানুষ কখনই নিশ্চিত হতে পারে না যে সে যাবতীয় প্রজাতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি তথা আচরণ থেকে মুক্ত হতে পেরেছে কিনা। একথা বলার অর্থ এই নয় যে প্রজাতিবাদ সম্পূর্ণভাবে পরিহার্য নয়। এই বিচার শুধু এটাই ইঙ্গিত করে যে বর্ণবাদ থেকে মুক্ত হওয়ার তুলনায় প্রজাতিবাদ থেকে মুক্ত হওয়া অনেক বেশি কঠিন। টিম হেওয়ার্ড এই মর্মে যুক্তি দিয়েছেন যে প্রজাতিবাদ পরিহার করার কিছু বাস্তব সমস্যা রয়েছে, কিন্তু তা প্রজাপতিবাদী মানবকেন্দ্রিকতাকে পরিহার করার অসম্ভব্যতাকে প্রকাশ করে না।

প্রজাতিবাদী স্বেচ্ছাচারিতাকে পরিহার করার অসুবিধাগুলির অন্যতম হল একটা নির্দ্দিষ্ট সময়-সীমায় অর্জিত জ্ঞানের আপতিক সীমাবদ্ধতা। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোনো এক বিশেষ প্রজাতির প্রাণীর এক বিশেষ ধরনের সামর্থ্য আছে কিনা আমরা জানি না, যে সামর্থ্য আমাদের এক বিশেষ ধরনের আচরণের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তাই, আমরাও ঠিক জানি না ঐ বিশেষ ধরনের আচরণ অনুমোদনযোগ্য হবে কিনা। অর্থাৎ মনুষ্যেত্বর জগৎ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার যে বাস্তব শর্ত তা প্রজাতিবাদকে সম্পূর্ণ অতিক্রমনের করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। কেননা এর মধ্যে স্বরূপত নৈতিক চিন্তনের এক অ-আপতিক সীমাবদ্ধতা আছে (it involves a non-contingent limitation on moral thinking as such.)। যেখানে প্রজাতিবাদ অতিক্রমণের মধ্যে মানুষ এবং মনুষ্যেতর প্রজাতির প্রাসঙ্গিক সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের জ্ঞানের চর্চা করার ব্যাপার আছে সেখানেও প্রসঙ্গিকতার মানদন্ড কি হবে তা সর্বদা মানবের বিচারের উপরই নির্ভর করবে। প্রজাতিবাদ বলতে প্রাসঙ্গিক ভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ নৈতিক বিবেচনাকে মনুষ্যত্বের প্রাণীকূল পর্যন্ত প্রসারিত করতে অস্বীকার করার স্বেচ্ছাচারিতাকে বোঝায়। কিন্তু মনুষ্যেতর প্রজাতিসমূহের যে সব দিকগুলি মানুষের স্বার্থের মতো নয়, সেগুলি সম্পর্কে সার্থক

নৈতিক সিদ্ধান্ত দেওয়া অসম্ভব। টিম হেওয়ার্ডের ভাষায়, 'the ineliminiable element of anthropocentrism is marked by the impossibility of giving meaingful moral consideration to cases which bear no similarity to any aspect of human cases.' বস্তুত , যেকোনো ধরনের নীতিতত্ত্বের চূড়ান্ত বিষয় যদি হয় মানুষের আচরণকে পরিচালিত করা, তাহলে সেখানে মানবকেন্দ্রিকতাবাদের প্রসঙ্গ থাকবেই। হেওয়ার্ডের ভাষায়,'...... the human reference is ineliminable even when extending moral concern to non-human.'

সব থেকে আকর্ষণীয় ব্যাপার হল, মানবকেন্দ্রিকতাবাদের যে উপাদানটি অপরিহার্য তাই-ই নীতিশাস্ত্রকে সম্ভব করে। যদি নীতিশাস্ত্রের উদ্দেশ্য হয় আমাদের ক্রিয়া-কর্মকে সঠিক পথে পরিচালনা করা এবং কোনো বিশেষ ধরনের নীতিশাস্ত্রে অন্যের উদ্দেশ্যকে নিজের হিসাবে গ্রহণ করা, তাহলে তা ঐ সংশ্লিষ্ট কর্ম-কর্তারাই উদ্দেশ্য হবে। এটি এমন এক অ-আপতিক অথচ গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা যা সম্পূর্ণ অ-মানবকেন্দ্রিক নীতিশাস্ত্র সূত্রবদ্ধ করার প্রচেষ্টাকে অসম্ভব করে তোলে। মূল্যমান সব সময় মূল্যায়নকারী ব্যক্তির মূল্যবোধকেই প্রকাশ করে এবং মূল্যায়নকারী শ্রেণীর মধ্যে যেহেতু মনুষ্যসত্তা প্রবলভাবে অন্তর্ভুক্ত তাই সেখানে মানবীয় মূল্যবোধ অপরিহার্যভাবেই উপস্থিত থাকবে। পরবর্তী অংশে হেওয়ার্ড যুক্তি দিয়েছেন যে মানবিকেন্দ্রিকতার এই প্রকরণ মোটেই মন্দ কিছু নয়।

১.২.৬ মানবিকেন্দ্রিকতাবাদ 'অতিক্রমণ'-এর খারাপ দিক কি? (What is wrong with 'overcoming' anthropocentrism) ঃ

হেওয়ার্ডের মতে, মানবিকেন্দ্রিকতাবাদের সম্পূর্ণ উচ্ছেদের প্রস্তাব মূল সমস্যাকে বুঝতে অসুবিধা সৃষ্টি করে। এখানে সমস্যাটি হল, অ-মানব প্রজাতির প্রতি মানুষের ঔদাসীন্য। তবে মানবকেন্দ্রিকতাবাদ আমরা মানব-স্বার্থের ব্যাপারে অতিরিক্ত প্রযত্ন নেওয়াকেও বোঝাতে পারে। এই দ্বিতীয় অর্থটি কোনো সমস্যা সৃষ্টি করে না, বরং তা প্রত্যাশিত। জগতের চারপাশে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখতে পাই যে কত মানুষ অন্যান্য মানুষদের সম্বন্ধে কি ভয়ঙ্কর মাত্রায় উদাসীন! অধিকন্তু, যেখানে অন্য মানুষের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না তখনও এটা বলা অযৌক্তিক যে যারা এই ক্ষতি করছে তারা 'মানব-কেন্দ্রিক'। যে কয়েকজন চোরা শিকারী এক একটি প্রজাতিকে বিলুপ্তির পথে ঠেলে দিচ্ছে তাদের কাজকে 'মানব-কেন্দ্রিক' বলার বিশেষ কোন অর্থই হয় না। কেননা এই কাজ মনুষ্য-প্রজাতির কয়েকজন ব্যক্তি করে থাকে, যাদের কাজকে সংখ্যাগুরু মানুষই নিন্দা করে। এই চোরা-শিকারীদের কাজ সাধারণভাবে মানুষের কাজ সিদ্ধ করছে না, বরং সংশ্লিষ্ট কয়েকজন ব্যক্তিরই সংকীর্ণ স্বার্থকে সিদ্ধ করে। অনুরূপভাবে, যারা বন-জঙ্গল নষ্ট করছে তারা শুধুই নিজেদের অর্থনৈতিক লভ্যাংশই গণনা করছে। তারা শুধুমাত্র স্থানীয় জনসাধারণের স্বার্থেরই বিরোধিতা করছে না, তারা সকল মানুষ যারা বৃক্ষজাত অক্সিজেনের উপর বাঁচার জন্য নির্ভর করে তাদের ক্ষতি করছে। এমন কি বিভিন্ন ঔষধ তৈরির জন্য মনুষ্যেত্বর প্রাণীর ব্যবহারও সকল মানুষের পক্ষে যায় না। ঐ ধরনের ঔষধপত্র কেনার সামর্থ্য যাদের আছে কেবল তারাই উপকৃত হয়।

টিম হেওয়ার্ড যা বলতে চান তা হল এই ধরনের কাজ-কর্মের জন্য সকল মানুষকেই দায়ী করা বা মানুষকে প্রজাতিবাদী বলা যথোচিত নয়। এই ধরনের কাজ-কর্ম মুষ্টিমেয় কয়েকজন মানুষ করে এবং এদের কাজকে

বেশিরভাগ মানুষ সমালোচনা করে। তাই মানবকেন্দিকতাবাদ-বিরোধী অভিধা এখানে আমাদের কোনো সাহায্য করে না। মুষ্টিমেয় কয়েকজন মানুষের জন্য সাধারণভাবে সকল মানুষকে সমালোচনায় বিদ্ধ করা শুধু ধারণাগতভাবেই বিভ্রান্তিকর নয়, ব্যবহরিক এবং কর্মপন্থাগত ভ্রান্তিও। আমাদের মানবকেন্দ্রিকতাবাদ-বিরোধী অভিধা প্রয়োগ করার উদ্দেশ্য যদি সমস্যাগুলিকে আলোকিত করা হয়, যাতে করে আমরা এই ধরনের কাজকর্ম থেকে বিরত থাকি তাহলে সমস্যাটিকে এরকম ভুলভাবে উপস্থাপন করা সমাধান খোঁজার কাজকে আরও কঠিন করে তোলে। এটা বিশেষ করে গুরুত্ব দেওয়া দরকার যে যখন মানবকেন্দ্রিকতাবাদের চরমপন্থী সমালোচকরা মানুষের স্বার্থের পক্ষে যাঁরা কথা বলে তাঁদের বিরুদ্ধে যান যখন তারা বড় ধরনের বিভ্রান্তির সূচনা করেন। পরিবেশ, বাস্তুতন্ত্র বা প্রাণীকুলের ক্ষতিকরা মুষ্টিমেয় কয়েকজন মানুষের কাজ। কিন্তু যাঁরা এই ধরনের ক্ষতিকর আচার-আচরণগুলিকে মানব সাধারণ (human-in-general)- এর নামে সমর্থন করার চেষ্টা করেন সেই বিশেষ ধরনের চিন্তাধারা (idelogy)-র প্রবর্তকরা প্রকৃত বিষয়কে তুলে ধরার ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি করেন। এই ধরনের ক্ষয়-ক্ষতি সব মনুষ্যেত্বর প্রজাতির, এবং কেবলমাত্র মনুষ্যেত্বর প্রজাতির, ক্ষতি করে না, এবং এর থেকে যে আপাত সুফল পাওয়া যায় তাও সকল মানুষের পক্ষে যায় না।

এইভাবে মানবকেন্দ্রিকতাবাদের সমালোচনাকে ফল-বিরোধী হিসাবে বিচার করার অর্থ প্রজাতিবাদ বা মানব-স্বাজাত্যভিমানকে সমর্থন করা নয়। মানুষের বৈধ স্বার্থ (legitimate interest) এবং অ-বৈধ স্বার্থ (illegitimate interest) -এই দুই ধরনের স্বার্থের মধ্যে পার্থক্য করতে না পারলে তা ফল-বিরোধী হবে। বিপরীতে, প্রজাতিবাদের সমালোচনা সেই সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয় যেখানে অবৈধভাবে প্রজাতির মানদন্ডকে প্রয়োগ করা হয়। প্রজাতিবাদের এমন কোনো প্রকরণ নেই যাকে আমরা সমর্থন করতে পারি। তাই যখন কোনো বিশেষ ধরনের প্রজাতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বা আচরণ মুষ্টিমেয় কয়েকজনের স্বার্থসিদ্ধি করে, সামগ্রিকভাবে মানব প্রজাতির স্বার্থসিদ্ধি না করে, তখন এই ঘটনা প্রজাতিবাদের বিরুদ্ধে আমাদের সমালোচনাকে দুর্বল করে না। কারণ যখনই আমরা স্বীকার করে নিচ্ছি প্রজাতির মানদন্ডকে খেয়ালখুশিরমতো প্রয়োগ করা অবৈধ, তখনই তা সকল মনুষ্য প্রজাতির স্বার্থ সংরক্ষণ করে না — এই ঘটনাটি প্রজাতিবাদের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগকে দুর্বল করে দেয় না। একই রকমভাবে মানব-স্বাজাত্যভিমানের বিরুদ্ধে সমালোচনাও এর দ্বারা দুর্বল হয়ে যায় না। টিম হেওয়ার্ড তাই মন্তব্য করেছেন 'Criticism of speciesism and human chauvinism, then, focus on what is wrong with particular human attitudes to nonhumans without allowing in unhelpful and counterproductive doubts about humans' legitimate concerns for their own kind.' যাইহোক, প্রজাতিবাদকে আরো সুস্পষ্টভাবে বোঝার জন্য, এবং কেন তা সমর্থনযোগ্য নয় তা প্রতিপাদনকল্পে, আমরা এখন বিশেষভাবে প্রজাতিবাদের পর্যালোচনা করব।

পাঠ একক - ১

তৃতীয় অংশ ঃ প্রজাতিবাদ

১.৩.১. প্রজাতিবাদ (Speciesism) ঃ

আমরা পাঠ্যসূচি অনুসরণ করে ডোনাল্ড এ. গ্রাফ্‌ট্ (Donald A. Graft)-এর 'Speciesism' প্রবন্ধটির আলোকে পর্যালোচনা করব। নিছক প্রজাতি সদস্যতার বিবেচনার ভিত্তিতে যে বৈষম্যমূলক আচরণ তাই প্রজাতিবাদ। ডোনাল্ড এ. গ্রাফ্‌টের ভাষায়, 'Speciesism is discrimination, prejudice, or different treatment justified by consideration of species membership'. প্রজাতিবাদের এই বিচারধারা বহু প্রাচীন যুগ থেকেই চলে আসছে। প্রাচীন গ্রীক চিন্তাধারার মধ্যে, পরবর্তীকালে ইহুদী-খ্রীষ্টতত্ত্বে এই প্রজাতিবাদ যথেষ্টই প্রকট। এমনকি, আধুনিক যুগেও প্রজাতিবাদী বিচারধারার তেমনি কোন পরিবর্তন ঘটে নি। বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট-এ সৃষ্টিতত্ত্বের যে বিবরণ আমরা পাই সেখানে মানুষকে সবার উপরে স্থান দেওয়া হয়েছে এবং প্রাণীকুলকে মানুষের নিয়ন্ত্রণে রাখার উপদেশ আছে। এমনকি মনুষ্যেতর প্রাণীকুলকে যথেচ্ছ ব্যবহারকেও স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। কেউ হয়ত মনে করতে পারেন, এই প্রজাতিবাদী ধ্যানধারণা অনালোকিত (জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনগ্রসর) মানুষজনের সীমাবদ্ধ বিশ্ববীক্ষার ফল। কিন্তু ঘটনা হল, বহুল চর্চিত আধুনিকতা বা জ্ঞানদীপ্তি প্রজাতিবাদকে কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করেনি; বরং মনুষ্যেতর প্রাণীকুলে কেবল সহায়ক মূল্যই আছে—এই ভাবনা যুক্তিতর্কের রসদ পেয়ে আরো শক্তপোক্ত হয়েছে। তবে একইসঙ্গে এটাও সত্য যে আধুনিক নীতি-দার্শনিকদের মধ্য থেকেই জেরেমি বেন্‌থাম প্রজাতিবাদের প্রথম সমালোচনা করেন। বেন্‌থামের এই প্রজাতিবাদ বিরোধিতার সূত্র ধরেই সমকালীন ফলিত নীতিশাস্ত্রে প্রজাতিবাদ বিরোধিতা আরো সংহত হয়েছে। বেশ কিছু পরিবেশতাত্ত্বিক তথা প্রাণী-নীতিবিদ বেন্‌থামের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সুসংহত রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, পিটার সিঙ্গারের গ্রন্থ 'Animal Liberation', যার প্রকৃত দৃষ্টান্ত। তিনি খেদোক্তি করে বলেন যে বর্ণের ভিত্তিতে বৈষম্য বা লিঙ্গের ভিত্তিতে বৈষম্য যুক্তি ও নীতির দিক থেকে আজকাল অসহনীয় বিবেচিত হলেও প্রজাতিবাদ এখনও বহাল-তবিয়তে আছে এবং তা পরিত্যাজ্য মনে হয়নি। বেন্‌থাম প্রথম বর্ণবাদের প্রসঙ্গ তুলে প্রজাতিবাদকে বর্জন করার কথা বলেছিলেন। তাঁর বিচারে, ত্বকের কৃষ্ণবর্ণ যেমন কোনো মানুষকে অত্যাচারীর খামখেয়ালিপনায় ছেড়ে আসার কোনো কারণ হতে পারে না তেমনি সংবেদনশীল প্রাণীকে অত্যাচারীর কাছে ফেলে আসা নৈতিক দিক থেকে যথোপযুক্ত নয়।

বর্ণবাদের সঙ্গে প্রজাতিবাদের তুলনার মাধ্যমে যে সাধারণ নীতিটি সামনে উঠে আসে তা হল নৈতিক প্রাসঙ্গিকতার নীতি (the principle of moral relevance)। এই নীতি অনুসারে কোন বৈশিষ্ট্য বা বৈশিষ্ট্যগুচ্ছ নীতিবিবেচনার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হবে সেই বিচারই ঠিক করে দেবে প্রজাতিবাদ নীতি বা যুক্তির দিক থেকে সমর্থনযোগ্য কিনা। গ্রাফ্‌টের মতে, প্রজাতিবাদকে সমর্থনযোগ্য করে তুলতে হলে দুটি বিষয় নিশ্চিত করতে হবে ঃ (ক) নীতিগতভাবে প্রাসঙ্গিক কোনো এক বা একাধিক বিষয় বা যুক্তি, যার ভিত্তিতে প্রজাতিভিত্তিক

বৈষম্যে যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠিত হবে, তা উত্থাপন করতে হবে। (খ) কি ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ কতদূর পর্যন্ত সমর্থনযোগ্য হবে তার একটি সুনির্দিষ্ট মাপকাঠি তাদের দাখিলা করতে হবে।

যাই হোক, প্রজাতিবাদের সমর্থনের যেসব তথ্য বা যুক্তি সাধারণভাবে তুলে ধরা হয় সেগুলি নিম্নোক্ত ধরনের ঃ

(১) প্রাণীরা মানুষের মত যুক্তিশীল বা বুদ্ধিমান নয়।

(২) প্রাণীদের মানুষের মতো উন্নত ভাষা-সামর্থ্য নেই।

(৩) প্রাণীরা নিজেদের অধিকারের দাবী তুলতে পারে না।

(৪) প্রাণীরা মানবাধিকারকে সম্মান করে না, মানুষ কেন তাদের কথা ভাবতে যাবে?

(৫) নীতি-নৈতিকতা মানুষেরই তৈরি। তাই প্রাণীদের ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ অর্থহীন ইত্যাদি।

আমরা প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে প্রাণী হত্যা করি, তাদের মাংস খাই, আবার নিছক আনন্দস্ফূর্তি করার জন্য প্রাণীদের তীব্র যন্ত্রনার মধ্যে ফেলি। আমরা প্রাণীদের উপর নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাই। বলা বাহুল্য, আমাদের সব ধরনের প্রজাতিবাদী আচরণ একটিমাত্র যুক্তির ভিত্তিতে সমর্থিত হবে তা ভাবা যথার্থ নয়। তবে প্রজাতিবাদের সমর্থক চিন্তাবিদরা প্রাণীদের বুদ্ধি তথা বিচার-সামর্থ্যের অভাবের উপর বেশী বেশী করে আলোকপাত করেন। যাই হোক, প্রজাতিবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে গ্রাফ্‌ট্‌ তিন ধরনের প্রজাতিবাদের মধ্যে পার্থক্য করেছেন ঃ স্থূল প্রজাতিবাদ (raw speciesism), সবল প্রজাতিবাদ (strong speciesism) এবং দুর্বল প্রজাতিবাদ (weak speciesism)। স্থূল প্রজাতিবাদ প্রজাতি-সদস্যতার স্বাজাত্যভিমানেই সীমাবদ্ধ। এর বক্তব্য অনেকখানি এরকম ঃ মানুষ মানুষই, প্রাণী প্রাণীই! মনুষ্য-প্রজাতির সদস্য হিসাবে আমাদের নীতিদায় কেবল মানুষের প্রতিই, ব্যস্! অতিরিক্ত কোনো যুক্তিতর্কের প্রয়োজন অনুভব করে না এর সমর্থকরা। কিন্তু সবল প্রজাতিবাদ প্রজাতিসদ্যসতার প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষন করেই ক্ষান্ত নয়। এর সমর্থকেরা অতিরিক্ত কিছু বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেন, যেগুলি কোনো না কোনোভাবে প্রজাতি-সীমার সঙ্গে সম্পর্কিত। তবে তাঁরা আপতিক বৈশিষ্ট্য (contingent traits)-এর কথা বলেন না, যা দুর্বল প্রজাতিবাদ বলে। সবল প্রজাতিবাদের বিপরীতে দুর্বল প্রজাতিবাদের বক্তব্যকে বুঝতে আমরা এই ভাবনাটি বিবেচনা করতে পারি ঃ কেবল সেইসব প্রাণীর নৈতিক মর্যাদা দেওয়া যাবে যারা উন্নত ব্যাকরণ মেনে ভাষা ব্যবহার করতে পারে। এটা আপতিক সত্য যে কেবল মানুষই এই শর্ত পূরণ করে। সুতরাং কোনো সত্তার নৈতিক বিবেচ্যতা বিচারের ক্ষেত্রে ঐ সত্তা মনুষ্য প্রজাতির সদস্য কিনা তার বিচারই যথেষ্ট। এইতত্ত্ব সবল প্রজাতিবাদ নয়, কেননা এখানে ভাষা-ব্যবহার-সামর্থ্য কেবল আপতিকভাবেই মনুষ্য প্রজাতি সদস্যতার সঙ্গে সম্পর্কিত। এটা অকল্পনীয় নয় যে বিবর্তনের নিয়মে কোন এক সময় উন্নত কোনো প্রাণীর উন্নত ভাষা-সামর্থ্য প্রকাশ পেল। তাই এ বৈশিষ্ট্য আপতিক (contingent)-ই। আমরা এবার এই তিনপ্রকার প্রজাতিবাদের মূল্যায়ন করব।

১.৩.১.১ স্থূল প্রজাতিবাদ ঃ

কিছু মানুষজন আছেন যারা এরকম যুক্তি দেন, ওরা তো পশু, এবং পশু পশুই! অন্যদিকে, মানুষ মানুষই এদের মধ্যে তুলনা চলে নাকি! এই মনোভাব স্থূল প্রজাতিবাদকেই ব্যক্ত করে। এখানে নীতি বা যুক্তির আলোকে গ্রাহ্য হতে পারে এমন কোনো সমর্থক যুক্তির উল্লেখ করার প্রয়োজনই অনুভূত হয় না। অধিকন্তু, কি ধরনের

বৈষম্যমূলক আচরণ কতদূর পর্যন্ত সমর্থনযোগ্য হবে তার কোনো মানদণ্ডের সন্ধান দেয় না এই স্থূল প্রজাতিবাদ। তাই একে কোনো যুক্তিসিদ্ধ দার্শনিক অবস্থান বলা যায় না। অনেকে একে 'অত্যন্ত মন্দ কাজকর্মের পক্ষে অজুহাত' হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

১.৩.১.২ সবল প্রজাতিবাদ ঃ

আগেই ইঙ্গিত করা হয়েছে, এখানে 'সবল' বা 'দুর্বল' অভিধা সমর্থক যুক্তির সবলতা বা দুর্বলতার দ্যোতক নয়। আপতিক ঘটনা বা তথ্যের প্রতি আবেদন আছে কি নেই তার ভিত্তিতেই আমরা সবল প্রজাতিবাদ এবং দুর্বল প্রজাতিবাদের মধ্যে পার্থক্য করি। সবল প্রজাতিবাদ আপতিক ঘটনার উপর কোন আবেদন না করেই যুক্তিতর্ক করে থাকে। সবল প্রজাতিবাদের যুক্তিগুলি নিম্নোক্ত ধরনের ঃ

(১) জীবতাত্ত্বিক যুক্তি (the biological argument) ঃ এই পৃথিবীতে প্রজাতি-প্রজাতিতে বেঁচে থাকার জন্য মানব প্রজাতির পূর্ণ অধিকার আছে অন্যান্য প্রজাতির সঙ্গে লড়াই করা এবং নিজে ভালভাবে বেঁচে থাকার জন্য অন্য প্রজাতির সদস্যদের শোষণ করা। এই যুক্তির বিরুদ্ধে যেসব আপত্তি উঠেছে সেগুলি এরকম ঃ প্রথমত, প্রজাতির ধারণাটি নড়বড়ে, অসঙ্গতিপূর্ণ। তাই এর উপর ভিত্তি করে এতবড় সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। দ্বিতীয়ত, প্রজাতির আত্মরক্ষা বা সার্থকভাবে বেঁচে থাকার জন্য অন্যান্য প্রজাতি সদস্যদের কতটুকু শোষণ বা কি ধরনের শোষণ আবশ্যিক তা নিরূপণ করা খুবই কঠিন। তৃতীয়ত, সবল প্রজাতিবাদী অবস্থানের পরিণতিগুলি আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। তবে, এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল প্রজাতির ধারণাটি। জীববিজ্ঞানীরা প্রজাতির বিভিন্ন ধারণা তথা সংজ্ঞা দিয়েছেন। এর থেকে বোঝা যায় ধারণাটি সমস্যাকীর্ণ। কেউ কেউ নানা ধরনের প্রজাতির ধারণাকে একত্রিত করে প্রজাতির সংজ্ঞা নিরূপণের চেষ্টা করেছেন। আসলে ধারণার বস্তুগততা থাকলে তার ভিত্তিতে নৈতিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত করা যায় তা প্রজাতির ধারণার মধ্যে নেই।

(২) গুরুত্বঘটিত যুক্তি (the importance argument) : প্রজাতিবাদের সমর্থকরা প্রায়শই মানুষের জীবনের অধিক গুরুত্ব তথা অলঙ্ঘনীয়তার প্রতি আবেদন করেন, এবং এর ভিত্তিতে তারা প্রজাতিবাদী আচরণ সমর্থন করেন। মানুষের জীবনকে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ভাবা হয় যে মনুষ্যেতর কোনো প্রজাতির জীবনের সঙ্গে তা কোনোভাবেই তুল্য নয়। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে গুরুত্বের এই ধারণার কোনো যুক্তিগত ভিত্তি নাই। প্রথমত, প্রশ্ন উঠেছে, গুরুত্বের এই ধারণাকে কোন্ অর্থে বুঝবো ঃ চূড়ান্ত অর্থে, নাকি আপেক্ষিক অর্থে? যদি চূড়ান্ত গুরুত্বের সংজ্ঞা ও পরিমাপক স্থির করতে হবে। যদি আপেক্ষিক অর্থে বুঝি তাহলে খেয়ালিপনা ছেড়ে নিরপেক্ষভাবে বলতে হবে কার নিরিখে তা আপেক্ষিক। যদি বলা হয় যে অপরাপর প্রাণীদের তুলনায় মনুষ্য প্রজাতির সদস্যদের জীবন অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ তাহলেও প্রশ্ন ওঠে, মানুষ কি সব সময় প্রাণীদের থেকে নিজের প্রজাতির সদস্যদের বেশী গুরুত্বপূর্ণ বিচার করে? অন্তত: তথ্য সেকথা বলছে না। আমেরিকার মতো ধনী দেশের অনেক মানুষ আছেন যারা তাদের পোষ্য প্রাণীর জন্য যে পরিমাণ খাদ্যশস্য খরচ করে তাতে পৃথিবীর কয়েকটি দেশের দারিদ্র মুছে যেতে পারে! দ্বিতীয়ত, অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ সত্তা হওয়ার কারণে যদি মানুষ প্রাণীদের শোষণ করার বা তাদের হত্যা করার নৈতিক অধিকার পায় তাহলে মানুষদের মধ্যে যারা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, যেমন বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা বা অমর্ত্য সেন তাদেরও আমাদের মতো কম গুরুত্বপূর্ণ মানুষজনকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করার নৈতিক অধিকার দিতে হয়।

(৩) বিশেষ সম্পর্ক-ঘটিত যুক্তি (the special relation argument) ঃ কিছু নীতি-দার্শনিক প্রজাতিবাদকে সমর্থন করতে গিয়ে বিশেষ সম্পর্ক ঘটিত যুক্তির অবতারণা করেছেন। জে. এ. গ্রে (J.A.Gray) মা-ছেলের বিশেষ সম্পর্কের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন কোনো মায়ের কাছে বিপদের মুখে পড়া দুইজন শিশুর মধ্যে একজন বাঁচানো ছাড়া কোনো বিকল্প না থাকে তাহলে তিনি নিজের শিশুকেই রক্ষা করতে অগ্রসর হবেন— এর মধ্যে কোনো নৈতিক সমস্যা আছে বলে মনে হয় না। একইরকমভাবে মানুষ নিজের সদস্যদের প্রতি বেশি মনোযোগী হবে — এতে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। অনেকে বিশেষ সম্পর্কের এই যুক্তির সারবত্তা মেনে নিয়েও আপত্তি তুলেছেন এই বলে যে নিরপেক্ষতা তথা সার্বজনীনতা নৈতিকতার অপরিহার্য উপাদান।

(৪) ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ ঘটিত যুক্তি (the special command argument) ঃ প্রজাতিবাদী আচরণের পক্ষে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি হল ঈশ্বরে আদেশ ঘটিত, এই যুক্তিটি এরকম — খ্রীষ্টতত্ত্ব অনুসারে ঈশ্বর আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে মনুষ্যপ্রজাতি সৃষ্টি করেছেন। তারপর এই পৃথিবীর জল, স্থল ও অন্তরীক্ষে সার্বভৌম অধিকার মানুষের হাতে তুলে দিয়েছেন। তাই প্রাণীদের সঙ্গে তার আচরণের ব্যাপারে মানুষ কারোর কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নয়। বলা বাহুল্য, এই বিচারের মধ্যে ধর্মের আপত্তি অনুমোদন থাকলেও যক্তির বিচারে এই ভাবনা খুবই নড়বড়ে। বিপরীতে, প্রাণীমুক্তি সম্বন্ধে সচেতন মানুষজন যদি বলেন, ঈশ্বর তাদের বলেছেন যে পশুদের স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকারকে সম্মান জানাতে, তাদেরকে না মারতে, তাহলে কিভাবে তা খণ্ডন করা যাবে?

ওপরের আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যুক্তি বা নৈতিকতা কোনো দিক থেকেই সবল প্রজাতিবাদ সমর্থনযোগ্য নয়।

১.৩.১.৩ দুর্বল প্রজাতিবাদ ঃ

সবল প্রজাতিবাদ যেখানে আপতিক ঘটনা তথা বৈশিষ্ট্যের প্রসঙ্গ না তুলেই যুক্তিতর্ক করে, দুর্বল প্রজাতিবাদ সেখানে আপতিকর ঘটনার প্রতি আবেদন রেখেই প্রজাতিবাদী আচরণের যৌক্তিকতা প্রদর্শনের চেষ্টা করে। যে ধরনের বৈশিষ্ট্য বা তথ্য দুর্বল প্রজাতিবাদ ব্যবহার করে সেগুলি অনেকখানি এরকম — কোনো সত্তাকে নৈতিক মর্যাদার দাবীদার হতে হলে আবশ্যই তাকে (ক) ইচ্ছা-অনিচ্ছা, পছন্দ-অপছন্দ জানাতে পারতে হবে। (খ) উন্নতভাষা বা সমতুল সংকেতের মাধ্যমে অপরাপর সত্তা তথা পরিবেশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারতে হবে। (গ) আত্মসচেতন হতে হবে, অন্যের অধিকারকে সম্মান করতে হবে। (ঘ) বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন হতে হবে, ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, এইসব বিষয়গুলি সরাসরি প্রজাতিবাদের প্রতিপাদক নয়, কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যগুলি যেহেতু প্রজাতি-সীমার মধ্যে এক নির্দিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে তাই প্রজাতি-সীমার উল্লেখ করে প্রজাতিবাদী আচরণের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা দেখা যায়। তবে দুর্বল প্রজাতিবাদের পক্ষে যেসব যুক্তি উত্থাপন করা হয় তার মধ্যে নিম্নোক্ত যুক্তিটি সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ।

বুদ্ধিমত্তার প্রতি আবেদন (the appeal to rationality) ঃ বুদ্ধিমত্তাকেই নৈতিক মর্যাদার সব থেকে বড় প্রতিপাদক হিসাবে তুলে ধরে প্রজাতিবাদী আচরণকে সমর্থন করার চেষ্টা হয়। কিন্তু যাঁরা এরূপ করেন তাদের প্রতি আমাদের প্রশ্ন, বুদ্ধিমত্তাই কেন নৈতিক মর্যাদালাভের জন্য প্রাসঙ্গিক? মানুষের বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ

অপরাপর প্রাণীর তুলনায় অনেক বেশি। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, হরেকরকম বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও কেন বুদ্ধিবৃত্তিকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়? চিতাবাঘ সবচেয়ে বেশি জোরে দৌড়ায়, শক্তি ধরে সবার থেকে বেশি, শিম্পাঞ্জি মানুষের থেকে বলশালী, গাছে উঠতে পারে অতিদ্রুত। এসব বৈশিষ্ট্যকে বাদ দিয়ে কেন শুধু বুদ্ধিমত্তার কথা উঠছে? উত্তরে কেউ হয়ত বলবেন, নীতিমান হতে গেলে উন্নত বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োজন। মানুষই কেবল কান্টের নিঃশর্ত অনুজ্ঞার নীতিতত্ত্ব বুঝতে পারে, বুঝতে পারে কেন ব্যক্তিগত বিধির সার্বজনীনযোগ্যতা নৈতিকতার আবশ্যিক শর্ত, যেখানে শিম্পাঞ্জি নীতির কোনো ধারণাই গঠন করতে পারে না।

এই বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কিত যুক্তির বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত আরও দুটি প্রসঙ্গ রয়েছে ঃ

(ক) নৈতিক কর্তা ও নৈতিক রোগীর মধ্যেকার পার্থক্য (the moral agent-moral patient distinction) ঃ নৈতিক কর্তা বলতে আমরা সেই স্বাধীন ব্যক্তিসত্তাকে বুঝি যে নিজে সিদ্ধান্ত নিয়ে স্ব-নির্বাচিত নীতি অনুসরণ করে কার্য সম্পাদন করতে পারে। অন্য দিকে, নৈতিক রোগী তারাই যাদের এ ধরনের সক্রিয় সামর্থ্য নেই। শিশুর আচরণ বা গুরুতরভাবে অসুস্থ কোনো ব্যক্তির আচরণকে আমরা ভাল বা মন্দ বলি না। তবে তাদের সংবেদন-সামর্থ্যসমূহ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে, যেগুলির জন্য তারা নৈতিক বিচারের উপযুক্ত পাত্র হতে পারে। মানবশিশু, মানসিক প্রতিবন্ধী এবং পশু-প্রাণীকে আমরা নৈতিক রোগী ভাবতে পারি। এই ভাবনায় নৈতিকরোগী নীতি-বিবেচনার যোগ্য হয়।

(খ) প্রান্তিক দৃষ্টান্তঘটিত যুক্তি (the argument from marginal cases) ঃ যারা বুদ্ধিমত্তার যুক্তিতে প্রজাতিবাদকে সমর্থন করেন তাদের বিরুদ্ধে বেশ কিছু দৃষ্টান্ত উত্থাপন করা যায় যেখানে কাঙ্খিত বুদ্ধিমত্তা না থাকা সত্ত্বেও কিছু সত্তাকে নৈতিক বিবেচনার যোগ্য বিবেচনা করা হয়। শিশু বা মানসিক প্রতিবন্ধী মানুষের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তির সার্থক প্রকাশ পরিলক্ষিত হয় না, অথচ তাদের নীতিবিবেচনার উপযুক্ত বিচার করা হয়। আমাদের স্বাভাবিক নৈতিক সংজ্ঞা এর পক্ষেই রায় দেয়। প্রাপ্তবয়স্ক স্বাভাবিক মানুষের মতো তারা কোনো বিষয় সম্পর্কে সম্যক্ ধারণা করতে পারে না। এখন, বুদ্ধিমত্তার অনুপস্থিতিতে যদি এদের নীতি বিবেচনায় রাখা হয়, নৈতিক মনোযোগ আকর্ষণকারী রোগী ভাবা হয়, তাহলে পশুদের কেন নৈতিক বিবেচনায় রাখা যাবে না। এখানে অবশ্য কেউ কেউ সম্ভাবনা (potentiality)-র কথা বলতে পারেন। আজকে যে শিশু সেই ভবিষ্যতে নৈতিক কর্তৃত্ব লাভ করবে, মানসিক প্রতিবন্ধী রোগী একদিন সেরে উঠতে পারে। তাই তাদের নীতি-বিবেচনায় রাখতে কোনো অসুবিধা হয় না। কিন্তু সেখানেও প্রশ্ন থেকে যায় সম্ভাবনাকে বাস্তবতার উপরে ঠাঁই দেওয়া কতদূর যুক্তি বা নীতিসম্মত?

এই বিবেচনার ভিত্তিতে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি সবল প্রজাতিবাদের মতোই দুর্বল প্রজাতিবাদ সমর্থনযোগ্য নয়।

১.১ সারসংক্ষেপ:

এই পাঠ এককের প্রথম অংশে পরিবেশ নীতিশাস্ত্র বলতে কি বোঝায়, এর বিচার্য বিষয়গুলি কি এবং এর মূল তত্ত্বগুলির পরিচয় দিয়েছি। দেখিয়েছে মূলত চার ধরনের তত্ত্ব এই পরিবেশনীতিশাস্ত্রে ঘুরে ফিরে আসছে এবং এগুলি হল মানবকেন্দ্রিকতাবাদ, প্রাণকেন্দ্রিকতাবাদ, বাস্তু-কেন্দ্রিকতাবাদ ও বাস্তুনারীবাদ। তবে একথা ঠিক যে মানবকেন্দ্রিকতাবাদী তথা প্রজাতিবাদী নীতি-ভাবনার সমালোচনার মধ্য দিয়েই পরিবেশ-নীতিশাস্ত্রের

বিকাশ ঘটেছে। তবে মানবকেন্দ্রিকতা বলতে ঠিক কি বোঝায় যে সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্ট নয়। আমরা এই পাঠএককের দ্বিতীয় অংশে মানবকেন্দ্রিকতাবাদের কোন প্রকরণগুলি আপত্তিজনক, আর কোন প্রকরণগুলি আপত্তিজনক নয় সে পর্যালোচনা করেছি তার থেকে এটা বেরিয়ে আসে যে মানবকেন্দ্রিকতাবাদের যে প্রকরণটি নীতিবিচারে আপত্তিকর তা হল প্রজাতিবাদ তথা মানবীয় স্বাজাত্যাভিমান। পাঠ-এককের তৃতীয় অংশে এই প্রজাতিবাদের পর্যালোচনা করা হয়েছে। ডোনাল্ড এ. গ্রাফ্টকে অনুসরণ করে আমরা দেখিয়েছি যে প্রজাতিবাদ নাতিগতভাবে গ্রহণযোগ্য কোন অবস্থান নয়। প্রজাতিবাদকে অতিক্রম করে আমরা প্রথম যে নৈতিক অবস্থানে পৌঁছাই পরিবেশ-নীতিশাস্ত্রে তাকে প্রাণকেন্দ্রিকতাবাদ (Biocentrism) বলা হয়। পরবর্তী পাঠ এককে এ সম্পর্কে আলোচনা থাকবে।

১.২ নমুনা প্রশ্নাবলী (তিনটি অংশ একত্রে) :

1. What is environmental ethics? What are the basic concerns of environmental ethics? Discuss.
2. Define environmental ethics as a branch of applied ethics. Discuss critically the fundamental controversies in environmental ethics.
3. What is anthropocentrism? What does it mean to overcome anthropocentrism? Discuss.
4. Define moral anthropocentrism. What is wrong with it? Discuss.
5. Define moral speciesism. Distinguish between strong speciesism and weak speciesism. Why is weak speciessism morally problematic? Discuss.
6. What is speciesism? State and explain the arguments for and against strong speciesism.
7. Write notes on :

   (a) Instrumental value and intrinsic/inherent value

   (b) Animal welfare and environmental ethics

   (c) Human chauvinism

   (d) Ineliminable element of anthropocentrism

   (e) Criticism of anthropocentrism and misanthropy

১.৩ গ্রন্থ-নির্দেশ :

পাঠ্যসূচি নির্দিষ্ট Tim Hayward এর 'Anthorpocentrism : A Misunderstood Problem' (Chapter-3 of his book Political Theory and Ecological Values, Polity Press, 1998) পড়তে হবে। একই সঙ্গে Donald A. Graft এর 'Speciesism' (দ্রষ্টব্য : Ruth Chadwick প্রমুখ সম্পাদিত 'Encyclopedia of Applied Ethics' (Vol. 4), Academic Press, San Diego, 1998) প্রবন্ধটি পাঠ্য। এর অতিরিক্ত সন্তোষকুমার পাল: সমকালীন পরিবেশ-নীতিশাস্ত্রের রূপরেখা (লেভান্ত বুকস্, কলকাতা, ২০০৮)-এর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায় পাঠ্য। এছাড়া Andrew Brennan এবং Yeuk-Sze Lo লিখিত 'Environmental Ethics' (internet edition), (http:// plato.stanford.edu/entries/ethics_environmental) প্রবন্ধটি অনুসরণ করা যেতে পারে।

পাঠ-একক - ২ : প্রথম অংশ

প্রাণকেন্দ্রিকতাবাদ (Biocentrism)

বিষয়সূচী

২.০ উদ্দেশ্য

২.১.১ প্রাক্‌কথন

২.১.২ টেলরের প্রাণকেন্দ্রিকতাবাদ

২.১.৩ প্রকৃতি বিষয়ে প্রাণকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি

২.১.৪ প্রাকৃতিক জগৎ এক অখণ্ড তন্ত্র

২.১.৫ এক একটি প্রাণীদেহ এক একটি উদ্দেশ্যমুখী জীবন-কেন্দ্র

২.১.৬ মানবীয় শ্রেষ্ঠত্বাভিমানের বর্জন

(পাঠ - একক—২ : দ্বিতীয় অংশ)

প্রাণীর অধিকারতত্ত্ব (Animal Rights)

২.২.০ উদ্দেশ্য

২.২.১ প্রাক্‌কথন

২.২.২ রেগানের বক্তব্য

২.২.২.১ কান্টীয় বিবরণ

২.২.২.২ নিষ্ঠুরতা-সংক্রান্ত বিবরণ

২.২.২.৩ উপযোগবাদী বিবরণ

২.২.৩ প্রাণীর অধিকার

২.১ সারসংক্ষেপ

২.২ নমুনা প্রশ্নাবলী

২.৩ গ্রন্থ নির্দেশ

পাঠ একক - ২

প্রাণকেন্দ্রিকতাবাদ (Biocentrism) ও প্রাণীর অধিকার (Animal Rights)

২.০ উদ্দেশ্য :

এই পাঠ এককটি দুটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে আমরা পাঠ্যসূচি অনুসারে প্রাণকেন্দ্রিকতাবাদের আলোচনা করব। দ্বিতীয় অংশে আমরা প্রাণীর অধিকার বিষয়ে আলোকপাত করব।

প্রথম অংশ : প্রাণকেন্দ্রিকতাবাদ (Biocentrism)

২.১.১ প্রাক্‌কথন :

প্রজাতিবাদী মানবকেন্দ্রিকতা অতিক্রম করার মধ্য দিয়েই সমকালীন পরিবেশ-নীতিশাস্ত্র বিকশিত হয়েছে। প্রজাতিবাদের সীমানা অতিক্রম করে যে নীতিশাস্ত্রের উদ্ভব ঘটেছে সেখানে কেউ কেউ নোঙর করেছেন প্রাণকেন্দ্রিকতাবাদে, কেউ বা বাস্তুকেন্দ্রিকতাবাদে। এই পাঠ এককের প্রথম অংশে আমরা Paul W. Taylor-এর প্রবন্ধ 'The Ethics of Respect for Nature' অনুসরণ করে প্রাণকেন্দ্রিকতাবাদের পর্যালোচনা করব। পরিবেশনীতিশাস্ত্রে প্রাণকেন্দ্রিকতাবাদ বলতে সেই আদর্শমূলক নীতিতত্ত্বকে বোঝায় যদনুসারে শুধু মানুষ নয়, প্রাণবান সত্তামাত্রেই নীতিবিবেচনার যোগ্য। এই তত্ত্বে প্রাণবান সকল ব্যক্তিসত্তার প্রতি নীতিদায় স্বীকৃতি হয়। এই প্রাণকেন্দ্রিক নীতি-দর্শনের উদ্ভবের প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় নীতিচিন্তার বিকাশের ইতিহাস যেন ক্রমপ্রসার্যমান একটি বৃত্ত (an expanding circle)। প্রত্যক্ষ নীতিদায়, যা প্রথমে পুরুষ জনগোষ্ঠীর প্রতি স্বীকৃত ছিল, তা ক্রমে নারী, শিশু, দাস.... এভাবে সকল মানুষকে অন্তর্ভূক্ত করে, পরে অন্তর্ভূক্ত হয় প্রাণবান সকল ব্যক্তিসত্তা। তবে এভাবে প্রজাতিবাদী নীতিবিচারের পরিধিকে অতিক্রম করে যাবতীয় প্রাণবান সত্তাকে নীতিবৃত্তের অন্তর্ভূক্ত করা বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের ঘটনা। চিরাচরিত ভাবনা অনুসারে প্রাণীকুল তথা প্রকৃতি কেবল মানুষের প্রয়োজনের নিমিত্ত, এবং এই নীতিদায়ের শুরুতে মানুষ, আবার শেষেও সেই মানুষ। এই নীতিভাবনায় মনুষ্যেতর প্রাণ বা প্রকৃতি-রাজ্যের স্বতন্ত্র কোনো মূল্য নেই, তাই মনুষ্যেতর প্রকৃতির কোন এক অংশকে ধ্বংস করা অন্যায় বা নীতি-বিগর্হিত নয়। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পরিবেশবাদীরা প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছেন যে মনুষ্যেতর প্রকৃতিকে নীতিবিচারের বাইরে রাখা নিছক স্বাজাত্যভিমান, যার পিছনে কোনো সুযুক্তি নাই। দ্বিতীয় যে ধারণাটি প্রাণকেন্দ্রিকতাবাদের পক্ষে গেছে তা হল প্রকৃতিকে বিস্ময়ের আধার ও আধ্যাত্মিক যোগের মিলন-ভূমি হিসাবে দেখার রীতি। বিস্ময়-বিহ্বল কবি, সাধু-সন্তপ্রকৃতির সান্নিধ্যে নিজেদেরকে নতুন করে আবিষ্কার করেছেন। একই সঙ্গে অন্তর দিয়ে অনুভব করেছেন যে এই মহতী প্রকৃতি ও অবলা প্রাণীকুল আজ বিপন্ন। অদূরদর্শী আত্মসর্বস্ব মনুষ্যকুলের দুর্নিবার লালসা তথা খেয়ালিপনার শিকার এই ধরিত্রীমাতা। বলার অপেক্ষা রাখে না, সমকালীন বাস্তুবিজ্ঞানের গবেষণা ও সংরক্ষণবাদীদের প্রচারাভিযান আমাদের বোঝাতে সমর্থন হয়েছে যে মনুষ্যেতর প্রকৃতিকে নীতি-মূল্য বিচারের মঞ্চ থেকে নির্বাসিত করে রাখা অন্যায়, আত্মঘাতীও। আমাদের নীতিবিচারের পরিধি অন্ততঃ প্রাণবান সত্তা-জগত পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

২.১.২ টেলরের প্রাণকেন্দ্রিকতাবাদ (Taylor's Biocentrism)

যদিও প্রাণকেন্দ্রিক নীতি-চিন্তাকে আদর্শমূলক তত্ত্ব হিসাবে সংহতকরণের কাজটি প্রথম শুরু করেছিলেন আলবার্ট সোয়াইৎসার (Albert Schweitzer), যার 'প্রাণের প্রতি শ্রদ্ধা' (Reverence for Life)-র ধারণা পরিবেশ-নীতিশাস্ত্রের পরবর্তীবিকাশকে প্রভাবিত করেছে, তথাপি এই নীতিতত্ত্ব সম্যক্ প্রচার লাভ করেছে দার্শনিক পল টেলরের 'প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা' (Respect for Nature)-র নীতিতত্ত্বের মধ্য দিয়ে। পল টেলরের দৃষ্টিতে যাবতীয় প্রাণবান সত্তার স্বগতমূল্য আছে, এবং কেবল এই স্বগতমূল্যের জন্যই তারা নৈতিক বিচারের পাত্র। তিনি বলেন, কোনো সত্তার নিজের ভাল-মন্দের ধারণা আছে বলার অর্থ হল অন্য কোনো সত্তার প্রতি উল্লেখ ব্যতিরেকে সত্তাটি উপকৃত বা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। তিনি এখানে যে নিজের ভাল-মন্দ বা মঙ্গলের কথা বলেছেন তা বস্তুগতমূল্য, এবং তা এই অর্থে যে এই মূল্য অন্য কোনো চেতন মূল্য নিরূপকের বিবেচনার উপর নির্ভর করে না, এমনকি যার মূল্য তার উপরেও নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নির্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত জল ক্যাক্টাসের পক্ষে ভাল নয়। আমরা বলতে পারি, ক্যাকটাস নিজে জানুক বা না জানুক, অন্য কেউ এ বিষয়ে চিন্তা করুক বা না করুক, অতিরিক্ত পরিমাণ জল ক্যাকটাসের পক্ষে খারাপ। টেলর অবশ্য এবিষয়ে সচেতন যে প্রাণবান সত্তার স্বীয় মঙ্গল বা উদ্দেশ্যমুখীনতার বিষয়টি অভিজ্ঞতার বিষয়, এবং তাই এই বিষয়টি নৈতিক সম্মান আকর্ষণ করার পক্ষে আবশ্যিক হলেও পর্যাপ্ত নয়। টেলর এখানে দুটি নীতির কথা বলেছেন : (ক) নৈতিক বিবেচনার নীতি (the principle of moral consideration) এবং (খ) স্বতোমূল্যের নীতি (the principle of intrinsic value)। প্রথমোক্ত নীতি অনুসারে প্রাণরাজ্যের সদস্য হওয়ার দৌলতে প্রতিটি প্রাণবান সত্তা নৈতিকভাবে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য। সংশ্লিষ্ট সত্তাটি কোন্ প্রজাতির সদস্য তা এখানে গুরুত্বপূর্ণ নয়। অন্য দিকে স্বতোমূল্যের নীতি অনুসারে অন্য বিষয়ে যতই আলাদা হোক না কেন, যদি কোনো সত্তা পৃথিবীর প্রাণরাজ্যের সদস্য হয় তাহলে সেই ব্যক্তি-প্রাণীর নিজের ভাল, নিজের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের উপলব্ধি স্বগতভাবে মূল্যবান। এই দুটি নীতি একত্রে ইঙ্গিত করে যে প্রাণবান সত্তার স্বতোমূল্য আছে এবং এই কারণেই তারা সবাই নৈতিক শ্রদ্ধালাভের যোগ্য।

টেলরের মতে, অপরাপর মানুষের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি নির্ভর করে আমরা যেভাবে তাদের দেখি তার উপর। একইরকমভাবে, প্রকৃতির প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি নির্ভর করে কোন্ দৃষ্টিতে আমরা তাকে দেখি তার উপর। বস্তুতঃ আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি নির্ভর করে এবং সমর্থিত হয় একটি বিশ্বাসতন্ত্রের দ্বারা, যে বিশ্বাসতন্ত্রের মধ্য দিয়ে আমাদের প্রকৃতি-দর্শন গড়ে ওঠে। টেলর তাই 'প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা'-র দৃষ্টিভঙ্গির পিছনে যে বিশ্বাসতন্ত্র কাজ করছে তাকে চিহ্নিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন।

২.১.৩ প্রকৃতি বিষয়ে প্রাণকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি (The Biocentric Outlook on Nature) :

পূর্বেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে 'প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা'-র দৃষ্টিভঙ্গির পিছনে যে বিশ্বাসতন্ত্র কাজ করছে টেলর তাকে প্রকৃতি-বিষয়ে প্রাণকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি বলেছেন। এই প্রকৃতি-দর্শনকে যেহেতু অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রতিপাদনযোগ্য বিবৃতিতে সম্পূর্ণ বিশ্লেষণযোগ্য নয়, সেহেতু আমাদের গ্রহে বাস্তুতন্ত্রগুলি সম্পর্কে জীববিজ্ঞানের নিছক একটি সংক্ষিপ্তসার হিসাবে ভাবা যথোচিত নয়। একে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বা ব্যাখ্যামূলক তন্ত্র হিসাবে না ভেবে, বরং একটি দার্শনিক জগদ্বীক্ষা (a philosophical world-view) রূপে বর্ণনা করাই শ্রেয়। তবে এই বিশ্ববীক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল বাস্তুবিজ্ঞানের সেই মহান শিক্ষা যা আমাদের জানান দিয়েছে যে সব প্রাণবান সত্তার পারস্পরিক নির্ভরতা এক সংহত ব্যবস্থা, যার ভারসাম্য এবং স্থায়িত্ব ছাড়া এর গঠনগত প্রাণসম্প্রদায়সমূহের মঙ্গল বা অভিষ্টকে উপলব্ধি করা যায় না। প্রাণকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির মূল উপাদানগুলির বিবরণ করার আগে টেলর পরিবেশ-নীতিশাস্ত্রের যে তত্ত্বকে তিনি সমর্থন করেছেন তার একটি সাধারণ কাঠামো লিপিবদ্ধ করতে চান। তাঁর মতে, 'প্রকৃতি প্রতি শ্রদ্ধা'-র এই নীতিতত্ত্বের তিনটি মূল উপাদান রয়েছে ঃ একটি

বিশ্বাসতন্ত্র, এক চূড়ান্ত নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং কর্তব্যবিধি এবং নৈতিক চরিত্রের মানদণ্ডের একটি তালিকা। এই উপাদানগুলি একে অপরের সঙ্গে নিম্নোক্তভাবে সম্পর্কিত, বিশ্বাসতন্ত্রটি প্রকৃতি বিষয়ে এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ সরবরাহ করে, যা স্বাধীন কর্ম-কর্তার 'প্রকৃতি প্রতি শ্রদ্ধা'র দৃষ্টিভঙ্গিকে এক চরম নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে গ্রহণ করাকে সমর্থন করে এবং বোধগম্য করে তোলে। যখন কোনো স্বাধীন কর্ম-কর্তা এই দৃষ্টিভঙ্গির ভাষায় প্রকৃতি-জগতের সঙ্গে তার সম্পর্ককে বোঝেন তখন তিনি এটা বুঝতে পারেন যে প্রাণজগতের সব ধরনের প্রাণকে অন্তর্ভুক্ত করে বোঝার ক্ষেত্রে এটিই একমাত্র মানানসই দৃষ্টিভঙ্গি। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রাণবান সত্তাসমূহকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিভঙ্গির উপযুক্ত পাত্র হিসাবে দেখা হয় এবং তাদেরকে স্বগতভাবে মূল্যবান সত্তা হিসাবে বিচার করা হয়। তখন তাদেরকে উদ্দেশ্যকে এগিয়ে দেওয়া এবং তাদের সংরক্ষণের উপর স্বস্থিতমূল্য আরোপিত হয়। এর ফলশ্রুতি হিসাবে এক কর্তব্যবিধি মেনে আচরণ করা নৈতিক চরিত্রের একটি মান পূর্ণ করার ব্যাপারে আমরা নৈতিকভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হই। এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার মধ্যে দিয়ে একজন নৈতিকভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়, কারণ সে বুঝতে পারে যে ঐসব নিয়ম-বিধি ও মানদণ্ডকে সব নৈতিক কর্তার উপর বৈধভাবে প্রযোজ্য হয়। তাদের আমরা সেইসব আচরণ এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হিসাবে দেখি সেগুলির মাধ্যমে 'প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা'র দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পায়।

টেলর 'প্রকৃতি প্রতি শ্রদ্ধা'র এই নীতিতত্ত্বকে 'ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা'র যে মানবীয় নীতিতত্ত্ব তার সঙ্গে তুলনা করেছেন। ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধার যে নীতিতত্ত্ব তার মধ্যে নিম্নোক্ত তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে ঃ প্রথমত, নিজেকে এবং অপর ব্যক্তি সমূহকে ব্যক্তি হিসাবে ধারণা করা, যে ব্যক্তিসমূহ স্বাধীন পছন্দ ও সক্রিয়তার এক একটি কেন্দ্র। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিকে ব্যক্তি হিসাবে সম্মান করার দৃষ্টিভঙ্গি। (যখন এই দৃষ্টিভঙ্গি চূড়ান্ত নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে গৃহীত হয় তখন এর মধ্যে একটি প্রবণতা সংশ্লিষ্ট হয়ে যায় যা সব ব্যক্তিকে স্বগতভাবে মূল্যবান হিসাবে বিচার করে। একেই আমরা মানবীয় মর্যাদা বলি। কান্ট একে 'উদ্দেশ্য হিসাবে ব্যক্তি' (person as end-in-itself) বলেছেন।) তৃতীয়ত, এখানে কর্তব্যের একটি নৈতিকতন্ত্র সংশ্লিষ্ট রয়েছে যা প্রত্যেক মানুষ প্রত্যেকের কাছ থেকে আশা করতে পারে। (আমি ব্যক্তি, অন্যান্য মানবসত্তাকে আমি ব্যক্তি হিসাবে দেখি। তাই আমি যেমন অন্যের প্রতি কর্তব্যের নিয়মে বাঁধা, ঠিক তেমনি আমিও যথার্থ আশা করতে পারি অপর ব্যক্তি আমার প্রতি কর্তব্য স্বীকার করবে)।

যাই হোক, টেলরের প্রাণকেন্দ্রিক বিশ্ববীক্ষার চারটি মূল উপাদান রয়েছে :

(ক) যেসব শর্তাধীনে মানুষ পৃথিবীর প্রাণ-রাজ্যের সদস্য সেই একই শর্তে অ-মানব সপ্রাণ সত্তাগুলি এই প্রাণরাজ্যের সদস্য।

(খ) পৃথিবীর বাস্তুতন্ত্রগুলি পরস্পর-সম্পর্কিত এবং পরস্পর-নির্ভর জটিল জালের মতো, যেখানে এক একটি বাস্তুতন্ত্রের সুষ্ঠ ও স্বাভাবিক জৈবিক ক্রিয়াশীলতার উপর অপর বাস্তুতন্ত্রের স্বাভাবিক বিকাশ নির্ভর করে।

(গ) প্রতিটি ব্যক্তিসত্তা নিজ নিজ লক্ষ্যের প্রতি ধাবমান জীবন-কেন্দ্র (a teleological centre of life) হিসাবে বিবেচ্য।

(ঘ) মানুষ এবং অপরাপর প্রাণী মৌলিক অবস্থানের দিক থেকে একই, কেউ শ্রেষ্ঠ বা কেউ নিকৃষ্ট নয়।

এই সব বিশ্বাস এক সমানতন্ত্র (biotic egalitarianism)-এর প্রতি আমাদের ইঙ্গিত করে। স্বগত মূল্যবান সত্তা হিসাবে একটি তিমি, একটি কাঠবেড়ালি বা একটি গুল্মলতার সঙ্গে মনুষ্য-বিশেষের কোনো ভেদ নেই। মানুষ যে নিজেকে জাহির করে আমরা অপরাপর প্রাণীর তুলনায় শ্রেষ্ঠ বা উন্নত -এর কোনো যুক্তিসিদ্ধ ভিত্তি নেই। এই আত্মম্ভরিতা টেলরের ভাষায়, 'nothing more than an irrational bias is our own favour.'

টেলর তাঁর প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে এই উপাদানগুলির বিবরণ করেছেন :

(১) পৃথিবীর প্রাণ-সম্প্রদায়ের সদস্য হিসাবে মানুষ (Human as member of the earth's community of life) : অন্যান্য প্রজাতির সঙ্গে আমরা মানুষেরাও এই পৃথিবীর সঙ্গে এক সাধারণ সম্পর্কে আবদ্ধ। প্রাণকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের মাধ্যমে আমরা যে প্রাণী-জগতের অংশ এই সত্যকে আমাদের অস্তিত্বের এক মৌলিক বৈশিষ্ট্য হিসাবে মেনে নিই। অন্যান্য প্রজাতির সঙ্গে আমাদের পার্থক্যগুলি টেলর অস্বীকার করছেন না। কিন্তু তিনি যে বিষয়টির উপর গুরুত্ব দিতে চাইছেন তা হল পৃথিবীর প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কে আমরা অন্যান্য অসংখ্য প্রজাতির মধ্যে একটি প্রজাতি মাত্র। এর মাধ্যমে আমরা এটা স্বীকার করে নিই যে যে বিবর্তন প্রক্রিয়ায় অন্যান্য সব প্রজাতির আবির্ভাব ঘটেছে আমরাও সেই একই বিবর্তন-প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে এসেছি। একই সঙ্গে এটাও স্বীকার করি যে অন্যান্য প্রাণীকুল যে পরিবেশগত বিরূপতার মুখোমুখি, আমরাও সেই একই সমস্যার শিকার। জিনতত্ত্বের নিয়ম-বিধি, প্রাকৃতিক নির্বাচনের নীতি এবং অভিযোজনের নিয়ম জীবতাত্ত্বিক প্রাণী হিসাবে আমাদের সকলের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য হয়। আমরা অন্যান্য প্রাণীকুল থেকে আলাদা নই। অন্যান্য প্রজাতির সদস্যরা যেমন অস্তিত্বের কতকগুলি মৌলিক শর্তের মোকাবিলা করে বেঁচে থাকে আমরাও তেমনি সেই সব শর্ত ও পরিবেশের মোকাবিলা করে বেঁচে থাকি। অধিকন্তু, প্রতিটি প্রাণী ও গাছপালার আমাদের মতোই নিজের নিজের ভালো-মন্দ বা অভিষ্ট আছে, যদিও আমাদের ভাল-মন্দের আদর্শ অন্যান্য প্রাণীদের থেকে আলাদা। আমরা একটি বিশেষ মূলতন্ত্র নির্বাচন করে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারি, তথাপি অস্তিত্ব এবং প্রাকৃতিক স্বাস্থ্যের জীবতাত্ত্বিক বাস্তবতা তথা অনিবার্যতাকে আমরা কাটিয়ে উঠতে পারি না, ঠিক যেমন অন্য প্রাণীরাও পারে না।

বিবর্তনবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে আমরা বুঝতে পারি যে আমরা এই পৃথিবীতে অনেক পরে এসেছি। এর আগে এই পৃথিবীই অন্যান্য প্রাণীকুলের বিচরণ-ভূমি ছিল কোটি কোটি বছর ধরে। অন্যদিকে, মনুষ্যপ্রজাতিও অন্যান্য কয়েকটি প্রজাতির মতো বিলুপ্তির সম্ভাবনার মুখোমুখি আজ দাঁড়িয়ে, যা আমাদের বুঝিয়ে দেয় অন্যান্য প্রজাতি থেকে আমরা বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত নই। মানুষের ভালভাবে বেঁচে থাকা বাস্তুতাত্ত্বিক সুস্থতা ও বহু প্রাণীসম্প্রদায়ের স্বাস্থ্যের উপর নির্ভর করে, যেখানে অন্যান্য প্রাণীদের সুস্থতা বা স্বাস্থ্য কোনোভাবেই মানুষের উপর নির্ভর করে না। এই বাস্তবতা এটাই ইঙ্গিত করে যে আমাদের অবস্থা অন্যান্য প্রাণীকুলের থেকে খারাপ।

২.১.৪ প্রাকৃতিক জগৎ এক অখণ্ড তন্ত্র (the natural world as an organic system) :

প্রাণকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে যদি আমরা নিজেদেরকে বিচার করি এবং এই প্রকৃতি-জগতে আমাদের অবস্থান বিষয়ে আমরা ভাবি তাহলে দেখব যে পৃথিবীর জীবমণ্ডলের এই সমগ্র প্রকৃতি পরস্পর সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রাণ, বস্তু এবং ঘটনার এক ঐক্যবদ্ধ জটিল জাল। এখানে অসংখ্য বাস্তুতন্ত্র পরস্পর-নির্ভর হয়ে কাজ করছে এবং এর মধ্য দিয়ে বেঁচে আছে। প্রতিটি বাস্তুতন্ত্র যেন এক একটি ক্ষুদ্র বিশ্ব যেখানে বিভিন্ন প্রজাতির সদস্যদের মিথস্ক্রিয়া কার্যকারণ সম্পর্কে এক-একটি সূক্ষ্ম জালের সৃষ্টি করে। এই ধরনের গতিময় অথচ কিছুটা স্থিতিশীল অবয়ব, যেমন খাদ্য-শৃঙ্খল, শিকার-শিকারী সম্পর্ক এবং অরণ্যের বৃক্ষ ও লতাগুল্মের পরম্পরা স্বনিয়ন্ত্রিতরূপে শক্তি-শৃঙ্খল-ব্যবস্থার মাধ্যমে সমগ্রের ভারসাম্য রক্ষা করে।

বন্যপ্রাণী তথা গাছপালার ভাল থাকা বা স্বাস্থ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এই বাস্তুতাত্ত্বিক ভারসাম্যকে

কখনই নষ্ট করা যায় না। মানুষের ভাল থাকার ক্ষেত্রে এই একই বিষয় সত্য। যখন প্রাণকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একজন প্রকৃতি-জগৎকে দেখে তখন সে কখনও ভোলে না যে আমাদের গ্রহে সামগ্রিক জীবমণ্ডলে সংহতি-এর প্রাণসম্প্রদায়গুলি ভাল থাকার জন্য অপরিহার্য। এই সংহতি থাকলে পরই মানুষ এর মনুষ্যেতর প্রতিটি প্রাণী নিজের নিজের অভিষ্টকে লাভ করতে পারবে।

টেলর অবশ্য মনে করিয়ে দিয়েছেন যে পৃথিবী বাস্তুতন্ত্রগুলির এই সমগ্রতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিজে নিজেই নৈতিক আদর্শ বা মানদণ্ড গঠন করে না। এটি জীবতাত্ত্বিক বাস্তবতার একটি দিক, যাকে সাধারণ অভিজ্ঞতালব্ধ কার্যকারণ সম্পর্কসমূহের একটি শৃঙ্খল হিসাবে বোঝা যেতে পারে। মানুষের ক্ষেত্রে এর যা তাৎপর্য মনুষ্যেতর প্রাণীকুলের ক্ষেত্রেও সেই একই তাৎপর্য বহন করে। এর নৈতিক তাৎপর্য নির্ভর করে আমরা নিজে নিজের উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসাবে এই কার্যকরণ সম্পর্কগুলিকে দেখছি কিনা তার উপর। আমরা যখন এই দৃষ্টিভঙ্গি যথার্থ গ্রহণ করব তখন আমাদের কি করা উচিত তা তার থেকে বেরিয়ে আসবে।

২.১.৫ এক একটি প্রাণীদেহ এক একটি উদ্দেশ্যমুখী জীবন-কেন্দ্র (Individual organism as teleological centre of life) :

প্রাণীজগৎ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান যতই বাড়ে ততই আমরা বুঝতে পারি প্রতিটি প্রাণীদেহ তার প্রজাতিনির্দিষ্ট স্বভাবের নিয়ম অনুসারে জীবতাত্ত্বিক ক্রিয়াকর্ম চলমান রাখে। আমরা যতই এক একটি প্রাণীদেহের সঙ্গে সম্পর্কিত হই ততই আমরা সেই জীবনচক্রের খুটিনাটি সম্পর্কে সংবেদনশীল হই। এক-একটি প্রাণীদেহ এক অনুপম অ-প্রতিস্থাপনযোগ্য ব্যক্তি হিসাবে সামনে আসে। একটি প্রাণকে জীবন-কেন্দ্র হিসাবে ভাবতে পারলে আমরা তার দৃষ্টিকোণ থেকে জগৎকে দেখতে পাব। টেলরের ভাষায়, 'We grasp the particularity of the organism as a teleological centre of life, striving to preserve itself and to realise its own good in its own unique way.'

২.১.৬ মানবীয় শ্রেষ্ঠত্বাভিমানের বর্জন (The denial of human superiority) ঃ

মানবকেন্দ্রিকতাবাদ যেখানে মানুষই সর্বতোরূপে শ্রেষ্ঠ জীব— এই ভাবধারা প্রচার করে প্রাণকেন্দ্রিকতাবাদ সেখানে তা অস্বীকার করে। যেসব জীবতাত্ত্বিক তথা প্রাকৃতিক শর্তের উপর মানব জীবন নির্ভর করে সেই একই ধরনের শর্তের উপর অপরাপর প্রাণীকুলের অস্তিত্ব নির্ভর করে। তাহলে কোন্ অর্থে মানুষ অন্যান্য প্রাণীদের থেকে শ্রেষ্ঠ? অবশ্য আমাদের এমন কিছু সামর্থ্য আছে যা অন্যান্য প্রাণীর নেই। কিন্তু এইসব স্বতন্ত্র সামর্থ্যগুলি কেন শ্রেষ্ঠত্বের চিহ্ন হিসাবে বিবেচিত হবে? আমাদের যেমন কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে, অনেক মনুষ্যেতর প্রাণীরও কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে, যা আমাদের নেই। চিতা প্রচণ্ডগতিতে ছুটতে পারে, ঈগলের দৃষ্টি প্রখর, বানর সব থেকে বেশি কর্মতৎপর— এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে মানুষের উপর তাদের শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শনরূপে বিবেচিত হবে না কেন? এর উত্তরে কেউ বলতে পারেন, এই বৈশিষ্ট্যগুলি মানুষের অনুপম বৈশিষ্ট্যগুলির মতো মূল্যবান নয়। যুক্তিবুদ্ধি, নান্দনিক সৃজনশীলতা, স্বাতন্ত্র্য ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণ এবং নৈতিক স্বাধীনতা ইত্যাদি অনুপম মানবীয় বৈশিষ্ট্যগুলির মূল্য অন্যান্য প্রজাতির মধ্যে আমরা যেসব বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই তার তুলনায় উচ্চমানের। কিন্তু সেখানেও প্রশ্ন ওঠে, কার কাছে মূল্যবান? কোন্ যুক্তিতে মূল্যবান? মানুষের কিছু বৈশিষ্ট্য যেমন মানবীয় দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠত্বের সূচক, তেমনি চিতার গতি তার প্রজাতির দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের থেকেও শ্রেষ্ঠত্বের সূচক। আমরা যদি প্রাণকেন্দ্রিক তথা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করি তাহলে বুঝতে পারব মানুষের এই শ্রেষ্ঠত্বের দাবী নিছক 'নিজের কোলে ঝোল টানা'।

এইভাবে পল টেলর প্রাণকেন্দ্রিক পরিবেশবাদের পক্ষে যুক্তি সাজিয়েছেন। তিনি এমন কি প্রাণী তথা বৃক্ষ-লতার আইনি অধিকার (legal rights)-এর কথাও বলেছেন।

পাঠ একক - ১

দ্বিতীয় অংশ : প্রাণীর অধিকারতত্ত্ব (Animal Rights)

২.২.০ উদ্দেশ্য :

পাঠ এককের এই দ্বিতীয় অংশে আমরা সিলেবাস-নির্দিষ্ট টম রেগান (Tom Regan)-এর 'Animal Rights, Human Wrongs' প্রবন্ধটি অনুসরণ করে প্রাণীকুলের অধিকার তথা নৈতিক মর্যাদা নিরূপণে সচেষ্ট হব।

২.২.১ প্রাক্‌কথন :

বলা বাহুল্য, সমকালীন পরিবেশ-নীতিশাস্ত্রের পুনরুত্থানের সাথে সাথেই অ-মানব প্রকৃতির অন্যতর অংশ প্রাণীকুল সম্পর্কে নতুন করে ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছে, আরো স্পষ্ট করে বললে, প্রাণীর মর্যাদার প্রশ্নটি সামনে এসেছে। সমকালীন একদল চিন্তাবিদ্ আমাদের চিরাচরিত প্রজাতিবাদী সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে বেশ জোরের সাথে বলতে চেষ্টা করেছেন যে শুধু মানুষ নয়, প্রাণীকুলও আমাদের নীতি-বিবেচনার যোগ্যপাত্র। কোনো সত্তা নীতিবিবেচনা পাওয়ার যোগ্য — এই স্বীকৃতির অর্থ ঐ সত্তার প্রতি আমাদের নৈতিক বিধি মেনে আচরণ কর্তব্য। প্রাণী-কল্যাণবাদী হিসাবে যাঁরা পরিচিত তাঁরা প্রাণীর প্রতি আমাদের হৃদয়হীন অন্যায় আচরণের নৈতিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। প্রাণীদের উপর অত্যাচার করা, শোষণ করা, তাদেরকে হত্যা করার বিরুদ্ধে জনমত সংগ্রহ করার চেষ্টা করছেন। প্রাণী-কল্যাণবাদী পিটার সিঙ্গার যুক্তি দিয়েছে যে মানুষের মতো যে কোনো সত্তা যাদের সুখ-দুঃখের অনুভব-সামর্থ্য রয়েছে এবং একইসঙ্গে দুঃখ পরিহারের স্বার্থ রয়েছে, তাদের স্বার্থকে নীতিবিবেচনার বাইরে রাখা এক নির্লজ্জ স্বাজাত্যাভিমান, যা যুক্তি বা নীতি কোনো দিক থেকেই সমর্থনযোগ্য নয়। প্রাণী-অধিকারবাদীরা আরো এগিয়ে গিয়ে প্রাণীকুলের স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকাকে নৈতিক অধিকারের সমতূল্য বিবেচনা করেন। তাঁরা প্রাণীকূলের স্বগতমূল্য স্বীকার করেন এবং মনে করেন যে কোনো প্রাণীর জীবনের অধিকারকে গুরুত্ব দেওয়া নীতিশাস্ত্রের দির থেকে একান্ত প্রয়োজন। প্রাণীর অধিকারের প্রবক্তারা স্বগত মূল্যবান প্রাণীদের অন্য কারোর উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসাবে ব্যবহার করার বিরোধিতা করছেন। অধিকাংশ মানুষ যে প্রাণী-মাংস খায়, এমন কি নিছক খেলার ছলে প্রাণীদের আঘাত করে, বিজ্ঞানীরা প্রাণীদের উপর যে যথেষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন তা তাদের জীবনের অধিকারের মতো মৌলিক অধিকারকে লঙ্ঘন করে।

টম রেগান প্রথম দিকে উপযোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থন করতেন এবং মনে করতেন যে সকল পূর্ণচেতনসত্তা এবং কিছু সংবেদন-স্যমর্থ্যযুক্ত সত্তার নৈতিক মূল্য আছে। পরবর্তী পর্যায়ে এই অবস্থান থেকে সরে এসে তিনি প্রাণীর অধিকারের তত্ত্ব প্রবর্তনে মনোযোগী হন। তিনি প্রাণীকুলকে মানুষের প্রয়োজনে সম্পদ হিসাবে বিচার করার সাবেকি রীতিকে নীতি-নৈতিকতার দিক থেকে ভ্রান্তদর্শী বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'The Care for Animal Rights'- এ নৈতিক অধিকারের পরিধিকে মনুষ্য-প্রজাতির বাইরে প্রাণী-জগতে বিস্তৃত করার আবশ্যিকতা ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। বলা বাহুল্য, কোনো সত্তার নৈতিক অধিকার স্বীকার করার অর্থ হল ঐ সত্তাকে কার্যকরীভাবে আঘাত করা থেকে বিরত থাকা। যাইহোক, আমরা এখন সিলেবাস নির্দিষ্ট টম রেগানের প্রবন্ধ 'Animal Rights, Human Wrongs' অনুসরণ করে প্রাণীমুক্তির নীতিতত্ত্বের পর্যালোচনা করব।

২.২.২ রেগানের বক্তব্য :

টম রেগান এই প্রবন্ধটি শুরু করেছেন এই বলে যে সাধারণভাবে এটা বলা হয়ে থাকে যে আমাদের নীতিভাবনা প্রাণীরা কিরূপ আচরণ আমাদের কাছ থেকে পাবে নির্ধারণ করে। কিন্তু দার্শনিক দিক থেকে যে প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ তা হল, কুকুরকে আঘাত করা বা বিড়ালের লেজে আগুন ধরিয়ে দেওয়া ইত্যাদি কাজ কেন অনুচিত তা ব্যাখ্যা করা। এই প্রসঙ্গে রেগান প্রচলিত তিন ধরনের ব্যাখ্যার উল্লেখ করেছেন : কান্টীয় বিবরণ, নিষ্ঠুরতা-সংক্রান্ত বিবরণ এবং উপযোগবাদী বিবরণ।

২.২.২.১ কান্টীয় বিবরণ (The Kantian Account) :

কান্ট ব্যক্তিত্ব (personality) তথা যুক্তিশীলতা (rationality) -কে নৈতিকতার নির্ণায়ক মাপকাঠি বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, প্রাণীদের প্রতি আমাদের কোনো প্রত্যক্ষ কর্তব্য নেই, তবে পরোক্ষ নীতিদায় আছে। ব্যাখ্যাকল্পে বলা যায়, যদি কোনো ব্যক্তি তার অশক্ত কুকুরটিকে গুলি করে হত্যা করে তাহলে সে কুকুরটির প্রতি কোনো কর্তব্যে অবহেলা করছে না। কিন্তু তার এই কাজটি অমানবিক এই কারণে যে প্রাণীদের প্রতি এই ধরনের ব্যবহার তার মনুষ্যসুলভ অনুভূতিগুলি নষ্ট করে দেয়, এবং এর ফলে সে এমনকি মানুষদের সঙ্গেও নিষ্ঠুর ব্যবহার করতে পারে। যেসব মানুষ যথেচ্ছভাবে প্রাণীদের কষ্ট দেয়, আঘাত করে তাদের মধ্যে মানুষকে কষ্ট দেওয়া বা আঘাত করার প্রবণতা গড়ে উঠবে। এই 'চুঁইয়ে পড়া' কার্যকারণ প্রবনতাই প্রাণীদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা যে অনুচিত তা প্রতিপন্ন করে। প্রাণীদের প্রতি খারাপ ব্যবহার সরাসরি আমাদের নীতি-ভাবনার বিষয় নয়। তা পরিণামে মানুষের সমাজে ক্ষতিকারক হতে পারে এটি আমাদের বিবেচ্য। তাই কান্টীয় ব্যাখ্যা অনুসারে, এখানে যে নৈতিক নীতি ক্রিয়াশীল রয়েছে তা হল: প্রাণীদের সঙ্গে এমনভাবে ব্যবহার করো না যা তোমাকে মানুষের সঙ্গে খারাপ ব্যবহারে পরিচালিত করতে পারে।

পরোক্ষ-নীতিদায়ের এই ভাবনার সঙ্গে রেগানের অভিমতের বিরোধ নেই। এখানে মূল বিতর্কের জায়গাটি হল এই নীতিটি যে ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে সেই ভিত্তি সম্পর্কে। পিটার সিঙ্গার যুক্তি দিয়েছেন যে এই অভিমতের সঙ্গে বর্ণবাদী ও লিঙ্গবাদীদের গভীর সাদৃশ্য রয়েছে। এই অভিমতকে তিনি রিচার্ড রাইডারকে অনুসরণ করে 'প্রজাতিবাদ' (speciesism) হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। বর্ণবাদী বিশ্বাস করে অন্যের স্বার্থ কেবল তখনই গণনাযোগ্য হয় যখন তারা তার নিজের বর্ণের সদস্য হয়। অনুরূপ, প্রজাতিবাদী অন্যের স্বার্থকে তখনই গুরুত্বপূর্ণভাবে যখন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা নিজের প্রজাতির সদস্য হয়। কিন্তু সমকালীন নৈতিক প্রজ্ঞা আমাদের শিখিয়েছে যে কারোর গাত্রবর্ণ তার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহারের কোনো কারণ হতে পারে না, তেমনি প্রজাতি-সদস্যতা কোন আচরণের নির্ণায়ক হতে পারে না। এখানে আমরা বেন্থামকে স্মরণ করতে পারি যিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন যে সংবেদন-সামর্থ্যই এখানে মূল বিচার্য বিষয়। কারোর গাত্রবর্ণ বা লিঙ্গ-পরিচয় এখানে অপ্রাসঙ্গিক। বেনথাম, সিঙ্গার এবং রাইডার প্রমুখের মতে, মনুষ্যেতর প্রাণীর স্বার্থকে প্রত্যক্ষ নীতিবিচারের অন্তর্ভুক্ত না করার পিছনে কোনো যুক্তিসিদ্ধ ভিত্তি নেই। কান্টীয় অভিমত যেহেতু স্বতন্ত্রভাবে প্রাণীদের প্রতি আমাদের আচরণের নৈতিকতাকে প্রতিপাদন করতে পারে না, তাই রেগান এই অভিমতকে বাতিল করেছেন।

২.২.২.২ নিষ্ঠুরতা-সংক্রান্ত বিবরণ (The Cruelty Account) :

দ্বিতীয় অভিমতটি যা প্রাণীদের প্রতি আমাদের ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় তাহল নিষ্ঠুরতা-সম্পর্কিত অভিমতটি। এই মত অনুসারে মনুষ্যেতর প্রাণীর প্রতি নিষ্ঠুর না হওয়া, তাদের প্রতি সদয় হওয়া আমাদের কর্তব্য। একটি কুকুরকে লাথি মারা অন্যায় এই কারণে যে আমরা তার প্রতি নিষ্ঠুর হচ্ছি। নিষ্ঠুরতার এই নিষেধ প্রাণীদের প্রতি আমাদের নঞর্থক কর্তব্যকে তুলে ধরে, অর্থাৎ প্রাণীদের সঙ্গে আমাদের কেমন ব্যবহার করা উচিত নয় তা তুলে ধরে।। নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে এই নিষেধাজ্ঞার ধারণার মধ্যে স্পষ্টতই কান্টীয় উপাদান রয়েছে। তবে তা সামনে আসে তখনই যখন প্রাণীদের প্রতি নিষ্ঠুরতা মানুষকে অন্য মানুষের প্রতি নিষ্ঠুর হতে পরিচালিত করে— এই যুক্তি প্রদত্ত হয়। রেগান এই প্রসঙ্গে জন লকের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। লকের পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে শিশুরা যখন কোনো ছোটো-খাটো নিরীহ প্রাণী হাতে পায় তখন তারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই খারাপ ব্যবহার করে। ছোট পাখি, প্রজাপতি এই ধরনের নিরীহ ছোটখাটো প্রাণীদের কাটা-ছেঁড়া করে এবং এতে তারা আনন্দ পায়। তিনি ইঙ্গিত করেন যে যখন শিশুরা এই ধরনের নিষ্ঠুর আচরণ করে তখন আমাদের উচিত তাদের বিপরীত ব্যবহার করতে শেখানো। অন্যথায় তাদের অতি সংবেদনশীল মন শক্ত হয়ে উঠবে যা পরিণামে মানুষের বিরুদ্ধে যেতে পারে।

লক এখানে সেই প্রজাতিবাদের প্রতিই ইঙ্গিত করছেন যা কান্টের বিবরণকে বিশেষায়িত করে। তবে নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে লকের অভিমত সঠিক এবং তা অনেক ইঙ্গিতবহ। অনেক চিন্তাবিদ্ যাঁরা প্রাণীর প্রতি নিষ্ঠুরতা নিষিদ্ধ করার জন্য আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাঁরা মনে করেন যে প্রাণীদের প্রতি নিষ্ঠুর হওয়া অনুচিত। নিষ্ঠুরতার প্রতি নিষেধাজ্ঞার এই অভিমতকেই রেগান নিষ্ঠুরতার বিবরণ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

এই অভিমতের পর্যালোচনা করতে গিয়ে রেগান মন্তব্য করেছেন যে নিষ্ঠুরতার ধারণাকে গুরুত্ব দেওয়া পরোক্ষে প্রাণীদের প্রতি অপেক্ষাকৃত ভাল ব্যবহার নিশ্চিতকরণের আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। অনেক সংগঠন তথা সামাজিক প্রতিষ্ঠান, যেমন আমেরিকার 'সোসাইটি ফর দ্য প্রিভেনশন অব ক্রুয়েলটি টু অ্যানিম্যালস' (SPCA), গ্রেট ব্রিটেনের 'রয়্যাল সোসাইটি ফর দ্য প্রিভেনশন অব ক্রুয়েলটি টু অ্যানিম্যালস' (RSPCA) ইত্যাদি এই আন্দোলনকে জনপ্রিয় করে তুলেছে। রেগান নিষ্ঠুরতা দমনের গুরুত্বকে অস্বীকার করছেন না, বা এই ধরনের সংগঠনের আন্তরিকতা নিয়েও কোনো প্রশ্ন তুলছেন না। তবে তাঁর বক্তব্য, নিষ্ঠুরতা প্রতিরোধের বিষয়ে খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া বিপরীত ফলদায়ী হয়ে পড়তে পারে এবং তা মৌলিক নৈতিক প্রশ্নগুলিকে গুলিয়ে দিতে পারে।

'নিষ্ঠুর' শব্দটি কোনো ব্যক্তির চরিত্র বা কোনো একটি কাজের নৈতিক মূল্যায়নের জন্য ব্যবহার করা হয়। সেইসব ব্যক্তি নিষ্ঠুর যাঁরা অন্যকে কষ্ট দিয়ে আনন্দ পেতে অভ্যস্ত। কোনো একটি নির্দিষ্ট কাজ তখনই নিষ্ঠুর হবে যখন অন্যকে কষ্ট দিয়ে কেউ আনন্দ পায়। তবে এটা স্পষ্ট যে, 'কারোর নিষ্ঠুর হওয়া' 'কাউকে কষ্ট দেওয়া' থেকে আলাদা। শল্য-চিকিৎসকরা যন্ত্রণা দেন, দন্ত চিকিৎসকরাও আমাদের কষ্ট দেন। কিন্তু এর থেকে এটা নিঃসৃত হয় না যে এসব চিকিৎসকেরা নিষ্ঠুর ব্যক্তি বা তাঁদের কাজকর্মগুলি নিষ্ঠুর। নিষ্ঠুরতাকে সপ্রমাণ করতে হলে কেউ কাউকে কষ্ট দিচ্ছে এটুকু জানলেই চলবে না, কর্মকর্তার মনে অবস্থাকেও আমাদের জানা প্রয়োজন। দেখতে হয় তারা অপরকে কষ্ট দিয়ে আনন্দ খোঁজে কিনা। তাই, নিম্নরূপ যুক্তিটি সঠিক নয় ঃ

যারা কষ্ট দেয় তারা নিষ্ঠুর।

শল্য চিকিৎসক বা দাঁতের ডাক্তাররা আমাদের কষ্ট দেন।

অতএব, শল্য চিকিৎসক বা দাঁতের ডাক্তাররা নিষ্ঠুর।

এই রকমভাবে, এরকম যুক্তি দেওয়া যথার্থ নয় ঃ

যারা কষ্ট দেয় তারা নিষ্ঠুর।

যারা প্রাণীদের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায় তারা কষ্ট দেয়।

অতএব, যারা এইভাবে প্রাণীদের সঙ্গে ব্যবহার করে তারা নিষ্ঠুর।

যারা নিষ্ঠুরতা-বিরোধী ব্যানারে আন্দোলন চালিয়ে যেতে চান তাঁরা এই ধরনের যুক্তির বিশেষত্ব বুঝতে পারবেন যদি তাঁরা প্রশ্নগুলিকে গুলিয়ে না ফেলেন। আমরা এখানে ড্রেইজি টেস্ট (the Draize test)-এ প্রাণীর ব্যবহারের বিষয়টি বিচার করতে পারি। অনেক মানুষ এই ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিরুদ্ধে আপত্তি তুলেছেন, এটা যে অন্যায় তা বোঝানোর চেষ্টা করছেন। এখন, যদি নিষ্ঠুরতার সপ্রমাণ করার প্রয়োজন হয় তাহলে তথ্য-প্রমাণের গুরুত্ব পরীক্ষকদের পক্ষে যাবে এবং অভিযোগকারীদের বিপক্ষে যাবে, কারণ যেসব মানুষ এই ড্রেইজি টেস্ট পরীক্ষা পরিচালনা করেন তাঁরা নিষ্ঠুর এই মর্মে কোনো উপযুক্ত প্রমাণ নেই। তাঁরা প্রাণীদের কষ্ট দেন ঠিকই, কিন্তু কষ্ট দেওয়া তাঁদের নিষ্ঠুর মানসিকতাকে সরাসরি প্রতিপাদন করে না। বৈজ্ঞানিককুলের ব্যতিক্রমী সম্ভাব্য দু'একজন ধর্ষকামীকে বাদ দিলে গবেষকরা অপরাপর সাধারণ মানুষের মতোই স্বাভাবিক ব্যক্তি , অপেক্ষাকৃত বেশি নিষ্ঠুরপ্রবণ নয়।

২.২.২.৩ উপযোগবাদী বিবরণ (The Utilitarian Account) ঃ

প্রাণীকুলের সঙ্গে আমাদের ব্যবহার কেমন হবে সে সম্পর্কে উপযোগবাদী তত্ত্ব দুটি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমটি সমতার নীতি (the principle of equality) এবং (তুলনামূলক) উপযোগিতার নীতি (the principle of utility)। সমতার নীতি দাবি করে প্রত্যেকের স্বার্থ সমানভাবে এবং একবারই গণনাযোগ্য হয়। তাই একই ধরনের স্বার্থ এখানে একই রকমভাবে বিবেচিত হয়। কোনো কাজের মাধ্যমে যারা প্রভাবিত হতে পারে তাদের সকলের স্বার্থকে সমানভাবে গণনা করাই সমতা। সেখানে কে শ্বেতাঙ্গ, কে কৃষ্ণাঙ্গ বা কে ভারতীয় তাদের বিচার যেমন অসঙ্গত, তেমনি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটি মানুষ, নাকি পশু সে বিবেচনাও অপ্রাসঙ্গিক। কারোর কোনো আচরণে কেউ ব্যথা পেলে বা কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার ব্যথা অন্য যে কারোর ব্যথার সঙ্গে সমানভাবে বিবেচ্য হবে। অন্য দিকে, তুলনামূলক উপযোগিতার নীতি দাবি করে যে আমাদের সকলেরই সেই কাজটি করা উচিত যা দুঃখ-হতাশার তুলনায় সুখ-সন্তুষ্টি উৎপাদনে অধিকতর উপযোগী। একাধিক বিকল্পের মধ্যে সমতা ও উপযোগিতা এই দুই নীতির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং তদনুসারে কাজ করাই নৈতিকভাবে সমর্থনযোগ্য হতে পারে।

যদিও এটি উপযোগবাদের একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন তথাপি, রেগানের মতে, এই প্রতিবেদন আমাদের উপযোগবাদী বিবরণের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরতে পারে। একইসঙ্গে কান্টীয় বিবরণ বা নিষ্ঠুরতা সংক্রান্ত বিবরণ থেকে এর সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য বোঝাতে সাহায্য করতে পারে। কান্টীয় ব্যাখ্যার মতো উপযোগবাদী ব্যাখ্যাও পরিণাম বা ফলাফলের উপর গুরুত্ব দেয়। কিন্তু উপযোগবাদী বিবরণ প্রাণীকুলের নিজের অধিকারের নৈতিক মর্যাদা স্বীকার করে, কান্টীয় ব্যাখ্যা যেখানে সরাসরি প্রাণীকুলের নৈতিক মর্যাদাকে স্বীকার করে না। আমরা

কেবল মানুষের স্বার্থে প্রজাতিবাদী মাপকাঠি থেকে নৈতিক মূল্যায়ন করতে পারি না। অন্য দিকে, নিষ্ঠুরতা-সংক্রান্ত বিবরণ যেখানে কোনো কাজের নৈতিকতাকে কর্মকর্তার মানসিক অবস্থার সঙ্গে মিশিয়ে বিচার করতে উদ্যত, উপযোগবাদী বিবরণ সেই ত্রুটি থেকে মুক্ত। তবে একজন উপযোগবাদী অন্য যে কারোর মতো নিষ্ঠুরতার বিরোধিতা করতে পারেন। কিন্তু উপযোগবাদীতত্ত্বে ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিত নির্ণীত হয় ফলাফলের দ্বারা, অনুভূতি বা অভিপ্রায়ের দ্বারা নয়।

উপযোগবাদের অন্যতম বড় সমর্থক পিটার সিঙ্গারের মতে এখানে উপযোগবাদ আরো সুদূরপ্রসারী পরিণামের দিকে আমাদের পরিচালিত করে। আমরা যেভাবে প্রাণীকে শোষণ করি, তাদের মাংস খাই তার বিপরীতে উপযোগবাদ আমাদের নিরামিষাশী হওয়ার পক্ষে চালিত করে এবং প্রাণীদের উপর একান্তভাবে আবশ্যিক না হলে গবেষণা চালানোর বিরোধিতা করে। সিঙ্গারের মূল যুক্তি, যথেচ্ছভাবে প্রাণী প্রতিপালন এবং রুটিন-মাফিক তাদের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা স্বার্থের সমতানীতিকে লঙ্ঘন করে। প্রাণীদের স্বার্থ আছে কষ্টের মধ্যে না পড়া, ঠিক যেমন মানুষের স্বার্থ অন্যের দ্বারা আঘাত না পাওয়া। আমরা যেমন নরমাংস খাওয়াকে নিন্দা করি, জোর করে কোনো মানুষকে গবেষণার জন্য ব্যবহার করার বিরোধিতা করি, ঠিক তেমনি প্রাণীর ক্ষেত্রে এই ধরনের ব্যবহার নিন্দনীয়।

রেগান অবশ্য মনে করেন, সিঙ্গার তাঁর বক্তব্যকে সম্পূর্ণ প্রত্যয়-উৎপাদনকারী যুক্তির উপর দাঁড় করাতে সমর্থ হননি। তিনি দেখাচ্ছেন যে আমরা মানুষের সঙ্গে যেমন ব্যবহার করি, প্রাণীকুলের সঙ্গে সেরূপ ব্যবহার করি না। কিন্তু সিঙ্গারের যুক্তি এটা প্রমাণ করতে পারেনি যে, এসব ক্ষেত্রে ভিন্ন ধরনের আচরণ স্বার্থের সমতানীতি বা উপযোগিতা নীতিকে লঙ্ঘন করে। আমরা প্রথমে স্বার্থের সমতানীতি বিবেচনা করতে পারি। আমরা সমান স্বার্থকে সমানভাবেই গণনা করতে পারি, কার স্বার্থে সে কথা মাথায় না রেখেই। তথাপি, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি আমাদের ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমি সঠিকভাবেই এটা বিচার করতে পারি যে কোনো এক মেডিক্যাল শিক্ষা পাওয়ার ব্যাপারে আমার পুত্রের স্বার্থ এবং আমাদের প্রতিবেশীর পুত্রের স্বার্থ সমান। তথাপি, আমি কেবল আমার ছেলেকেই সাহায্য করি। এখানে আমি এই দু'জনের সঙ্গে ভিন্ন ব্যবহার করছি, যদিও তাদের স্বার্থ বিবেচনার ক্ষেত্রে সমতার নীতি মেনে চলেছি। রেগান যে কথাটি বলতে চান, তা হল একই স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিসমূহের সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন আচরণ নিজে নিজেই স্বার্থের সমতানীতিকে লঙ্ঘন করে না। সিঙ্গারকে এমন যুক্তি সরবরাহ করতে হবে যা তাদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণের অতিরিক্ত এই বিষয়কে প্রতিপন্ন করতে পারে। সিঙ্গার শুধু এই প্রশ্ন তুলেই অগ্রসর হচ্ছেন যে প্রাণীদের ক্ষেত্রে আমরা যে ধরনের আচরণ অনুমোদন করি, মানুষের ক্ষেত্রে তা করি কিনা। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যে কষ্টদায়ক পরীক্ষায় একজন গবেষক একটি স্বাভাবিক প্রাণীকে 'সাবজেক্ট' হিসাবে ব্যবহার করতে উদ্যত, সেখানে তিনি একজন অনাথ প্রতিবন্ধী মানবশিশুকে ব্যবহার করেন না। সিঙ্গার এই গবেষকের বিরুদ্ধে প্রজাতিবাদের অভিযোগ আনবেন, তিনি স্বার্থের সমতানীতির লঙ্ঘন করছেন একথা বলবেন। কোনো প্রাণীর কষ্ট পরিহারের স্বার্থ একটি মানবশিশুর কষ্ট পরিহারের স্বার্থের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। যাই হোক, রেগানের মতে, এই যুক্তিটি মূল প্রশ্নটিই উপেক্ষা করে (begs the question), এটা ধরে নেয় যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বৈষম্যমূলক ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা তাদের স্বার্থকে আলাদা আলাদা ভাবে গণনা করছি। কিন্তু আমরা দেখেছি এটা সর্বদা সত্য নয়। কোনো একটি বিশেষ ক্ষেত্রে এটি সত্য কিনা তা প্রমাণ করতে হবে, শুধু ভিন্ন আচরণের ভিত্তিতে তা ধরে নিলে চলবে না। রেগানের মতে, সিঙ্গার এটাই করছেন এবং তাই মূল প্রশ্নেই আবার ঘুরে আসছেন।

রেগানের মতে, সিঙ্গারের যুক্তিতে আরো দুর্বলতা রয়েছে যা উপযোগবাদী নীতির সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রথমত, সিঙ্গার এটা দেখাচ্ছেন না যে প্রাণীদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক ব্যবহার মন্দের তুলনায় সম্ভাব্য সর্বোত্তম ফল উৎপন্ন করার উপযোগবাদী উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে যায়। এটা দেখাতে হলে সিঙ্গারকে কীভাবে প্রাণীকুলের সঙ্গে আমরা আচরণ করি সেটুকু দেখালেই চলবে না, সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের ক্ষেত্রে তার কী পরিণাম ঘটে, তার বিশ্লেষণও প্রয়োজন। তাঁকে দেখাতে হবে, প্রাণী-প্রতিপালন শিল্পে উৎপাদনশীলতার ওপর সমকালীন অর্থনীতি কীভাবে নির্ভর করে, কত সংখ্যক মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই প্রাণী-প্রতিপালন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত আছে এবং এর সব কিছুর প্রভাব কার উপর কীরূপ পড়বে। এই শিল্প ধ্বংস হয়ে গেলে কী কী পরিণাম ঘটবে, তা বিস্তারিতভাবে জানাতে হবে। তা না হলে আমরা সামগ্রিক ফলাফলের হিসাব করতে পারব না। দ্বিতীয়ত, যথেচ্ছ বা ব্যাপকভাবে প্রাণীপালন বা গবেষণার কাজে তাদের রুটিনমাফিক ব্যবহার না করা যে অপেক্ষাকৃত ভাল পরিণামের দিকে নিয়ে যাবে— এই অভিমতের পক্ষে বাধ্যতাকারী তথ্য-প্রমাণ হাজির করতে হবে। সিঙ্গারকে দেখাতে হবে অপেক্ষাকৃত ভাল পরিণাম এর থেকে বেরিয়ে আসবে, শুধুমাত্র এটা সম্ভব বা কল্পনাযোগ্য—এটুকু বলাই যথেষ্ট নয়।

বস্তুত, রেগানের মতে, সিঙ্গার এবং তাঁর উপযোগিতা নীতি সম্পর্কে প্রথম যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, তা হল সিঙ্গার এই নীতিটির নিরিখে দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন যে আধুনিক প্রাণী-প্রতিপালন ও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় যেমনভাবে এখন প্রাণীদের ব্যবহার করা হয় তা অন্যায়, অনুচিত। দ্বিতীয় যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হল আমরা যতটুকু জানি এবং যতদূর পর্যন্ত উপযোগিতা নীতির উপর নির্ভর করি তাতে প্রাণীদের প্রতি আমাদের বর্তমান আচরণ বাস্তবিক যুক্তিযুক্ত প্রমাণিত হতে পারে। এই ভাবনার পিছনে রেগানের যুক্তি নিম্নরূপ ঃ

প্রাথমিক বিচারে উপযোগবাদ সব থেকে ন্যায্য এবং সংস্কারমুক্ত অভিমত, প্রত্যেকের স্বার্থই এখানে গণনা করা হয় এবং কারোর স্বার্থকেই অন্যদের সদৃশ স্বার্থের থেকে বেশি বা কম গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করা হয় না। এখানে সমস্যাটি হল স্বার্থের সমতানীতির প্রতি শ্রদ্ধা এবং মন্দের তুলনায় বেশি ভাল ফল উৎপন্ন করা— এই দুইয়ের মধ্যে কোনো পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলা নেই। বরং উপযোগিতার নীতিটিকে ব্যক্তিতে বা গোষ্ঠীতে সব থেকে চরম বৈষম্যমূলক আচরণের যৌক্তিকতা প্রতিপাদন করতে ব্যবহার করা যেতে পারে, এবং এর মধ্যে দিয়ে এমনকী বর্ণবাদ এবং লিঙ্গবাদের কিছু প্রকরণ সমর্থিত হতে পারে। কেননা এই সংস্কারগুলি বিভিন্ন আকার লাভ করতে পারে এবং ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হতে পারে। এরূপ একটি ক্ষেত্র হল এমন যেখানে সংশ্লিষ্ট বর্ণ বা লিঙ্গের স্বার্থকে মোটেই গণনা করা হয় না। অন্য এক ক্ষেত্রে এই স্বার্থগুলি গণনায় আসে, কিন্তু পছন্দের গোষ্ঠীর সদৃশ স্বার্থের সমানরূপে সেগুলি বিবেচিত হয় না। অন্য একটি ক্ষেত্রে তাদের স্বার্থকে সমানভাবেই গণনা করা হয়, কিন্তু এমন ধরনের আইন, কর্মনীতি, প্রথা ইত্যাদি ব্যবহার করা হয় যা পছন্দের গোষ্ঠীর সদস্যদের অধিক সুবিধা পাইয়ে দেয়, কারণ সেভাবেই সামগ্রিক বিচারে মন্দের থেকে সর্বাপেক্ষা ভাল ফল উৎপন্ন হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বর্ণবাদ বা লিঙ্গবাদের যেসব প্রকরণ স্বার্থের সমতানীতির উপযোগবাদের দ্বারা বর্জিত হবে বলে মনে করা হয়েছিল সেগুলি আবার পুনরুত্থিত হতে পারে, এবং উপযোগিতা নীতির দ্বারা যুক্তিযুক্ত সপ্রমাণ হতে পারে। এখানে যদি কোনো উপযোগবাদী এর উত্তরে বলেন যে কিছু মানুষকে বর্ণবাদ বা লিঙ্গবাদের ভিত্তিতে সমান সুযোগ না দেওয়া স্বার্থের সমতানীতির বিরুদ্ধে যায় এবং তাই তা অন্যায়, তাহলে আমরা তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে পারি যে বৈষম্যমূলক আচরণ স্বার্থের সমতানীতিকে লঙ্ঘন করে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ,

কৃষ্ণাঙ্গদের স্বার্থ এবং শ্বেতাঙ্গদের স্বার্থ সমানভাবে গণনা করেও একইসঙ্গে দুই বর্ণের মধ্যে বৈষম্য করাও সম্ভব, যখন তা উপযোগবাদী বর্ণবাদ বা লিঙ্গবাদের অবসান ঘটাবে, তথাপি চূড়ান্ত বিচারে আমরা লক্ষ্য করছি, উপযোগবাদ এমন কোনো শক্তপোক্ত যুক্তি বা ভিত্তি আমাদের সরবরাহ করে না, যার ভিত্তিতে আমরা সব ধরনের বর্ণবাদ বা লিঙ্গবাদের অবসান ঘটাতে পারি।

অনুরূপভাবে, প্রজাতিবাদকেও উপযোগবাদ নির্মূল করতে পারে না। আমরা প্রাণীদের স্বার্থ এবং মানুষের স্বার্থের সমান বিচার করতে পারি। আবার এই উপযোগবাদই আমাদের সামনে সেই সুযোগ উন্মুক্ত রাখে, যেখানে প্রাণীদের বৈষম্যমূলক ব্যবহারই মন্দের তুলনায় বেশি ভাল ফল উৎপন্ন করে।

এইসব যুক্তির ভিত্তিতে রেগান উপযোগিতদাবাদ-সহ প্রচলিত অভিমতগুলি বাতিল করে প্রাণীর অধিকারের তত্ত্বকে সামনে এনেছেন।

২.২.৩ প্রাণীর অধিকার (Animal Right)ঃ

রেগানের মতে, অন্যের প্রতি আমাদের কর্তব্য স্থির করতে অধিকারের ধারণাই সব থেকে বেশি কার্যকরী। তবে প্রচলিত যে অধিকারতত্ত্ব তা মানব-প্রজাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই অধিকারের নীতিতত্ত্বের পরিধিকে সম্প্রসারিত করলে প্রাণীর প্রতি আমাদের আচরণ কেমন হবে, তা আমরা বুঝতে ও বোঝাতে পারব। এটা সত্য যে মানুষের এমন কিছু গুণ বা সামর্থ্য আছে যা প্রাণীর নেই। প্রাণীরা পড়তে পারে না, লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিতে পারে না। রেগান অবশ্য আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে অনেক মানুষও আছে যাঁরা অন্য মানুষজনের মতো অনেক কাজই করতে পারেন না, কিন্তু তৎতত্ত্বেও আমরা তাঁদের স্বগতমূল্য স্বীকার করি, তাঁদের অধিকার স্বীকার করি। সেক্ষেত্রে আমরা আংশিক প্রতিবন্ধী মানুষের সঙ্গে স্বাভাবিক মানুষের সাদৃশ্যের প্রকরণগুলিকেই গুরুত্ব দিই, পার্থক্যগুলিকে নয়। কিন্তু প্রাণীদের আমরা ঠিক উল্ট কাজটিই করি। রেগানের মতে সাদৃশ্যের সবেচেয়ে নির্ণায়ক এবং গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হল আমরা সবই সচেতন ব্যক্তিসত্তা যারা নিজের নিজের সুখ-সুবিধা, দুঃখ-আনন্দ বোঝে, অন্যের প্রয়োজনের সঙ্গে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ হোক বা না হোক। আসলে সবাই এক 'মূর্ত জীবনের কর্তা' রেগনের ভাষায় 'the experienceing subject of a life'। আমরা কিছু চাই, পছন্দ করি, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু চিন্তভাবনার থাকে আমাদের, অনেক প্রত্যাশা নিয়ে আমরা জীবন-যাপন করি। সুঃখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ আমাদের এই মূর্ত চলমান জীবন বহমান রাখে। ঠিক একই রকমভাবে বেশ কিছু স্বতোমূল্যবান প্রাণী আছে যাদেরকে জীবন-অনুভবকারী-বিষয়ী বলা যায়। তাই নিজের মতো স্বচ্ছন্দে বেড়ে ওঠার অধিকার, নিজের জীবনের অধিকার এবং অন্যের দ্বারা বিপজ্জনকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হবার অধিকার প্রাণীদেরও আছে। রেগানের বক্তব্য, জীবন-অনুভবকারী সত্তা হিসাবে সব উন্নত প্রাণীর স্বগতমূল্য আছে এবং তাই তারা নৈতিক বিচারের বিষয় হয়।

আলোচ্য প্রবন্ধে রেগান স্বগত মূল্যের ধারণা ও অধিকারের ধারণার পর্যালোচনা মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে মানুষের যেমন স্বগত মূল্য আছে, অন্যের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত না হওয়ার অধিকার আছে, ঠিক তেমনি উন্নত প্রাণীদেরও মানুষের মতো স্বগত ও মূল্য ও অধিকার আছে। তিনি লিখেছেন, 'I have argued for what appears to be the most promissing line of argument for explaining human rights the view that we

have inherent value, and this can rationally be extended to animals of some kinds.' কেউ অবশ্য প্রশ্ন তুলতে পারেন, প্রাণীর অধিকারের কথা বলা অর্থপূর্ণ নয়, কেননা তারা সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারে না, দাবিপত্র পেশ করতে পারে না, ইত্যাদি। কিন্তু রেগান বলেন, এইসব ঘটনা সত্য, তথাপি এগুলি তাদের অধিকারের পক্ষে আমাদের আজ করার নৈতিক বাধ্যতাবোধকে দুর্বল তো করেই না, বরং তাদের অক্ষমতা আমাদের দায়িত্ব বাড়িয়ে দেয়।

পরিশেষে বলি, কিছু সমালোচক রেগানের এই প্রাণী-অধিকারের তত্ত্বকে চরমপন্থী অবস্থান বলে মনে করেন। বলা বাহুল্য, অধিকারের ভাষায় প্রণীর নৈতিক মর্যাদা ব্যাখ্যা করলে ব্যতিক্রম স্বীকার করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। প্রয়োজন, পরিস্থিতি, স্থানীয় সংস্কৃতি কোনোকিছুই এখানে গুরুত্ব পায় না। তাই অনুভবকারী জীবনের কর্তা হলেই নীতিবিবেচনার যোগ্য হবে তাদের এই ফরমান মেনে চলা কঠিন।

২.১ সারসংক্ষেপ

এই পাঠ-এককের প্রথম অংশে আমরা পল টেলারের প্রাণকেন্দ্রিক পরিবেশনীতিতত্ত্বের বিবৃতি ও ব্যাখ্যা দিয়েছি। দেখেছি টেলারের এই প্রাণকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে প্রজাতিবাদী মানবকেন্দ্রিক স্বাজাত্যাভিমানকে কাটিয়ে উঠেছে। তবে সকল প্রাণের সমান মূল্যের প্রস্তাব কতখানি গ্রহণযোগ্য হবে, তা পুনর্বিচারের দাবি রাখে। পাঠ-এককের দ্বিতীয় অংশে টম রেগানকে অনুসরণ করে প্রাণীমুক্তি তথা প্রাণীর অধিকারতত্ত্ব বিবেচিত হয়েছে। আমরা দেখিয়েছি রেগান কীভাবে প্রচলিত ধ্যানধারণা তথা নীতিভাবনাকে অতিক্রম করে প্রাণীর অধিকারের পক্ষে সওয়াল করেছেন। উপযোগবাদী যুক্তির যে বিশ্লেষণ তিনি করেছেন তা অভিনব। তবে প্রাণীর অধিকারের তত্ত্ব অতি কঠোর এক অবস্থান, যাকে মেনে চলা কঠিন বলে মনে হয়।

২.২ নমুনা প্রশ্নাবলী

1. Define biocentrism, Give an account of biocentric environmentalism.
2. Discuss how Paul Taylor formulates his biocentric outlook on Nature.
3. How does Taylor explain that humans are just one among the members of the earth's biotic community? Do you agree with him? Give reasons for your answer.
4. What does Taylor mean when he says that each individual organism is a teleological centre of life? Explain fully.
5. What is the idea of human superiority? How does Paul Taylor dismiss the traditional idea of human superiority on Nature?
6. What is animal ethics? How is animal right iew different from animal welfarism? Discuss.
7. Give a brief account of Regan's animal rights view. Do you agree with Regan? give reason for your answer.

8. Explain and examine, following Tom Regon, the Kantian account of animal ethics.
9. Explain and examine the Cruelty account of animal ethics.
10. How do the utilitarians for animal welfarism? How does Regan reacts to it?
11. Elucidate the main ideas and principles of Regan's theory of animal rights. Is Regn's prescription practicable? Give reasons.
12. Write notes on the following :
    a) Speciesism
    b) Human Chauvinism
    c) Respect for life
    d) Four principles of biocentric outlook
    e) The natural world as an organic system
    f) Sentientism
    g) Singer's view on animal liberation

২.৩ গ্রন্থনির্দেশ ঃ

সিলেবাস নির্দিষ্ট দুটি প্রবন্ধ- Paul W Taylor এর 'The Ethics of Respect for Nature' এবং Tom Regan -এর 'Animal Rights, Human Wrongs' পাঠ্য। এছাড়া, Tom Regan এবং Peter Singer সম্পাদিত 'Animal Rights, Human Obligations' গ্রন্থটি প্রণিধানযোগ্য। বাংলায় লেখা হিসাবে আমার গ্রন্থ 'সমকালীন পরিবেশ নীতিশাস্ত্রের রূপরেখা'-এর পঞ্চম অধ্যায়টি দেখতে পারেন।

পাঠ-একক-৩

বাস্তুকেন্দ্রিকতাবাদ (Ecocentrism)

বিষয়সূচী

৩.০ উদ্দেশ্য

৩.০.১ প্রাক্ কথন

৩.১ প্রথম অংশ: ভূমি-নীতিতত্ত্ব

৩.১.১ নৈতিক পরম্পরা

৩.১.২ সম্প্রদায়ের ধারণা

৩.১.৩ বাস্তুতাত্ত্বিক বিবেক

৩.১.৪ ভূমি-পিরামিড

৩.১.৫ ভূমির স্বাস্থ্য

৩.১.৬ দৃষ্টিভঙ্গি

৩.১.৭ ভূমি-নীতিতত্ত্বের পর্যালোচনা

৩.২ দ্বিতীয়অংশ : গভীর বাস্তুবাদ

৩.২.১ ভূমিকা

৩.২.২ গভীর বাস্তুবাদী নীতিসমূহ

৩.২.৩ গভীর বাস্তুবাদের আন্দোলন কি?

৩.২.৪ গভীর বনাম অ-গভীর বাস্তুবাদ

৩.২.৫ গভীর বাস্তুবাদ কেন?

৩.২.৬ নিঃসরণমূলক (অবরোহী) যুক্তিতন্ত্র হিসাবে গভীর বাস্তুবাদের ব্যাখ্যা

৩.২.৭ নেসের 'ইকোসফি- T'

৩.৩ সারসংক্ষেপ

৩.৪ নমুনা প্রশ্নাবলী

৩.৫ গ্রন্থ নির্দেশ

পাঠ একক-৩

বাস্তুকেন্দ্রিকতাবাদ (Ecocentrism)

৩.০ উদ্দেশ্য :

এই পাঠ এককে আমরা বাস্তুকেন্দ্রিকতাবাদের পর্যালোচনা করব। এই পাঠ এককের প্রথম অংশে অল্ডো লিওপোল্ডের ভূমিনীতিতত্ত্ব এবং দ্বিতীয় অংশে আর্নে নেসের গভীর বাস্তুবাদের আলোচনা থাকবে।

৩.০.১ প্রাক্ কথন :

বাস্তুকেন্দ্রিকতাবাদ বলতে পরিবেশ-নীতিশাস্ত্রের সেই আদর্শমূলক তত্ত্ব তথা পরিবেশ-দর্শনকে বোঝায় যেখানে কেবল মানুষ বা প্রাণবান সত্তাই নয়, কথিত জড়-জগৎ, প্রজাতি, বাস্তুব্যবস্থা ইত্যাদিরও নৈতিক মূল্য স্বীকার করা হয়। সমকালীন বাস্তুবিজ্ঞান (Ecology)-এর গবেষণা আমাদের এই উপলব্ধিতে পৌঁছে দিয়েছে যে এই বিশ্বপ্রকৃতি এক অখণ্ড সর্বব্যাপক তন্ত্র। 'ঔকস' (Oikos) এবং 'লোগস' (Logos) এই দুটি শব্দের সমন্বয়ে 'Ecology' শব্দটি তৈরি। গ্রীক শব্দ 'ঔকস'-এর অর্থ বসতি। বুৎপত্তিগত অর্থে 'Ecology' বিশেষ বসতি সম্পর্কিত বিজ্ঞানকে বোঝায়। অধুনা বাস্তুবিজ্ঞান বলতে সেই আন্তর্বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞানকে বোঝায়, যা মানুষ, প্রাণী, উদ্ভিদ, জীবাণুর ইত্যাদির পারস্পরিক সম্পর্ক, পরিবেশের জৈব ও অজৈব উপাদানসমূহের মধ্যে যে পরিবর্তনশীল অথচ সুনিয়ন্ত্রিত মিথস্ক্রিয়া সে সম্পর্কে সুসংবন্ধ জ্ঞন-আরহণ করে।) এখানে সম্পূর্ণ স্বাধীন সত্তা বলে কিছু নেই, প্রত্যেক সত্তা অপরাপর সত্তার উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভর করে। সেই সঙ্গে বাস্তুবিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পরিবেশ চিন্তার জগতে যে সব সমগ্রতাবাদী নীতিতত্ত্ব তথা পরিবেশ-দর্শনের উদ্ভব ঘটেছে তাদেরকে একত্রে বাস্তুকেন্দ্রিকতাবাদ বলা হয়। বাস্তুকেন্দ্রিক পরিবেশতত্ত্ব হিসাবে আমরা যেসব পাশ্চাত্য তত্ত্বের সন্ধান পাই তার মধ্যে অল্ডো লিওপোল্ডের ভূমি-নীতিতত্ত্ব (the Land Ethic) এবং অর্নে নেসের গভীর বাস্তুবাদ (Deep Ecology) সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমরা পাঠ্যসূচি-নির্দিষ্ট এই দুই নীতিতত্ত্বের আলোচনা করব। এই পাঠ এককের প্রথম অংশে সিলেবাস নির্দিষ্ট অলডো লিওপোল্ডের প্রবন্ধ 'the Land Ethic' (১৯৪৯) অনুসরণ করে ভূমি-নীতিতত্ত্বের পর্যালোচনা করব। দ্বিতীয় অংশে সিলেবাস-নির্দিষ্ট আর্নে নেসের প্রবন্ধ,'The Shallow and the Deep, Long Range Ecology Movements'(১৯৭৩) এবং 'The Deep Ecology Movement : Some Phiosophical Aspcts' (১৯৮৬) অনুসণ করে গভীর বাস্তুবাদের পর্যালোচনা করব।

৩.১ প্রথম অংশ : ভূমি-নীতিতত্ত্ব (The Land Ethic)

অলডো লিওপোল্ড তাঁর পরিবেশ ভাবনার আলোচনা শুরু করেছেন সাবেকি নীতিশাস্ত্রে সংকীর্ণতার প্রতি ইঙ্গিত করে। ওডিস্যেউস ট্রয় যুদ্ধে জয়ী হয়ে যখন ফিরে এলে তখন তিনি তাঁর বাড়ির এক ডজন দাসীকে একটি দড়িতে বেঁধে ফাঁস দিয়ে হত্যা করেন এই সন্দেহের বশে যে তাঁর দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে তারা বিশ্বাসঘাতকতা রূপ খারাপ আচরণ করে থাকবে। ওডিস্যেউসের এই কাজের নৈতিকতা নিয়ে কোনো প্রশ্ন ওঠেনি সেদিন। এই দাসীগুলি তাঁর অন্যান্য স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যেই পড়ে। তাই এই সম্পত্তিকে কত তাড়াতাড়ি বিদায়

করা যায় সেটাই তাঁর কাছে বিবেচ্য ছিল। কাজটি যথোচিত না অনুচিত-এই প্রশ্নে তখন ওঠেনি। তবে এর মানে এই নয় যে ওডিস্যেউসের গ্রীসে ন্যায়-অন্যায়, উচিত অনুচিতের কোনো ধারণা ছিল না। ওডিস্যেউস কিন্তু তাঁর স্ত্রীর বিশ্বস্ততা নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলেনি, তাঁর প্রতি ওডিস্যেউসের আচরণ নীতি মাফিক ছিল। আসলে তৎকালীন নীতি বিচারে ভাবনার যে পরিধি তার মধ্যে স্ত্রীর স্থান ছিল, কিন্তু মানবীয় সম্পত্তিরূপ দাসী-বাঁদিরা এই নীতি বিচারের মঞ্চ থেকে নির্বাসিত ছিল। তারপর থেকে তিন সহস্র বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, আমাদের নৈতিক মানদণ্ড আচার বিচারের অনেক ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়েছে। কিন্তু যেসব বিষয়কে উপযোগিতার নিরিখে বিচার করা হত সেগুলি সম্পর্কে আমাদের নীতিভাবনা বেশী দূর অগ্রসর হয়নি।

৩.১.১ নৈতিক পবম্পরা (The Ethicl Sequence)

লিওপোল্ডের মতে নীতিতত্ত্বের সম্প্রসারণ আসলে বাস্তুতাত্ত্বিক বিবর্তনের একটি প্রক্রিয়া। এর পরম্পরাকে যেমন বাস্তুতাত্ত্বিক পরিভাষায় বর্ণনা করা যায় তেমনি দার্শনিক পরিভাষাতেও এই পরম্পরাকে বোঝা যায়। বাস্তুতাত্ত্বিক দিক থেকে নীতিশাস্ত্রে হল অস্তিত্বের সংগ্রামে স্বাধীন আচরণের পর এক বিশেষ ধরনের নিয়ন্ত্রণ। দার্শনিক বিচরে নীতিশাস্ত্র অসামাজিক আচরণ থেকে আচরণকে আলাদা করার উপায়। তবে এই সংজ্ঞা দুটি একই বিষয়ের, আর এই বিষয় যাকে নীতিশাস্ত্র বলছি, তার উৎস রয়েছে পরস্পর নির্ভর ব্যক্তিসমূহ বা গোষ্ঠীগুলির পারস্পরিক সহযোগিতাকামী প্রবণতার মধ্যে। বাস্তুবিজ্ঞাণী একে বলবেন মিথোজীবিতা (sysmbiosis)। রাজনীতি ও অর্থনীতি প্রাগ্রসর মিথোজীবিতার এক একটি দৃষ্টান্ত, যেখানে নিয়ন্ত্রণহীন প্রতিযোগিতাকে নৈতিক উপাদান সহযোগি ব্যবস্থার মাধ্যমে পুনঃস্থাপন করা হয়েছে। এই সহযোগিতার ব্যবস্থাপনার জটিলতা বেড়েছে জনসংখ্যার চাপ এবং উপকরণগুলির কার্যকারিতা যত বেড়েছে। প্রথম পর্যায়ে নীতিশাস্ত্র ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করত, পরবর্তী পর্যায়ে তা ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যেকার সম্পর্কের পর্যালোচনায় উন্নীত হয়। আমরা যাকে স্বর্ণালী নিয়ম (The Golden Rule)বলি তা ব্যক্তিকে সমাজের সঙ্গে সংহত করতে চেষ্টা করে, ঠিক যেমন গণতন্ত্র সামাজিক সংগঠনকে ব্যক্তির সঙ্গে জুড়ে দিতে চেষ্টা করে।

কিন্তু, লিওপোল্ড বলেন, এখনও পর্যন্ত এমন কোনো নীতিশাস্ত্রে উদ্ভব ঘটেনি যা ভূমি (The Land)-এর সঙ্গে এবং তার উপর যেসব প্রাণী ও গাছপালা বেড়ে ওঠে তাদের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে তুলে ধরবে। 'ভূমি' ওডিস্যেউসের দাসীদের মতোই এখনও পর্যন্ত আমাদের সম্পত্তি। আর পাঁচটা বিষয়ের মতো ভূমির মালিক আমরা, যাকে আমরা যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারি। আর ভূমি সম্পর্ক এখনও পর্যন্ত কঠোরভাবে অর্থনৈতিক, যা আমাদের সুযোগ- সুবিধা পাইয়ে দেয়, কিন্তু কোনো বাধ্যতাবোধ বা নীতিদায়ের সূচনা করে না। এই নব- আবিষ্কৃত জগতের প্রতি নীতিশাস্ত্রের সম্প্রসারণ আসলে বিবর্তনমূলক সম্ভাবনা, এবং একই সাথে তা বাস্তুতাত্ত্বিক আবশ্যিকতা। বিংস শতাব্দির মধ্যভাগ থেকে সুরুহওয়া ভূমির প্রতি নৈতিকতাকে টেনে নিয়ে যাওয়ার এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই (পাশ্চাত্য) পরিবেশ-নীতিশাস্ত্রের উদ্ভব ঘটেছে।

৩.১.২ সম্প্রদায়ের ধারণা (The Community Concept) :

লিওপোল্ড বলেন, এ পর্যন্ত নীতিশাস্ত্রের যে বিবর্তন ঘটেছে তা একটি আশ্রয় বাক্যের উপর দাঁড়িয়ে আছে এবং সেটি হল, ব্যক্তি আসলে পরস্পর-নির্ভর অংশ তা একটি সম্প্রদায়ের সদস্যমাত্র। ব্যক্তির স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সম্প্রদায়ের মধ্যে তার জায়গা খুঁজে নেওয়ার জন্য তাকে প্রতিযোগিতার মুখে ঠেলে দেয়। কিন্তু তার

নীতিবোধ তাকে সহযোগিতা করতে প্রণোদিত করে। লিওপোল্ডের এই ভূমিনীতিতত্ত্ব 'ভূমি'র সকল সদস্যকে একই সম্প্রদায়ের সদস্য হিসাবে বিচার করে। এখানে কেবল মানুষের স্বার্থ নয়, সামগ্রিকভাবে 'ভূমি'-র স্বার্থ বিবেচিত হয়। স্পষ্টতই, 'ভূমি' শব্দের দ্বারা লিওপোল্ডের এই নিছক পৃথিবী গ্রহের স্থলভাগের উপরিতলকে বোঝাননি, সমগ্র বিশ্ব-ব্যবস্থা, যার মধ্যে মৃত্তিকা, জল , গাছপালা, প্রাণীকূল সব কিছুই অন্তর্ভুক্ত, তাকে বুঝিয়েছেন। তাই তিনি লিখেছেন 'The land ethic simply enlarges the boundaries of the community to include soils, Waters, plants, and animals, or collectively: the land'. আমরা এতদিন পর্যন্ত গাছপালা, প্রাণীকূল বামৃত্তিকার প্রতি আমাদের কোনো দায় বদ্ধতা দেখাইনি কিন্তু ভূমিনীতিতত্ত্ব এইসব বিষয়কে নিছক প্রয়োজনের সামগ্রী হিসাবে দেখার বিরোধিতা করে এবং এদের অবিরাম অস্তিত্বের অধিকারকে জোরের সাথে ঘোষণা করে। শুধু মানুষের স্বার্থের কথা ভাবা, মানুষকে কেন্দ্র করেই সব কিছু চিন্তা করার যে সাবেকী নীতিভাবনা তাকে আমূল পরিবর্তনেরকথা বলে এই নূতন নীতিতত্ত্ব। লিওপোল্ডের ভাষায় 'In short, a land ethic changes the role of *Homo Sapiens* form conqueror of the land community to plain member and citizen of it. It implies respect for his fellow members and also respect for community as such'

এই নীতিতত্ত্বে মানুষকে প্রাণমণ্ডলের সমমর্যাদাসম্পন্ন সদস্য হিসাবে বিচার করা হয়। ইতিহাসের বাস্তুতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা এই সত্যকে ধরে যে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা যেগুলিকে এ পর্যন্ত মানুষের উদ্যোগের ভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেগুলি আসলে মানুষের সঙ্গে ভূমির পারস্পারিক মিথস্ক্রিয়া। ভূমির শক্তি-শৃঙ্খলাদি বৈশিষ্ট্যসমূহ ঘটনাক্রমকে সেইভাবে নির্ধারণ করে ভূমির উপর বসবাসকারি মানুষের বৈশিষ্ট্যসমূহও যেমনভাবে নির্ধারিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, লিওপোল্ড মিসিসিপি উপত্যকায় মানুষের বসতি স্থাপনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। বিপ্লবের পরবর্তী বছরগুলিতে এই উপত্যকা নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার জন্য নেটিভ ইন্ডিয়ান, ফরাসি এবং ইংরেজ ব্যবসায়ি এবং আমেরিকান অধিবাসীদের একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। ঐতিহাসিকরা বিস্ময় প্রকাশ করেন, যদি ডেট্রয়টের ইংরেজরা ইন্ডিয়ানদের ওপর আরো বেশি গুরুত্ব দিত তাহলে ঘটনা অন্য রকম ঘটতে পারত। অনুরূপ, যদি ঐ উপত্যকায় গাছপালা, জলবায়ু আবহাওয়া অন্যরকম হত, তাহলে ইতিহাস অন্যরকম হতে পারত। লিওপোল্ডের মতে, ভূমির শক্তিশৃঙ্খলের পরম্পরা ইতিহাসের গতিকে পরিচালিত করে। বাস্তুতাত্ত্বিকের ভূমিরমধ্যে কি ধরনের পরম্পরা কাজ করেছে তাকে ব্যাখ্যা করে। সম্প্রদায় হিসাবে ভূমির ধারণা যখন আমাদের বৌদ্ধক জীবনকে ভেদ করতে পারবে তখনই এই ইতিহাসকে আমরা ঠিক ঠিক বুঝতে পারব।

৩.১.৩ বাস্তুতাত্ত্বিক বিবেক (The Ecological Conscience)

সংরক্ষণ বলতে মানুষ এবং ভূমির মধ্যেকার (আচরণগত) সাম্যাবস্থাকে রক্ষা করা বোঝায়। এক শতাব্দী ধরে প্রচার সত্ত্বেও সংরক্ষণের বিষয়টি শম্বুক গতিতে চলেছে। শুধু চিঠিপত্রের আদানপ্রদান, আর সভা-সমিতিতে বক্তৃতার এটি সীমাবদ্ধ থেকেছে। অনেকে মনে করেন , সংরক্ষণ বিষয়ে আরো শিক্ষা প্রয়োজন। কিন্তু লিওপোল্ড প্রশ্ন তোলেন, শিক্ষার পরিধি বাড়ালেই কি কাজ হবে, না কি শিক্ষার বিষয়ের মধ্যেই কিছু ঘাটতি আছে, যা পূরণ করা দরকার? প্রচলিত সংরক্ষণ-শিক্ষার বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, এই বিষয়বস্তুর সারমর্ম এরকম : আইন মেনে চলো, ঠিক ঠিক ভোট দাও, কোনো সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হও, যে ধরনের সংরক্ষণ লাভ জনক তা অনুশীলন করো,— সরকার বাকি কাজটা করে দেবে। বলার অপেক্ষা রাখে না, ভাল কিছু করার জন্য এই সহজ ফর্মুলা মোটেই যথেষ্ট নয়। এর মধ্যে ন্যায় অন্যায়ের কথা নেই, কোনো দায়-দায়িত্ব

নির্দেশনা নেই, এ শুধুই আলোকিত আত্ম-স্বার্থেকেই তুলে ধরে। এই আত্ম-স্বার্থের উপরে উঠতে না পারলে ভূমি নীতিতত্ত্বে পৌঁছানো সম্ভব নয়। আবার দায়-দায়িত্বের কোনো অর্থই থাকে না যদি বিবেক বলে কিছু না থাকে। লিওপোল্ডের কাছে সমস্যাটি হল, সামাজিক বিবেককে মনুষ্যকেন্দ্রিকতার বেড়াজাল কেটে 'ভূমি'তে পৌঁছে দেওয়া (the extension of social conscience from people to land) তিনি একই সঙ্গে মন্তব্য করেছেন,-'No important change in ethics was ever accomplished without an internal change in our intellectual emphasis, layalities, affections and convictions.'

৩.১.৪ ভূমি পিরামিড (The Land Pyramid) :

লিওপোল্ডের মতে, ভূমি নীতিতত্ত্বকে বুঝতে হলে ভূমিকে 'বায়োটিক্ মেকানিজম্' হিসাবে ভাবতে পারতে হবে। শুধু তাই নয়, যেসব বিষয়কে আমরা দেখি, অনুভব করি, বুঝি, ভালবাসি, অথবা যার প্রতি আমার আস্থা আছে, তাদের প্রতি আচরণেই আমরা নীতিমান হতে পারি। তাই 'ভূমি'কে নিছক মৃত্তিকারূপে জড়বস্তু হিসাবে না দেখে তাকে প্রাণমণ্ডলের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে দেখতে হবে, তার প্রতি দরদ রাখতে হবে। তবেই আমরা প্রজাতিবাদী মানবকেন্দ্রিকতার বৃত্তপেরিয়ে উন্নত নৈতিকতার রাজ্যে প্রবেশ করতে পারব। সংরক্ষণ সম্পর্কিত শিক্ষায় 'ভূমি'-র যে চিত্রকল্প সাধারণভাবে ব্যবহার করা হয় তা হল প্রকৃতির ভারসাম্য (the balance of nature)। অবশ্য বাস্তুবিদ্যায় যে চিত্রকল্পটি ব্যবহার করা হয় তা হল প্রাণমণ্ডলের পিরামিড' (the biotic pyramid)। লিওপোল্ড এই পিরামিডকেই 'ভূমি'-র প্রতীক হিসাবে চিত্রিত করেছেন এবং পরবর্তী এর কিছু ইঙ্গিত বা অনুষঙ্গকে ভূমি ব্যবহারের ভাষায় বুঝতে চেষ্টা করেছেন।

গাছপালা সূর্য থেকে শক্তি শোষণ করে। এই শক্তি প্রাণমণ্ডলের প্রদক্ষিণপথ (circuit)বেয়ে অগ্রসর হয়, যে ব্যবস্থাটিকে অনেকগুলি স্তরবিশিষ্ট পিরামিড হিসাবে বোঝানো যেতে পারে। একদম নীচের স্তরে আছে মৃত্তিকা। একটি গাছ মৃত্তিকার উপর নির্ভর করে, তাই আমরা বলতে পারি, গাছপালার স্তরটি মৃত্তিকা- নির্ভর। কীট-পতঙ্গ গাছপালাকে নির্ভর করে বেঁচে থাকে, তাই আমরা বলতে পারি, কীটপতঙ্গের যে স্তর তা বৃক্ষ নির্ভর। পাখি এবং তীক্ষ্ন-দন্ত বিশিষ্ট প্রাণী পোকা- মাকড়ের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে। এইভাবে পিরামিডের ক্রমশ শীর্ষের দিকের স্তরগুলিতে বৃহদাকার তথা উন্নত প্রাণীকূল অবস্থান করে। সর্ববৃহৎ মাংসাশী স্তন্যপায়ী প্রাণীগুলি এভাবে পিরামিডের শীর্ষের দিকে অবস্থান করে। একটি স্তরের প্রজাতিগুলি একই ধরনের খাদ্যগ্রহণ করে, তাই তারা পরস্পরের সদৃশ। প্রতিটি পরম্পরাগত স্তর তার নীচের স্তরের উপর খাদ্য এবং অন্যান্য ব্যাপারে নির্ভর করে এবং প্রতিটি স্তরে পরিবর্তে উপরের স্তরে থাকা প্রজাতির খাদ্যের জোগান দেয়। নীচের থেকে যতই ওপরের দিকে যাওয়া যায় ততই স্তর-পরম্পরায় সংখ্যাগত প্রাচুর্য (Numerical abundance) কমতে থাকে। প্রতিটি মাংসাশী স্তন্যপায়ীর জন্য শত-সহস্র শিকার থাকে, লক্ষ-কোটি পোকা-মাকড় এবং অসংখ্য গাছপালা থাকে। এই তন্ত্রের যে পিরামিড-সদৃশ আকার তা শীর্ষদেশ থেকে নিম্নতলের দিকে সংখ্যাগত প্রাচুর্যকে তুলে ধরে। ভালুক এবং কাটবেড়ালী যারা মাংস ও শাকসবজি উভয়ই খায় তাদের সঙ্গে একই স্তরে অবস্থান করে মানুষ।

খাদ্য এবং অন্যান্য ব্যাপারে নির্ভরতার যে পরম্পরা তাকে খাদ্য-শৃঙ্খল বলা হয়। মানুষসহ প্রতিটি প্রজাতি এই খাদ্য-শৃঙ্খলের এক একটি পর্যায়ে অবস্থান করে। এই শৃঙ্খলের যে পিরামিড তা এতটাই জটিল যে আমরা তার মধ্যে অনেক সময় বিশৃঙ্খলা লক্ষ্য করি। কিন্তু সামগ্রিকভাবে এই ব্যবস্থার যে স্থায়িত্ব তা প্রমাণ করে যে

এই শৃঙ্খল উচ্চমানের উপর নির্ভর করে। যদি এই শৃঙ্খলের মধ্যে কোথাও কোন ছেদ ঘটে তাহলে অন্যান্য অংশগুলি এই পরিবর্তনকে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করে। যেকোনো পরিবর্তন শক্তিশৃঙ্খলের স্বাভাবিক ছন্দকে বাধা দেয়—এরকম ভাবার কোনো কারণ নেই। বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন বিবর্তন আসলে স্ব-সৃষ্ট অসংখ্য পরিবর্তনের একটি দীর্ঘ পরম্পররা, যার নীটফল হল শক্তি-শৃঙ্খলের প্রবাহকে আরো বিস্তৃত করা এবং প্রদক্ষিণ পথকে (circuit) দীর্ঘায়িত করা। তবে বিবর্তন প্রক্রিয়ার যেসব পরিবর্তনের সূচনা হয় সেগুলি সাধারণত মন্তরগতি এবং স্থানীয় চরিত্রের। কিন্তু মনুষ্যসৃষ্ট যে পরিবর্তন তা অতি দ্রুততার সঙ্গে ঘটে, এবং তার পরিধির ব্যাপকতাও অনেক বেশি। মানুষ যেসব বিভিন্ন ধরনের উপকরণ তৈরি করেছে, প্রযুক্তি নির্মাণ করেছে তা এমন ভয়ঙ্কর মাত্রায় পরিবর্তন সংগঠিত করতে পারে যা অনেক সময় আমাদের কল্পনাকেও ছড়িয়ে যায়। লিওপোল্ডের মতে, ভূমি পিরামিডকে শক্তি-শৃঙ্খল হিসাবে চিত্রায়ণ তিনটি মৌলিক বিষয়কে প্রকাশ করে ঃ

(১) ভূমি মানে নিছক মৃত্তিকা নয়।

(২) স্থানীয় গাছপালা এবং প্রাণীরা শক্তি -শৃঙ্খলের প্রদক্ষিণ উন্মুক্ত রাখে। কিন্তু অন্যেরা তা রাখতে পারে, আবার নাও পারে।

(৩) মনুষ্যসৃষ্ট পরিবর্তনগুলি বিবর্তনমূলক পরিবর্তন থেকে আলাদা, এবং এর পরিণাম বা ফলাফল আমরা যতটুকু পূর্বানুমান করতে পারি তার থেকেও ব্যাপক ও বিধ্বংসী হতে পারে।

স্পষ্টতই ভূমি-শৃঙ্খল তথা প্রকৃতির উপর মানুষের এই ধরনের হস্তক্ষেপেই পরিবেশ-সমস্যার মূল কারণ। তবে নিছক কিছু তথ্য তুলে ধরলেই আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটবেনা, এর জন্য বাস্তুতাত্ত্বিক বিবেকের প্রয়োজন হয়।

৩.১.৫ ভূমির স্বাস্থ্য (The Land Health) :

ভূমি নীতিতত্ত্ব এক বাস্তুতাত্ত্বিক বিবেকের দিকে আমাদের ইঙ্গিত করে এবং ভূমির স্বাস্থ্যের ব্যাপারে ব্যক্তি-মানুষের দায়দায়িত্বের গভীর প্রত্যয়কে প্রতিফলিত করে। স্বাস্থ্য হল ভূমির আত্ম-পুনর্নবীকরণের সামর্থে আর সংরক্ষণ হল ভূমির এই সামর্থ্যকে বোঝা এবং তাকে রক্ষা করার ব্যাপারে আমাদের উদ্যোগ।

কিন্তু সমস্যা হল, সংরক্ষণবাদীদের মতানৈক্য। একদল সংরক্ষণবাদী ভূমিকে কেবল মৃত্তিকা হিসাবে বোঝে এবং এর কাজকে পণ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা হিসাবে বিচার করে। অন্যদল ভূমিকে একটিখণ্ড প্রাণমণ্ডল হিসাবে বিচার করে এবং এর কার্যকারিতাকে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে বিচার করে। লিওপোল্ড দৃষ্টান্তস্বরূপ বন-পালনবিদ্যা (Forestry) উল্লেখ করে বলেন, একদল সংরক্ষণবাদী (যাকে তিনি Group-A বলেছেন) এবং বিভিন্ন গাছপালা লাগানোতেই ব্যস্ত এবং তার থেকে যে পণ্য উঠে আসবে তা নিয়েই সন্তুষ্ট। এই দলের মতাদর্শ কৃষি-অর্থনীতি (Agronomics) সম্বন্ধিয়। অন্যদল (যাকে লিওপোল্ড Group-B বলেছেন) বন পালনবিদ্যাকে কৃষিঅর্থনীতি থেকে মূলগতভাবে স্বতন্ত্র বিবেচনা করেন। তাঁরা প্রাকৃতিক প্রজাতিসমূহকে সংরক্ষণে সচেষ্ট থাকেন এবং কৃত্রিম পরিবেশ তৈরি করার পরিবর্তে প্রাকৃতিক পরিবেশকে স্বচ্ছন্দে টিকে থাকতে সাহায্য করেন। এই দ্বিতীয় দল, অর্থাৎ গ্রুপ-বি নীতিগতভাবে প্রাকৃতিক পুনরুৎপাদনকে গুরুত্ব দেয়। বিভিন্ন প্রজাতির বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তারা উদ্বিগ্ন এবং এই উদ্বেগ নিছক অর্থনৈতিক কারণে নয়। প্রাণমন্ডলের স্থায়িত্ব ও ভারসাম্য নিয়ে তারা গভীরভাবে চিন্তিত। বনভূমিকে গৌণ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা, যেমন মনোরঞ্জনের জন্য বা বিনোদনভূমির নামে

বনাঞ্চলকে ব্যবহার করার ব্যাপারে এঁদের ততটা সায় নেই। এই দ্বিতীয় দল (গ্রুপ-বি) বাস্তুতান্ত্বিক বিবেকের আহ্বান শুনতে পান। লিওপোল্ড বলেন ‘To my mind, Group-b feels the stirrings of an ecological conscience.’

৩.১.৬ দৃষ্টিভঙ্গি (The outlook)ঃ

লিওপোল্ড মনে করেন, ভূমির প্রতি ভালবাসা এবং তার স্বগত মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকলে ভূমির প্রতি যথার্থ নৈতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। এখানে ‘মূল্য’ বলতে নিছক অর্থনৈতিক মূল্য বুঝলে চলবে না, লিওপোল্ড এখানে দার্শনিক অর্থে মূল্যের কথা বলেছেন। বাস্তুতত্ত্বের জ্ঞান প্রয়োজন। কিন্তু লিওপোল্ডের আমলে বাস্তুতান্ত্বিক ধারণা তথা দৃষ্টিভঙ্গিকে সেইভাবে গুরুত্ব দেওয়া হত না। যাই হোক, লিওপোল্ড বলেন এক অখণ্ড বাস্তুতান্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই ভূমি তথা প্রকৃতিকে বিচার করতে হবে। আর নীতিতত্ত্ব হবে সেই ধরনের আদর্শ- নির্দেশনা, যা প্রাণমণ্ডলের সংহতি, স্থায়িত্ব এবং সৌন্দর্যকে রক্ষা করতে সাহায্য করবে। ভূমিনীতিতত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গিতে তাই ‘A thing is right when it tends to preserve the integrity, stability, and beauty of the biotic community. It is Wrong Ehen it tends otherwise.’

৩.১.৭ ভূমি-নীতিতত্ত্বের পর্যালোচনা:

ভূমি-নীতিতত্ত্বের মানদণ্ড অনুসারে যা আমাদের প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষায় সহায়ক হবে সেই কাজই ন্যায্য বা যথোচিত হবে। আর যা ভারসাম্যের পক্ষে ক্ষতিকারক তাই অন্যাযয, অনুচিত। ‘আধুনিক’ নীতিতত্ত্ব যেখানে মনুষ্যসত্তার বাইরে নৈতিক শ্রদ্ধা ও মর্যাদার কথা ভাবতে পারেনি, লিওপোল্ডের ভূমিনীতিতত্ত্ব সেখানে বাস্তুব্যবস্থার সকল সহ- সদস্যই যেমন নৈতিক মর্যাদা স্বীকার করেছে তেমনি বাস্তুসম্প্রদায়রূপ সমষ্টিগত সত্তার প্রতি আমাদের নৈতিক দায়কে প্রতিপাদন করছে। বলার অপেক্ষা রাখে না, পরিবেশচিন্তায় লিওপোল্ডের এই অবদান বৈপ্লবিক ও ঐতিহাসিক। তাই লিও পোল্ডের ব্যাখ্যাকারেরা তার ভূমি নীতিতত্ত্বকে পরিবেশ নীতিশাস্ত্রে আদর্শ দৃষ্টান্ত (The paradigam case) হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

জে.বি. ক্যালিকট প্রমুখ ভাষ্যকারেরা লিওপোল্ডের ভূমিনীতিতত্ত্বের ভিত্তিভূমির সন্ধান করতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে ডারউইনের বিবর্তনবাদী নীতিতত্ত্বের মধ্যেই এর উৎস রয়েছে। ডারউইনের বিবর্ত তত্ত্বকে নঞর্থকভাবে বুঝলে মনে হয় স্বার্থপর প্রতিযোগিতাই কোনো প্রজাতির টিকে থাকার মুল কথা। কিন্তু যথেষ্ট হত্যা, বিশ্বাসঘাতকতা বা অন্যায় প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই কোনো প্রজাতিতে বা জনগোষ্ঠী টিকে থাকতে পারে না। ডারউইনের পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে আদিম মানুষের মধ্যে পরার্থপরতার উপাদানও বর্তমান ছিল। তিনি অভিভাবকসুলভ স্নেহ ও অনুভূতির কথা বলেছেন, যা অভিভাবকদের আত্মীয়-স্বজনের যত্ন নিতে, সন্তানদের বড় করে তুলতে সাহায্য করে। যদিও অনেকে এগুলিকে প্রবৃত্তি (instincts) হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন, তথাপি মানুষের ক্রমশঃ বিবর্তিত বিচারবুদ্ধি, স্মৃতি , কল্পনা ইত্যাদির সঙ্গে মিশে তা নীতিভাবনার জন্ম দিয়েছে বলে মনে হয়। লিওপোল্ড ডারউইনের এ ভাবনাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বলেন যে এক একজন ব্যক্তি পরস্পর নির্ভর অসংখ্য অংশ যুক্ত যে ভূমি সম্প্রদায় তার এক একজন সদস্য। প্রসঙ্গতঃ আরো উল্লেখ্য যে লিওপোল্ডে চার্লস এল্টন Charles Elton) কে অনুসরণ করে ‘সম্প্রদায়’-র ধারণাকে আরো বিস্তৃত করেন এবং মৃত্তিকা, জলরাশি, গাছপালা, প্রাণীকূল সব কিছুকে বাস্তুসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করেন।

যাই হোক, লিওপোল্ড যে সময় তাঁর ভূমিনীতিতত্ত্বের প্রচার করেছেন সেই সময় বাস্তুবিজ্ঞানীরা প্রকৃতিকে স্থায়ী সাম্যাবস্থার তন্ত্র হিসাবে বিচার করতেন। কিন্তু পরপবর্তীকালে বাস্তুতত্ত্বের গবেষণায় এই সত্য সামনে আসে যে প্রকৃতি সতত পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনশীল প্রকৃতির ধারণা ঈঙ্গিত করে যে প্রকৃতির মধ্যে কিছু পরিবর্তন একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ঘটে চলেছে। কোনো কোনো সমালচক তাই মন্তব্য করেছেন, সম্যাবস্থায় প্রকৃতির ধারণা পশ্চাদগমন লিওপোল্ডের ভূমিনীতিতত্ত্বকে অপ্রাসঙ্গিক করে দিয়েছে। তবে ক্যালিকট প্রমুখ ভাষ্যকারেরা মনে করেন, এই ধরনের বিচার যথার্থ নয়। তবে তারা মেনে নিয়েছেন বাস্তুবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক পট-পরিবর্তনের আলোক ভূমিনীতিতত্ত্বের কিছু সংশোধন প্রয়োজন হতে পারে। আজকের বাস্তুবিজ্ঞান বলেছে, প্রকৃতির সামান্য পরিবর্তন স্বাভাবিক। কিছু প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে যাবে, আবার কিছু প্রজাতির আর্বিভাব ঘটবে। কিন্তু কি মাত্রায় এবং কে সেই পরিবর্তন ঘটাচ্ছে সেটি এখানে মূল বিবেচ্য। পরিবর্তনশীল প্রকৃতির প্রবক্তরা প্রকৃতির উপর মনুষ্যকৃত পরিবর্তনের নৈতিকতা বিচারে যথোপযুক্ত মাত্রার মানদণ্ড মেনে নেন। কিন্তু প্রকৃতি পরিবর্তনশীল বলে যে কোনো পরিবর্তন যুক্তিযুক্ত হবে তা ভাবা মূর্খামি। প্রকৃতির শৃঙ্খলায় পরিবর্তনের নির্দিষ্ট কঠোর মাত্রা আছে। তাই সেখানে দ্রুততালে বিস্তৃত দৈনিক মাত্রায় পরিবর্তন সংগঠিত করা যথোচিত নয়। ক্যালিকটের মতে, সাম্প্রতিক প্রকৃতি ভাবনার নিরিখে লিওপোল্ডের সর্বাধিক উদ্ধৃত নীতি নির্দেশনাটিকে এইভাবে সংশোধন করা যেতে পারে : 'A things is right when it tends too disturb the biotic community only at normal, specila and temporal scales.It is wrong when it tends otherwise.'

৩.২ দ্বিতীয় অংশ ঃ গভীর বাস্তুবাদ (Deep Ecology)

৩.২.১ ভূমিকা ঃ

পরিবেশে-নীতিশাস্ত্রে দৃষ্টান্তস্থাপনকারী অল্‌ডো লিওপোল্ডের 'ভূমি-নীতিতত্ত্ব' প্রকাশিত হয় ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে, তার ঠিক ২৪ বছর পরে ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে আর্নে নেসের 'প্রাক্‌কথন'-এ উল্লিখিত প্রথম প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। লিওপোল্ডের সময়ে পরিবেশ-প্রকৃতিকে স্থায়ী সাম্যাবস্থারূপে বিচার করা হত। পরবর্তী পর্যায়ে স্থায়ী সাম্যাবস্থার প্রকৃতির ধারণার পশ্চাদ্‌গমন শুরু হয়, বাস্তু তত্ত্বের গবেষণায় পরিবর্তনশীল প্রকৃতির ধারণা সামনে আসে।

পরিবর্তনশীল প্রকৃতির ধারণার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সমকালীন পরিবেশ-দর্শনে যে তত্ত্বটি সামনে এসেছে তাই-ই গভীর বাস্তুতত্ত্ব বা নিবিড় বাস্তুবাদ (Deep Ecology)। এই গভীর বাস্তুবাদের মূল প্রবক্তা হলেন নরওয়ের অস্‌লো বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক আর্নে নেস। গভীর বাস্তুতত্ত্ব যদিও ভূমিনীতিতত্ত্বের মতোই এক সমগ্রতাবাদী পরিবেশ-দর্শনকে বোঝায়, যদিও এ বাস্তুতত্ত্বের কেন্দ্রীয় প্রবক্তা একজনই—আর্নে নেস তথাপি এর একটি মাত্র স্থির অর্থ আছে এরকম ভাবা ঠিক নয়। আর্নে নেসের বহুত্ত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গি, সমমনোভাবাপন্ন অন্যান্য পিছু দার্শনিক তথা পরিবেশবাদীদের চিন্তাভাবনার মধ্যে দিয়ে এর অর্থের ক্রমব্যাপ্তি ঘটে চলেছে। বিভিন্ন স্থানীয় ধর্ম, সংস্কৃতি দর্শন এই গভীর পরিবেশ-ভাবনায় নতুন নতুন মাত্রা যোগ করে চলেছে। গভীর বাস্তুবাদ পরিবেশ ভাবনায় (বিশেষ করে, পাশ্চাত্য পরিবেশে ভাবনায়) বহু যুগ ধরে-চলে-আসা প্রজাতিবাদী মানবকেন্দ্রিকতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতিতে যে আন্তঃভারসাম্য রয়েছে, যে পরস্পর নির্ভরতা রয়েছে, তার দিকে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। বস্তুত, গভীর বাস্তুবাদ মূলত দুটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে এগিয়ে গেছে : জীবমণ্ডলগত সমতাবাদের ধারণাকে উৎসাহিত করা এবং নীতিভাবনায় অন্যায় মানবকেন্দ্রিকতাবাদকে উৎপাটিত করা। যাই হোক, একটি বাস্তুতন্ত্রে পারস্পরিক নির্ভরতার যে চিত্র আমরা

পাই, যে সত্তাকুলের ধারণা পাই, তাকে সমগ্র প্রকৃতির ক্ষেত্রে প্রসারিত করলে আমরা বুঝতে পারব, এই বিশ্বব্যবস্থা মানুষ-প্রাণী-গাছপালা-পাহাড়-পর্বত-নদী, কথিত জড়বস্তু—এসব কিছুর ভারসাম্যের উপর নির্ভর করে। তবে গভীর বাস্তুবাদ যে সমগ্রতাবাদের কথা বলে তা নিছক অংশ মাত্রের সমষ্টি নয়, তার অতিরিক্ত। এই বাস্তু-সমাজের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা অংশগুলির বৈশিষ্ট্য ও তাদের সম্পর্কের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায় না। এই বাস্তুকেন্দ্রিক সমতাবাদ ও পারস্পরিকতার অধিবিদ্যার উপর গভীর বাস্তুবাদ দাঁড়িয়ে আছে।

বলা বাহুল্য, বাস্তুতত্ত্বের পূণর্জাগরণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নেস গভীর বাস্তুবাদের নতুন পরিবেশ-তত্ত্বের প্রবর্তন করেন। তাঁর যাত্রা শুরু হয় ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে 'The shallow and the Deep, long Range Ecology Movements' প্রবন্ধটির প্রকাশের মধ্য দিয়ে। এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধটি পরিবেশভাবনায় একদিক চিহ্ন হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। এই প্রবন্ধে অধ্যাপক নেস গভীর বাস্তুবাদকে অ-গভীর বাস্তুবাদ (Shallow Ecology) থেকে আলাদা করেন। তাঁর মতে, এ পর্যন্ত চলে-আসা- বাস্তুভাবনা মানুষের জন্য পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখা ও প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ চিন্তায় ব্যাপৃত থেকেছে। সমকালিন পরিবেশ-ধ্বংস তথা পরিবেশ-দূষণ উন্নত দেশের মানুষজনকে কিভাবে প্রভাবিত করছে এবং তার থেকে মুক্তির উপায় কি— এই মানবকেন্দ্রিক ভাবনার মধ্যেই ঘুরপাক খায় এই অগভীর বাস্তুবাদ। নেসের মতে, এই পরিবেশবাদের মধ্যে তেমন কোনো বিশেষ অন্তর্দৃষ্টি নেই। নতুন বাস্তুতাত্ত্বিক অনুসন্ধান এই অগভীর বাস্তুবাদে সীমাবদ্ধতাকে তুলে ধরে গভীর বাস্তুবাদের দিকে আমাদের এগিয়ে দিয়েছে. আমরা এখন ''The Shallow and the Deep, Long- Range Ecology Movements " প্রবন্ধটি ,অনুসরণ করে নেস প্রস্তাবিত সাতটি পরিবেশ-নীতির পর্যালোচনা করব। এই পর্যালোচনার মধ্য দিয়েই গভীর বাস্তুবাদের তাত্ত্বিক অবয়বটি ফুটে উঠবে।

৩.২.২ গভীর বাস্তুবাদী নীতিসমূহ (the principles of Deep Ecology) ঃ

(১) **'পরিবেশের কেন্দ্রে মানুষ'— এই সাবেকি ভাবনার বর্জন** (Rejection of 'man-in environment' image) ঃ গভীর বাস্তুবাদ বিশ্বপ্রকৃতির কেন্দ্রে মানুষ এই পরিবেশ-ভাবনাকে বর্জন করে পারস্পরিক সম্বন্ধমূলক সামগ্রিকতার ধারণা (relation, total field image) গ্রহণ করে। গভীর বাস্তুবাদ এই অন্তর্দৃষ্টিকে প্রকট করে যে এই প্রকৃতির প্রতিটি ব্যক্তিসত্তা স্বগতভাবে মূল্যবান এবং তারা অপরাপার সত্তার সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের সম্বন্ধে সম্পর্কিত। এই সম্পর্ক এক জটিল জালের মতো। এই সম্বন্ধকে নেস স্বতোবিধৃত সম্পর্ক (intrinsic relation) বলেছেন। তাঁর ব্যাখ্যা অনুসারে 'ক' এবং 'খ' এই দুই সত্তার সম্বন্ধ স্বতোবিধৃত বলা হবে যখন তাদের সম্পর্ক তাদের মৌলিক গঠনের মধ্যে এমনভাবে বিধৃত যে এই সম্পর্ক ব্যতিরেকে 'ক' এবং 'খ' রূপ সত্তার কথাই বলা না। স্পষ্টতই এই সমগ্রতাবাদী বিশ্বতত্ত্বে প্রচলিত প্রজাতিবাদী মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে অসার প্রতিপন্ন করে। একই সঙ্গে প্রকৃতিকে নিছক মানুষের প্রয়োজন সামগ্রী হিসাবে বিচার করার বিরোধিতা করে।

(২) **জীবমণ্ডলগত সমতাবাদ** (Biospherical egalitarianism) : গভীর বাস্তুবাদের নীতিতত্ত্ব পল টেলারের মতো জীব জগতের সমতায় বিশ্বাস করে। জীবকুলের প্রতিটি সদস্যের বাঁচা ও নিজের মতো করে বেড়ে ওঠার অধিকার আছে—এই সত্যকে বৈধতা দেয় গভীর বাস্তুবাদ। অধ্যাপক নেস অবশ্য জীবনের সংজ্ঞাকে জীববিজ্ঞানের গন্ডি ছাড়িয়ে তথাকথিত জড়জগৎ পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেছেন। একটি প্রবহমান স্রোতোস্বিনী, একটি ভূদৃশ্য, তুষারবৃত পর্বতশৃঙ্গও তাঁর দৃষ্টিতে প্রাণবান মনে হয়।

এই সমতাবাদের সমর্থনে গভীর বাস্তুবাদের বক্তব্য হল, মূল্যের স্রষ্টা বা দাতা মানুষ নয়। আবার তা অঙ্গ সংস্থানের আপেক্ষিক জটিলতার উপরেও নির্ভর করে না। প্রতিটি সত্তা স্বগতভাবে মূল্যবান। গভীর অনুভবে

ধরা পড়ে যে প্রকৃতি পরস্পর নির্ভর এক অখণ্ড সমগ্র। এখানে কেউ ছোটো, কেউ বড় নয়, কেউ রাজা কেউ প্রজা নয়— সকলেই সমান।

নেস অবশ্য সচেতন যে গভীর বাস্তুবাদে সমতাবাদী নীতি বাস্তবে মেনে চলা কঠিন। তাই তিনি 'নীতিগতভাবে' এই পদটি যোগ করেছেন অর্থাৎ তিনি 'biosphercial egalitarianism, in principal' -এর কথা বলেছেন। তিনি স্বীকার করেন যে কিছু ক্ষেত্রে প্রাণী-হত্যা, শোষণ ইত্যাদি অনিবার্য হয়ে উঠতে পারে। 'Ecology, Community and Lifestyle' গ্রন্থে নেস এই সমতাবাদের প্রকৃত অর্থ নিরূপণ করতে গিয়ে বলেন, এর সমতাবাদের অর্থ এই নয় যে মানুষের স্বার্থ কখনোই অগ্রাধিকার পাবে না। অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের কাছের মানুষজনকে বাঁচাতে প্রাণী-হত্যা, শোষণ ইত্যাদি অনিবার্য হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু আমাদের তুচ্ছ প্রয়োজনে প্রাণীর স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকার অধিকার লঙ্ঘন করা কখনো অনুমোদনযোগ্য হবে না।

(৩) **বৈচিত্র ও মিথোজীবিতা** (Diversty and Symbiosis) ঃ গভীর বাস্তুবাদ বৈচিত্র্যও মিথোজীবিতার নীতিতে বিশ্বাসী। এই গভীর বাস্তুভাবনায় ধরা পড়ে বৈচিত্র ও পারস্পারিকতা জীবন-সংগ্রামে টিকে থাকার সম্ভবনা বাড়ায়, প্রকৃতিতে প্রাণ-প্রাচুর্য ও নতুনত্বের সঞ্চার করে। তাই পারস্পরিক সহযোগিতা তথা সহ-অবস্থানই যথার্থ বাস্তুনীতি। 'হয় তুমি, নয়তো আমি'— এই নীতির পরিবর্তে গভীর বাস্তুবাদ 'বাঁচো এবং বাঁচতে দাও' এই নীতিতে আস্থাশীল। 'হয় তুমি, নয়তো আমি'— এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার নীতি প্রাণের বৈচিত্র্য কমিয়ে দেয়। পক্ষান্তরে, 'বাঁচো এবং বাঁচতে দাও' নীতি একদিকে যেমন প্রাণের বৈচিত্র ও সমৃদ্ধি আনে তেমনি প্রকৃতির ভারসাম্যকে রক্ষা করে।

(৪) **শ্রেণী ভাবনা-বিরোধী মনোভঙ্গি** (Anti-class Posture) ঃ বিজ্ঞানীসহ বেশ কিছু চিন্তাবিদ মনে করেন, জীবনের গুণগত মান বাড়াতে মনুষ্যেতর প্রাণীকুল ও জড়প্রকৃতিকে পদানত করে রাখা, তাদেরকে শোষণ করা আবশ্যিক। কিন্তু সমকালীন বাস্তুভাবনা আমাদের শিখিয়েছে যে মুখোমুখি সংঘর্ষের এই দৃষ্টিভঙ্গি, এরূপ শ্রেণীকরণ যথার্থ নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি একে অপরকে দূরে সরিয়ে দেয়। ফলে উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাদের আত্মোপলব্ধি ব্যাহত হয়।

(৫) **পরিবেশ দূষণ ও সম্পদ-ধ্বংসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম** (Fight against pollution and resource depetion) ঃ দূষণ-নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ সংরক্ষণের সংগ্রামে বাস্তুবাদীরা অনেক সমর্থন পেয়ে থাকেন। কিন্তু এইসব অত্যুৎসাহী পরিবেশবাদীরা তাদের মনোযোগ বিচ্ছিন্নভাবে দূষণ কমানো ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে কেন্দ্রিভূত রাখে, এবং বাস্তুকেন্দ্রিকতার অপরাপর নীতিগুলি সম্পর্কে উদাসীন থাকে। নেস এই দৃষ্টিভঙ্গিকে গভীর বাস্তুবাদ বলে চিহ্নিত করেছেন। এরা দূষণ কমানোর জন্য ব্যবস্থাগ্রহণের কথা বলেন, কিন্তু দূর ভবিষ্যতে তা কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে তার কথা ভাবতে আগ্রহী নয়। কিন্তু সত্যিকারের দায়িত্বশীল বাস্তুবাদী সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে সব কিছুকে বিচার করে অপরাপর নীতিগুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থেকেই।

(৬) **পারস্পরিক জটিলতা, দুর্বোধ্যতা নয়** (Complexity, but not complication)ঃ

বাস্তুবাদে দুর্বোধ্যতা (Complication) ও জটিলতা (Complexity)-র মধ্যে পার্থক্য করা হয়। অগণিত সত্তা বিভিন্ন সম্বন্ধে নির্ভর করে বেড়ে ওঠে এবং পারস্পরিক সম্পর্কগুলি এক জটিল জালের সৃষ্টি করে। আমরা যদি সামগ্রিক বাস্তুতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গিত বিষয়গুলি বুঝতে চেষ্টা করি, মনে রাখি 'বিপুলা এই পৃথিবীর কতটুকু জানি' তাহলে কোনো কিছুকেই দুর্বোধ্য মনে করে ছেঁটে ফেলতে ইচ্ছে করবে না।

(৭) আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য ও বিকেন্দ্রীকরণ (Local Autonomy and Decentralization) **ঃ**

একাধিক সত্তা স্থানীয়ভাবে এক-অপরের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এক একটি বাস্তুতন্ত্র গঠিত করে। সেই তন্ত্রের মধ্যেকার সত্তাগুলি স্থায়ীভাবে ঐক্যবদ্ধ সমগ্র হিসাবে গড়ে ওঠে। এখন, যদি স্বশাসনের মাধ্যমে সত্তাসমূহ নিজেদেরকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে পারে তাহলে বহির্প্রভাবের কবলে পড়ার সম্ভাবনা কমে, টিকে থাকার সম্ভাবনা বাড়ে। বাস্তুতন্ত্রের এই স্বাতন্ত্র্য তথা বিকেন্দ্রীকরণ গভীর বাস্তুবাদের আর একটি নীতি হিসাবে গণ্য হয়।

উপরে বর্ণিত বাস্তু-নীতিগুলি একত্রে নিবিড় বাস্তুবাদের একটি সুসংহত তাত্ত্বিক চেহারা দান করে। তবে অধ্যাপক নেসের আগ্রহ তত্ত্বরচনায় সীমাবদ্ধ নয়। তিনি এই ভাবধারায় বিশ্বব্যাপী এক পরিবেশ-আন্দোলনের সূচনা করেছেন। যাই হোক, ঐ সাতটি নীতি তথা কর্মসূচি অস্পষ্ট এক সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি (a vague global approach)-র পরিচায়ক। বাস্তবে প্রয়োগ করার সময় পরিস্থিতি অনুযায়ী সেগুলি সুস্পষ্ট করা, প্রয়োজনে পরিমার্জিত করা প্রয়োজন হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের মনে রাখতে হবে গভীর বাস্তুবাদের যে আন্দোলন তা কিন্তু আদর্শনিষ্ঠ (normative), এবং তাই এর মধ্যে মূল্য-প্রাথমিকতার (value priority) একটি ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট থাকবেই। তৃতীয়তঃ, নেস মনে করিয়ে দিয়েছেন বাস্তুবাদের এই তত্ত্ব ও নীতিগুলি আসলে বাস্তু-দর্শনমূলক (ecophilosophical), নিছক বাস্তুতত্ত্বের বিজ্ঞান (ecology) নয়। অধ্যাপক নেস গভীর বাস্তুবাদের প্রজ্ঞায় সমৃদ্ধ চেতনার আলোকে সকলকে সক্রিয় হতে বলেছেন এবং পরিবেশ আন্দোলনকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার কথা বলেছেন। এরজন্য তিনি অবশ্য সত্তাতত্ত্বের প্রশ্নে ও অধিবিদ্যক বিষয়ে কিছুটা উদার মনোভাব গ্রহণের পক্ষপাতী, বহুত্ববাদের পথে হাঁটতে রাজি।

আর্নে নেসের এই গভীর বাস্তুবাদ বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, বিশেষ করে আট ও নয়ের দশকে পরিবেশ চিন্তার জগতে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। অনেক চিন্তাবিদ তথা পরিবেশবাদীরা এই গভীর বাস্তুবাদের পরিবেশবাদকে সমর্থন করেন। একই সঙ্গে গভীর বাস্তুবাদ সম্বন্ধে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। বলা বাহুল্য, এসব স্বাভাবিক, কিন্তু এই পর্যায়ে উন্নয়নের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রশ্নে মতানৈক্যের সূচনা হয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে পরিবেশতাত্ত্বিক তথা পরিবেশবাদীদের আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রয়োজন অনুভূত হতে থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই আর্নে নেস তাঁর প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশের প্রায় তেরো বছর পরে ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে 'The Deep Ecological Movement : Some Philosophical Aspects' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। এই প্রবন্ধটি আমাদের সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত। আমরা এখন এই প্রবন্ধটি অনুকরণ করে গভীর বাস্তুবাদের আন্দোলনকে বোঝার চেষ্টা করব। নেস এখানে বাস্তুবাদের আন্দোলনের বক্তব্যকে পুনর্বিবৃত করেছেন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন।

৩.২.৩ গভীর বাস্তুবাদের আন্দোলন কি? (What is Deep Ecology Movement ?) ঃ

বলা বাহুল্য, গভীর বাস্তুবাদ শুধু একটি পরিবেশ-নীতিতত্ত্বই নয়, এ এক আন্দোলন, যাকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার আন্তরিক চেষ্টা করেছেন নেস এবং তাঁর সহযোগীরা। নেস অবশ্য গভীর বাস্তুবাদী আন্দোলনের কোনো সংজ্ঞা না দিয়ে এই প্রবন্ধে জর্জ সেশনকে সঙ্গে নিয়ে যে একগুচ্ছ পরিবেশ নীতির প্রস্তাব করেছেন, তার উল্লেখ করেছেন। এই নিয়মনীতিগুলি গভীর বাস্তুবাদের মর্মবস্তুকে তুলে ধরে। এগুলি এই উদ্দেশ্যে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যে সংখ্যাগুরু পরিবেশবাদীরা তথা তাত্ত্বিকেরা এগুলিকে মোটের উপর গ্রহণ করবেন। এই নীতিগুলিকে 'ডীপ ইকোলজি প্লাটফর্ম'-এর নীতিগুচ্ছ বলা হয়। এখানে মোট আটটি নীতির প্রস্তাব করা হয়েছে ঃ

১. এই পৃথিবীতে মানুষ ও মনুষ্যেতর প্রাণের নিজস্ব মূল্য আছে যাকে আমরা স্বস্থিত মূল্য (intrinsic value) বা স্বগতমূল্য (inherent value) বলি। এই মূল্য সকল মানুষের জন্য অ-মানব প্রকৃতির ব্যবহার-নিরপেক্ষ।

২. রকমারী প্রাণের প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য এইসব মূল্যের উপলব্ধিতে সহায়ক হয়। শুধু তাই নয়, এ গুলি স্বগতভাবেও মূল্যবান।

৩. প্রধান বা মৌলিক প্রয়োজন (vital need) ব্যতিরেকে এই প্রাচুর্য তথা বৈচিত্র্যকে নষ্ট করার কোনো অধিকার মানুষের নেই।

৪. মানুষের জনসংখ্যা বড় মাপের হ্রাসের সঙ্গে জীবনের গুণগত মানোন্নয়ন সঙ্গতিপূর্ণ। অ-মানব প্রাণীর স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্যও তা প্রয়োজন।

৫. মনুষ্যেতর জগতের উপর মানুষের হস্তক্ষেপ বর্তমানে মাত্রা ছাড়িয়েছে এবং এই পরিস্থিতি দ্রুততালে আরো খারাপের দিকে যাচ্ছে।

৬. (চিরাচরিত) কর্মনীতিকে তাই অবশ্যই বদলাতে হবে। এই বদল আমাদের অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত এবং মতাদর্শগত মৌলিক চিন্তাকাঠামোয় পরিবর্তন আনবে। পরিণামে পরিস্থিতি বর্তমানের থেকে গভীরভাবে স্বতন্ত্র হবে।

৭. মতাদর্শগত পরিবর্তন স্বগতমূল্যবান জীবনের গুণগত মানকে অনুধাবন করতে সাহায্য করবে এবং তা তথাকথিত ভোগের পরিমাণের ভাষায় বোধব্য জীবনের উচ্চমানের ধারণাকে পাল্টে দেবে।

৮. যারা উপরিলিখিত এই নীতিগুচ্ছকে স্বীকার করেন তাদের উপর একটা নৈতিক দায় বর্তায় যে তারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আবশ্যিক পরিবর্তনগুলি বাস্তবায়নের চেষ্টা করবে।

উপরিউক্ত নীতিগুলির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অধ্যাপক নেস বেশ কিছু মন্তব্য করেছেন। উপরের ক্রমিক সংখ্যা অনুসরণ করে আমরা সেগুলি লিপিবদ্ধ করব।

১. প্রথম নীতিটিতে 'প্রাণমণ্ডল' (biosphere)-এর উল্লেখ আছে, যাকে অন্যভাষায় 'বাস্তুমণ্ডল' (ecosphere)-ও বলা যেতে পারে। এই প্রাণমণ্ডল বা বাস্তুমণ্ডলে যাবতীয় প্রজাতি, বসতি (habitats), এবং মানবসংস্কৃতি এবং অ-মানবসংস্কৃতি অন্তর্ভুক্ত। সর্বব্যাপক এই যে গভীর পারস্পরিক সম্পর্কগুলি তা একটি মৌলিক ভাবনা তথা শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। এখানে যে 'প্রাণ' (life) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা জীববিজ্ঞানীরা যে অর্থে বোঝেন তার থেকে ব্যাপক অর্থে বুঝতে হবে। বিজ্ঞানীরা যাদেরকে অ-জীব (non-living) রূপে বিচার করেন (যেমন নদী, ভূদৃশ্য, বাস্তুতন্ত্র) তাদেরকেও গভীর বাস্তুবাদীরা প্রাণবান বিচার করেন। আর এখানে যে স্বস্থিত মূল্যের কথা বলা হয়েছে তা অপর কারোর বিচার-বিবেচনা, স্বার্থ বা প্রয়োজন-নিরপেক্ষ অর্থে বোধব্য।

২. তথাকথিত সরল নিম্নস্তরীয় তথা আদিম গাছপালা এবং প্রাণী-প্রজাতিগুলি জীবনের বৈচিত্র্যকে বাড়ায়, জীবনকে সমৃদ্ধ করে। তাদের নিজস্বমূল্য, অর্থাৎ স্বগতমূল্য আছে। তারা উচ্চতর বা অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান জীবন-পর্যায়ের দিকে উত্তরণের ধাপ মাত্র নয়। দ্বিতীয় এই নীতিটি ধরে নেয় যে জীবন যা বিবর্তন-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে উঠে আসে, তা নিজে নিজেই বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধি বাড়িয়ে নিয়ে এগিয়ে চলে।

৩. এখানে যে মৌলিক বা প্রাণদায়ী প্রয়োজন (vital need)-এর কথা বলা হয়েছে তা ঠিক কোন অর্থে বোধব্য হবে তা ইচ্ছে করে অস্পষ্ট রাখা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে আত্মরক্ষা তথা স্বচ্ছন্দে বেড়ে ওঠারও প্রয়োজনকে

অপরিহার্য বা মৌলিক প্রয়োজন বোঝা হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই বিশেষ পরিস্থিতি জলবায়ু এবং আনুষঙ্গিক কারণে, এমনকি সমাজের গঠনগত বা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কারণে এই ধারণার পরিবর্তন হতে পারে।

৪. বস্তুগতভাবে সবথেকে ধনী দেশের মানুষজন রাতারাতি অ-মানব প্রকৃতির প্রতি তাদের হস্তক্ষেপ কমিয়ে দেবে — এরকম ভাবনা যথার্থ নয়। তেমনি মনুষ্য-জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণও সময় সাপেক্ষ বিষয়। যদি ভাবি আরো শত শত বছর লাগবে এসব সমস্যাকে মোকাবিলা করতে তাহলে অন্তর্বর্তীকালীন কর্মপন্থা গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু কোনোভাবেই বর্তমান সমাজের এই দীর্ঘসূত্রিতা বা আত্মতুষ্টিকে সমর্থন করা যায় না। বর্তমান অবস্থার গভীরতাকে প্রথমে বুঝতে হবে; বুঝতে হবে আমরা যদি এখন কিছু না করে বসে থাকি তাহলে ভবিষ্যতে আরো ধরনের মূল্য আমাদের চোকাতে হবে।

৫. এখানে যে হস্তক্ষেপ না-করা (non-interference)-র কথা বলা হয়েছে তার মানে এই নয় যে মানুষ কোনো বাস্তুতন্ত্রেরই কোনোরূপ পরিবর্তন সাধন করবে না। অন্যান্য প্রজাতির মতো চিরদিন মানুষও এই পৃথিবীর অল্পবিস্তর পরিবর্তন করেছে এবং ভবিষ্যতেও তা করতে থাকবে। এখানে যেটা উদ্বেগের বিষয় তা হল এই ধরনের হস্তক্ষেপের ধরন এবং পরিধি (nature and extent)। মনুষ্যকৃত পরিবর্তনের মাত্রা এবং ব্যাপকতা এতই বেশি হয়, তা প্রকৃতিতে অন্যান্য যে পরিবর্তনগুলি ঘটে তার তুলনায় অনেক বেশি ব্যাপক ও মারাত্মক হতে পারে।

৬. এখন যেভাবে আমরা অর্থনৈতিক বিকাশকে বুঝি এবং শিল্পোন্নত দেশগুলি যেভাবে একে প্রয়োগ করে, তা দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের ধারাকে প্রতিফলিত করে না, যা উদ্বেগের বিষয়। সমকালীন চিন্তাধারা তথা মতাদর্শ সেইসব বিষয়কেই মূল্য দেয় যা দুষ্প্রাপ্য এবং যার পণ্য-মূল্য আছে। শুধু তাই নয়, যে ব্যক্তি যত বেশি পরিমাণে ভোগ করতে পারবে এবং যত সম্পদ নষ্ট করতে পারবে সমাজে তারই যেন মান-মর্যাদা বেশি! পক্ষান্তরে, 'আত্ম-নিয়ন্ত্রণ','স্থানীয় সম্প্রদায়' এবং 'সারা বিশ্বের কথা মাথায় রেখে বিচার কর এবং স্থানীয়ভাবে কাজ কর' — এইসব মূল স্লোগানগুলি আমাদের উদ্বুদ্ধ করে। তবে, উন্নত দেশগুলি যদিও পরিবেশ সমস্যা নিয়ে কম-বেশি সোচ্চার, সরকারগুলি গভীর বাস্তুতাত্ত্বিক সমস্যাগুলি নিয়ে তত বেশি চিন্তিত মনে হয় না। বুঝতে হবে সমস্যাটি সকলের, তাই সকলে মিলে কর্মতৎপর হতে হবে।

৭. কিছু কিছু অর্থনীতিবিদ্ 'জীবনের গুণগতমান ' (quality of life) -এর সমালোচনা করে বলেন এই ধারণাটি অস্পষ্ট। কিন্তু গভীর চিন্তনে ধরা পড়বে যে তারা যে বিষয়টিকে অস্পষ্ট বিবেচনা করছে তা আসলে ধারণাটির অ-পরিমাপযোগ্যতার বিষয়টি। জীবনের গুণগত মানকে সবসময় পরিমাণের ভাষায় বোঝা যায় না, এরজন্য গভীর অনুধ্যানের প্রয়োজন হয়। সুখে-দুঃখে, দারিদ্র্য-সম্পদে প্রতিবেশী সকলের সঙ্গে জীবনকে মিলিয়ে নিতে পারলে তবেই জীবনের প্রকৃত মান বাড়তে পারে।

৮. কে কীভাবে পরিবেশ-সংরক্ষণে উদ্যোগী হবে সে সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত থাকতে পারে। কোন্ কাজ আগে করতে হবে, কোন্টা পরে, কোন্টা জরুরী, এসব বিচার-বিমর্শ চলতেই থাকবে। কিন্তু এর মধ্যে সকলেরই কিছু না কিছু করার থাকবেই। গভীর বাস্তুবাদ এই বিষয়টি আমাদের মনে করিয়ে দেয়।

যাই হোক, গভীর বাস্তুবাদী আন্দোলনের এই আটটি নীতি সমর্থকদের কাছে খুবই কার্যকরী মনে হতে পারে। কিন্তু অনেকেই এগুলিকে অসম্পূর্ণ, এমনকি বিভ্রান্তিকর মনে করতে পারে। অনেকে আবার 'ডীপ' বিশেষণটি ব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। এ প্রসঙ্গে নেস আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন যে 'ডীপ ইকোলজি'

বা গভীর বাস্তুবাদ প্রচলিত অর্থে কোনো দর্শনতন্ত্র নয়, আবার একে একটি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম বা মতাদর্শও বলা যায় না। আসলে বিভিন্ন স্তর থেকে মানুষজন পরিবেশ-সমস্যার ভয়াবহতা সম্পর্কে প্রচারে অগ্রণী হয়েছেন এবং সরাসরি পথে নেমে কাজ করছেন। সেই সব লোকজনেরা একটি বন্ধুত্বের বলয় তৈরি করেছেন যাঁরা একই ধরনের জীবনযাপন-রীতি সমর্থন করছেন যাকে অন্যান্যরা 'সাধাসিধে' ভাবতে পারেন। কিন্তু তাঁদের কাছে এগুলি যথেষ্ট সমৃদ্ধ ও বাস্তুমূল্যযুক্ত। এইসব মানুষজনের ভাবনা-চিন্তাকে একটি সুতোয় বাঁধার চেষ্টা হয়েছে, যাকে আমরা 'ডীপ-ইকোলজি প্ল্যাটফর্ম' বলে থাকি। অন্যান্য অনেক মানুষজন পরিবেশ-সমস্যা সমাধানে কাজ করে চলেছেন। কিন্তু তাদের সকলের ভাবনা-চিন্তা বাস্তুতত্ত্বের গভীর উপলব্ধির দ্বারা প্রণোদিত নয়। এদের পরিবেশভাবনাকে নেস অ-গভীর বাস্তুভাবনা (shallow ecology) বলেছেন।

৩.২.৪ গভীর বনাম অ-গভীর বাস্তুবাদ (Deep versus Shallow Ecology) ঃ

নেসের মতে, পরিবেশ-বিতর্কে কয়েকটি কেন্দ্রীয় বিষয় তথা স্লোগানকে বিশ্লেষণ করলেই আমরা অ-গভীর বাস্তুবাদ এবং গভীর বাস্তুবাদী আন্দোলনের মধ্যে পার্থক্য অনুধাবন করতে পারব।

ক) দূষণ (Pollution) : অ-গভীর বাস্তুবাদী বিচার অনুসারে, উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে বায়ু-দূষণ, জল-দূষণ ইত্যাদিকে কমাতে হবে। আইন-কানুন করে দূষণে লাগাম পরাতে হবে। দূষণ-সৃষ্টিকারী শিল্প কারখানাকে উন্নয়নশীল দেশে সরিয়ে ফেলতে হবে।

অপরপক্ষে গভীর বাস্তুবাদ অনুসারে, দূষণকে সামগ্রিকভাবে প্রাণমণ্ডলের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করতে হবে। ধনী রাষ্ট্রগুলির মানুষের স্বাস্থ্যে এই দূষণের পরিণাম কি কেবল তার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা নয়, সামগ্রিকভাবে প্রাণমণ্ডলের স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে দূষণের বিষয়টিকে দেখতে হবে। প্রতিটি প্রজাতি তথা তন্ত্রে জীবন-শর্তের নিরিখে দূষণ নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপ নিতে হবে। অ্যাসিড বৃষ্টির মতো ঘটনা ঘটলে আমরা শুধু সেই ধরনের বৃক্ষ প্রজাতির সন্ধান করেই কার্য সমাধান করব না, যে বৃক্ষ উচ্চমানের অম্লতা সহ্য করতে পারে। গভীর বাস্তুবাদী বিচার সামগ্রিক বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে কোথায় কি পরিবর্তন ঘটছে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা প্রযুক্তি ব্যবহার এর জন্য দায়ী কিনা সে ব্যাপারে গবেষণা চালিয়ে যেতে হবে। অধিকন্তু, দূষণ এক দেশ থেকে অন্য দেশে রপ্তানি করা মানবতার বিরুদ্ধেই অপরাধ নয়, ইহা সাধারণভাবে জীবনের বিরুদ্ধে এক অপরাধ।

খ) সম্পদ (Resources) অ-গভীর দৃষ্টিতে প্রাকৃতিক সম্পদসমূহকে মানুষের জন্য, বিশেষ করে উন্নত দেশগুলির ধনীদের জন্য, সংরক্ষণের কথা ভাবা হয়। এই অ-গভীর ভাবনায় পৃথিবীর সম্পদ তাদেরই যাদের সেই সম্পদকে আহরণ করার মতো প্রযুক্তি আছে। প্রাকৃতিক সম্পদ বিনষ্ট হবে না এই বিশ্বাসে স্থিত অ-গভীর বাস্তুবাদীরা। তাঁরা মনে করেন, যখনই সেগুলি দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়বে তখনই তাদের উচ্চ বাজার-দর সেগুলিকে সংরক্ষণের পরিধির মধ্যে পৌঁছে দেবে। প্রয়োজনে প্রযুক্তির উন্নতি সাধন করে তার বিকল্প খোঁজার চেষ্টা করতে হবে। তাছাড়া, কোনো গাছপালা বা প্রাণী বা কোনো প্রাকৃতিক বস্তু মানুষের কোনো প্রয়োজনে না আসে বা তাদের ব্যবহার অজ্ঞাত হয় তাহলে সেসব জিনিস থাকল, কী ধ্বংস হল তাতে কিছু যায় আসে না!

বিপরীতে, গভীর বাস্তুবাদ যাবতীয় সম্পদ তথা বাসভূমি সামগ্রিকভাবে জীব-মণ্ডলের স্বার্থে রক্ষা করার চেষ্টা করে। কোনো প্রাকৃতিক বস্তুকে এখানে তাই মানুষের জন্য সম্পদ বা 'রিসোর্স' মাত্র হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ফলত, মানুষের উৎপাদন ব্যবস্থা তথা ভোগের বিভিন্ন ধরনের প্রকরণের মূল্যায়নের প্রসঙ্গ ওঠে। প্রশ্ন

ওঠে, উৎপাদন তথা ভোগের কোনো একপ্রকার বৃদ্ধি চূড়ান্ত মানবিক মূল্যের দিকে আমাদের কতটা এগিয়ে দেয়, কতদূর পর্যন্ত তা আমাদের মৌলিক তথা প্রাণদায়ী প্রয়োজনকে পূরণ করে। অর্থনৈতিক, আইনি এবং শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানগুলিকে এই সম্পদ-ধ্বংসকে প্রতিহত করার জন্য পরিবর্তন করা যেতে পারে। সম্পদ-ব্যবহার ভোগবাদী ব্যবস্থায় ভোগের এই পরিমাণের ভাষায় বোধব্য জীবনের ধারণাকে অতিক্রম করে কীভাবে জীবনের গুণগত মানের সূচনা করতে পারে তার দিকে মনোনিবেশ করে। গভীর বাস্তুবাদী দৃষ্টিতে জীবনের খণ্ড খণ্ড প্রকাশগুলিকে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে অখণ্ড বাস্তুকেন্দ্রিক দৃষ্টিতে বিচার করা হয়।

গ. জনসংখ্যা (Population) : অগভীর বাস্তুবাদী দৃষ্টিতে মনুষ্যজনসংখ্যার অস্বাভাবিক এই বৃদ্ধিকে উন্নয়নশীল দেশগুলির সমস্যা হিসাবে বিচার করা হয়। কোনো উন্নত দেশ বা কোনো বিশেষ সমাজ স্বল্পকালীন অর্থনৈতিক, সামরিক বা অন্য কোনো বিবেচনায় জনসংখ্যাবৃদ্ধিকে মেনে নিতে পারে। যে দেশের জনসংখ্যা কম অথচ প্রাকৃতিক সম্পদ অঢেল সে দেশের সরকার জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়টিকে সুবিধাজনক ভাবতে পারেন; আবার ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও বন্যবসতি ধ্বংসের মতো বিষয়কে অনিবার্য অমঙ্গল হিসাবে মেনে নিতে পারে, বন্যপ্রাণীর সংখ্যা অতিমাত্রায় হ্রাসকেও মেনে নিতে পারে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সংশ্লিষ্ট প্রজাতিটি একেবারে বিলুপ্তির পথে যাচ্ছে।

অপর পক্ষে, গভীর বাস্তুবাদ এই বিশ্বাসে স্থিত যে মনুষ্য জনসংখ্যার এই বিস্ফোরণ পৃথিবী গ্রহের প্রাণমণ্ডলের উপর অত্যধিক চাপ সৃষ্টি করেছে। তাই এই মনুষ্য- জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বিষয়টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। সংকীর্ণ, স্বল্পমেয়াদি দৃষ্টিতে নয়, এক সার্বিক বাস্তুতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে বিচার করতে হবে।

ঘ) সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং যথোপযুক্ত প্রযুক্তি (Cultural Diversity and Appropriate Technology):

অ-গভীর বাস্তুবাদী দৃষ্টিতে পাশ্চাত্য মডেলকে অনুসরণ করে শিল্পায়ন উন্নত দেশগুলির লক্ষ্য। পাশ্চাত্য প্রযুক্তির এই সার্বত্রিক গ্রহণ সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের পক্ষে যে সঙ্গতিপূর্ণ নাও হতে পারে সে বিষয়টিকে এখানে গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

অন্যদিকে, গভীর বাস্তুবাদী ভাবনায় পাশ্চাত্য মানদণ্ডের নিরিখে অ-শিল্প (non-industrial) সমাজের সংস্কৃতিকে কথিত শিল্পোন্নত সমাজের ভোগবাদী আক্রমণ থেকে রক্ষা করা কর্তব্য। পৃথিবীর বিভিন্নপ্রান্তে এমন অনেক পরিবেশ-অনুকূল সাদাসিধে জীবন-সংস্কৃতি বর্তমান আছে যাদেরকে শিল্পোন্নত সমাজের কথিত জীবনের ধারণা দিয়ে বোঝা যায় না। এগুলিকে রক্ষা করা দরকার। এর ফলে একদিকে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য রক্ষিত হবে, অন্যদিকে তেমনি জৈব বৈচিত্র্যও রক্ষিত হবে।

ঙ) ভূমি এবং সমুদ্র নীতি (Land and Sea Ethics) : অ-গভীর বাস্তুবাদীর চোখে অসংখ্য সুদৃশ্য ভূখণ্ড, অগণিত বাস্তুতন্ত্র, নদী, পাহাড় — এগুলি ধারণাগতভাবে আলাদা আলাদা। এগুলিকে বিভিন্ন ব্যক্তি, সংগঠন তথা অবস্থানের বৈশিষ্ট্য তথা সম্পদ হিসাবে বিচার করা হয়। বহুমুখী ব্যবহার (multiple use) এবং লাভ-লোকসান বিশ্লেষণ (cost-benefit analysis) এর ভাষায় এখানে সংরক্ষণের ব্যাপারটিকে বোঝা হয়। বন্য-প্রাণের সংরক্ষণের কথা বলা হয় ভবিষ্যৎ মনুষ্যপ্রজন্মের কথা মাথায় রেখে। মৃত্তিকা-ক্ষয়, জলের গুণগত মানের অবনতি ইত্যাদি বিষয়কে মানবীয় ক্ষতি হিসাবে দেখা হয়। প্রযুক্তিগত উন্নতির উপর এঁরা এতটাই আস্থাশীল যে আমাদের চিন্তাধারা তথা জীবনযাপন-রীতিতে কোনো বড় ধরনের পরিবর্তনের প্রয়োজনের

কথা তাদের বিবেচনায় আসে না। অন্যদিকে, গভীর বাস্তুবাদী অন্তর্দৃষ্টিতে ধরা পড়ে এই পৃথিবী কেবল মানুষের সম্পত্তি নয় — 'The earth does not belong to humans'। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নরওয়ের সুন্দর ভূখণ্ডগুলি নদী, গাছপালা বা প্রাণীকুল শুধু নরওয়েবাসী মানুষজনের নিজেদের সম্পত্তি নয়। তেমনি নর্থ সী-র নীচে যে তৈলভাণ্ডার আছে তা কোনো এক কালের বা এক দেশের মানুষের সম্পত্তি নয়। স্থানীয় প্রজাতিগুলি এর দ্বারা অধিক উপকৃত হয় সত্য, কিন্তু এই সবকিছুই সর্বকালের সকল প্রজাতির জন্য। গভীর বাস্তুবাদীরা কেবল প্রযুক্তির উন্নয়নের দ্বারাই সব পরিবেশগত সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে— এই আশাবাদে সন্দেহ প্রকাশ করে।

চ) শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক উদ্যোগ (Education and the Scientific Enterprise) : অ-গভীর বাস্তুবাদী বিচারে আমাদের অনেক অনেক বিশেষজ্ঞ (experts) গড়ে তুলতে হবে, যাঁরা পরিবেশের স্বাস্থ্য বজায় রেখে কীভাবে অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সে সম্বন্ধে উপদেশ দেবেন। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির শিক্ষাকে এমন উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে যাতে করে আমরা এই গ্রহকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারব, ঠিক ঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারব। পদার্থবিজ্ঞান তথা রসায়ন বিজ্ঞানের মতো তথাকথিত কঠোর বিজ্ঞান(hard science)-কে আরো উৎসাহিত করতে হবে।

অন্যদিকে, গভীর বাস্তুবাদী দৃষ্টিতে আমাদের সেই ধরনের শিক্ষায় গুরুত্ব দিতে হবে যা এই পৃথিবী বাস্তুব্যবস্থার প্রতি অধিক সংবেদনশীল করে তুলতে পারে। কঠোর বিজ্ঞানের সাধনা ছেড়ে আমাদের নরম বিজ্ঞান (soft science) -এর প্রতি মনোযোগ দিতে হবে, যা স্থানীয় এবং সার্বত্রিক উভয় ধরনের বাস্তুসংস্কৃতি তথা জীবন-সংস্কৃতির প্রতি গুরুত্ব দেবে। শিক্ষা এমন হওয়া চাই যা প্রাণমণ্ডলের প্রতি আমাদের সংবেদনশীল এবং শ্রদ্ধাশীল হতে শেখাবে।

৩.২.৫ গভীর বাস্তুবাদ কেন? (Why a 'Deep'Ecology?)ঃ

অ-গভীর বাস্তুবাদ এবং গভীর বাস্তুবাদের মধ্যে এই যে সিদ্ধান্তকারী পার্থক্য তা বাস্তবে আমাদের বিভিন্ন ধরণের অর্থনৈতিক তথা রাজনৈতিক কর্মনীতি সম্পর্কে যথোপযুক্ত ও গভীর প্রশ্ন উত্থাপন করতে প্রণোদিত করে। কোনো কিছুই আগে থেকে ধরে না নিয়ে আমাদের অবিরাম অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। মানবকেন্দ্রিক যুক্তিভাবনাকে গভীর বাস্তুবাদ বর্জন করার কথা বলেন। নিছক সংকীর্ণ মানবস্বার্থের দৃষ্টিতে পরিবেশ-সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে বিবেচনা করার অনেক বিপদ আছে। মানবকেন্দ্রিক যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কোন কর্মনীতি উপযুক্ত বাস্তুবিচারকে লঙ্ঘন করতে পারে। শুধু তাই নয়, মানবকেন্দ্রিক যুক্তিতর্ক প্রয়োজনীয় সামাজিক তথা জীবনশৈলীগত পরিবর্তনের উদ্যোগকে দুর্বল করে দেয়। তাছাড়া, এই ধরনের বিচারে বারবার মতবিরোধ উপস্থিত হয় যা সমস্যার কার্যকরী ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রক্রিয়াকে স্তিমিত করে দেয়। বাস্তুবাদ চায় এই মহান কর্মযজ্ঞে সকলেই গভীরভাবে অংশগ্রহণ করুক।

গভীর বাস্তুবাদ আন্দোলনের শরিক লেখকেরা প্রভাবশালী অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পিছনে লুকিয়ে থাকা পূর্বস্বীকৃতিগুলিকে খুঁজে বের করে মূল্য প্রাথমিকতার দর্শন ও ধর্মের ভাষায় সেগুলিকে বোঝার চেষ্টা করে। আমরা যে আট দফা প্ল্যাটফর্ম প্রিন্‌সিপ্‌ল-এর বিবরণ করেছি তা থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে সব কিছু বিষয়ে গভীর অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে।

প্রসঙ্গত, 'সমতাবাদ', 'মানবকেন্দ্রিকতাবাদ', 'মানবীয় স্বাজাত্যাভিমান' — এই ধরনের পরিভাষা তথা নীতির ভাষার গভীর বাস্তুবাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে বিশেষিত করার জন্য ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এইসব পরিভাষাগুলি

ভুল-বোঝাবুঝির কারণ হতে পারে। এগুলিকে আমরা এই অর্থে ব্যবহার করতে পারি যে বিশেষ কয়েকটি দিক থেকে মানুষ এই গ্রহের অন্যান্য প্রজাতির মতোই সাধারণ সদস্য (plain citizen)। তবে মানুষের কোনো বিশেষ ধরনের বা অসাধারণ বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করে না এই পরিভাষাগুলি। শুধু তাই নয়, মানুষের তার নিজের সদস্যদের প্রতি কোনো বিশেষ দায় নেই — এই ভাবনাও ঠিক নয়।

এখানে উল্লেখ্য যে গভীর বাস্তুবাদের সমর্থকদের মধ্যে কয়েকজন মাত্রই প্রথাগত অর্থে দার্শনিক। একই সঙ্গে এটাও সত্য যে এই গভীর বাস্তুবাদকে একটি দর্শনতন্ত্র হিসাবে সম্পূর্ণ করে ফেলাও সম্ভব নয়। তবে এর অর্থ এই নয় যে এই দার্শনিকরা যতদূর সম্ভব সুস্পষ্ট ভাষায় গভীর বাস্তুবাদকে তুলে ধরতে চাইবেন না। নেসের বিচারে এই বাস্তুবাদকে একটি নিঃসরণমূলক (অবরোহী) যুক্তিতন্ত্র (a derivational system) হিসাবে ব্যাখ্যা করতে পারলে এদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি ও সিদ্ধান্তের মধ্যেকার সম্পর্কগুলিকে সুস্পষ্ট করা যাবে।

৩.২.৬ নিঃসরণমূলক (অবরোহী) যুক্তিতন্ত্র হিসাবে গভীর বাস্তুবাদের ব্যাখ্যা (Deep Ecology illustrated as a Derivational System) ঃ

আমরা যে আটটি প্ল্যাটফর্ম প্রিন্সিপ্‌ল-এর কথা বলেছি তার মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে আরো মৌলিক কিছু অবস্থান ও নিয়মনীতি যেগুলি সাধারণত দার্শনিকতন্ত্রে এবং বিভিন্ন ধর্মে আমরা দেখতে পাই। আমরা গভীর বাস্তুবাদী আন্দোলনের মধ্যে যেসব বিষয় আছে সেগুলিকে আমরা নিম্নোক্ত 'অ্যাপ্রণ ডায়াগ্রাম'-এর মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি।

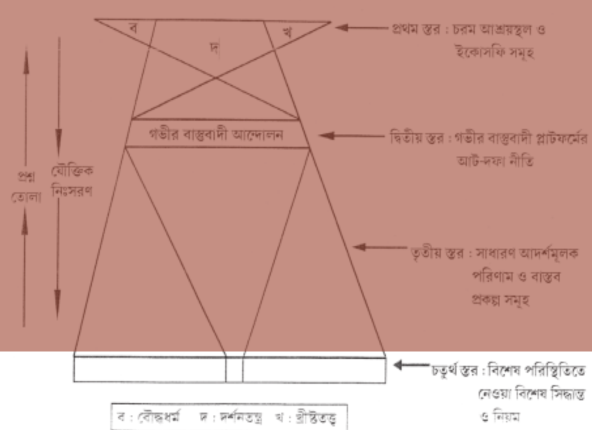

এই ডায়াগ্রামের সর্বোচ্চ স্তরে আছে, চূড়ান্ত আশ্রয়স্থল বা চরম যুক্তিবাক্য (এখানে বৌদ্ধধর্ম, হিন্দুধর্ম বা স্পিনোজার দর্শন—এরূপ ভাবতে পারি)। তার ঠিক নীচের দ্বিতীয় স্তরে গভীর বাস্তুবাদ প্ল্যাটফর্মের আটটি নিয়মনীতি স্থান পেয়েছে। তৃতীয় স্তরে সাধারণ আদর্শগত পরিণাম তথা ঘটনাগত প্রকল্পগুলি স্থান পায়। সব শেষে চতুর্থ স্তরে বিশেষ পরিস্থিতির তথা প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে কর্তব্য সম্বন্ধে বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপার থাকে।

এখানে যে যুক্তিতন্ত্রের কল্পনা করা হয়েছে সেখানে আমরা চূড়ান্ত স্তরে এসে থামি। যখন আমরা দার্শনিকীকরণ করার চেষ্টা করি তখন আমরা বিভিন্ন অবস্থানে পৌঁছাই। কিন্তু আমরা যেসব যুক্তিবাক্যগুলি ব্যবহার করি সেগুলি আমাদের কাছে চূড়ান্ত। এই চূড়ান্ত আশ্রয়বাক্যগুলি ডায়াগ্রামের প্রথম স্তরে স্থান পায়। যেমন কেউ 'প্রতিটি জীবনের স্বস্থিত মূল্য আছে' এই বচনটিকে চূড়ান্ত আশ্রয়বাক্য হিসাবে ব্যবহার করতে পারে এবং সেটিকে প্রথম স্তরে স্থাপন করতে পারে। এই স্তরে বিভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করতে পারে। কেউ হিন্দু ধর্মের বাস্তু-অধ্যাত্মবাদের স্থিত হতে পারে, কেউ বা জৈন প্রকৃতি-দর্শনের আশ্রয় নিতে পারে। এর ফলে ভিন্ন ভিন্ন 'ইকোসফি'-র সূচনা হতে পারে। কিন্তু আমরা যে অবস্থান থেকেই চরম আশ্রয়বাক্যের সন্ধান করি না কেন, দ্বিতীয় স্তরে আমরা সকলে কমবেশি একমত হতে পারি। বক্তব্য এই যে আমরা ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম, সংস্কৃতি বা দর্শনে স্থিত হয়েও প্রকৃতিকে রক্ষা করার মহান ব্রতে নিজেদেরকে আত্মনিয়োগ করতে পারি। তৃতীয় স্তরে আমরা সাধারণ কর্মনীতি নিঃসরণ করতে পারি, যার মধ্যে আমরা সাধারণভাবে পরিবেশ-ধ্বংসের পরিণামসমূহ এবং তার প্রতিকারে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারি। সর্বনিম্ন চতুর্থ স্তরে নির্দিষ্ট পরিবেশ পরিস্থিতি অনুসারে কর্মনীতি গ্রহণের কথা থাকবে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, গভীর বাস্তুবাদের নীতিগুলি বিভিন্ন উৎস থেকে আহৃত হতে পারে। গভীর বাস্তুবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত তাঁদের কেউ কেউ খ্রীস্টতত্ত্বের মধ্যে, কেউ বা বৌদ্ধদর্শনে কেউ বা তাওবাদের মধ্যে এই বাস্তুতাত্ত্বিক নিয়মনীতিগুলির সন্ধান করেছেন। বলা বাহুল্য, নেসের এই বহুত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গি গভীর বাস্তুবাদী আন্দোলনের বিকাশে সহায়ক হয়েছে।

৩.২.৭ নেসের 'ইকোসফি - T':

প্রথমেই বলে রাখা ভালো যে নেস তাঁর প্রিয় শৈলবাস Tvergastein-এ অবস্থিত এক কেবিনের নামে তাঁর বাস্তুদর্শনকে চিহ্নিত করেছেন, নাম দিয়েছেন 'ইকোসফি - T'। নরওয়ের দুই শহর — বার্গেন ও অসলোর মধ্যিখানে একটি পর্বতমালা হল Tvergastein। এই পর্বতমালার উচ্চ চূড়ায় একটি ছোট কেবিনে নেস তাঁর জীবনের অনেকখানি সময় অতিবাহিত করেছেন। এই কেবিনের জানালা-দরজা দিয়েই তিনি প্রকৃতিকে একবারে কাছ থেকে দেখেছেন, অনুভব করেছেন। বৈচিত্র্যময় প্রকৃতিকে দেখতে দেখতেই তাঁর অন্তরে গভীর বাস্তুতাত্ত্বিক উপলব্ধির জন্ম হয়েছে। একে স্মরণীয় করে রাখতেই তিনি নিজের বাস্তুদর্শনের এরকম নামকরণ করেছেন। একই সঙ্গে এটাও বুঝিয়ে দিয়েছেন যে প্রত্যেকের স্বতন্ত্র বাস্তুদর্শন থাকতে পারে। তিনি লিখছেন, "You are not expected to agree with all of its (Deep Ecology's) value and paths of derivation, but to learn the means for developing your own systems or guides, say ecosophies X, Y, or Z. Saying 'your own' does not imply that the ecosophy is in anyway an original creation by yourself. It is enough that it is a kind of total view which you feel at home with, 'where you philosophically belong'." (Ecology, Community and Life-style, p.37) অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের নিজের অনুভব ও ঐতিহ্যের মধ্য থেকে নিজের বাস্তুদর্শনকে খুঁজে নিতে পারেন। মূল কথা হল, বাস্তুতাত্ত্বিক আত্মোপলব্ধি, যা সবচেয়ে খাঁটি ও গভীর দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। এই উপলব্ধিই পরিবেশ-সংরক্ষণে আত্ম-নিয়োগ করতে আমাদের প্রণোদিত করে। নেস তাঁর Ecosophy-T কে নিম্নোক্ত কয়েকটি থিম-এ বিবৃত করেন ঃ

ক) সংকীর্ণ ব্যক্তি-আত্মার বিপরীতে ব্যাপক বাস্তু-আত্মা (The Comprehensive Ecological Self as against narrow ego self)

খ) গভীর আত্মোপলব্ধি এই ব্যাপক বাস্তু-আত্মার উপলব্ধির অন্য নাম (Self realization as the realization of the Comprehensive Self)

গ) একাত্মীকরণ প্রক্রিয়ায় নিজেকে ক্রমশ বাড়িয়ে তোলার মৌলিক উপকরণ এবং এর মধ্য দিয়েই আমাদের পরিপক্কতা আসে (The process of identification as the basic tool of widening the self and a natural consequence of increased maturity)

ঘ) বৈচিত্র্যময় সমগ্র প্রকৃতির সঙ্গে জোরালো একাত্মতাই গভীর বাস্তুবাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণের প্রেরণা বা উৎস (Strong identification with the whole of nature in its diversity and interdependence of parts as a source of active participation in the deep ecological movement)

ঙ) একাত্মতাই স্বস্থিত মূল্যের বিশ্বাসের সূত্র (Identification as a source of belief in intrinsic values)

তবে নেসের মতে, এই (Ecosophy - T) এর চরম আদর্শকে আমরা একটিমাত্র সূত্রে গ্রথিত করতে পারি : আত্মোপলব্ধি! (Self realizations!) এই কথাটিকে নেস সংকীর্ণ অহমের ব্যক্তিগত অর্থে বোঝাননি। ভারতীয় দর্শনে যে পরমাত্মা-জীবাত্মার ধারণা আছে নেস তাঁর উল্লেখ করে পরমাত্মার উপলব্ধির কথা বলেছেন। এই সর্বব্যাপক আত্মা 'ছোট আমি' সহ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবপ্রাণকে অন্তর্ভুক্ত করে। এই চরম আদর্শকে বোঝাতে গিয়ে নেস নিম্নোক্তরূপ স্লোগান ব্যবহার করেছেন :

'Maximize Self realization!'

'Maximize Sysbiosis!'

'Maximize Diversity!'

যাই হোক, নেস তাঁর চিন্তার ধরন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে নিম্নোক্তরূপ কয়েকটি মন্তব্য করেছেন যা তাঁর বাস্তুদর্শনকে বুঝতে সাহায্য করে :

প্রথমত, তিনি বৈচিত্র্যের চূড়ান্ত উপলব্ধির প্রস্তাব করেছেন, প্রজাতি বা প্রাণমণ্ডলের নিছক বৈচিত্র্যকে বোঝেননি। দ্বিতীয়ত, তিনি কান্টের 'beautiful actions' এর প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেন, শুধু কর্তব্য বা দায়িত্বের বোধ থেকে কাজ করার তুলনায় বাস্তুতাত্ত্বিক উপলব্ধিতে স্থিত হয়ে কাজ করা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কেবল কর্তব্যনিষ্ঠ পরার্থবাদের নিরিখে বিচার না করে বিশ্বাত্মাকে ক্রমোপলব্ধির প্রক্রিয়ায় বোঝা অনেক বেশি অর্থবহ। তৃতীয়ত, তিনি যে বহুমুখী উচ্চস্তরের আত্মোপলব্ধিতে বিশ্বাস করেন তা 'simple in means but rich in ends' এই জীবনবোধের দ্বারা অর্জিত হয়।

৩.৩ সারসংক্ষেপ :

এই পাঠ এককের দুটি অংশে আমরা প্রথমে অল্‌ডো লিওপোল্ডের 'ভূমি নীতিতত্ত্ব' এবং পরের অংশে আর্নে নেসের গভীর বাস্তুবাদের বিস্তারিত আলোচনা করেছি। বাস্তুতান্ত্রিকতাবাদের এই দুই নীতিতত্ত্ব সমকালীন পরিবেশচিন্তার জগতে গভীর প্রভাব বিস্তার করছে। এই দুই পরিবেশবাদ সাবেকি মানবকেন্দ্রিক স্বাজাত্যাভিমানের সংকীর্ণতাকে কাটিয়ে উঠে যথার্থ পরিবেশদর্শনের দিকে আমাদের এগিয়ে দিয়েছে। এর সমদর্শিতাবাদ ও সমগ্রতাবাদ আমাদের আকর্ষণ করে, যদিও তা অনেক ক্ষেত্রে ভুল বোঝাবুঝির কারণ হতে পারে। এসব বিষয়ে সচেতন থেকেই আমাদের পরিবেশ আন্দোলনকে চলমান রাখতে হবে।

৩.৪ নমুনা প্রশ্নাবলী :

1. What is an ecocentric environmental theory ? Discuss in this connection the main tenets of Land Ethic.
2. What is Land Ethic? Critically examine Leopold's Land Ethic in view of the paradigm shiFt form the notion of nature as 'static equilibrium' to the concept of nature as 'flux'.
3. What is Deep Ecology? How does Naess distinguish it from shallow ecology?
4. State and explain the basic principles of Deep Ecology. Do you support all these principles? Give a reasoned answer.
5. What is Deep Ecology Movement? State and explain in this context the principles of Deep Ecology Platform.
6. What are the basic tenets of Deep Ecology? How does Naess demonstrate the necessity of Deep Ecology?
7. Explain Deep Ecology as a derivational system. What are its implications?
8. How would you distinguish between Deep Ecology and Ecosophy T? Discuss in this connection the main themes of Naess's Ecosophy T.
9. Write notes on the following :
   a) Leopold's Community concept
   b) The Ecological conscience
   c) The Land Pyramid
   d) Man-in-environment image
   e) Biospherical Egalitarianism
   f) Diversity and symbiosis
   g) The Apron Diagram
   h) Self-Realization

৩.৫ গ্রন্থনির্দেশ :

সিলেবাস-নির্দিষ্ট তিনটি প্রবন্ধ অবশ্য পাঠ্য। এর অতিরিক্ত নিম্নোক্ত প্রবন্ধ / পুস্তক সহায়ক পাঠ হিসাবে কাজ করবে :

1. J. Baird Callicotlt : 'The Conceptual Foundations of the Land Ethic', Environmental Philosophy : From Animal Rights to Radical Ecology(eds Michael E. Zimmerman et al), Prentice Hall, New Jersey, 1993.
2. Arne Naess : 'Simple in Means, Rich in Ends', Environmental Philosophy, প্রাগুক্ত।
3. Arne Naess : Ecology, Community and Life-style, Cambridge University Press, Cambridge, 1989.

পাঠ একক -৪

বাস্তুনারীবাদ (Eco-feminism)

বিষয়সূচী

৪.০ উদ্দেশ্য

৪.১ ভূমিকা

৪.২ বাস্তুনারীবাদের মূল বক্তব্য

৪.৩ নারী ও প্রকৃতির মধ্যেকার যোগসূত্রসমূহ

৪.৪ বাস্তুনারীবাদের কয়েকজন বিশিষ্ট প্রবক্তার বক্তব্য

৪.৫ কারেণ জে. ওয়ারেনের অভিমত

৪.৬ বাস্তুনারীবাদ নারীবাদের পুনর্মূল্যায়ন করে

৪.৭ বাস্তুনারীবাদ থেকে পরিবেশ-নীতিশাস্ত্রের উত্তরণ

৪.৮ বাস্তুনারীবাদ একাধারে নারীবাদী ও পরিবেশ সম্পর্কিত নীতিতত্ত্ব

৪.৯ বাস্তুনারীবাদের পর্যালোচনা

৪.১০ সারসংক্ষেপ

৪.১১ নমুনা প্রশ্নাবলী

৪.১২ গ্রন্থ নির্দেশ

পাঠ একক - ৪

বাস্তুনারীবাদ (Eco-feminism)

৪.০ উদ্দেশ্য :

এই পাঠ এককে আমরা পরিবেশ-নীতিশাস্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নারীবাদের পর্যালোচনা করবো, অর্থাৎ বাস্তুনারীবাদের সবিচার বিবরণ করব।

৪.১ ভূমিকা :

সমকালীন পরিবেশনীতিতত্ত্ব মানবকেন্দ্রিকতাবাদ (anthropocentricity) -কে অতিক্রম করে বাস্তুকেন্দ্রিকতাবাদের দিকে আমাদের নিয়ে যায়। প্রজাতিবাদী এই মানবকেন্দ্রিকতাবাদের নির্মূলন সমকালীন পরিবেশ-বাদের অন্যতম প্রধান বিষয় হিসাবে সামনে এসেছে। কিন্তু নারীবাদী পরিবেশ-তাত্ত্বিকদের বিচারে, মানবকেন্দ্রিকতাবাদের সঙ্গে আর একটি উপাদান — পুরুষকেন্দ্রিকতা (androcentricity) - কে একইসঙ্গে নির্মূল করতে না পারলে পরিবেশ-আন্দোলন সার্থক হবে না। নারীবাদের এই অন্তর্দৃষ্টি পরিবেশ-দর্শনে যে নতুন মাত্রা যোগ করেছে তাই-ই বাস্তুনারীবাদ (Ecofeminism) নামে পরিচিত। বাস্তুনারীবাদ অনুসারে, প্রকৃতির ওপর মানুষের শোষণ-নিপীড়ন আর নারীর ওপর পুরুষের শোষণ-নিপীড়ন — এই দুইয়ের পিছনে একই ধরনের পুরুষতান্ত্রিক অবদমন-প্রভুত্বের মতাদর্শ কাজ করছে। একই সঙ্গে বাস্তুনারীবাদ মনে করে, নির্দিষ্ট জীবতাত্ত্বিক ও সামাজিক ভূমিকার দৌলতে নারীর মধ্যে প্রকৃতির এক সহজাত আগ্রহ (concern) আছে, যা পরিবেশ সংরক্ষণে সহায়ক। পুরুষকেন্দ্রিক প্রভুত্বকামিতা নির্মূল করে আমরা যদি প্রকৃতির প্রতি নারীসুলভ এই সমব্যথাকে জাগরিত করতে পারি তাহলে বাস্তু-আন্দোলন প্রকৃত সার্থকতা লাভ করবে।

৪.২ বাস্তুনারীবাদের মূল বক্তব্য :

বাস্তুনারীবাদ হল সেই তাত্ত্বিক অবস্থান যেখানে মনে করা হয় নারীর ওপর পুরুষের প্রভুত্ব এবং প্রকৃতির উপর মানুষের প্রভুত্ব — এই দুই এর মধ্যে ঐতিহাসিক ধারণাগত, সাংকেতিক, পদ্ধতিগত এবং রাজনৈতিক ইত্যাদি বিভিন্ন দিক থেকে যোগসূত্র আছে। এই যোগসূত্রের কারণেই একটিকে বুঝতে গেলে অন্যটিকে বোঝা জরুরী। আমাদের বুঝতে হবে যে সমাজব্যবস্থায় সম্পর্কের মৌলিক ধরনটি অবদমন ও প্রভুত্বের সেখানে নারীমুক্তি বা বাস্তুতাত্ত্বিক সংকট — কোনোটিরই সুরাহা সম্ভব নয়। নারী তথা প্রকৃতি যেহেতু এক সাধারণ পুরুষকেন্দ্রিক অবদমন তথা প্রভুত্বকামিতার মতাদর্শের শিকার তাই এই মতাদর্শকে উৎপাটিত করতে না পারলে পরিবেশ-আন্দোলন সার্থক হতে পারে না।

নারীবাদ (Feminism) ও বাস্তুবাদ (Ecology) পরস্পর-সম্পর্কিত এবং এই দুই চিন্তাধারার সাধারণ লক্ষ্য হল পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে যে প্রভুত্বকামিতার মতাদর্শ, যে চিন্তাকাঠামো রয়েছে তাকে অতিক্রম করে এমন এক বিশ্ববীক্ষা তথা আচরণবিধির সূচনা করা যার মধ্যে অবদমনের কোনো উপাদান থাকবে না। এই ভাবনা থেকেই বাস্তু নারীবাদের জন্ম। বাস্তুনারীবাদ নারীবাদী এই কারণে যে এই ক্রিয়াত্মক মতাদর্শ যা যেখানে যেখানে পুরুষলিঙ্গ-প্রেক্ষিত আছে সে সকল ক্ষেত্রকে বুঝতে ও তাকে কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে। অন্য দিকে,

বাস্তুনারীবাদ বাস্তবাদী এই কারণে যে ইহা প্রকৃতির বাস্তুতন্ত্র-সমূহের সংরক্ষণের আবশ্যিকতাকে বুঝতে সাহায্য করে। কোনো কোনো চিন্তাবিদের মতে, বাস্তুনারীবাদ পরিবেশবাদের মধ্যে সেই ধারা যা বিশেষভাবে পুরুষকেন্দ্রিক অবদমনের যুক্তি কাঠামোকে সামনে আনতে চায়।

৪.৩ নারী ও প্রকৃতির মধ্যেকার যোগসূত্রসমূহ (Women - Nature Connections) ঃ

কারেণ জে. ওয়ারেণের মতে, নারী এবং প্রকৃতির মধ্যে অন্ততঃ আটপ্রকার যোগসূত্র বা সাদৃশ্যের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এই সাদৃশ্যসূত্রগুলি কখনও পরস্পরের পরিপূরক, কখনো বা পরস্পর বিরোধী। এই সাদৃশ্যসূত্রগুলিকে সম্যক্ অনুধাবন করতে না পারলে বাস্তুনারীবাদের মমার্থ বোঝা যায় না। তাই আমরা প্রথমেই এই সম্পর্ক সূত্রগুলির বিবরণ করব।

১. **ঐতিহাসিক সম্পর্কসূত্র (historical connection)** ঃ নারী ও প্রকৃতির মধ্যে একটি যোগসূত্র হল ঐতিহাসিক। এই সম্পর্কসূত্রটি কার্যকারণধর্মী। কার্যকারণধর্মী এই ঐতিহাসিক সম্পর্কসূত্রটি বাস্তুনারীবাদী রচনায় এত ব্যাপকমাত্রায় আলোচিত যে কোনো কোনো তাত্ত্বিক বাস্তুনারীবাদকে কেবল এই সম্পর্কসূত্রের ভাষাতেই ব্যাখ্যা করে থাকেন। অ্যারিয়েল কে শালে-এর মতে, বাস্তুনারীবাদ হল নারীবাদী চিন্তার সাম্প্রতিক প্রকাশ যেখানে দাবী করা হয় যে আজকের বিশ্বব্যাপী যে পরিবেশ সমস্যা তা পূর্বাভাসযোগ্য। এই ঐতিহাসিক সম্পর্কসূত্রের সন্ধান করতে গিয়ে কোনো কোনো বাস্তুনারীবাদী আনুমানিক চার হাজার পাঁচ শত বছর পূর্বেকার ইউরেশিয়া থেকে আগত যাযাবর উপজাতির দ্বারা ইন্দো-ইউরোপীয় সমাজের আক্রমনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন এবং মন্তব্য করেছেন যে তখন থেকেই এক বিশেষ ধরণের প্রভূত্বকামিতাজাত অবদমনের সূত্রপাত ঘটেছে। এই আক্রমণের আগে পর্যন্ত ইন্দো-ইউরোপীয় সমাজ ছিল মূলত মাতৃতান্ত্রিক এবং কৃষিনির্ভর। কোনো কোনো চিন্তাবিদ আবার ধ্রুপদী গ্রিক-দর্শনের দ্বৈতবাদ এবং যুক্তিবক্তার ধারণার প্রতি অঙুলি নির্দেশ করেছেন। অর্থাৎ এঁদের মতে, প্রাচীন গ্রীকদর্শনের যে যুক্তিবাদিতা এবং দ্বৈতবাদ তার মধ্যেই নারী ও প্রকৃতির মধ্যে সম্পর্কের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। অন্য দিকে, ক্যারেলিন মার্চেন্ট প্রমুখ নারীবাদী ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি জগতে যেসব বৈপ্লবিক পরিবর্তন সংগঠিত হয় তার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন যে এই সময়কালে বিজ্ঞান-ভাবনার মধ্যে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সংঘঠিত হয় তার থেকেই নারী ও প্রকৃতির ওপর প্রভুত্বের সূত্রপাত ঘটেছে। এই সময় থেকেই মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে পুরনো সহযোগিতার সম্পর্কের পরিবর্তে রূপান্তরবাদী যান্ত্রিক বিজ্ঞান-দর্শনের সূচনা হয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে এই বিজ্ঞান-দর্শনই প্রকৃতির যথেচ্ছ শোষণকে ক্রমশঃ বৈধতা দান করেছে। নারীর অধীনতার সূত্রপাতও সেই সময় থেকেই।

২. **ধারণাগত যোগসূত্র (conceptual connection)** ঃ অনেক চিন্তাবিদ এই মর্মে যুক্তি দিয়েছেন যে নারীর ওপর প্রভূত্ব এবং প্রকৃতির ওপর প্রভুত্বের যে ঐতিহাসিক তথা কার্যকারণগত যোগসূত্র তা শেষ পর্যন্ত অবদমনের ধারণাগত কাঠামোর ওপর ভিত্তিশীল রয়েছে। এই ধারণাগত পরিকাঠামোর মধ্যে পুরুষসুলভ চিন্তাভাবনা তথা পুরুষতন্ত্রের উপাদান রয়েছে। কারেণ জে. ওয়ারেণের মতে যোগসূত্রের তিন ধরনের বিবরণ পাওয়া যায় ঃ

(ক) প্রথম ব্যাখ্যানুসারে নারী ও প্রকৃতির ওপর অবদমনের ধারণাগত ভিত্তি রয়েছে মূল্য-দ্বৈতবাদ (value dualism) এবং মূল্যের উচ্চনীচ বিন্যাস (value hierarchy) -এর মধ্যে। মূল্যদ্বৈতবাদ হল এক একটি বৈকল্পিক

ধারণাযুগল যার একটিকে অন্যটির বিরোধী এবং সম্পূর্ণ বহির্ভুত হিসাবে দেখা হয়। যেমন, যুক্তি-আবেগ, দেহ-মন , স্ত্রী-পুরুষ ইত্যাদি ধারণাযুগল। এগুলির একটিকে অন্যটির সম্পূর্ণ বিপরীত হিসাবে দেখা হয় এবং এদের মধ্যে কোনরূপ অন্তর্ভুক্তির সম্পর্ক স্বীকার করা হয় না। তার মূল্যের উচ্চনীচ-বিন্যাস বলতে মর্যাদা, সম্মান গুরুত্ব ইত্যাদি সূচক উচ্চ-নীচ বিন্যাসকে বোঝায়। এই ভাবনা অনুসারে ঐতিহাসিকভাবে যা কিছু দেহ, আবেগ, প্রকৃতি ও নারীর সঙ্গে সম্পর্কিত তাদেরকে নিম্নস্তরের বিবেচনা করা হয়। বিপরীতে, যা কিছু মন, যুক্তিবুদ্ধি, সংস্কৃতি, পুরুষ ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্কিত তাদেরকে উচ্চ মানের বিবেচনা করা হয়।

(খ) দ্বিতীয় ব্যাখ্যা প্রথমোক্ত মূল্যদ্বৈতবাদ এবং মূল্যের উচ্চনীচ-বিন্যাস সম্পর্কিত বিষয়টিকে আরো বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে, এক সার্বিক নিপীড়নগত পরিকাঠামোর মধ্যে কেবল বিচার করে, যে ধারনাগত পরিকাঠামো লিঙ্গবাদ, বর্ণবৈষম্যবাদ, শ্রেণীবাদ তথা প্রকৃতিবাদ - যাবতীয় অবদমনমূলক মতবাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এই ধারণাগত পরিকাঠামো আসলে সামাজিকভাবে নির্মিত কতকগুলি মৌলিক বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি, যার মধ্য দিয়ে আমরা নিজেকে এবং অপরকে দেখি। এই ধারণাগত পরিকাঠামো তখনই নিপীড়নমূলক পরিকাঠামোতে পরিণত হয় যখন তা প্রভুত্ব এবং নিপীড়নের সম্পর্কের যৌক্তিকতা প্রতিপাদনে ব্যবহৃত হয়। এই পরিকাঠামো পুরুষতান্ত্রিক, কেননা অনেক সময় তাকে পুরুষের দ্বারা নারীর অবদমনের যৌক্তিকতা প্রতিপাদনে ব্যবহার করা হয়। এখানে এমন এক ধরণের যুক্তিকাঠামো অর্ন্তলীন থাকে যে সত্তাবিন্যাসের উপরের দিকে অবস্থান করে তার অবদমনে বিষয়টির বৈধতা প্রতিপাদনে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

(গ) তৃতীয় ব্যাখ্যাটি যৌন পরিচয় (sex) এবং লিঙ্গ পরিচয় (gender) এই দুয়ের মধ্যেকার ধারণাগত ভিত্তির প্রতি আমাদের মনোযোগ আর্কষণ করে। মনে করা হয়, সন্তানধারণ ও সন্তানপ্রতিপালনের মতো দেহগত অভিজ্ঞতা পুরুষের তুলনায় নারীকে প্রকৃতির অনেক কাছাকাছি এনে দেয়। যৌনতা ও লিঙ্গের এই পার্থক্য প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় নারীর এক স্বতন্ত্র চেতনাকে প্রকাশ করে, ধারণাগতভাবে যা তথাকথিত বিশ্লেষণধর্মী নৈর্ব্যক্তিক পুরুষালি অভিজ্ঞতার বিপরীত। বাস্তুনারীবাদের লক্ষ্য লিঙ্গ-সংবেদনশীল এমন ভাষা, তত্ত্ব এবং আচরণবিধি গড়ে তোলা যা প্রকৃতির প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে কোন লিঙ্গপ্রেক্ষিতকে প্রশ্রয় দেবে না। একইসঙ্গে ইহা অবদমন সম্পর্কিত যাবতীয় মতবাদের ধারণাগত কাঠামোকে উন্মোচন করবে। শুধু তাই নয়, বাস্তুনারীবাদীরা মনে করেন, প্রচলিত দর্শনের জগতে যুক্তি ও যুক্তিবত্তা, জ্ঞান ও বস্তুগততা, নৈতিকতা প্রভৃতির ধারণা পুনর্মূল্যায়ন হওয়া জরুরী।

(৩) অভিজ্ঞতামূলক যোগসূত্র (empirical and experiential connections) ঃ বেশ কিছু বাস্তুনারীবাদী নারীর অবদমনে এবং প্রকৃতির ধ্বংসের মধ্যে সম্পর্কসূত্রের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যপ্রমাণের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। তাঁদের অনেকে নারী, শিশু, বর্ণগত সংখ্যালঘু এবং দরিদ্ররা যে ধরণের স্বাস্থ্যসমস্যা এবং ঝুঁকির মধ্যে বেঁচে থাকে সে সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করেন, কিভাবে কীটনাশক, বিষাক্ত বর্জ্য এবং অন্যান্য দূষকগুলি এদের শরীরের ওপর প্রভাব বিস্তার করে তার কথা বলেছেন। অন্যান্য বাস্তুনারীবাদীরা প্রথম বিশ্বের উন্নয়ন-কর্মসূচী কিভাবে তৃতীয় বিশ্বের মানুষজন তথা নারীর ওপর প্রভাব বিস্তার করে সে সম্পর্কে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। এঁদের মধ্যে যাঁরা প্রাণীর অধিকার সম্পর্কে সচেতন তাঁরা প্রাণীর ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পশু শিকার করা, মাংস খাওয়া ইত্যাদিকে পুরুষতান্ত্রিক

ধ্যানধারণা তথা বিধি-নিয়মের সঙ্গে সম্পৃর্কিতরূপে বুঝেছেন। কেউ কেউ নারীর ওপর দৈহিক নির্যাতন ও পর্নোগ্রাফিকে নারী ও প্রকৃতির বিরুদ্ধে পুরুষালি নিগ্রহ হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এই ধরণের অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যপ্রমাণগুলি সামনে এনে বাস্তুনারীবাদীরা প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক ভাবনাচিন্তার অমানবিক মুখটিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

(৪) **সাংকেতিক যোগসূত্র (symbolic connection) ঃ** একদল বাস্তুনারীবাদী ধর্ম, ঈশ্বরতত্ত্ব, শিল্পকলা, সাহিত্য ইত্যাদির মধ্যে নারী ও প্রকৃতির যে অবমূল্যায়ন করা হয়ে থাকে তার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। নারী ও প্রকৃতির যে সাংকেতিক যোগসূত্র তা নারীর আত্মতত্ত্বের রাজনীতি (the politics of women's spirituality) -কে সামনে আনে। কোন কোন তাত্ত্বিক প্রকৃতি সম্পর্কীয় সাহিত্যের মধ্যে যে বিভিন্ন ভাষাগত চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় সেগুলি বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করেছেন কিভাবে নারী ও প্রকৃতি সম্পর্কে পুরুষতান্ত্রিক ধ্যানধারণা প্রকৃতির অবদমন ও নারীর অবদমন - এই দ্বিমুখী নিপীড়নের যৌক্তিকতা প্রতিপাদনে সচেষ্ট। অনেকে নারী ও প্রকৃতির বর্ণনায় যে ভাষা ব্যবহার করা হয়, নিউক্লিয়ার যুদ্ধাস্ত্র সম্পর্কে যেসব ভাষা ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে সাংকেতিক যোগসূত্রের সন্ধান করেছেন। এই ভাষা নারী এবং মনুষ্যেতর প্রকৃতিকে নিকৃষ্ট বলে প্রতিপাদন করতে চায়। নেস্ট্রা কিং বলেন, প্রচলিত ভাষায় নারীকে যে 'প্রকৃতিমাতা' হিসাবে বর্ণনা করা হয় তা অবদমনকে অতিক্রম করে নারীকে স্বাধীন করতে পারে নি। নারীকে অনেক সময় মনুষ্যেতর প্রাণীর ভাষায়, যেমন, গাভী, মুরগী, কুকুর,সাপ ইত্যাদির ভাষায় বর্ণনা করা হয়। ঠিক তেমনি প্রকৃতিকে অনেক সময় নারীসুলভ তথা যৌনতাগন্ধী ভাষায় বর্ণনা করা হয় ঃ প্রকৃতির ধর্ষণ, প্রকৃতিকে জয় করা ইত্যাদি। এখানে বক্তব্য এই যে ভাষা যা প্রকৃতিকে নারীত্বায়িত্ব করে এবং নারীকে প্রকৃতায়িত করে এবং এর মধ্য দিয়ে উভয়ের অবদমন ঘটানো হয়; পরিশেষে, তাদের ওপর প্রভুত্ব করাকে যুক্তিসিদ্ধ করার চেষ্টা হয়।

(৫) **জ্ঞানতাত্ত্বিক যোগসূত্র (epistemological connection) ঃ** নারী ও প্রকৃতির ঐতিহাসিক, ধারণাগত, অভিজ্ঞতালব্ধ, সাংকেতিক যোগসূত্র একইসঙ্গে এক নতুন জ্ঞানতত্ত্বের সূচনা করেছে। সমকালীন নারীবাদীরা যুক্তি, বৌদ্ধিকতা, জ্ঞান এবং জগতের স্বরূপ সম্পর্কে চলে আসা ধ্যান - ধারনাগুলিকে প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছেন। যেমন, ভ্যাল প্লামউড (Val Plumwood) মন্তব্য করেছেন, সাবেকি ধ্যানধারণা তথা সংজ্ঞাগুলি জ্ঞাতাকে জ্ঞেয় প্রকৃতি থেকে আলাদা করেছে এবং প্রকৃতিকে নিছক যন্ত্র হিসাবে ভাবতে শিখিয়েছে। তাই জ্ঞাতার স্বরূপ সম্পর্কে নতুন করে ভাবনা চিন্তা করা দরকার। জ্ঞান-সংগঠনের ক্ষেত্রে জ্ঞেয় বিষয়ের অবস্থান সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে এবং আমরা লক্ষ্য করছি 'ফেমিনিস্ট স্ট্যান্ডপয়েন্ট এপিস্টিমোলজি' (Feminist Standpoint Epistemology) এইসব বিষয়গুলি সম্পর্কে নতুন করে আলোকপাত করছে। নারীসমাজের স্থানীয় প্রযুক্তির ব্যবহার, জলসংগ্রহ, কৃষিকাজ ও খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনসংক্রান্ত তথ্যগুলি নারীর জ্ঞানগত অগ্রগামিতা (epistemic privilege) কে তুলে ধরে এবং একই সঙ্গে 'feminist standpoint epöiistemologies' এর প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরে।

(৬) **রাজনৈতিক যোগসূত্র (political connection) :** 'ইকোফেমিনিজম' শব্দটি ফ্রাঙ্কোজ ডি' আওবেন প্রথম ব্যবহার করেন, বাস্তুভাবনার জগতে বিপ্লব ঘটানোর ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকার প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে। তাই প্রথম থেকেই বাস্তুনারীবাদ তৃণমূলস্তরের রাজনৈতিক আন্দোলনগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। নারীর স্বাস্থ্য, প্রকৃতির স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির ব্যবহার, উন্নয়ন, শান্তিবাদ ইত্যাদি আন্দোলনগুলির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত থেকে দেখানোর চেষ্টা করে। এই সব কিছুর মধ্যে অবদমনের রাজনীতি তথা প্রভুত্বকামিতা কাজ করে

চলে। বিশ্বব্যাপি নারীর নিম্নমানের জীবন-যাপন-ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে প্রচলিত রাজনীতির তত্ত্বগুলির মধ্যে পুরুষকেন্দ্রিকতার বিষয়টি সামনে এনেছে।

(৭) **নৈতিক যোগসূত্র (ethical connection)** ঃ আজ পর্যন্ত নারী ও প্রকৃতির যোগসূত্র বিষয়ে যেসব দার্শনিক লেখালেখি সামনে এসেছে সেগুলির বেশির ভাগটাই পরিবেশ নীতিশাস্ত্র (nvironmental ethics) নামে। নারী, পশু এবং প্রকৃতি সম্পর্কে এতদিনকার চলে আসা ধ্যান-ধারণা নারীবাদী নীতিশাস্ত্রের বিশ্লেষণের দাবী করে। তাই বাস্তুনারীবাদী পরিবেশ-নীতিশাস্ত্র এমন নীতিতত্ত্ব তথা আচরণ বিধি গড়ে তুলতে চায় যার মধ্যে পুরুষতান্ত্রিক লিঙ্গপ্রেক্ষিত থাকবে না, থাকবে না অবদমন-নিপীড়নের কোন উপাদান। ক্যারোল-গিলিগ্যানের দরদের নীতিতত্ত্ব (care ethics), প্লামউডের সম্পর্কের নীতিশাস্ত্র (kinship ethics) এই ধরণের নীতিশাস্ত্রের দৃষ্টান্ত। বাস্তুনারীবাদীরা অভিযোগ করেছেন প্রচলিত প্রধান ধারা পরিবেশ-নীতিশাস্ত্র সমস্যাকীর্ণভাবে মানবকেন্দ্রিক বা আশাহীনভাবে পুংকেন্দ্রিক (problematically anthropocentric or hopelessly androcentric)।

(৮) **তত্ত্বগত যোগসূত্র (theoretical connection)** ঃ উপরের যে বিভিন্ন ধরণের যোগসূত্রের কথা বলা হল সেগুলি নারীবাদী এবং পরিবেশ-দর্শন উভয়ক্ষেত্রেই বিভিন্ন ধরণের কখনও বা পরস্পর বিরুদ্ধ তাত্ত্বিক অবস্থানের জন্ম দিয়েছে। পরিবেশ নীতিশাস্ত্রে সব থেকে বেশি তাত্ত্বিক অবস্থান আমরা লক্ষ্য করি। অনেক ক্ষেত্রেই সমকালীন পরিবেশনীতিশাস্ত্র সমকালীন দার্শনিক নীতিশাস্ত্রের তত্ত্বগুলিকেই প্রতিবিম্বিত করেছে। দার্শনিক নীতিতত্ত্বগুলির মধ্যে যেমন আছে সাবেকি নৈতিক আত্মবাদ এবং উপযোগিতাবাদ নামে পরিণামবাদী তত্ত্বসমূহ, তেমনি কাছে কান্টীয় অধিকার ভিত্তিক বা সদ্‌গুণভিত্তিক কর্তব্যবাদী নীতিত্তত্বগুলি। একই সঙ্গে নারীবাদী, অস্তিবাদী, মার্ক্সবাদী প্রভৃতি নীতিতাত্ত্বিকদের সেই সব তত্ত্ব যা সাবেকি পরিণামবাদ তথা কর্তব্যবাদীতত্ত্ব সম্পর্কে নানা ধরণের প্রশ্ন উত্থাপন করে। একই রকমভাবে আমরা পরিবেশ নীতিশাস্ত্রেও একদিকে লক্ষ্য করছি নৈতিক আত্মবাদ, বাস্তু-উপযোগিতাবাদ, উপযোগিতাবাদ, প্রাণী-মুক্তিতত্ত্ব এবং অন্যদিকে, অধিকার ভিত্তিক প্রাণীমুক্তিতত্ত্ব ও নায়েবী নীতিশাস্ত্রের মতো কর্তব্যবাদী তত্ত্বসমূহ। প্রথাবাহী নয় এমন নীতিতাত্ত্বিক অবস্থানও লক্ষ্য করা যায়, যেমন লিওপোল্ডের সমগ্রতাবাদী ভূমিনীতিতত্ত্ব (The Land Ethics), সামাজিক বাস্তুবাদ (Social Ecology), নিবিড় বাস্তুবাদ(Deep Ecology) ইত্যাদি। এইসব নীতিতত্ত্বগুলি মুলধারার দার্শনিক নীতিতত্ত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

যদিও নারীবাদীরা নারীর অধীনতার স্বরূপ ও তার থেকে মুক্তির উপায় সম্পর্কে একমত নন, তথাপি সকলেই স্বীকার করেন যে লিঙ্গভিত্তিক শোষণ অন্যায় এবং এর অবসান জরুরী। পরিবেশের ধ্বংস বা প্রকৃতির শোষণ নারীবাদী বিষয় এই কারণে যে প্রকৃতির ওপর মানুষের যে অন্যায় আক্রমণ ও আগ্রাসনকে ঠিকমত বুঝলে পুরুষতন্ত্রের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত নারীর অবস্থানকে আরো ভালোভাবে বোঝা যায়। অন্য দিকে, নারীর অধীনতার বিষয়টি ঠিক ঠিক বুঝলে পরিবেশ-বিপর্যয়ের পটভূমি তথা কারণকেও বোঝা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যথেচ্ছ বৃক্ষ নিধন এবং ইউক্যালিপটাসের মতো একমাত্রিক প্রজাতির বৃক্ষের মাধ্যমে সামাল দেওয়ার প্রচেষ্টা নারীবাদী বিষয়, কেননা বিভিন্ন প্রজাতির স্থানীয় বৃক্ষগুল্মযুক্ত প্রাকৃতিক অরণ্যের বিনাশে জীবনধারণের ন্যূনতম ব্যবস্থাটুকুও বিনষ্ট হওয়ায় গ্রামীন নারীরা, বিশেষ করে যারা অরণ্য বিনাশে বা সংলগ্ন অঞ্চলে বাস করেন, সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বৈচিত্র্যময় স্বাভাবিক অরণ্য তাদের খাদ্য, জ্বালানি, গৃহস্থালি, আসবাবাদি, ভেষজ, গোখাদ্য প্রভৃতি সরবরাহ করে, কৃত্রিমভাবে তৈরী করা এক প্রজাতির বৃক্ষের অরণ্য যা সরবরাহ করতে অক্ষম।

৪.৪ বাস্তুনারীবাদের কয়েকজন বিশিষ্ট প্রবক্তার বক্তব্য ঃ

ফ্রাঙ্কোজ ডি' আওবেন ঃ ফ্রাঙ্কোজ ডি আওবেন 'ইকোফেমিনিজম' এই অভিধাটি প্রথম প্রচলন করেন। তিনি ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে 'ফেমিনিজম অর ডেথ' গ্রন্থে 'দ্য টাইম ফর ইকোফেমিনিজম' নামে একটি অধ্যায় প্রকাশ করেন যেখানে তিনি প্রথম নারীবাদ ও বাস্তুবাদের মধ্যে সাদৃশ্যের বিষয়টি উত্থাপন করেন। তিনি চাইতেন আমাদের এই পৃথিবী গড়ে উঠুক একেবারে নতুনরূপে। অন্যথায়, প্রকৃতির ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও নিঃশেষ হয়ে যাব। তিনি পরিবেশ ধ্বংসের যাবতীয় দায় চাপিয়েছেন পুরুষতন্ত্রের ওপর। যুগ যুগ ধরে চলে আসা এই পুরুষতন্ত্রকে ধ্বংস করতে না পারলে নারীর যেমন মুক্তি নেই তেমনি মানব-সমাজেরও মুক্তি নেই। এই প্রবন্ধে মানব-প্রজাতিকে বাঁচাতে তিনি এই জগতের আমূল পরিবর্তনের ডাক দিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'ইকোলজি-ফেমিনিজম সেন্টার' -এর শ্লোগান ছিল ঃ 'আজকের পৃথিবীকে ভবিষ্যত মানবতার জন্য সংরক্ষণ করতে পুরুষতন্ত্রের হাত থেকে কেড়ে নিতে হবে।' যদি এই পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থা টিকে থাকে তাহলে মানবতার কোন ভবিষ্যৎ নেই। পুরুষতন্ত্রের উৎপত্তির বিবরণ করতে গিয়ে ডি' আওবেন লিখছেন, প্রায় পাঁচহাজার বছর আগে পৃথিবীব্যাপী নারীর পরাজয় সূচনা হয়েছে, যাকে 'দ্য গ্রেট ডিফিট অফ দ্য ফেমিনিন সেক্স' ('the great defeat of the feminine sex') বলে উল্লেখ করা হয়। সমাজ বিবর্তনের এই পর্যায়ে পুরুষ চাষবাস করতে শুরু করে, ভূমিতে বীজ বপন করে ফসল ফলাতে শেখে। একই সঙ্গে প্রকৃতির সঙ্গে তুল্য নারীকে পদানত করে। নারীর দেহের উপরও অধিকার কায়েম করে পুরুষ। এর সঙ্গেই দ্বিতীয় লিঙ্গের শৃঙ্খল যুগ ('iron age of the second sex') শুরু হয়। এক দিকে ধরিত্রীকে অধীনস্ত করে পুরুষ শৃঙ্খলিত করে নারীকে। পুরুষের দ্বারা পুরুষের জন্য তৈরী পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ধরিত্রীর ওপর আগ্রাসন শুরু হল। একই সঙ্গে নারীর ওপর পুরুষের প্রভুত্ব স্থাপনের মধ্য দিয়ে লিঙ্গ-বৈষম্য তন্ত্রবদ্ধ হয়। মাতৃরূপী ধরিত্রী আজ লৌহকষ্টে দিনযাপন করছে প্রভু পুরুষ তাকে মৃত্যুর উদ্বেগে স্থাপন করেছে। ডি' আওবেনের মতে, ইহা পুংতন্ত্র (phallocracy)-এর ফল। যে স্বামীরা নারীর দেহকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাদের গর্ভবতী করে, যে পুরোহিত তাদের বৃহত্তর পরিবারের পক্ষে উপদেশ দেয় তারা সকলেই এই পুংতন্ত্রের ধারক ও বাহক। পরিবেশ-ধ্বংসের একটি বড় উপাদান মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ—এর ফলে প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর মানুষের আগ্রাসন চলতেই থাকে। আমরা খুব কম মানুষজন এব্যাপারে সচেতন যে কোন ধর্মতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র নয়, আসলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীর ওপর একচ্ছত্র প্রভুত্ব করার অধিকার দিয়েছেন পুরুষকে। তাই এধরনের বিপর্যয়। ডি' আওবেন অবশ্য মনে করেন না যে পুরুষতন্ত্রের স্থলে নারীতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেই যাবতীয় সমস্যার সমাধান হবে। তিনি এর পরিবর্তেএক নতুন মানবতাবাদের স্বপ্ন দেখেছেন, যেখানে ক্ষমতাতন্ত্র বিদায় নেবে এবং তার জায়গায় সমানতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। মানুষ তখন মানুষ হিসাবেই বিবেচিত হবে, পুরুষ বা নারী হিসাবে নয়।

ক্যারোলিন মার্চেন্ট ঃ ক্যারোলিন মার্চেন্ট তাঁর 'দ্য ডেথ অফ নেচার ঃ ওমেন, ইকোলজি অ্যান্ড দ্য সায়েন্টিফিক রিভোলুইসন' ('The Death of Nature : Women, Ecology and the Scientific Revolution) গ্রন্থে পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপের বিজ্ঞানের আবিষ্কারসমূহের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন যে সমগ্রতাবাদী বিশ্ববীক্ষা থেকে যান্ত্রিক বিশ্ববীক্ষায় রূপান্তরই নারী ও প্রকৃতির অবমূল্যায়নের প্রথম বাহিকা-শক্তি হিসাবে কাজ করেছে। তিনি বলেন, পৃথিবীকেন্দ্রিক জগৎবীক্ষা (geocentrism) থেকে

সূর্যকেন্দ্রিক জগৎবীক্ষা (heliocentrism)-য় পরিবর্তন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। পৃথিবীকেন্দ্রিক বিশ্ববীক্ষায় পৃথিবীকে পরিচর্যাকারী মাতা ও অনিয়ন্ত্রণযোগ্য সত্তা (যে প্রয়োজনে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে) এই দুই রূপ বিবেচনা করা হত। যখন এই বিশ্ববীক্ষা সূর্যকেন্দ্রিকতাবাদে রূপান্তরিত হল তখন নারীকেন্দ্রিক বিশ্বভাবনার স্থানে পুরুষকেন্দ্রিক বিশ্বভাবনার আবির্ভাব ঘটল। এই কারণ দুর্বোধ্য নয় ঃ সূর্যকে প্রথাগতভাবে পুরুষোপম বিবেচনা করা হয়। একই সঙ্গে ক্রিয়াবত্তাকে পৌরুষের সঙ্গে এবং নিষ্ক্রিয়তাকে নারীত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত করে দেখার রীতি ষোড়শ শতাব্দীতে পুনরুত্থাপিত হয়। এর প্রকাশ আমরা লক্ষ্য করি কোপার্নিকাসের এই বক্তব্যে ঃ "The earth conceives by the Sun and becomes pregnent with annual off-springs." তবে এই পরিবর্তন শুধু পৃথিবীতে নয়, সর্বত্র সংগঠিত হতে পারে — সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্ববীক্ষাজনিত এই ধারণা এই ভীতির জন্ম দিল যে প্রকৃতির শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়তে পারে। এই ভয়ের কারণে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার অভিপ্রায় জেগে ওঠে মানুষের মধ্যে। নারীসুলভ প্রকৃতির যে ধারণা সামনে এল তা বন্য, বিধ্বংসী প্রকৃতির ধারণা। অন্যদিকে, পরিচর্যাকারী মাতা হিসাবে প্রকৃতির আর এক রূপ, যা সমগ্রতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অংশ ছিল, ক্রমে অপ্রচলিত হতে থাকল। তখন থেকেই প্রকৃতিকে জোর করে নিয়ন্ত্রণ করা, প্রকৃতিকে মানুষের পদানত করার প্রচেষ্টা শুরু হল। সেই সময়কালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতেও চিন্তাধারার পরিবর্তন সূচিত হয়। আধুনিক বিজ্ঞানের জনক বলে আমরা যাকে মান্য করি সেই ফ্রান্সিস বেকানের বিজ্ঞান-দর্শন তথা প্রকৃতি ভাবনা নারী ও প্রকৃতি উভয়ের পক্ষেই মারাত্মক হয়ে ওঠে। শুধু ব্যক্তির জন্যই নয়, সমগ্র মানবজাতির জন্য তিনি প্রকৃতিকে অবদমন করার আহ্বান করলেন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির যৌক্তিকতা প্রতিপাদন করতে গিয়ে তিনি প্রকৃতিকে নারীর সঙ্গে তুলনা করলেন ডাকিনী-বিদ্যার জন্য যাকে অভিহিত করা হয়েছে। এই সময়কাল থেকেই এতদিন ধরে চলে আসা সমগ্রতাবাদী জগৎ দর্শনের স্থানে যান্ত্রিকতাবাদের বিজ্ঞান-দর্শনের উদ্ভব ঘটে।

যদিও বাস্তুনারীবাদীরা প্রকৃতির সঙ্গে নারীর সম্পর্কের বিভিন্ন ধরনের সম্পর্কসূত্রেই কথা বলেছেন, তথাপি অধিকাংশই নারীবাদী দার্শনিকরা দাবী করেন যে ধারণাগত যোগসূত্রেই সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাদের যুক্তি নারীর উপর প্রভূত্ব এবং প্রকৃতির উপর প্রভুত্বের সম্পর্কসূত্রগুলি অধিকাংশই শেষমেশ ধারণাগত। এই বিষয়টিকে প্রতিপাদন করার জন্যই বাস্তুবাদের লেখিকা কারে জে. ওয়ারেণ তাঁর 'The Power and Promise of Ecological Feminism' প্রবন্ধে এই বিষয়টির উপর আলোকপাত করেছেন। আমরা সিলেবাস নির্দিষ্ট এই প্রবন্ধটি অনুসরণ করে ওয়ারেণের বক্তব্য তুলে ধরব।

৪.৫ কারেণ জে. ওয়ারেণের অভিমত ঃ

কারেণ জে. ওয়ারেণের মতে প্রভুত্ববাদ শেষপর্যন্ত এক নিপীড়নমূলক ধারণাগত পরিকাঠামোর উপর নির্ভর করে। এই ধারণাগত পরিকাঠামোই একদিকে পুরুষের দ্বারা নারীর ওপর অবদমন-নিপীড়নের ব্যাখ্যা দেয় ও যৌক্তিকতা প্রতিপাদন করে। মূলত এই ধারণাগত পরিকাঠামোই প্রকৃতির ওপর মানুষের প্রভুত্বকামিতাকে সমর্থন করে।

ধারণাগত পরিকাঠামো বলতে কতকগুলি মৌলিক বিশ্বাস, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি ও পূর্বস্বীকৃতির একটি গুচ্ছকে বোঝার যা একজন ব্যক্তি নিজেকে এবং তার জগতকে কেমনভাবে দেখবে তা নির্দিষ্ট করে দেয়। বলা বাহুল্য, এটি সামাজিকভাবে নির্মিত লেন্সের মতো যার মধ্যে দিয়ে আমরা নিজেদেরকে দেখি, অপর ব্যক্তিদের দেখি এবং সামগ্রিকভাবে জগতকে বুঝি। এই ধারণাগত পরিকাঠামো লিঙ্গ, বর্ণ, শ্রেণী, বয়স, স্নেহ-মায়া-মমতা,

জাতীয়তা এবং ধর্মীয় প্রেক্ষিতের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। আপাতবিচারে এ ধারণাগত পরিকাঠামো নির্দোষ বলেই মনে হয়। কিন্তু ওয়ারেণ আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন যে বেশ কিছু ধারণাগত পরিকাঠামো নিপীড়নমূলক। একটি অবদমনমূলক ধারণাগত পরিকাঠামো বলতে আমরা সেই ধরনের চিন্তাধারাকে বুঝি যা অবদমন ও নিপীড়নের সম্পর্কগুলিকে ব্যাখ্যা করে, যৌক্তিকতা প্রতিপাদন করে এবং তাকে বহন করে চলে। শ্রীমতী ওয়ারেণের অন্তর্দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে যে এই ধরনের নিপীড়নমূলক ধারণাগত পরিকাঠামোর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য থাকে ঃ (১) মূল্যবিন্যাগত উচ্চ-নীচ চিন্তা (value-hierarchical thinking), যা মূল্যমানের উপরের দিকে অবস্থানকারী বিষয়সমূহকে বেশি মূল্যবান মনে করে; বিপরীত মূল্যমানের নীচের দিকে যারা থাকে তাদের কম মূল্যবান মনে করে, অনেক সময় অমর্যাদা করে। (২) মূল্যগত দ্বৈতবাদ (value dualism), যেখানে বৈকল্পিক যুগলকে পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে না ভেবে পরস্পর-বিরোধী হিসাবে ভাবা হয় এবং এর মধ্য থেকে একটিকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয় (দৃষ্টান্তস্বরূপ মন-এর তুলনায় দেহ-কে, যুক্তির তুলনায় আবেগকে, পুরুষ-এর তুলনায় নারীকে কম গুরুত্বপূর্ণ ভাবা হয়।) (৩) প্রভুত্বজ্ঞাপক যুক্তি (the logic of domination), যা আসলে একটি যুক্তিকাঠামো অবদমন-নিপীড়নের যৌক্তিকতা প্রতিপাদনে ব্যবহার করা হয়।

এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রভুত্বজ্ঞাপক যুক্তি-প্রকরণটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই যুক্তি-প্রকরণটি নিছক এক যুক্তি-প্রকরণটি নিছক এক যুক্তিকাঠামো নয়, এর মধ্যে সারবান এক মূল্যবোধ অন্তর্লীন থাকে যা তুলনায় নিচের দিকে অবস্থানকারী সত্তার অবদমনের ন্যায্যতা প্রমাণ করার জন্য প্রযুক্ত হয়। মজার ব্যাপার হল, এখানে ন্যায্যতা-প্রতিপাদন এমন কিছু বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে করা হয় যা বিন্যাসকাঠামোয় অপেক্ষাকৃত উচ্চস্তরে অবস্থান করে যে সত্তা তারই থাকে এবং নিম্নস্তরে অবস্থানকারী সত্তার থাকে না।

বলা বাহুল্য, মূল্যবিন্যাসগত চিন্তাকাঠামো স্বরূপত সমস্যাকীর্ণ নয়। অবদমন-নিপীড়নের ক্ষেত্র ব্যতিরেকে উচ্চ-নীচরূপ মূল্যবিন্যাসগত চিন্তার মধ্যে তেমন কিছু সমস্যা নেই। আমরা দৈনন্দিন জীবনে তথ্য-উপাত্তের শ্রেণীকরণ, তুলনা ও বিশ্লেষণের জন্য মূল্যবিন্যাসগত চিন্তা-ভাবনা করেই থাকি এবং অনেক ক্ষেত্রে তার কোনো বিকল্পই নেই। যেমন, সামাজিক পরিবেশকে বড় রকমভাবে পরিবর্তিত করার বিশেষ সামর্থ্য মানুষের আছে। তাই কেউ যদি বলেন, গাছপালা, শিলাপাথরের তুলনায় মানুষ তাদের পরিবেশের তাৎপর্যপূর্ণভাবে পরিবর্তন করতে সমর্থ, যদিও এটি মূল্যবিন্যাসগত চিন্তার প্রকাশ, তথাপি স্বরূপত এর মধ্যে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু অবদমন-নিপীড়ন প্রসঙ্গে এই ধরনের বিচারধারা যথেষ্ট তাৎপর্যবাহী। কারণ জে. ওয়ারেণ সঠিকভাবেই মন্তব্য করেছেন যে হীনাবস্থা তথা অধীনতাকে যুক্তিযুক্ত প্রমাণ করার জন্য ও ধরনের মূল্যবিন্যাসগত চিন্তা-ভাবনা যখন প্রয়োগ করা হয়, এবং যেভাবে তার প্রয়োগ ঘটে, তা সমস্যা সৃষ্টি করে। মূল্যবিন্যাসগত চিন্তা ও মূল্য-দ্বৈতবাদের সঙ্গে যুক্ত করে প্রভুত্বজ্ঞাপক যুক্তি-প্রকরণটি প্রয়োগ করা হয় তখন তা অবদমনকে ন্যায্যতা দেওয়ার চেষ্টা করে। আর এখানেই সমস্যার শুরু।

নিপীড়নমূলক ধারণাগত পরিকাঠামোর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল এই প্রভুত্বজ্ঞাপক যুক্তি-প্রকরণ (the logic of domination)। অন্ততঃ তিনটি কারণে এই যুক্তি প্রকরণটি গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, এই প্রভুত্বজ্ঞাপক যুক্তিপ্রকরণটি ছাড়া সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্যসূচক যুক্তি নিছক বর্ণনা মাত্র; তার থেকে কোনো তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিঃসৃত হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মানুষ, গাছপালা তথা শিলা-পাথরের থেকে আলাদা এই কারণে যে মানুষ যে বাস্তুসংস্থানের মধ্যে বাস করে সচেতনভাবে তার আমূল পরিবর্তন ঘটাতে পারে। আবার মানুষ গাছপালা

শিলা-পাথরের সঙ্গে সমান এই কারণে যে তারা সকলেই একই বাস্তুব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। মানুষ বাস্তুসংস্থানের আমূল পরিবর্তন সাধনে সমর্থ্য (যে সামর্থ্য গাছপালা বা শিলাপাথরের নেই)-এর থেকে নৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ কোনো পার্থক্য নিঃসৃত হয় না, বা অন্যভাবে বললে, নৈতিক ভাবে প্রাসঙ্গিক মানব-মানবেতর প্রকৃতির মধ্যে কোনো পার্থক্য নিঃসৃত হয় না। এর থেকে নৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত পেতে হলে আমাদের অন্ততঃ দুটি জোরালো পূর্বস্বীকৃতি যোগ করতে হবে, যেমন, নীচের যুক্তিটিতে (A-2) এবং (A-4) বিবৃতি দুটি —

(A1) মানুষ যে পরিবেশ বা সমাজে বাস করে সচেতনভাবে সে তার পরিবর্তন ঘটাতে সমর্থ যে সামর্থ্য কোন গাছপালা বা শিলাপাথরের নেই।

(A2) সচেতনভাবে পরিবেশ বা সমাজের পরিবর্তন ঘটানোর সামর্থ্য যার আছে সে যাদের সেই সামর্থ্য নেই তাদের থেকে নৈতিকভাবে উৎকৃষ্টতর।

(A3) সুতরাং মানুষ গাছপালা বা শিলাপাথরের থেকে নৈতিকভাবে উৎকৃষ্টতর।

(A4) যে কোন X এবং Y এর ক্ষেত্রে যদি XY এর তুলনায় নৈতিকভাবে উৎকৃষ্টতর হয় তাহলে X এর Y কে অবদমন করার অধিকার আছে।

(A5) অতএব গাছপালা ও শিলাপাথরের ওপর প্রভুত্ব করার ব্যাপারে মানুষ যুক্তিযুক্ত।

বলা বাহুল্য, অ-মানব প্রকৃতি থেকে মানুষ উৎকৃষ্টতর (A3) এবং উৎকৃষ্টতা অবদমনের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করে (A4) এই দুটি পূর্বস্বীকৃতি ছাড়া বাকী যুক্তিটিতে আমরা কেবল পাই মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির কিছু পার্থক্য, আর কিছু নয়। তাই বলা হয়েছে, এই অবদমন-প্রতিপাদক যুক্তিটি নিপীড়ন-অবদমন সম্পর্কিত বাস্তুনারীবাদী আলোচনার সর্বনিম্নস্তর। দ্বিতীয়তঃ, বাস্তুনারীবাদীরা যুক্তি দিয়েছেন যে অন্তত পাশ্চাত্য সমাজে নারীও প্রকৃতির ওপর এই দ্বিমুখী অবদমন-প্রতিপাদক এই যে নিপীড়নমূলক ধারণাগত পরিকাঠামো তা পূর্বোক্ত কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের দ্বারা বিশিষ্ট পুরুষতান্ত্রিক চিন্তাকাঠামোই। অনেক বাস্তুনারীবাদীর বক্তব্য, ঐতিহাসিক বিচারে এই মূল ধারার পাশ্চাত্য সংস্কৃতি এই যে পুরুষতান্ত্রিক ধারণাগত পরিকাঠামো তা নীচের যুক্তি (B) এর বৈধতা দেয়।

(B1) নারীপ্রকৃতি তথা ভৌতজগতের সঙ্গে অভিন্ন বিবেচিত হয়, পুরুষ মানব তথা যা কিছু মানসিক তার সঙ্গে অভিন্ন বিবেচিত হয়।

(B2) কোন সত্তা যা প্রকৃতি তথা ভৌত জগতের সঙ্গে অভিন্ন বিবেচিত হয় তা যা কিছু মানবোপম তথা মানসিকতার তুলনায় নিকৃষ্ট, অথবা বিপরীতভাবে, পুরুষ নারীর তুলনায় উৎকৃষ্ট।

(B3) সুতরাং নারী পুরুষের তুলনায় নিকৃষ্ট, অথবা বিপরীতভাবে, পুরুষ নারীর তুলনায় উৎকৃষ্ট।

(B4) যে কোনো X এবং Y এর জন্য যদি XY তুলনায় উৎকৃষ্ট হয় তাহলে XY কে অবদমিত করার ব্যাপারে যুক্তিযুক্ত।

(B5) অতএব নারীকে অবদমিত করার ব্যাপারে পুরুষ যুক্তিযুক্ত।

যাই হোক, B যুক্তিটি (যদি যথোচিত ও বৈধ হয় তাহলে) এটি পুরুষতন্ত্র, অর্থাৎ নারীর ওপর পুরুষের তন্ত্রবদ্ধ অবদমনের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা করে (B5)। কিন্তু বাস্তুনারীবাদ অনুসারে সিদ্ধান্ত B5 এর যৌক্তিকতা নিপীড়নমূলক ধারণাগত পরিকাঠামোর কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের দ্বারা প্রতিপাদিত হয় ঃ মূল্য বিন্যাসগত চিন্তা (B2 যুক্তিবাক্যটি যা প্রকাশ করে), মূল্যগত দ্বৈতবাদ (এখানে দৈহিক / ভৌতিক এবং মানসিক-এর প্রচলিত দ্বৈতবাদ B1 যুক্তিবাক্যটি যা প্রকাশ করে) যা মানসিক তার তুলনায় যা দৈহিক তার হীনাবস্থা (B2 যুক্তিবাক্যটি যা প্রকাশ করে) এবং অবদমন প্রতিপাদক যুক্তি (B4 যুক্তিবাক্যটি যা তুলে ধরে)। শেষোক্ত B4 যুক্তিবাক্যটি এবং আগের যুক্তির A4 যুক্তিবাক্যদুটি একই বক্তব্য তুলে ধরে। তাই বাস্তুনারীবাদ অনুসারে যেভাবে অবদমনমূলক পুরুষতান্ত্রিক ধারণাগত পরিকাঠামো ঐতিহাসিকভাবে নারীর ওপর প্রভুত্ব এবং প্রকৃতির ওপর প্রভুত্ব — এই দুই প্রকার প্রভুত্বপ্রতিপাদনে ক্রিয়াশীল থেকেছে তাতে বোঝা যায় যুক্তি B এবং পুরুষতান্ত্রিক ধারণাগত পরিকাঠামো (যার থেকে এটা নিঃসৃত হয়) পরিত্যাজ্য। বলা বাহুল্য, এর থেকে এটাও সুস্পষ্ট হয় যে যেহেতু নারী ও প্রকৃতি উভয়ের ওপর প্রভুত্বকামিতা তথা অবদমন একই যুক্তিতন্ত্র থেকে বেড়িয়ে আসে এবং যেহেতু এভাবে পরিবেশ ধ্বংস ও লিঙ্গবাদের অবসানের কর্মসূচী ধারণাগতভাবে সম্পর্কিত, সেহেতু পরিবেশবাদী ও নারীবাদী উভয়ে একজোট হয়ে কর্মতৎপর হওয়া উচিত।

অবশ্য ওপরের আলোচনা B যুক্তির কোন্ আশ্রয়বাক্যটি মিথ্যা তা বুঝিয়ে দিতে পারে না। এখানে B1 এবং B2 আশ্রয়বাক্যদুটির গুরুত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন উঠলে অধিকাংশ নারীবাদীরা বলবেন B1, এবং অনেক বাস্তুনারীবাদী বলবেন B2। পাশ্চাত্য দার্শনিক ও বৌদ্ধিক ঐতিহ্যের মধ্য থেকে এগুলিকে ধরে নেওয়া হয়েছে। ফলত, নারীবাদীরা বলেন ঐতিহাসিক ঘটনা হিসাবে প্রভাবশালী পাশ্চাত্য দার্শনিক চিন্তাধারা B1-এর সত্যতাকে আগে থেকে স্বীকার করে নেয়। বাস্তুনারীবাদীরা অবশ্য আশ্রয়বাক্যটিকে অস্বীকার করে। আবার প্রকৃতির সঙ্গে নারীর কোনো ধরনের অনৈতিহাসিক একাত্মিকরনের বিরোধিতার ব্যাপারে তারা উদ্বিগ্ন। তাই কিছু বাস্তুনারীবাদী B1যুক্তিবাক্যটিকে অস্বীকার করে যখন B1 নারীকে প্রকৃতিজগত তথা ভৌত জগতের সঙ্গে একাত্ম করতে চায়। অর্থাৎ, বাস্তুনারীবাদী প্রেক্ষাপটে B1 এবং B2 সমস্যাকীর্ণ, যদিও ঐতিহাসিকভাবে এরকম ভাবা হয়ে আসছে। একটু স্পষ্ট করে বললে, এই দুই আশ্রয়বাক্য ঠিক এই জন্যই সমস্যাকীর্ণ যে পুরুষতান্ত্রিক ধারণাগত পরিকাঠামো তথা সংস্কৃতির মধ্যে নারী ও প্রকৃতির ওপর প্রভুত্বকে ন্যায্যচা দিতে ঐতিহাসিকভাবে ক্রিয়াশীল থেকেছে।

যাই হোক, যে ব্যাপারটি সকল বাস্তুনারীবাদী একমত তা হল এক সূক্ষ্ম অথচ নির্দিষ্টভাবে প্রভুত্বজ্ঞাপক যুক্তিপ্রকরণটি পুরুষতন্ত্রের মধ্যে ঐতিহাসিকভাবে কাজ করে এসেছে এবং নারী ও প্রকৃতির এই যুগ্ম অবদমনে যৌক্তিকতা প্রতিপাদন করে এসেছে। যেহেতু সব নারীবাদীই (এবং নিছক বাস্তুনারীবাদীরা নন) পুরুষতন্ত্রের বিরোধিতা করেন, (অর্থাৎ B5-এ যে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে তার বিরোধিতা করেন), সেহেতু সকল নারীবাদী (বাস্তুনারীবাদীদের ধরে) প্রভুত্বজ্ঞাপক যুক্তিপ্রকরণ (যা B4 যুক্তিবাক্যটি প্রকাশ করেছে, এবং যার উপর B যুক্তিটি নির্ভরশীল)-কে অবশ্যই বিরোধিতা করবেন, পুরুষতান্ত্রিক প্রসঙ্গের বাইরে B1 এবং B2 সত্যমূল্য যাই হোক না কেন।

সব নারীবাদী আবশ্যিকভাবে প্রভুত্বজ্ঞাপক যুক্তিপ্রকরণটির বিরোধিতা করে — এই বাস্তবতা B যুক্তিটির বাস্তুনারীবাদী সমালোচনার ব্যাপকতা ও গভীরতাকে প্রমাণ করে। এটি শুধুমাত্র B1, B2 এবং B4 এই তিনটি আশ্রয়বাক্যে যে পূর্বস্বীকৃতি আছে (যার উপর প্রকৃতি ও নারীর অবদমনের যুক্তিটি নির্ভর করে) সেই পূর্বস্বীকৃতিরই

সমালোচনা নয়, এটি সাধারণভাবে পুরুষতান্ত্রিক ধারণাগত পরিকাঠামোর সমালোচনা। ইহা সেই অবদমনমূলক ধারণাগত পরিকাঠামোর বিরোধিতা করে যা পুরুষকে উচ্চে স্থান দেয় এবং নারীকে তার অধীনস্ত করতে চায়। সুতরাং পুরুষতন্ত্রে যে কোনো নারীবাদী মূল্যায়নে বাস্তুনারীবাদী অপরিহার্য। একই সঙ্গে নারীবাদের পক্ষেও ইহা আবশ্যিক।

কারেণ জে. ওয়ারেণ বলেন, বাস্তুনারীবাদী এটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেয় প্রভুত্বজ্ঞাপক যুক্তি-প্রকরণটিকে এবং যে ধারণাগত পরিকাঠামো এটির জন্ম দেয় তাকে আবশ্যিকভাবে নির্মূল করতে হবে, যাতে করে স্বাতন্ত্র বা পার্থক্যের একটি অর্থপূর্ণ ধারণা (যা প্রভুত্বকে প্রশ্রয় দেয় না) সম্ভব হতে পারে। একই সঙ্গে ইহা প্রাথমিকভাবে অভিজ্ঞতার শরিকানার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা 'সার্পোট মুভমেন্ট' (support movement) হওয়া থেকে নারীবাদকে রক্ষা করে। বলা বাহুল্য, সমকালীন সমাজে নারীর একটি মাত্র কণ্ঠোস্বর নেই; প্রতিটি নারী কোনো বিশে, বর্ণ, শ্রেণী, বয়স, বৈবাহিক মর্যাদা, স্থানীয় বা জাতীয় প্রেক্ষিতে ইত্যাদি কোনো না কোন একটির দ্বারা বিশেষিত। এখন, যেহেতু এমন কোনো একটি কণ্ঠস্বর নেই যা পৃথিবীর সকল নারীর প্রতিনিধিত্ব করতে পারে, তাই নারীবাদকে অবশ্যই কিছু বিশ্বাস এবং স্বার্থের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা 'সংহতি আন্দোলন' (solidarity movement) হিসাবেই গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তুনারীবাদ সেই ধরনের প্রভুত্বজ্ঞাপক যুক্তি-প্রকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করে, যা এক দিকে লিঙ্গ, বর্ণ, শ্রেণী ইত্যাদির দ্বারা মানুষের প্রভুত্বকে যুক্তিযুক্ত সপ্রমাণ করার চেষ্টা করে, অন্যদিকে, প্রকৃতির উপর মানুষের অবদমনকেও সমর্থন করে। যেহেতু প্রভুত্বজ্ঞাপক যুক্তির একটি বিশেষ প্রকরণের নির্মূল করা নারীবাদী সমীক্ষার অংশ, তাই বাস্তুনারীবাদী এই বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেয় যে প্রকৃতিবাদ (naturism)-কে লিঙ্গবাদী অবদমনের বিনাশকল্পে গড়ে ওঠা নারীবাদী সংহতি আন্দোলনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবেই দেখা যুক্তিযুক্ত। (প্রকৃতিবাদ হল সেই তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি যা প্রকৃতিকে মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখে, মানুষের জন্য 'রিসোর্স' হিসাবে বিবেচনা করে, প্রকৃতিকে শোষণ করেই মানুষ বেঁচে থাকতে - এই অভিমত পোষণ করে।)

৪.৬ বাস্তুনারীবাদী নারীবাদের পুনর্মূল্যায়ন করে (Ecofeminism Reconceives Feminism) :

এই পর্যন্ত আমাদের আলোচনা পুরুষতন্ত্রের ধারণাগত পরিকাঠামোর কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি আলোকপাত করে। ওয়ারেণের মতে, প্রথাবাহী নারীবাদের যে যুক্তিধারা (the logic of traditional feminism) লিঙ্গবাদী অবদমনের ধারণাগত শিকড়গুলিকে প্রভুত্বজ্ঞাপক যুক্তি-প্রকরণের দ্বারা বিশেষিত একটি নিপীড়নমূলক পুরুষতান্ত্রিক ধারণাগত পরিকাঠামোর মধ্যে সন্ধান করে। বর্ণবাদ, শ্রেণীবাদ ইত্যাদি অন্যান্য ধরনের অবদমনও যেহেতু প্রভুত্বজ্ঞাপক এক যুক্তি প্রকরণের দ্বারা পুষ্ট, সেহেতু প্রথাবাহী নারীবাদের যুক্তিতন্ত্রের প্রতি আবেদন শেষ পর্যন্ত সব ধরনের অবদমন-নিপীড়নের মৌলিক ধারণাগত আন্তর্সম্পর্কগুলি প্রভুত্বজ্ঞাপক যুক্তিপ্রকণের স্থিতিলাভ করে। এইভাবে ইহা ধারণাগত স্তরে ব্যাখ্যা করে লিঙ্গবাদী অবদমন নির্মূর্ল করার জন্য অন্যান্য প্রকারের অবদমনগুলির নির্মূলন কেন দরকার। বিভিন্ন অবদমনতন্ত্রের এই ধারণাগত আন্তর্সম্পর্ককে পরিষ্কার করার মধ্য দিয়েই লিঙ্গবাদী অবদমনকে সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষ করা যায়। এই উপলব্ধিই নারীবাদকে সব ধরনের অবদমনের অবসানের জন্য আন্দোলন হিসাবে পুনর্মূল্যায়নের সুযোগ করে দেয়।

বাস্তু-নারীবাদকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য নারীবাদের এই সম্প্রসারণের ধারণাগত যৌক্তিকতা দ্বিমুখী : প্রথমত, নারী ও প্রকৃতির উপর দ্বৈত অবদমনের ধারণাগত যোগসূত্র নিপীড়নমূলক পুরুষতান্ত্রিক ধারণাগত পরিকাঠামোর মধ্যে নিহিত আছে — এই ঘটনা এটি দেখিয়ে দেয় বাস্তুনারীবাদ কিভাবে এবং কেন নারীবাদকে প্রকৃতিবাদকে নির্মূল করার আন্দোলন হিসাবে বিস্তৃত করা আবশ্যিক। নিচের যুক্তিটির C মাধ্যমে এটি সুস্পষ্ট হয় :

C1 : নারীবাদী লিঙ্গবাদ আবসানের জন্য গড়ে ওঠা একটি আন্দেলন।

C2 : কিন্তু লিঙ্গবাদ প্রকৃতিবাদের সঙ্গে ধারণাগতভাবে সম্পর্কিত (প্রভূত্বজ্ঞাপক যুক্তিপ্রকরণের দ্বারা বিশেষিত একটি অবদমনমূলক ধারণাগত পরিকাঠামোর মধ্য দিয়ে)।

C3 : সুতরাং নারীবাদী প্রকৃতিবাদের অবসানের জন্য গড়ে ওঠা একটি আন্দোলনও।

যেহেতু লিঙ্গবাদ ও প্রকৃতিবাদের এই সম্পর্কসূত্রগুলি ধারণাগত, তাই প্রথাবাহী নারীবাদের যুক্তিতন্ত্র বাস্তুতাত্ত্বিক নারীবাদকে গ্রহণ করার দিকে আমাদের পরিচালিত করে।

দ্বিতীয়ত, বাস্তুনারীবাদকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য নারীবাদের অন্য যৌক্তিকতা লিঙ্গ (gender) এবং প্রকৃতির ধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত। লিঙ্গ-সম্পর্কিত ধারণাগুলি যেমন সামাজিকভাবে নির্মিত, তেমনি প্রকৃতি সম্পর্কিত ধারণাগুলিও সমাজ নির্মিত। অবশ্য নারী এবং প্রকৃতি সামাজিক নির্মিত — এই দাবী এটা অস্বীকার করে না যে জগতে অসংখ্য ব্যক্তি-মানুষ আছে, ঠিক যেমন জগতে গাছপালা, নদনদী বর্তমান। ইহা শুধু এটাই ইঙ্গিত করে যে ঐতিহাসিক এবং সামাজিক সত্তা হিসাবে নারী ও প্রকৃতিকে কিভাবে বিচার করা হয়েছে সেই ধারণাগুলি সংস্কৃতির ভিন্নতার কারণে এবং কালগতভাবে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। ফলত, প্রকৃতির অবদমন বা নিপীড়ন-সংক্রান্ত যেকোনো আলোচনা মানুষ কর্তৃক অ-মানব প্রকৃতির সামাজিক অবদমনের ঐতিহাসিকভাবে বিশেষ প্রকরণের প্রতি আমাদের পরিচালিত করে, ঠিক যেমন মানুষ কর্তৃক নারীর সামাজিক অবদমনের বিশেষ ঐতিহাসিক প্রকরণের দিকে নারীর অবদমন-সংক্রান্ত আলোচনা নির্দেশ করে।

এখন প্রশ্ন হল, প্রকৃতিবাদকে (naturism) একটি নারীবাদী বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে গিয়ে বাস্তুনারীবাদী প্রচলিত নারীবাদকে যেভাবে পুণর্বীক্ষণের প্রস্তাব করে বাস্তুনারীবাদ কি সেইভাবে নারীবাদের মধ্যে আসার জন্য পরিবেশনীতিশাস্ত্রের পুনর্বীক্ষণের প্রতিজ্ঞা করে?

৪.৭ বাস্তুনারীবাদ থেকে পরিবেশ-নীতিশাস্ত্রের উত্তরণ (Climbing from ecofeminism to environmental ethics) :

অনেক নারীবাদী এবং বেশকিছু পরিবেশ-নীতিশাস্ত্রকার নীতিতত্ত্বে দার্শনিকভাবে সম্ভাবনাময় বিষয় সার্থকভাবে তুলে ধরতে 'উত্তম-পুরুষ-আখ্যান' (first person narrative) ব্যবহার করেছেন। মুখ্যধারায় দার্শনিক নীতিশাস্ত্রে এই প্রচেষ্টা কখনই গুরুত্ব পায় নি। কিন্তু সমকালীন সমাজতাত্ত্বিকেরা মনে করেন, ব্যক্তিগত এবং

সামাজিক ইতিহাসের নথি তৈরি করার ক্ষেত্রে প্রথম-পুরুষের আখ্যান খুবই গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। ওয়ারেণ এখানে চারটি কারণের উল্লেখ করেছেন :

প্রথমত, প্রথম-পুরুষ আখ্যান অনুভূত সংবেদনশীলতাকে প্রয়োজনীয় স্বর (voice) প্রদান করে, যা প্রথাবাহী বিশ্লেষণধর্মী নৈতিক আলোচনায় অনুপস্থিত। এটি এমন প্রকরণ যা সম্পর্কগুলিকে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেয় এবং একই সঙ্গে রূপান্তরবাদী প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করে।

দ্বিতীয়ত, প্রথম-পুরুষ আখ্যান বৈচিত্র্যময় নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী তথা আচরণের প্রকৃত প্রকাশ ঘটাতে পারে।

তৃতীয়ত, কোনো কিছু জয় করা এবং কোনো কিছুর যত্ন নেওয়ার মধ্যে যে পার্থক্য তা একদিকে নারীবাদ এবং অন্যদিকে পরিবেশ নীতিশাস্ত্রের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। এর মধ্য দিয়ে নীতিশাস্ত্র তথা নৈতিক অর্থ কর্মকর্তার যে বিশেষ অবস্থানের মধ্যে থাকে তার থেকে বেরিয়ে আসা। ওয়ারেণের ভাষায়, 'It provides a way of conceiving of ethics and ethical meaning as emergign out of particular situations moral agents find themselves in, rather than as being imposed ao those situations (e.g., as a derivation or instantiation of some predetermined abstract principle or rule).' শেষত, আখ্যানের ব্যবহারে যুক্তিগত তাৎপর্য (argumentative significance) আছে। এর মধ্যে দিয়ে নৈতিক যুক্তি-তর্কের প্রসঙ্গটি সামনে আসে। একইসঙ্গে তা প্রযত্ন ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রকাশ করে। এই প্রসঙ্গে মেরিলীন ফ্রে একরোখা (arrogant) এবং ভালবাসার (loving)-এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য করেছেন। একরোখা দৃষ্টিভঙ্গি যেখানে জয় করে নেওয়ার আক্রমণাত্মক মনোভাবকে প্রকাশ করে, ভালবাসার দৃষ্টি সেখানে ব্যক্তিরা বিষয়ের প্রতি যত্নশীল হতে শেখায়। ক্যারোল গিলিগ্যানের দরদের নীতিতত্ত্ব এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। যখন কোনো ব্যক্তি কোনো একটি পর্বত শৃঙ্গে বিজয়ীর মতো আরোহণ করে তখন সে একরোখা দৃষ্টিতে প্রকৃতিকে দেখে, প্রকৃতির প্রভু হিসেবে নিজেকে ভাবে। কিন্তু যখন কেউ ভালবাসার দৃষ্টিতে দরদ দিয়ে শৃঙ্গে আরোহণ করতে যায় সে প্রতি পদক্ষেপে প্রকৃতির ডাক শুনতে পায়।

বস্তুত, বাস্তুনারীবাদ প্রকৃতিকে একরোখা প্রভুত্বকামী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখার দৃষ্টিকোণ থেকে সরিয়ে এনে ভালবাসা, প্রযত্নের দৃষ্টিতে মানবেতর প্রকৃতিকে দেখতে শেখায়।

৪.৮ বাস্তুনারীবাদ একাধারে নারীবাদী ও পরিবেশ সম্পর্কিত নীতিতত্ত্ব (Ecofeminism as a feminist and environmental ethic) :

নারীবাদী নীতিতত্ত্ব একদিকে যেমন নীতিশাস্ত্রে পুরুষালি একদেশদর্শিতাকে সমালোচনা করে তেমনি অন্যদিকে লিঙ্গ-অতিবর্তী নীতিতত্ত্ব গড়ে তুলতে সাহায্য করে। প্রযত্ন, বিশ্বাস, বন্ধুতা সম্পর্ক ইত্যাদি মূল্যের উপর এই নীতিভাবনা গুরুত্ব দেয়, প্রচলিত নীতিশাস্ত্র যেগুলিকে অপ্রয়োজনীয় বলে বাতিল করেছে। এই প্রসঙ্গে ওয়ারেণ নারীবাদী নীতিতত্ত্বের কতকগুলি পরিধি-নির্ণায়ক শর্তের কথা বলেছেন :

প্রথমত, নারীবাদী নীতিতত্ত্বে এমন কিছু থাকবে না, যা লিঙ্গবাদ, বর্ণবাদ, শ্রেণীবাদ ইত্যাদি সামাজিক অবদমনের কোনো 'বাদ'কে প্রশ্রয় দেয়। অবশ্য কাকে লিঙ্গবাদী আচরণ বলব, কোন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিকে বর্ণবাদী বলব এসব নিয়ে সামান্য মতভেদ থাকতে পারে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও নারীবাদী নীতিতত্ত্ব যেহেতু লিঙ্গবাদকে বর্জন করতে চায়, এবং লিঙ্গবাদ যেহেতু ধারণাগতভাবে বর্ণবাদ শ্রেণীবাদ এবং প্রকৃতিবাদ-এর সঙ্গে

অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত, সেহেতু নারীবাদী নীতিতত্ত্ব অবশ্যই লিঙ্গবাদ বিরোধী, বর্ণবাদ-বিরোধী এবং প্রকৃতিবাদ-বিরোধী হবে।

দ্বিতীয়ত, নারীবাদী নীতিতত্ত্ব প্রসঙ্গ-নির্ভরতাবাদী (contextualist)। প্রসঙ্গ-নির্ভর নীতিতত্ত্ব বলতে আমরা সেই ধরনের নীতিতত্ত্বকেই বুঝবো যেখানে নীতিশাস্ত্রের আলোচনা ও অনুশীলন বিভিন্ন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে অবস্থিত বিভিন্ন মানুষের বাস্তব স্বর থেকে বেড়িয়ে আসে। কোলাজ যেমন অনেকগুলি খণ্ড খণ্ড চিত্র দিয়ে গড়ে ওঠে, প্রসঙ্গ-নির্ভর নীতিতত্ত্ব সেভাবে গড়ে ওঠে। এখানে সব স্বরগুলি একটিমাত্র সার্বত্রিক স্বরে হারিয়ে যায় না, কিন্তু তাদের মধ্যে একটা 'প্যাটার্ণ' থাকে। আর প্রসঙ্গ-নির্ভর নীতিতত্ত্ব যেখানে নারীবাদী, সেখানে ইহা সকল নারীর স্বরকে কেন্দ্রে স্থান দেবে।

তৃতীয়ত, নারীবাদী নীতিশাস্ত্র যেহেতু নারীর স্বরগুলির বৈচিত্র্যকে গুরুত্ব দেয়, তাই নারীবাদী কোনো নীতিতত্ত্ব অবশ্যই বহুত্ববাদী হবে, একত্ববাদী বা রূপান্তরবাদী হবে না। নারীবাদী নীতিসত্ত্ব এই পূর্বস্বীকৃতিকে অস্বীকার করে যে নারীর একটিমাত্র স্বর আছে, যার ভাষায় নৈতিকমূল্যগুলি বিশ্বাসগুলি, দৃষ্টিভঙ্গিগুলি তথা আচরণধারাগুলিকে মূল্যায়ন করা যায়।

চতুর্থত, নারীবাদী নীতিতত্ত্ব নৈতিক তত্ত্বকে প্রক্রিয়ার মধ্যে অবস্থানকারী হিসাবে বিবেচনা করে (ওয়ারেণের ভাষায়, 'reconceives ethical theory as theory 'in process' which will change over time') অন্যান্য তত্ত্বের মতো নারীবাদীতত্ত্বে অবশ্যই কিছু সামান্যীকরণের প্রচেষ্টা থাকবে। কিন্তু এই সামান্যীকরণ যেন ভিন্ন ভিন্ন প্রাণবান স্বরগুলিকে বিনষ্ট করে না দেয়।

পঞ্চমত, নারীবাদী নীতিতত্ত্ব অন্তর্ভুক্তি (inclusiveness)-এর ভাষায় বোধব্য। এই নীতিতত্ত্ব যেহেতু প্রসঙ্গ-নির্ভর, অবয়বগতভাবে বহুল, যেহেতু এর ভিন্ন ভিন্ন স্বর আছে, তাই এই তত্ত্বকে অন্তর্ভুক্তিবাদী বলা যেতে পারে। অন্তর্ভুক্তির শর্ত দাবী করে যে নিপীড়িত ব্যক্তি হিসাবে নারীর বিচিত্র স্বরকে তত্ত্ব রচনার ক্ষেত্রে যথাযথ গুরুত্ব ও বৈধতা দেবে।

ষষ্ঠত, নারীবাদী নীতিতত্ব 'বস্তুগত' (objective) দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করার ব্যাপারে ততটা আগ্রহী নয়। ইহা বিভিন্ন সংস্কৃতির স্বরকে সমান গুরুত্ব দিতে চায়। তাই এই নীতিতত্ত্ব মূল্যনিরপেক্ষ বা বস্তুগত — এই অর্থে সমদর্শী নয়।

সপ্তমত, নারীবাদী নীতিশাস্ত্র প্রযত্ন, ভালবাসা, বন্ধুত্ব এবং বিশ্বাসযোগ্যতা ইত্যাদি মূল্যবোধকে চিন্তাভাবনার কেন্দ্রে স্থান দেয়, প্রচলিত নীতিশাস্ত্র যেসব মূল্যকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে না। তবে এইসব মূল্যগুলোকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে অধিকার, নিয়ম বা উপযোগিতা বিচারকে এই নীতিশাস্ত্র কম গুরুত্ব দিয়েছে — এরকম ভাবা ঠিক নয়। যেমন চুক্তি বা সম্পত্তি-সম্পর্কের ক্ষেত্রে অধিকারের কথা বলা যথোচিত, যেখানে তুল্যমূল্য বিচারের প্রশ্ন সেখানে উপযোগিতার কথা বলা খুবই প্রাসঙ্গিক। প্রসঙ্গ-নির্ভর নীতিশাস্ত্র হিসাবে নারীবাদী নীতিশাস্ত্রে এই ধরনের কথা বলা উপযুক্ত কিনা তা পরিস্থিতি-প্রসঙ্গের উপর নির্ভর করে।

অষ্টমত, নারীবাদী নীতিতত্ত্ব মানুষ হওয়া বলতে বা মানুষের নৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়া বলতে কি বোঝায় তার পুনর্বিচারের কথা বলে। পরিস্থিতি নিরপেক্ষভাবে মানব সারসত্তার কথা বলা বা মানব প্রকৃতির কথা বলার সাবেকি বিচার-ধারাকে এই নীতিতত্ত্ব বাতিল করেছে।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি কিভাবে বাস্তুনারীবাদ এক স্বতন্ত্র নারীবাদী তথা পরিবেশ সংক্রান্ত নীতিতত্ত্বের পরিকাঠামো সরবরাহ করে। এটি এমন ধরনের এক নারীবাদ যা পরিবেশ-নীতিশাস্ত্রসহ নীতিতত্ত্বে যেখানেই পুরুষ-পক্ষপাতের প্রকাশ দেখে সেখানেই প্রতিবাদ ধ্বনিত করে। একই সঙ্গে এই নারীবাদ এমন এক পরিবেশ নীতিশাস্ত্রের সন্ধান দেয় যা নারীদাবী নীতিতত্ত্বের প্রাথমিক শর্তগুলি পূরণ করে। ওয়ারেণ এর নিম্নোক্ত রূপ বিবরণ দিয়েছেন :

১. বাস্তুনারীবাদী আবশ্যিকভাবে অ-প্রকৃতিবাদী (antinaturist)। ইহা অ-মানব প্রকৃতির প্রতি সেই ধরনের চিন্তা-ভাবনা তথা আচরণধারাকে বাতিল করে, যা প্রভূত্বের পক্ষে যুক্তি মূল্যবোধ বা দৃষ্টিভঙ্গিকে পুষ্ট করে। এর অ-প্রকৃতিবাদী, অ-লিঙ্গবাদী, অ-বর্ণবাদী অবস্থান এর পরিসীমাকে নির্ধারণ করে। অর্থাৎ বাস্তুনারীবাদে এমন কিছুই থাকবে না, যা প্রকৃতিবাদকে বা লিঙ্গবাদকে বা বর্ণবাদকে প্রশয় দেয়।

২. বাস্তুনারীবাদ প্রসঙ্গ-নির্ভর এক নীতিতত্ত্ব। অধিকার, উপযোগিতা বা সার্বত্রিক নিয়মের ভাষায় নৈতিকতাকে ব্যাখ্যা করার সাবেকি ধারা থেকে বেরিয়ে এসে এই নীতিতত্ত্ব সম্পর্কের নীতিতত্ত্বের সূচনা করে। আর সম্পর্ক মানেই তা পরিস্থিতি-নির্ভর। তবে বাস্তুনারীবাদী অ-মানব প্রকৃতির প্রতি নৈতিক মনোযোগ দেওয়ার যুক্তি হিসাবে যুক্তি হিসাবে যুক্তিবত্তা, স্বার্থ, নৈতিক কর্তৃত্ব ইত্যাদি সাবেকি বিচার-ধারার পরিবর্তে বাস্তুসম্প্রদায়ের সদস্য হিসাবে মানুষ হওয়া বলতে কি বোঝায়, এবং নৈতিক দৃষ্টিতে মানুষের জন্য অ-মানব জগতের অবস্থানের স্বরূপ নিরূপণ করে এই বিচারধারাকে আমরা বলতে পারি '[A] highly contextual account to see clearly what a human being is and what the nonhuman world might be, morally speaking, for human beings.'

৩. বাস্তুনারীবাদ অবয়বগতভাবে বহুত্ববাদী, ইহা স্বাতন্ত্র্য (difference) কেও গুরুত্ব দেয়। বাস্তুনারীবাদ যখন প্রকৃতি / সংস্কৃতি — এই দ্বৈতবাদের বিরোধিতা করে, তখনও স্বীকার করে যে মানুষ যেমন বাস্তুম্প্রদায়ের সদস্য তেমনি অন্য কিছু দিক থেকে তারা স্বতন্ত্রও। লক্ষ্যণীয় যে বাস্তুনারীবাদের সম্পর্ক তথা সম্প্রদায়ের উপর গুরুত্ব স্বাতন্ত্র্য তথা বৈচিত্র্যকে মুছে দেয় না। আসলে বাস্তুনারীবাদ এমন এক বিচারধারার প্রবর্ত্তন করে যেখানে পার্থক্য বা স্বাতন্ত্র্য (difference)-কে উপযুক্তভাবে স্বীকার করা হবে, অথচ তা নিপীড়ন-অবদমনের কারণ হবে না।

৪. বাস্তুনারীবাদ কোনো তত্ত্বকে স্বয়ংসম্পূর্ণ, বদ্ধতত্ত্ব হিসাবে স্বীকার করে না। এর অন্তর্দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে যে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নতুন নতুন অর্থ সামনে আসে এবং সেগুলিকে তত্ত্বে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা থাকে। বাস্তুনারীবাদীরা এ প্রসঙ্গে প্রথম-পুরুষ আখ্যানের কথা বলেছেন, যা ইঙ্গিত করে যে নীতিতত্ত্বের বিষয় সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়, ঠিক যেমন নারীর জীবনের ঐতিহাসিক ও বস্তুগত বাস্তবতার পরিবর্তনের সাথে সাথে নারীর অভিজ্ঞতা তথা বোধের পরিবর্তন ঘটে।

৫. বাস্তুনারীদাব অন্তর্ভুক্তিবাদী (inclusivist)। বাস্তুনারীবাদ অগণিত নারীর বিচিত্র অভিজ্ঞতা থেকে গড়ে ওঠে। বিভিন্ন সমাজের নারী বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকারক অবদমনের শিকার হয়। শ্বেতাঙ্গ নারীর অভিজ্ঞতা কৃষ্ণাঙ্গ নারীর অভিজ্ঞতা থেকে আলাদা, ভারতীয় নারীর অভিজ্ঞতা ইউরোপীয় নারীর অভিজ্ঞতা থেকে আলাদা। বাস্তুনারীবাদী সকলের অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দিয়ে বিচার করতে চায়।

৬. নারীবাদী হিসাবে বাস্তুনারীবাদ কোনো বস্তুগত দৃষ্টিকোণ গড়ে তোলার চেষ্টা করে না। বাস্তুনারীবাদকে তাই সামাজিক বাস্তুনারীবাদ (social ecology)-ও বলা হয়। এখানে নারী এবং প্রকৃতির উপর প্রভূত্বকে সামাজিক সমস্যা হিসাবে বিচার করে, এবং মনে করে যে এর শিকড় রয়েছে মূর্ত, ঐতিহাসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং অবদমনমূলক পিতৃতান্ত্রিক ধারণাগত পরিকাঠামোর মধ্যে, যা এই অবদমনকে টিকিয়ে রাখে।

৭. বাস্তুনারীবাদ প্রযত্ন, ভালবাসা, বন্ধুতা, বিশ্বস্ততা এবং যথোপযুক্ত পারস্পরিকতা এই সব মূল্যবোধকে বিচার-বিবেচনার কেন্দ্রে স্থান দেয়। এই সব কিছুই অন্যের প্রতি আমাদের সম্পর্কের গুরুত্ব দেওয়া।

৮. বাস্তুনারীবাদী নীতিতত্ত্ব মানুষ হওয়া বলতে কি বোঝায় এবং মানুষের নৈতিক আচরণ বলতে কি বোঝায় — এই সব প্রশ্নের পুনর্বিচারের কথা বলে। বাস্তুনারীবাদ বিমূর্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিরোধিতা করে। মানুষ মানেই অপরাপর মানুষ ও মনুষ্যেতর প্রাণীদের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই সম্পর্ককে বাদ দিয়ে মানুষের কল্পনা অর্থপূর্ণ নয়। অ-মানব পরিবেশের প্রতি মানুষের সম্পর্কসূত্রগুলি অন্তত আংশিকভাবে মানুষকে গঠন করে।

নারী ও প্রকৃতির অবদমনের মধ্যেকার আন্তর্সম্পর্কগুলির এভাবে স্পষ্টীকরণের মাধ্যমে বাস্তুনারীবাদী এটা দেখায় যে দুই ধরনের অবদমনই নারীবাদী বিষয়। একই সঙ্গে ইহা প্রমাণ করে যে উভয়ের সুস্পষ্ট স্বীকৃতি যে কোনো দায়িত্বশীল পরিবেশ-নীতিশাস্ত্রের পক্ষে আবশ্যিক। বস্তুতপক্ষে, নারীর উপর অবদমন নিপীড়নকে নিঃশেষ করতে হলে নারীবাদকে অবশ্যই বাস্তুতাত্ত্বিক নারীবাদ অঙ্গীভূত করতে হবে, যেহেতু নারীর অবদমন ধারণাগতভাবে এবং ঐতিহাসিকভাবে প্রকৃতির অবদমনের সঙ্গে সম্পর্কিত।

দায়িত্বশীল পরিবেশ-নীতিতত্ত্বকেও আবশ্যিকভাবে নারীবাদকে অঙ্গীভূত করতে হবে। তা না হলে আপাত বিচারে খুবই বৈপ্লবিক এবং সমগ্রতাবাদী নীতিতত্ত্ব ও প্রকৃতি এবং নারীর পরস্পর-সম্পর্কিত অবদমনকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করতে ব্যর্থ হবে।

৪.৯ বাস্তুনারীবাদের পর্যালোচনা :

বাস্তু-নারীবাদের পর্যালোচনা একটি বিষয় লক্ষিত হয় যে অবদমন-প্রভূত্বের এই তত্ত্বকে এর সমর্থকেরা পররর্ত্তী পর্যায়ে **যাবতীয় অবদমন-নিপীড়নের এক সাধারণতত্ত্ব** (a general theory of oppession) হিসাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। ভ্যাল প্লামউড (Val Plumwood) এই উদ্যোগের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা। তিনি সামাজিক বাস্তুবাদ (social ecology), গভীর বাস্তুবাদ (deep ecology) এবং বাস্তুতাত্ত্বিক নারীবাদ (ecological feminism) এদের বিকল্প বিচার ধারার মধ্যে আন্তঃসম্পর্কের সুলুক সন্ধান করেছেন এবং তার মধ্য দিয়ে প্রভূত্ববাদের এক সাধারণ তত্ত্ব (a general theory of domination) দাঁড় করাতে চেয়েছেন। বলা বহুল্য, উল্লেখিত এই তিন প্রকার বাস্তুদর্শনের বেশ কিছু বৈধ অর্ন্তদৃষ্টি রয়েছে। এই অর্ন্তদৃষ্টি গুলির সন্ধান দিতে গিয়ে তারা অন্য প্রকার বাস্তুবাদী তত্ত্বকে সমালোচনায় বিদ্ধ করেছেন। গভীর বাস্তুবাদ যখন সামাজিক বাস্তুবাদের নিছক পুরুষকেন্দ্রিকতা (androcentrism)-কে প্রশ্নবিদ্ধ করে তখন তাঁদের বক্তব্য সঠিক বলেই মনে হয়। তবে সাধারণভাবে মানবকেন্দ্রিকতাকে তুলে না ধরে কেবল পুরুষালি ভাবনাকে বাস্তুধ্বংসের কারণ হিসাবে দেখাতে গিয়ে সামজিক বাস্তুবাদীরা অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। অন্য দিকে আবার সামাজিক বাস্তুবাদ যখন সমাজের স্তরবিন্যাসগত পার্থক্যের ভাষায় পরিবেশ ধ্বংসের ব্যাখ্যা দেয় তখন তাদের বক্তব্য যথার্থ বোধ হয়। কিন্তু এই দুটি তত্ত্ব পরস্পর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র-এই ভাবনাটি সমস্যার সৃষ্টি করে। প্লামউডের মতে, বাস্তুনারীবাদের লক্ষ্যের প্রতি নিষ্ঠা

আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে বিভিন্ন প্রকার নিপীড়ন-অবদমনের মধ্যে কোথাও এক যোগসূত্র রয়েছে। এই যোগসূত্রকে সম্যক অনুধাবন করতে পারলে আমরা যাবতীয় নিপীড়ন-অবদমন থেকে মুক্তির পথ দেখাতে পারবো। নারী, সংখ্যালঘু মানুষজন, উপনিবেশবাসী, প্রাণী ও প্রকৃতি সকলেই নিপীড়িত-অবদমিত। যদিও বাস্তুনারীবাদীরা নারী ও প্রকৃতির ওপর শোষণ-অবদমনকে কেন্দ্রীয় বিষয় হিসাবে দেখেন তথাপি অন্যান্য প্রকরণের প্রভুত্ববাদের বিশ্লেষণ আমাদের সমস্যার ব্যাপকতাকে বুঝতে সাহায্য করে। কেননা প্লামউডের মতে, '[T] he oppressed are often both feminised and naturalised' তিনি মনে করেন, বিভিন্ন ধরনের প্রভুত্বের মধ্যে মাকড়সার জালের মত আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে। আমরা যদি এই জটিল জালে বিস্তৃত প্রভুত্বকামিতার বিভিন্ন রূপকে না বুঝি, কেবল এর একটিমাত্র দিককে নিয়ে নিশ্চিন্তে বসে থাকি এবং অন্য তাত্ত্বিক প্রকরণকে কেবল সমালোচনা করি তাহলে আমরা আমাদের লক্ষ্যে কখনই পৌঁছাতে পারব না। এক সংহত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নিপীড়ন-অবদমন প্রভুত্বের বিষয়টিকে বুঝতে হবে। আশার কথা, সমকালীন চিন্তাবিদেরা এই আর্ন্তসম্পর্ককে বুঝতে সচেষ্ট হয়েছেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাবকে কাটিয়ে সহযোগিতার মনোভাব দেখাচ্ছেন।

আর একটি প্রসঙ্গ : পরিবেশ-প্রকৃতির প্রতি নারীর এক গভীর সমব্যথা আছে, নারীই পারে প্রকৃতির সার্তক যত্ন নিতে — বাস্তুনারীবাদের এই বক্তব্য নারীর এক সার-ধর্মের প্রতি আমাদের ইঙ্গিত করে না কী? অন্য ভাষায় বললে, এই স্বীকৃতি শেষ পর্যন্ত আমাদের **সারধর্মবাদ (essentialism)**-এ পৌঁছে দেয়, যা নারীমুক্তি আন্দোলনকে এক পা পিছিয়ে এগিয়ে দিয়ে দুই পা পিছিয়ে দেয়। নারীর অবস্থান প্রকৃতির কাছাকাছি বা নারী প্রকৃতিস্বরূপা — এই অভিমত পরোক্ষে নারীকে সন্তানাদির লালন-পালন সেবামূলক কাজ তথা গৃহস্থালির তুচ্ছ কাজকর্মের মধ্যে তাদের জগৎকে নির্দিষ্ট করে দেয় না কী? গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক তথা গণ পরিসর (public sphere) থেকে নারীদের সরিয়ে রেখে এতদিন ধরে চলে আসা পুরুষ প্রভুত্ববাদকেই পরোক্ষে মেনে নেওয়া হচ্ছে না কী? অনেকে মনে করেন, বাস্তুনারীবাদ নারীমুক্তি আন্দোলনকে এগিয়ে দেবার পরিবর্তে পশ্চাদগামী করে।

সারধর্মবাদের এই অভিযোগের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব এলিজাবেথ কারলাসের (Elizabeth Carlassare) 'এসেন্সিয়ালিজম ইন ইকোফেনিনিস্ট ডিসর্কোস'-প্রবন্ধটির অনুসরণে। আলোচনার শুরুতেই এটা বলে রাখা ভালো যে বাস্তুনারীবাদের একটি মাত্র সর্বসম্মত ভাষ্য নেই। এই বাস্তু-নারীবাদের মধ্যেই আমরা পাই সামাজিক তথা সমাজতান্ত্রিক বাস্তুনারীবাদ (social and socialist ecofeminism), যে তত্ত্বের সমর্থকরা শ্রেণীবৈষম্য ও পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কাঠামোকে ব্যাখ্যা করতে বস্তুবাদী পদ্ধতির প্রয়োগ করেন। একই সঙ্গে আমরা পাই সাংস্কৃতিক বাস্তুনারীবাদ (cultural ecofeminism) যাদের সমর্থকরা আধ্যাত্মিক বা অনুসঙ্গমূলক ও কাব্যিক বিচারধারা অনুসরণ করে ব্যক্তিগত তথা বৃহত্তর সামাজিক স্তরে নিপীড়ন-অত্যাচারের বিচার বিশ্লেষণ করে থাকেন। বাস্তুনারীবাদীদের মধ্যে অনেক সমালোচক আছেন যাঁরা সামাজিক তথা সমাজতান্ত্রিক বাস্তুনারীবাদীদের নির্মাণবাদ (constructionism)-এর সঙ্গে একাত্ম হয়ে সাংস্কৃতিক বাস্তুনারীবাদে সারধর্মবাদ (essentialism)-এর সমালোচনা করেন। সারধর্মবাদ অনুসারে একজন বিষয়ী প্রাক্-সামাজিক, সহজাত ও অপরিবর্তনীয় কিছু গুণাগুণ তথা বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে গড়ে ওঠে। বিপরীতে, নির্মাণবাদের বিচারে একজন বিষয়ী জটিল এবং পরিবর্তনশীল সামাজিক, ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে ক্রমশ নির্মিত হয়। সারধর্মবাদীর চোখে নারী ও

পুরুষ এমন কিছু বিশেষ বিশেষ সহজাত বৈশিষ্ট্য তথা সারধর্মের সমন্বয়ে সৃষ্ট যা ইতিহাসগত বা সাংস্কৃতিকগতভাবে আপতিক বা অনির্দিষ্ট নয়, বরং চিরন্তন,অপরিবর্তনীয়। অনেকে একে স্থির জীবতত্ত্বের পরিণাম হিসাবে বিচার করেছেন।

বলা বাহুল্য, বাস্তুনারীবাদী যাঁরা নারীত্বের মানবিক বাঁধাধরা ছাঁচকে অতিক্রম করতে চান তাঁদের কাছে নারীত্বের সারধর্মবাদী ব্যাখ্যা বড় ধরনের সমস্যা তৈরী করে। এঁদের বিচারে, পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী পুরুষতন্ত্র নারীকে যে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম করা হয়েছে তা এক প্রকার সামাজিক নির্মাণ। নারী ও প্রকৃতির মুক্তি তখনই ঘটবে যখন বৈপ্লবিক সামজিক পরিবর্তনের মাধ্যমে যেসব ব্যবস্থা বা তন্ত্র মানুষের অবদমন-নিপীড়নের উপর ভিত্তিশীল তার উচ্ছেদ ঘটবে। তার জায়গায় অ-ক্রমবিন্যাসগত, অ-প্রভুত্বকামী সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। এই ভাবনায় সাংস্কৃতিক বাস্তুনারীবাদে যে সারধর্মবাদের অনুষঙ্গ তা নারীবাদ তথা বাস্তুনারীবাদের মূল উদ্দেশ্য — নারী ও প্রকৃতির মুক্তি — তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ মনে হয় না। অনেক নারীবাদী মনে করেন, এই সারধর্মবাদী যুক্তিতন্ত্রকে কৌশলে ব্যবহার করে নারীর ওপর এতদিন ধরে চলে আসা অত্যাচার-নিপীড়ন-অবদমনকে স্বাভাবিক প্রতিপন্ন করা হয়েছে। সারধর্মবাদের এই 'পশ্চাদমুখী সম্ভাবনা'-এর বিষয়টি সামাজিক তথা ও প্রকৃতি নারীর অবদমনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আছে, তথাপি নারী বা প্রকৃতি কোনটিরই সহজাত সারধর্ম নেই। আমরা অনেক সময় সারধর্মের কথা বলি, কিন্তু মনে রাখতে হবে সারধর্ম মাত্রই সার্বত্রিক (universal) বা প্রাক্‌সামাজিক (pre-social) নয়, তা সামাজিক কাঠামোর নিয়ামকও নয়। ক্যারোলিন মার্চেন্টও মনে করেন, যৌন-পরিচয়, লিঙ্গ-পরিচয় বা প্রকৃতির কোন অপরিবর্ত্তনীয় সার-বৈশিষ্ট্য নেই।

এলিজাবেথ কারলাসেরও মনে করেন, সারধর্মমাত্রেই অপরিবর্তনীয় স্থায়ী-এরকম ভাবনা যর্থাথ নয়। আর সারধর্ম নির্মিত হয়-এই দিক থেকে যদি বিচার করি তাহলে সাংস্কৃতিক বাস্তুনারীবাদের সারধর্মবাদ এবং সামাজিক তথা সমাজতান্ত্রিক বাস্তুনারীবাদের নির্মাণবাদের মধ্যে বিরোধের মীমাংসা সম্ভব। প্রকৃতির সঙ্গে নারীকে সংযুক্ত করা এবং পুরুষকে সংস্কৃতির সঙ্গে সংযুক্ত করার যে কথিত সারধর্মবাদী প্রচেষ্টা তাকে প্রতিবাদের কৌশল হিসাবেই দেখা যেতে পারে। বাস্তুনারীবাদীদের কেউ কেউ দেখিয়েছেন কিভাবে নারীত্বের সারধর্ম ঐতিহাসিকভাবে নির্মিত (historically constituted) হয়। তাই কারলাসের বলতে চান, কথিত সারধর্মবাদী রচনাগুলিকে পশ্চাদমুখী ভাবনা হিসাবে না দেখে সচেতন বিরোধিতার কৌশল (a conscious oppositional strategy) হিসাবে দেখা বাঞ্ছনীয়।

কারলাসেরকে অনুসরণ করে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে বাস্তুনারীবাদীর বিরুদ্ধে সারধর্মবাদের অভিযোগ তাকে আপাতভাবে বুঝলে চলবে না। একটু গভীরে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে এই সারধর্মবাদের নারীত্বের সারধর্মের প্রসঙ্গ তলে পরোক্ষ নারীমুক্তির পক্ষেই সওয়াল করা হয়েছে।

৪.১০ সারসংক্ষেপ

এই পাঠ-এককে আমরা বাস্তুনারীবাদের একটি পরিচয় চেষ্টা করেছি। বাস্তুনারীবাদের মূল বক্তব্য, কয়েকজন প্রধান বাস্তুনারীবাদীর বক্তব্য তুলে ধরেছি। ওয়ারেণের প্রবন্ধ অনুসরণ করে নারী ও প্রকৃতির মধ্যেকার যোগসূত্রসমূহ ব্যাখ্যা করেছি, নিপীড়নমূলক ধারণাগত পরিকাঠামোর স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছি। একই সঙ্গে বাস্তু-নারীবাদের সঙ্গে নারীবাদের সম্পর্ক, পরিবেশ-নীতিশাস্ত্রের সম্পর্ক ও এদের মধ্যেকার সাধারণ ক্ষেত্র

তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। বাস্তনারীবাদের বিরুদ্ধে উঠা সারধর্মের অভিযোগের উত্তর খোঁজার মধ্য দিয়ে এই পর্যালোচনা শেষ হয়েছে।

৪.১১ নমুনা প্রশ্নাবলী :

1. What is ecofeminsm ? Bring out its main tenets.

2. What is, according to Warren, an oppressive conceptual framework ? Explain its nature and function.

3. Elucidate ecofeminism as feminist and environmental ethic.

4. Define ecofeminism. Does the ecofeminism reconceive feminism ? Discuss.

5. What is essentialism ? Does the ecofeminism contention that women are closer to nature lead to feminine essentialism ? Discuss critically.

6. Write notes on

   a) The logic of domination

   b) Androcentrism in environmental ethics

   c) Woman-nature connections

   d) Social Ecology

৪.১২ গ্রন্থ নির্দেশ :

সিলেবাস-নির্দিষ্ট প্রবন্ধ Karen J. Warren এর ‘The Power and Promise of Ecological Feminism’ অবশ্যপাঠ্য। এর অতিরিক্ত Karen J. Waren এর Ecofeminism এর 'Introduction' নামে একটি রচনা (যা Environmental Philosophy : FromAnimal Rights to Radical Ecology (eds. Maichael E. Zimmermanetat বই-এ পাওয়া যাবে) এবং নিম্নলিখিত তিনটি প্রবন্ধ প্রাসঙ্গিক বিবেচিত হয় :

১. Francoise d' Eavbonne : 'The Time for Ecofeminism' (Trans. by Ruth Hottell)

২. Val Plamwood : 'Ecosocial Feminism as a General Theory of Oppression'

৩. Elizabeth Carlassar : ' Essentialism in Ecofeminist Discourse'

(এই তিনটি প্রবন্ধ Carolyn Merchant (ed) Ecology : Key Concepts in Critical Theory, Rawat Publication, Jaipur & New Delhi, 1996 গ্রন্থে পাওয়া যাবে)

Philosophy 8 Paper Part 2

ORIGINALITY REPORT

3%	3%	1%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	singhaniauniversity.co.in Internet Source	1%
2	pilatus.web.psi.ch Internet Source	<1%
3	ekdin-epaper.com Internet Source	<1%
4	aleksander-lobanov.com Internet Source	<1%
5	hindusamhati.net Internet Source	<1%
6	bugs.freedesktop.org Internet Source	<1%
7	documents.mx Internet Source	<1%
8	dodl.klyuniv.ac.in Internet Source	<1%
9	parbo.in Internet Source	<1%

10	es.scribd.com Internet Source	<1 %
11	trumpeter.athabascau.ca Internet Source	<1 %
12	investor.sebi.gov.in Internet Source	<1 %
13	www.kmcgov.in Internet Source	<1 %
14	download.nos.org Internet Source	<1 %
15	Submitted to Clarkson University Student Paper	<1 %
16	Sandler, Ronald. "Environmental Ethics", Oxford University Press Publication	<1 %
17	Joon Woo Son. "Intelligent rain sensing and fuzzy wiper control algorithm for vision-based smart windshield wiper system", Journal of Mechanical Science and Technology, 09/2006 Publication	<1 %
18	timhayward.files.wordpress.com Internet Source	<1 %
19	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
	www.hindusamhati.com	

20	Internet Source	<1 %
21	www.buruniv.ac.in Internet Source	<1 %
22	mafiadoc.com Internet Source	<1 %
23	Submitted to Santa Rosa Junior College Student Paper	<1 %
24	wbfbcp.org Internet Source	<1 %
25	bdnet.weebly.com Internet Source	<1 %
26	crijaf.icar.gov.in Internet Source	<1 %
27	Lautemann, Sven-Eric. "Schemaevolution in objektorientierten Datenbanksystemen auf der Basis von Versionierungskonzepten", Publikationsserver der Goethe-Universität Frankfurt am Main, 2003. Publication	<1 %
28	Shibo He, Jiming Chen, Xu Li, Xuemin Shen, Youxian Sun. "Leveraging Prediction to Improve the Coverage of Wireless Sensor Networks", IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 2012 Publication	<1 %

29	www.duo.uio.no Internet Source	<1%
30	Amkee Kim. "Study of Al-alloy foam compressive behavior based on instrumented sharp indentation technology", Journal of Mechanical Science and Technology, 06/2006 Publication	<1%
31	Donald Buzzelli. "Serious deviation from accepted practices", Science and Engineering Ethics, 1999 Publication	<1%
32	Fabrício Klain Cristofoletti. "A fenomenologia de Husserl como herança científica", Primeiros Escritos, 2003 Publication	<1%
33	Grammig, Joachim, Hujer, Reinhard and Kokot, Stefan. "Time varying trade intensities and the Deutsche Telekom IPO", Publikationsserver der Goethe-Universität Frankfurt am Main, 2005. Publication	<1%
34	Lluch Lafuente, Alberto. "Directed search for the verification of communication protocols", Universität Freiburg, 2003. Publication	<1%
35	Peter Hay. "2 ECOPHILOSOPHY", Walter de Gruyter GmbH, 2019 Publication	<1%

36	"Umwandlung von Primärenergie in Kraftwerken", Elektroenergiesysteme, 2006 Publication	<1 %
37	Chang- Hyun Sohn. "Experimental and Numerical Studies in a Vortex Tube", Journal of Mechanical Science and Technology, 03/2006 Publication	<1 %
38	Rafal Krolikowski, Andrzej Czyzewski. "Chapter 14 Noise Reduction in Telecommunication Channels Using Rough Sets and Neural Networks", Springer Science and Business Media LLC, 1999 Publication	<1 %
39	Stünkel, Steffen. "Kohlendioxid-Abtrennung in der Gasaufbereitung des Prozesses der oxidativen Kupplung von Methan", Technische Universität Berlin, 2013. Publication	<1 %

Exclude quotes	On	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	On		